মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ রচনা সংকলন

শতবার্ষিকী সংস্করণ

আবির্ভাব — ২২শে ভাদ্র, ১২৯৪ (7th Sept., 1887)
তিরোধান — ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ (12th June, 1976)

মহামহোপাধ্যায়
গোপীনাথ কবিরাজ রচনা সঙ্কলন

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ
শতবার্ষিকী উৎসব সমিতি

প্রকাশক :
সম্পাদক,
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ
শতবার্ষিকী উৎসব সমিতি
ভাদাইনী, বারাণসী-২২১ ০০১

প্রচ্ছদ : দেবব্রত চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৯৬
ইং ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯০

মূল্য : চল্লিশ টাকা

মুদ্রক :
দি ইউরেকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড্
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রকাশকের নিবেদন

আচার্যবর্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। নানা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ উদার হস্তে অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগও তাঁহাদের সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। সকলের এই সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতির পক্ষে সমস্ত কর্মসূচী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইয়াছে।

তবু একটি কাজ আমাদের সমিতির পক্ষ হইতে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়েই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। তাহা হইল পূজনীয় কবিরাজ মহাশয়ের নিজস্ব রচনাবলী হইতে বাছাই করিয়া একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করা। অবশ্য 'নবোন্মেষ' নাম দিয়া সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজি ও বাংলায় নানা মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ের রচনাবলীর একটি সুবিশাল গ্রন্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে আমরা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি কিন্তু তাঁহার নিজস্ব রচনাবলীর সামান্য অংশও তাহাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ভারত সরকারের আর্থিক আনুকূল্যের ফলে তাহাও এতদিনে প্রকাশ করা সম্ভব হইল, ইহাতে আমরা যেন এই শতবার্ষিকী জন্মোৎসব মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে পারিলাম বলিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ করিতেছি।

পূজনীয় কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে যে নিরবচ্ছিন্ন সারস্বত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার স্বর্ণময় উজ্জ্বল ফসল তাঁহার অজস্র রচনাবলীতে সকলের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়াই তিনি অমর হইয়া থাকিবেন এবং চিরদিন সকলের মনে প্রেরণা দান করিয়া চলিবেন। ভবিষ্যতে কোনদিন তাঁহার রচনাসমগ্র যথাযথভাবে সম্পাদিত হইয়া গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা রাখি, কারণ তাঁহার প্রত্যেকটি রচনাই একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ এবং তাহাদের সুরক্ষার ভার জাতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা এখানে তাঁহার ইতিপূর্বে প্রকাশিত নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী হইতে সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম এবং এইটুকুর মধ্য দিয়া তাঁহার অপার ও অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও দীপ্তির চকিত উদ্ভাস সকলে লাভ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কত অনন্ত শাখা-প্রশাখায় তাঁহার জ্ঞানের পরিধি যে বিস্তৃত ছিল এবং প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি কি ভাবে অভিনব আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও পরিচয় এই সামান্য সঙ্কলনে সকলে লাভ করিতে পারিবেন। এই সঙ্কলন প্রকাশের দ্বারা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো আমাদের এই সমিতির শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল এবং বিশুদ্ধজ্ঞানদেহ এই বিদেহ মহাপুরুষের অমর বাঙ্‌ময় বিগ্রহও স্থাপিত হইল, যাহা চিরদিনই সকলের আরাধনা ও প্রেরণার উৎসস্থল হইয়া থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সূচীপত্র

আমরা এখানে তাঁহার ইতিপূর্বে প্রকাশিত নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী হইতে সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম এবং এইটুকুর মধ্য দিয়া তাঁহার অপার ও অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও দীপ্তির চকিত উদ্ভাস সকলে লাভ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কত অনন্ত শাখা-প্রশাখায় তাঁহার জ্ঞানের পরিধি যে বিস্তৃত ছিল এবং প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি কি ভাবে অভিনব আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও পরিচয় এই সামান্য সঙ্কলনে সকলে লাভ করিতে পারিবেন। এই সঙ্কলন প্রকাশের দ্বারা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো আমাদের এই সমিতির শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল এবং বিশুদ্ধজ্ঞানদেহ এই বিদেহ মহাপুরুষের অমর বাঙ্‌ময় বিগ্রহও স্থাপিত হইল, যাহা চিরদিনই সকলের আরাধনা ও প্রেরণার উৎসস্থল হইয়া থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

———

সূচীপত্র

রচনা সঙ্কলন

শ্রীগুরু

(১)

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

এই শ্লোকটি শ্রীগুরুর নমস্কার শ্লোক। লক্ষ্য করিতে হইবে এই স্থলে গুরুকে শ্রীগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রী শব্দ পরাশক্তির বাচক, সুতরাং শ্রীসহিত বা শ্রীযুক্ত গুরুই শ্রীগুরু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গুরু শক্তিহীন হইলে তাহা দ্বারা জীব বা জগতের কল্যাণ-সাধন সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ তিনি জীবের উপাস্য নন, এমন কি নমস্কারের বিষয়ীভূত নন। কারণ, শক্তিহীন শিব অব্যক্ত এবং জীবের পক্ষে অনধিগম্য। হঠযোগ এবং তন্ত্রশাস্ত্র উভয়স্থলেই স্বরূপভূতা শক্তির সঙ্গে নিত্যমিলিত গুরুকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্ররহস্য বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া যাবতীয় আধারকমল বিদ্ধ এবং অতিক্রম করিতে করিতে উত্থিত হইয়া সহস্রদলের বিন্দু-স্থানে পরম শিবের সহিত মিলিত হন। এই মিলন নিত্য মিলন। এই মিলনে শিবরূপী গুরু শক্তিযুক্তরূপে সাক্ষী জীবের নিকট নিরন্তর অপরোক্ষভাবে প্রকাশিত হন। জীব সাধনবলে অথবা ভগবৎকৃপায় কোন শুভ মুহূর্তে এই মহামিলনের অবস্থা লাভ করে। কিন্তু শ্রীগুরু নিত্যই নিজশক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত থাকেন। তাই তিনি নমস্য।

'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' বলিতে এই চৈতন্যরূপা শক্তিসংযুক্ত পরমগুরু তত্ত্বই জীবের নমস্কারের বিষয়রূপে লক্ষিত হইয়াছে। নমঃ বলিতে বুঝায় ন মম অর্থাৎ আমার নয়, অর্থাৎ তোমার বা তাঁহার। আমি ভাব এবং তন্মূলক মমত্বভাব যাঁহাকে অর্পণ করা যায় তাহাই আমির পক্ষে নমস্য। এই নমস্কার শ্লোকে শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে। শুধু গুরুমাত্রে নহে।

শ্রীগুরুর স্বরূপটি বুঝাইবার জন্য শ্লোকের পূর্বাংশ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে পরমতত্ত্ব উপেয়রূপে এবং উপায়রূপে দুইভাবেই স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি উপেয় তাঁহাকে পরমপদ বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা

ভগবদ্ভাবেরও অতীত পরমাবস্থা। যিনি এই পরমপদকে জীবের নিকট প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু। বস্তুতঃ উপেয়রূপ পরমপদ ও উপায়রূপ গুরু মূলতঃ অভিন্ন। কারণ উভয়ে স্বরূপগত ভেদ থাকিলে একটির দ্বারা অপরটির প্রাপ্তি বা প্রকাশন সম্ভবপর হইত না। যে যাহা নয় সে তাহা জানে না এবং জানাইতেও পারে না। সুতরাং যিনি পরমপদস্বরূপ তিনিই যে বস্তুতঃ গুরুতত্ত্ব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেকে নিজে সদাই জানেন এবং পরপ্রকাশক বলিয়া নিজেকে জগতের নিকট প্রকাশিত করেন। এই যে প্রকাশকরূপ ইহাই গুরুর রূপ। এই যে স্বপ্রকাশরূপ ইহাই পরমপদের স্বরূপ। বস্তুতঃ জীব বা জগতের নিকট সেই পরম বস্তুর প্রকাশ হইতেই পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে গুরু যখন স্বীয় স্বরূপকে অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে পরের নিকট প্রকাশিত করেন তখন পরকে আপন করিয়াই তাহা করেন নতুবা তাহা সম্ভবপর হইত না। এইজন্য যতক্ষণ জীবের তৃতীয় নেত্র অথবা জ্ঞাননেত্র উন্মিষিত না হয় ততক্ষণ পরমপদ স্বপ্রকাশ হইলেও তাহার নিকট প্রকাশিত হয় না। শ্রীগুরুই এই জ্ঞাননেত্র উন্মেষের কারণ। অনাদি অজ্ঞান-পাশে আবদ্ধ জীব যতক্ষণ শ্রীগুরুর কৃপায় এই জ্ঞাননেত্রের উন্মীলনের সৌভাগ্য লাভ না করে ততক্ষণ তাহার পক্ষে মিথ্যাদর্শন ব্যতিরেকে পরমার্থদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? স্বপ্রকাশ জ্ঞেয় বস্তু নিত্যই সন্নিহিত রহিয়াছে কিন্তু অন্ধ জীব সন্নিহিত পদার্থও দেখিতে পায় না। সুপ্তজ্ঞান জাগিয়া উঠিলে পরমসত্য বা পরমপদের অন্বেষণ করিতে হয় না। তাহাকে নিত্যপ্রাপ্তরূপেই উপলব্ধি করা যায়।

এই যে পরমপদের কথা বলা হইল ইহাই মুখ্য বিষ্ণুপদ বা বিষ্ণুর পরমপদ যাহা নিত্যমুক্ত পুরুষ সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন —সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। বিষ্ণু কাহাকে বলে? যিনি ব্যাপক, যিনি সম্যকরূপে সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন তিনিই বিষ্ণু অর্থাৎ পরমাত্মা এবং বিষ্ণু একই অভিন্ন সত্তা। সর্বভূত বলিতে স্থাবর এবং জঙ্গম, চর এবং অচর সকল পদার্থই বুঝাইতেছে। এই যে অখিল পদার্থ এবং তাহার সমষ্টি তাহাই কার্য এবং কারণ উভয়াত্মকরূপে অখণ্ডমণ্ডলভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ চরাচর অখণ্ডমণ্ডলের আকারে দীপ্তিমান। তাই মণ্ডলের ব্যাপকরূপে যে অনন্ত মহাসত্তা রহিয়াছে তাহাই বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণু বা পরমাত্মার অতি ক্ষুদ্র বা

পরিচ্ছিন্ন এক অংশে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিষ্ণু বা পরমাত্মা ব্যাপক, জীব বা জগৎ তাহার ব্যাপ্য। উভয়ে মিলিয়া চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর এই ত্রিবিধ তত্ত্বের মহাসমষ্টিতে পরিণত হয়। পরমাত্মার পদ বলিতে বুঝিতে হইবে সেই পরমা স্থিতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব-জগতের অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ স্বয়ং পরমাত্মাও প্রকাশিত হন। ইহাই তৎপদ বা বিষ্ণুপদ অথবা পরমপদ গীতাতে। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' বলিয়া এই তৎপদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যিনি এই তৎপদকে প্রত্যক্ষ ফুটাইয়া তোলেন বা প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু। জীবের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন দ্বারাই ইহা নিষ্পন্ন হইতে থাকে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীগুরু ভিন্ন এই প্রকার অঘটন ঘটাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। এখানে আমরা বুঝিতে পারিলাম অচর হইতে চর শ্রেষ্ঠ, চর হইতে বিষ্ণু বা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু বা পরমাত্মা হইতে তৎপদ, বিষ্ণুপদ বা পরমপদ শ্রেষ্ঠ এবং বস্তুতঃ পরমপদ হইতেও এক হিসাবে শ্রীগুরু শ্রেষ্ঠ। গুরু এবং পরমপদ বস্তুতঃ অভিন্ন তথাপি যখন ঐ গুরু বা পরমপদ শ্রী সংযুক্ত হন তখনই তাঁহার উৎকর্ষ, কারণ শ্রীগুরু ভিন্ন পরমপদ জানিয়া জানাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, থাকিতে পারে না। শ্রী রহিত গুরু বস্তুতঃ গুরুপদ বাচ্যই নহেন, যদিও তিনি পরম সত্যের সহিত অভিন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব বর্ণনায় অচর বলিতে অচিৎ, চর বলিতে চিৎ এবং বিষ্ণু বলিতে পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং তৎপদ বলিতে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝাইতেছে, শ্রীগুরু এই চারটি তত্ত্ব হইতেও উচ্চতর তত্ত্ব। গুরুর এই প্রকার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। 'নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্' এই প্রসিদ্ধ বাক্যেও গুরুভাবের শ্রেষ্ঠতাই সূচিত হইয়াছে।

———

চক্ষুর উন্মীলন

আমাদের প্রচলিত গুরু প্রণামে একটি মন্ত্র আছে, তাহা এই—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

ইহার তাৎপর্য এই যে যিনি অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তির নেত্রকে জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকার দ্বারা খুলিয়া দেন তিনিই গুরু, তাঁহাকে প্রণাম। এখন কথা এই — এই অজ্ঞানতিমির বস্তুটি কি — উহার দ্বারা অন্ধ হওয়া বলিতে কি বুঝায় এবং জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকার দ্বারা ঐ অজ্ঞানতিমিরকে অপসারিত করা ইহারই বা অর্থ কি — কে ইহা করেন এবং এই কার্যের ফলই বা কি — এই প্রশ্ন কয়টির সদুত্তর জানিতে পারিলে এবং তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইলে গুরুর মহিমা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে অনাদিকাল হইতে জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। জীব স্বরূপতঃ বস্তুতঃ শিবস্বরূপ হইলেও সে তাহার এই নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। দ্বৈতবাদ অথবা অদ্বৈতবাদ উভয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ হইতেই জীবের এই অনাদি অবিদ্যা-সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। কেন যে এই সম্বন্ধ সংঘটিত হইল তাহা বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের পক্ষে বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন। নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায় এবং এই সকল উত্তর ভিন্ন হইলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু উহার আলোচনা এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক।

আত্মা স্বরূপতঃ অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে অনন্ত শক্তি অভিন্ন-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সংক্ষেপতঃ এই সকল শক্তিকে জ্ঞান ও ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব জ্ঞান ও ক্রিয়ার যেটি অভিন্ন পূর্ণরূপ তাহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যশক্তি, কিন্তু জীবরূপী আত্মা এই বিশুদ্ধ শক্তির স্ফুরণ অনাদিকাল হইতে না পাওয়ার দরুণ অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিরূপে সংসারী সাজিয়া মায়িক জগতে নিজ নিজ অধিকার — অনুরূপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। চৈতন্যশক্তি লুপ্ত না

হইলেও লুপ্তবৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাবস্থা ইহারই নামান্তর। এই শক্তিকে প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, কারণ এই শক্তি জাগ্রত হইলেই জীব জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া শিবভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি প্রতি মনুষ্যের দেহে মেরুদণ্ডের নীচে নির্দিষ্ট স্থানবিশেষে সুপ্ত হইয়া আছে। জাগতিক কোন কর্মের দ্বারা, এমন কি অলৌকিক পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিলেও, এই শক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে জাগাইবার সামর্থ্য জন্মে না। যোগশাস্ত্রের প্রারম্ভিক যাবতীয় সাধনা এই শক্তিকে জাগাইবার জন্যই অভিপ্রেত। এই শক্তির জাগরণ সাধারণতঃ ক্রমশঃই হইয়া থাকে, কদাচিৎ কাহারও অক্রমেও ঘটিতে পারে। যাহাকে সাধারণতঃ ষট্‌চক্রের সাধনা বলা হয় তাহা প্রকৃত পক্ষে এই শক্তিকে জাগাইয়া উহাকে ঊর্দ্ধ্বমুখী করার সাধনা। শক্তির এই ঊর্দ্ধ্বমুখী প্রগতি চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধ্বস্থলে বিন্দুতে যাইয়া নিবৃত্ত হয়। ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির সাধনা ইহারই নামান্তর। এই সাধনা সম্যক্‌প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সাধক বিন্দুস্থান অধিকার করিতে পারে। তখন মাধ্যাকর্ষণ থাকে না, কর্মসংস্কারের আবরণ তিরোহিত হইয়া যায় এবং অস্ফুট-ভাবে হইলেও ঊর্দ্ধ্ব আকর্ষণের ক্রিয়া অনুভূত হইতে আরম্ভ হয়।

প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, আত্মা তখন অবিদ্যা-সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধবিদ্যালাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই শুদ্ধবিদ্যাই চৈতন্যশক্তির উন্মেষ যাহা গুরুকৃপায় জীব যথাসময়ে অনুভব করিতে পারে। গুরুপ্রণামে যাহাকে চক্ষুর উন্মীলন বলা হইয়াছে তাহা জীবের সম্যক্‌জ্ঞানরূপী চক্ষুর উন্মীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি এই দিব্য জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। এই চক্ষুর উন্মীলন করিবার জন্য তাঁহাকে তৎকালে বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই শক্তি অবলম্বন করিয়া সাধককে অবিদ্যা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইতে হয় এবং অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যা বা জ্ঞান হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হয়।

অবিদ্যা হইতে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্মীলিত তৃতীয় নেত্রের উজ্জ্বল ছটা স্পষ্টভাবে দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ পাইতে থাকে।

বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা — ইহা শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু জীবাত্মাকে অনুগ্রহ করিবার সময় তাহাতে সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ নিজ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে জগৎকে দেখা, কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ নিজ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে — উহা আত্মারই তিরোহিত প্রকাশমাত্র। যখন সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে শুদ্ধ জ্ঞানের অঙ্কুর হৃদয়ে রোপিত হয় তখন যোগীর দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বোধ থাকে না। প্রতি বস্তুই তখন প্রথমে নিজ সত্তা হইতে বিসৃষ্ট অংশমাত্র রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব তখন শিবরূপী আত্মার শক্তিরূপ ধারণ করে — ইহারই নাম দিব্য চক্ষুর উন্মীলন এবং তদ্‌দ্বারা সত্য বস্তুর নিরীক্ষণ।

কিন্তু এই মহান পরিবর্তন কখনই সম্ভব হইতে পারে না যদি গুরুরূপী আত্মা নিজ শক্তির দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া উহাকে উর্দ্ধ্বমুখে প্রেরণা না করেন। ভেদজ্ঞান কাটিয়া গেলে প্রতি বস্তুর সহিত ব্যক্তিগত অভেদজ্ঞান জাগে বলিয়া সমগ্র বিশ্বকে নিজের অভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে হয়, ইহাই প্রেমের অভিব্যক্তি। ইহারও মূল পূর্বোক্ত গুরুকৃপা-সংজাত অভেদ দৃষ্টির উন্মেষ। সুতরাং মল পরিপক্ব হইলে গুরুকৃপার উদয় হউক অথবা গুরুকৃপার আবির্ভাব-বশতঃ মল পরিপক্ব হউক, যে কোন প্রকারে প্রজ্ঞাদৃষ্টির উন্মীলন হইলেই ব্রহ্মস্বরূপ এই মহাজ্ঞানের উদয় হয় যাহার ফলে জীবন্মুক্তি স্বভাবতঃ ফুটিয়া উঠে। ইহাই জীবনের চরম সফলতা এবং ইহার প্রাপ্তির মূলে শ্রীগুরুর অনুগ্রহ। গুরুর মাহাত্ম্য ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে।

গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু রহস্য

১

পূর্বালোচিত জীবের জাগরণ বা প্রবুদ্ধ, সুপ্রবুদ্ধাদি অবস্থা যাঁহার মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে, এখন সেই গুরু বা সদ্‌গুরুর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

গুরুপ্রণামের মন্ত্রে এই শ্লোকটি নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় —

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

— এর সঙ্গে এই শ্লোকটিও পাওয়া যায় এবং উহাও এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আপাততঃ এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্য এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে —

যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বের ব্যাপক পরমপদকে প্রদর্শন করেন তিনিই গুরু এবং যিনি অজ্ঞানতিমিরপ্রভাবে অন্ধীভূত শিষ্যের নেত্রকে জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দেন তিনিই গুরু।

এই যে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের কথা বলা হইল ইহাই অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচরের ব্যাপক পরমপদ দর্শনের একমাত্র উপায়। বস্তুতঃ এই জ্ঞানচক্ষু ও পরমপদ উপায় ও উপেয়রূপে পরিগণিত হইলেও স্বরূপদৃষ্টিতে একই বস্তু। প্রকারান্তরে ঋগ্‌বেদে একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্রে এই ভাবটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা —

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

— এই স্থানে বিষ্ণুর পরম পদকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতম স্থিতিকে ব্যাপক দিব্য চক্ষুর সহিত তুলনা করায় স্বরূপদৃষ্টিতে দিব্যচক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু এবং পরম পদের অভিন্নতাই সিদ্ধ হয়।

অনেকে এ প্রশ্নও করিতে পারেন — জ্ঞানচক্ষুটি কি প্রকার? এবং ইহার নিমীলন ও উন্মীলন ব্যাপারের রহস্যই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু ইহাই বলা যাইতে পারে যে — যেমন অজ্ঞানচক্ষু আছে, তেমনই জ্ঞানচক্ষুও আছে। অজ্ঞানচক্ষুর দ্বারা যেমন অজ্ঞানের জগৎ ও জগতের যাবতীয় পদার্থ ভিন্নরূপে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জ্ঞানজগতের সব কিছু অভিন্নরূপে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যের জ্ঞান-চক্ষু এবং অজ্ঞানচক্ষু উভয়ই বিশ্বপ্রকৃতির দান। যে দুইটির সহিত আমরা পরিচিত তাহাদের নাম অজ্ঞানচক্ষু। অজ্ঞান অবস্থায় এই দুইটি চক্ষু ক্রিয়া করে এবং জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত থাকে। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইলে সেইপ্রকার জ্ঞানচক্ষু ক্রিয়া করিতে থাকে এবং আমাদের পরিচিত অজ্ঞান চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া যায়। জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ের অতীত হইয়া উভয়ের অধিকারী হইলে মানুষ 'ত্রি:নত্র' পদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য হয়।

সাধারণ অবস্থায় অজ্ঞান-চক্ষুর ক্রিয়াশীলতাবশতঃ মানুষ দ্বিনেত্র। নির্বিকল্প সমাধিকালে অথবা যে কোন উপায়ে সম্ভূত জ্ঞানের উন্মেষকালে মানুষ ক্রিয়াশীল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন এবং একনেত্র বলিয়া অভিহিত হয়। উক্ত অবস্থার তিরোভাব হইলে পুনর্বার অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয় এবং মানুষ দ্বিনেত্ররূপে ব্যবহার-ভূমিতে সঞ্চরণ করে। জ্ঞানের অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত থাকে বলিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রাচীন কালে প্রজ্ঞাচক্ষু শব্দে অন্ধকে বুঝাইত। অবস্থার পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে জ্ঞানশক্তি ও অজ্ঞানশক্তি উভয়ই নিজের আয়ত্তে থাকে। তখন মনুষ্য ইচ্ছা অথবা প্রয়োজন অনুসারে উভয় শক্তি সমুচ্চিত ভাবে বা বিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

এই জ্ঞানচক্ষুই মহাজন-সমাজে তৃতীয় নেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা খুলিয়া দেওয়া ও জ্ঞান দান করা একই কথা। ইহাই গুরুর কাজ।

মনুষ্য সাধারণ অবস্থায় বিরুদ্ধ শক্তির অধীন থাকে। প্রতি-স্তরেই তাহাকে ঐ স্তরের অনুরূপ বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ সহ্য করিতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া, সুখ-দুঃখ বোধ, মান-অপমান বা আপন-পর জ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্বভাব মৌলিক বিরুদ্ধ শক্তি হইতে উদ্ভূত। মানুষের দুইটি চক্ষু বস্তুতঃ বাম ও

দক্ষিণ রূপে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির প্রতীক। চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও বিরুদ্ধ শক্তির আস্পদ। এই বাম শক্তি ও দক্ষিণ শক্তি পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। কালের আবর্তনে ও গুণের আবর্তনেও কখনও বাম প্রধান হয় দক্ষিণ অভিভূত থাকে, আবার কখনও দক্ষিণ প্রধান হয় বাম অভিভূত থাকে। মনুষ্যের দেহে তাহার প্রাণময় ও মনোময় কোষে বিশ্বের যাবতীয় ভুবনাবলীতে এমন কি অণু-পরমাণুর মধ্যেও এই দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির খেলা চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিরুদ্ধ শক্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে শান্তি, প্রেম, সমন্বয়, মৈত্রী প্রভৃতি কোন সদ্‌গুণের বিকাশেরই সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য সর্বত্রই মানুষের বিশেষতঃ যাঁহারা পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য, যে কোন উপায়েই হউক্ এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা ও দ্বন্দ্বাতীত হওয়া। এইজন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া কর্মপথে প্রবৃত্ত হইলে সর্বপ্রথম এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষ নিবারণই কর্মের উদ্দেশ্যরূপে পরিণত হয়।

ক্রিয়াকৌশলে যখন এই সংঘর্ষের সমন্বয় সম্পন্ন হয় তখন বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয় মধ্য-বিন্দুতে আসিয়া সাম্য অবস্থা লাভ করে। এই যে মধ্য-বিন্দু, ইহা অব্যক্ত। কিন্তু অব্যক্ত হইলেও ইহা যে মধ্যমার্গের মূল আধার তাহাতে সন্দেহ নাই। বিরোধ থাকে না বলিয়াই এই অব্যক্ত ভূমিকেও মধ্য বলিয়া নির্দেশ করা চলে।

যোগিগণ এই মধ্যভূমিতে উভয় শক্তির সাম্যলাভের ফলে এক অচিন্ত্য তেজের উদ্দীপন অনুভব করিয়া থাকেন। কুণ্ডলিনীর জাগরণ বস্তুতঃ এই উদ্দীপনেরই পারিভাষিক নাম মাত্র। ইহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ না বলিয়া যদি মধ্যশক্তির বিকাশ বলা হয় তাহা হইলেও কোন প্রকার ক্ষতি হয় না।

বুদ্ধদেব বহুদিন পর্যন্ত গুরূপদেশের অধীন হইয়া এবং তাহার পর স্বয়ং, বাহ্যতঃ অনুপদিষ্ট ভাবে, এই মধ্যশক্তির সাধনাই করিয়াছিলেন। অন্তে ইহার প্রাপ্তি ঘটিলে তাহাকে মধ্যমার্গ (মধ্যমা প্রতিপদা) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই মধ্যমার্গের আবিষ্কার বস্তুতঃ চিদগ্নির প্রজ্বলন মাত্র। প্রজ্বলিত হইয়া এই অগ্নি-শিখা ক্রমশঃ মধ্যপথ অবলম্বনে উর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতে থাকে। যদিও বাম ও দক্ষিণ এই দুইটি পার্শ্বগত শক্তি অভিভূত হইয়াছে এবং ব্রহ্মপথ-

গামিনী সরল শক্তির ঊর্ধ্বগতি সিদ্ধ হইয়াছে তথাপি সংস্কাররূপে দক্ষিণ ও বামের প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয় নাই, এইজন্য মধ্য-পথের সরল গতিরও আবর্তভাব তিরোহিত হয় নাই। কারণ, সরল গতিতে বাম দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রিয়া থাকিলে আবর্ত-রচনা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু প্রজ্বলিত অগ্নির এমনই মহিমা যে যতই ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বেগ বর্দ্ধিত হয় ততই বাম ও দক্ষিণে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ন্যূন হইয়া আসে। চরম অবস্থায় এই বাম ও দক্ষিণের বিরুদ্ধ সংস্কার, সংস্কাররূপেও আর থাকে না, এবং যখন এই সংস্কার ক্ষীণ হইয়া যায় তখন এক হিসাবে অগ্নির ঊর্ধ্বগতিও অবসান প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ ইন্ধন থাকে, ততক্ষণই যেমন আগুন জ্বলে — ইন্ধন না থাকিলে, আগুন যেমন জ্বলিতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ বাম ও দক্ষিণের বক্রগতির সংস্কার থাকে ততক্ষণই মধ্যমার্গের ঊর্ধ্বগতির খেলাও চলিতে থাকে। যখন উপশম ঘটে তখন সবগুলি একসঙ্গে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় বিরাট ও বিশাল প্রকাশরূপে ঐ ঊর্ধ্ব-গতিশীল অগ্নি অর্থাৎ চিদগ্নি নিজেকে অভিব্যক্ত করে। ইহারই নাম জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ এবং ষট্‌চক্র ভেদের পূর্ণ পরিণতি।

জ্ঞানচক্ষুর অর্থাৎ ব্যাপক জ্ঞানের প্রকাশ হইলে আত্মা স্বভাবতই অনাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। দেহাত্ম-বোধ তখন থাকে না, শুধু দেহ কেন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি — এমনকি প্রাকৃতিক সত্ত্ব, সর্বত্র হইতে এই আত্ম-বোধ উপসংহৃত হইয়া শান্ত প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই চিদাকাশের প্রকাশ এবং জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন। ইহার পর যে অবস্থার উদয় হয় তাহা ঐ জ্ঞাননেত্রের উপযোগ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে জানিতে হইবে। সদ্‌গুরু নিজশক্তি দ্বারা শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য-চৈতন্যকে যাবতীয় প্রাকৃতিক আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই শান্ত স্বরূপে স্থাপন করেন। লৌকিক ভাষাতে যাহাকে কাশী-মৃত্যু বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ এই জ্ঞানের উদয়ে দেহাত্মবোধের উল্লঙ্ঘন মাত্র। ভ্রূমধ্য পর্যন্ত ষট্‌চক্রের বিস্তার। আত্ম-চৈতন্য গুরুকৃপাতে ভ্রূমধ্য ভেদ করিতে পারিলেই, দেহাত্মবোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। ইহার সাক্ষাৎ উপায় পূর্বোক্ত আত্মচৈতন্যরূপ ব্যাপক জ্ঞানের বিকাশ।

এখন প্রশ্ন এই — সদ্‌গুরু ভিন্ন অপর কেহ জীবের আত্ম-চৈতন্যকে এই অখণ্ড প্রকাশরূপ স্থিতিতে পেঁাছাইয়া দিতে পারেন

কি ? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত না হইলে এই উৎক্রমণ ব্যাপার সম্ভবপর হয় না। সর্বজ্ঞ হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃত্ব লাভ করিয়া ক্রিয়াশক্তিকে আয়ত্ত না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং মুক্ত হইয়াও অন্যের মোচনক্রিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কথা এই, সদ্‌গুরু দীক্ষা দ্বারা শ্রীভগবানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত জীবকে উদ্ধার করিয়া দিলেও জীবন্মুক্তি লাভের জন্য উক্ত জীবের নিজেরও কিছু কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে। কারণ, শ্রীগুরুর কৃপায় দীক্ষারূপ ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে অধিকারি-বিশেষে পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও জীবের বুদ্ধিগত অজ্ঞান তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত সে শিবত্ব লাভ করিয়াও নিজেকে শিব বলিয়া চিনিতে পারে না এবং সেইজন্যই জীবন্মুক্তি-সাক্ষাৎকাররূপ আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। ভোগান্তে দেহপাত হইলে শিবত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ অবশ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য, এই ভোগ এই জন্মে পূর্ণ হইতে পারে এবং অবস্থা-বিশেষে উর্ধ্বলোকে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া এবং সেখানে তদনুরূপ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া উর্ধ্বদেহের অবসানেও পূর্ণ হইতে পারে।

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, সদ্‌গুরু তাঁহার অনন্ত করুণার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ণ জ্ঞানশক্তি ও পূর্ণ ক্রিয়াশক্তিপ্রভাবে অনাদিকালের বদ্ধ জীবকে জাগাইয়া দেন এবং তাহার জ্ঞানচক্ষুর পটল অপসারণ করিয়া তাহাকে শিবপদে স্থাপিত করেন। অতি উচ্চ অধিকারীর পক্ষে অবশ্য বাহ্য গুরুর প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম।

সুতরাং শিষ্যের পক্ষে নত হইয়া শ্রীগুরুচরণে গুরুর মহিমময় স্বরূপ চিন্তনপূর্বক প্রণতি জ্ঞাপন আবশ্যক এবং এই স্বরূপচিন্তনের অন্তর্গতভাবে তাহার পক্ষে ইহাই প্রধানতঃ চিন্তনীয় যে, গুরু নিজ গুণে এবং নিজ শক্তি দ্বারা সংসার-পঙ্ক হইতে তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া চিদালোকে উদ্ভাসিত মুক্তিপদে স্থাপন করিয়াছেন। অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপক পদ তিনিই প্রদর্শন করেন।

যে গুরু অখণ্ড পদে স্থাপন করিতে পারেন না তিনি গুরুরূপে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সদ্‌গুরু নহেন, কারণ, নিরবচ্ছেদ মুক্তিই মুক্তি। অবচ্ছেদবিশিষ্ট গণ্ডীসংযুক্ত মুক্তি পূর্ণ মুক্তি নহে, এবং যিনি পূর্ণ মুক্তি দিতে না পারেন তিনি গুরু হইলেও প্রকৃত গুরু নহেন,

লাভ করে, তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে — প্রলয়কৈবল্যের ন্যায় একটি অর্ধজড় অবস্থামাত্র। প্রকৃত মুক্তিতে পশুত্বের নিবৃত্তি হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এই সব সাধকদের ঐ অবস্থাতেও পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না[২]। ইহারা মায়াপাশ অথবা শ্রীভগবানের বামা নাম্নী শক্তি দ্বারা রঞ্জিত থাকে বলিয়াই ইহাদের 'অসদ্‌গুরু'তে অনুরাগ ও বিশ্বাস গাঢ়ভাবে উদিত হয়।

কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ যে সদ্‌গুরু লাভ করিতে না পারে, এমন কোন কথা নাই। ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্ত শক্তিপাত-পবিত্রিত সাধক যখন আপনার স্বরূপলাভের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন জ্যেষ্ঠা শক্তি নাম্নী ভগবদিচ্ছার প্রেরণায় তাহার চিত্তে সদ্‌গুরুপ্রাপ্তির জন্য শুভ ইচ্ছা জাগিয়া উঠে[৩]। এই ইচ্ছা শুদ্ধবিদ্যার বিকাশ এবং 'সৎতর্ক' নামে প্রসিদ্ধ।

অসদ্‌গুরুই হউক্ বা সদ্‌গুরুই হউক্ উভয়ত্রই প্রবৃত্তির মূলে ভগবদিচ্ছা। আসল কথা এই — শক্তিপাতের প্রবৃত্তি ক্রমিক। তাই কেহ কেহ অসদ্‌গুরু ও অপূর্ণত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের আশ্রয় করিয়া পরে সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। আবার কেহ কেহ প্রথমেই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়া থাকে। শক্তিপাতের বিচিত্রতাবশতঃই গুরু ও শাস্ত্রগত সদসৎ ভাবের বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে। পূর্ণসত্যের প্রতিপাদক শাস্ত্র ও গুরুই সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরু।

---

২ যাহা আগমসম্মত পরামুক্তি তাহাই পূর্ণত্ব। আগমমতে সাংখ্যের কৈবল্য পূর্ণত্ব নহে, বেদান্তের মুক্তিও পূর্ণত্ব নহে। দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বিবিধ আগমেই ইহা সমর্থিত হয়। জয়রথ বলেন, (তন্ত্রালোকটীকা ৪।৩১), বেদান্তমুক্তি সবেদ্য প্রলয়াকল অবস্থার ন্যায়। তিনি এই মুক্তিকে বিজ্ঞান-কৈবল্যবৎ বলিয়াও স্বীকার করেন না। ইহা হইতে মনে হয় তাঁহার মতে এই অবস্থায় (বেদান্তের মোক্ষে) আণবমল সম্পূর্ণই বজায় থাকে, ধ্বংসোন্মুখও হয় না। বিজ্ঞানকৈবল্যে কিন্তু আণবমল অন্ততঃ ধ্বংসোন্মুখ হয়ই—অবশ্য একেবারে ধ্বস্তও হইতে পারে। বিজ্ঞানকেবলীর কর্ম নাই বলিয়া পুনরাবৃত্তি হয় না—আণবমল ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া উহা হইতে কর্মও জন্মাইতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ বেদান্তমোক্ষ বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ মনে করেন। বৈষ্ণবাদির মোক্ষ ঐ মতে প্রলয়াকলের ন্যায়। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল মোহাদিরূপ ভোগ হয়। পরে জন্ম হয় (নতুন সৃষ্টিতে)। ন্যায়াদির অপবর্গ আত্মার সর্ববিশেষগুণোচ্ছেদ বলিয়া অপবেদ্য প্রলয়াকলসদৃশ।

৩ ভগবানের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়—ইহা সর্বত্র স্বীকৃত।

যাহা বাস্তবিক মোক্ষ নহে, তাহাকেও যে মোক্ষ বলিয়া মনে হয় এবং মোক্ষ মনে করিয়া তাহাকেই পাওয়ার যে স্পৃহা জন্মে, মায়াই তাহার একমাত্র কারণ। মায়াপিশাচীই এইপ্রকারে জীবকে নিরন্তর নানাদিকে ঘুরাইয়া কষ্ট দেয়, কিন্তু মায়ার পিছনে ভগবানের করুণাও জাগিয়া থাকে। তাই সাধকের চিত্ত দৃঢ় সংস্কারবশতঃ ঐ জাতীয় শাস্ত্র ও গুরুতে আস্থাসম্পন্ন হইলেও ভগবৎকৃপায় উহাতে 'সৎতর্ক' বা পরামর্শজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে। তখন কোন্‌টি সার, কোন্‌টি অসার তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এইভাবে শুদ্ধবিদ্যার প্রভাবে — জ্যেষ্ঠাশক্তির অধিষ্ঠানবশতঃ — পবিত্রতা লাভ হয় ও নির্বিঘ্নে সৎপথের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে সামর্থ্য জন্মে।

৩

'সৎতর্ক' বা শুদ্ধবিদ্যার উদয় কি প্রকারে হয়? কিরণাগমের মতে কাহারও 'সৎতর্ক' গুরুর উপদেশ হইতে জন্মে, কাহারও বা শাস্ত্র হইতে জন্মে। কিন্তু এমন উত্তম সাধকও আছেন, যাঁহার 'সৎতর্ক' গুরুর উপদেশ বা শাস্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি (স্বতঃ) উদিত হয়। ইঁহার বস্তুবিষয়ক সুনিশ্চিত জ্ঞান আপনা হইতেই (স্বতঃ) উৎপন্ন হয় — তাহা গুরু প্রভৃতির অধীন নহে।[৪] এই জ্ঞানও যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনিই এই প্রকার তত্ত্বনিষ্ঠ সাধকও স্বভাবসিদ্ধ (সাংসিদ্ধিক)। তবে এই জ্ঞান নিতান্তই যে নিমিত্তহীন তাহাও নহে, কারণ ভগবানের শক্তিপাত প্রভৃতি অদৃষ্ট নিমিত্ত অবশ্যই আছে। তবে লৌকিক নিমিত্ত নাই, ইহা সত্য।

পরামর্শোদয়ের পূর্বনির্দিষ্ট কারণপরম্পরার মধ্যে গুরু হইতে শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, এবং শাস্ত্র হইতে স্বভাব শ্রেষ্ঠ। কারণ, গুরু যেমন শাস্ত্রাধিগমের

---

৪ ত্রিপুরারহস্যে আছে:

'উত্তমানাং তু বিজ্ঞানং গুরুশাস্ত্রানপেক্ষণম্'। বামদেব, কর্কটিকা এবং অন্যান্য অকৃতশ্রবণ ব্যক্তির জ্ঞান এইপ্রকার সাংসিদ্ধিক ছিল বলিয়া জানা যায়। আত্মার স্বরূপে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ভেদ নাই, ইহা পরমুক্ত রূপ, সঙ্কল্প-বিকল্পহীন, মোহহীন। ইহা নিত্যসিদ্ধ হইলেও জীব ইহা জানে না। ইহার উপলক্ষণ বা পরিচয় নাই। গুরু ও শাস্ত্র পরিচয় করাইয়া দেন। কাহারও কাহারও পরিচয় আপনিই হইয়া যায়।

উপায়স্বরূপ, তদ্রূপ শাস্ত্র স্বভাবপ্রাপ্তির দ্বারভূত। সেইজন্য গুরু ও শাস্ত্রের কারণতা গৌণ, মুখ্য নহে। স্বভাবই মুখ্য কারণ।[৫]

৪

যাহার "সৎতর্ক" স্বভাবতঃ (স্বতঃ) উদিত হয়, তাহার অধিকারে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি নাই। তাহার বাহ্যদীক্ষা ও বাহ্য অভিষেকের আবশ্যকতা থাকে না। সে নিজের সংবিত্তি-দেবীগণের দ্বারাই দীক্ষিত হয় ও অভিষিক্ত হয়। তাহার স্বীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইয়া প্রমাতার সঙ্গে — তাহার স্বাত্মার সঙ্গে — ঐক্য ফুটাইয়া তোলে। ইহারাই দ্যোতনকারিণী সংবিদ্ দেবী। ইহারা তাহার জ্ঞানক্রিয়াখ্য প্রসুপ্ত চৈতন্যকে উত্তেজিত করে। ইহাই 'দীক্ষা'। যে ক্রিয়ার ফলে সে সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তাহা 'অভিষেক'। বহির্মুখ চিত্তের বৃত্তিসকলই অন্তর্মুখাবস্থায় শক্তি নামে কীর্তিত হয়।

এইরূপ সাধক সকল আচার্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে বিদ্যমান থাকিতে অন্য কেহ পরানুগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে অধিকারী হয় না। সাধারণ সাধক গুরু হইতে শাস্ত্ররহস্য অবগত হয়। কিন্তু যাহার জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ, সে 'সৎতর্ক' হইতে সমস্ত শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারে, বাহ্য গুরুর সাহায্য লওয়া তাহার পক্ষে আবশ্যক হয় না। এমন কোন সত্যই নাই এবং থাকিতে পারে না — যাহা শুদ্ধবিদ্যার আলোকে প্রকাশিত হইতে পারে না। এইজন্য এইপ্রকার সাধক লৌকিক কোন নিমিত্ত অবলম্বন না করিয়া সমস্ত শাস্ত্রেরই নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই প্রাতিভ মহাজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

এই যে স্বভাবজাত মহাজ্ঞানের কথা বলা হইল, ইহা বস্তুতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে অর্থাৎ ভিত্তি ও তদংশের ভেদবশতঃ নানাপ্রকার হইতে পারে। যাহাকে আশ্রয় করিয়া (উপজীব্য) জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে ঐ জ্ঞানের ভিত্তি বলে। ইহা নিজের

---

৫ যোগবাশিষ্ঠে আছে :
'শিষ্যপ্রজ্ঞৈব বোধস্য কারণম্ গুরুবাক্যতঃ'। (নির্বাণ প্রকরণ ১।১২৮।১৬৩) অর্থাৎ গুরুবাক্য হইতে যে বোধ জন্মে, শিষ্যের প্রজ্ঞাই তাহার কারণ। সুতরাং স্বপরামর্শই যে গুরু ও শাস্ত্রজ জ্ঞানস্থলেও প্রধান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিমর্শ ও পরকৃত তত্তৎ কর্মের অভিধায়ক শাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান কাহাকেও আশ্রয় করিয়া উদিত হয় না বলিয়া যে ভিত্তিহীন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা কোন কোন স্থলে ভিত্তিবিশিষ্টও হইতে পারে। কি ভাবে ইহা হয় তাহা বলা যাইতেছে।

যাঁহার স্বতঃই সৎতর্কের উদয় হয়, তাঁহার নকল বন্ধন শিথিল হইয়া পূর্ণ শিবভাবের আবির্ভাব হয়। তাঁহাকে সাংসিদ্ধিক গুরু বলিয়া বর্ণনা করা চলে। তাঁহার নিজের বিষয়ে কিছু করণীয় থাকে না, কারণ, তিনি স্বাত্মাতে কৃতকৃত্য ; তাই পরের অনুগ্রহই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন।

"স্বং কর্ত্তব্যং কিমপি কলয়ঁল্লোক এষ প্রযত্নাৎ
নো পারক্যং প্রতি ঘটয়তে কাঞ্চন স্বাত্মবৃত্তিম্।
যস্ত ধ্বস্তাখিলভবমলো ভৈরবীভাবপূর্ণঃ
কৃত্যং তস্য স্ফুটমিদমিয়ল্লোককর্তব্যমাত্রম্ ॥"

যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এইপ্রকার সাংসিদ্ধিক গুরু সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলা চলে — "তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্।" এই পরানুগ্রহ অনুগ্রাহ্যজনের যোগ্যতার তারতম্যবশতঃ বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। যে শিষ্য নির্মল সংবিদ্‌বিশিষ্ট বা শুদ্ধচিত্ত, তাহাকে অনুগ্রহ করিবার সময় ইঁহাকে কোন উপকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। শুধু নিষ্কাম বা অনুসন্ধানহীন দৃষ্টি দ্বারাই ইনি ঐ প্রকার অনুগ্রহার্থী যোগ্য শিষ্যকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। নিজ বোধরূপ স্ব-শক্তির সঞ্চার দ্বারা শিষ্যকে নিজের সহিত সমভাবাপন্ন করাই অনুগ্রহের লক্ষণ।

'তং যে পশ্যন্তি তাদ্রূপ্যক্রমেণামলসংবিদঃ।
তেঽপি তদ্‌রূপিণস্তাবত্যেবাস্যানুগ্রহাত্মতা ॥'

এইপ্রকার নিষ্কাম শিষ্যের অনুগ্রহব্যাপারে কোন উপকরণের আবশ্যকতা হয় না। ইহা নির্ভিত্তিক জ্ঞানের উদাহরণ।

কিন্তু অনুগ্রাহ্য শিষ্য তাদৃশ নির্মলসংবিদ্‌বিশিষ্ট না হইলে উপকরণের আবশ্যকতা হয়। অর্থাৎ ঐস্থলে সাংসিদ্ধিক গুরুতে 'ইহাকে আমি এইপ্রকার অনুগ্রহ করিব' এইপ্রকার অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন জন্মে। কাজেই তখন বাহ্য সকল উপকরণেরই প্রয়োজন

হয় — শাস্ত্রজ্ঞানাদিতে অধিকার লাভ করে। এই অভিষেক গুরু প্রভৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না।

ইহা ব্যতীত 'কল্পিত' ও কল্পিতাকল্পিত' গুরুও আছেন। যাঁহার সৎতর্ক আপনা-আপনি উদিত হয় না, তাঁহার পক্ষে অকল্পিত অথবা অন্য কোন গুরুকে যথাবিধি ও ভক্তিসহকারে শুশ্রূষাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া শাস্ত্রসম্মত ক্রম অনুসরণপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-যোগে শাস্ত্রার্থ জ্ঞান লাভ করার ব্যবস্থা আছে। এইভাবে গুর্বারাধন-ক্রমে তাঁহার শুদ্ধবিদ্যা উদিত হইতে পারে। তিনি পরে অভিষেক-প্রাপ্ত হইয়া পরানুগ্রহাদিব্যাপারে অধিকার লাভ করেন। তাঁহাকে কল্পিত গুরু বলে। কিন্তু কল্পিত অর্থাৎ আচার্যান্তর দ্বারা নিষ্পাদিত হইলেও ইনি সকল পাশকে নিঃশেষে নষ্ট করিতে সমর্থ হন।

কেহ কেহ কল্পিত হইলেও গুরু প্রভৃতিকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বীয় প্রতিভাবলে লোকোত্তর শাস্ত্রীয় তত্ত্বসম্বন্ধে আকস্মিকভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন ও সকল রহস্য বুঝিতে পারেন। ইনি কল্পিত হইলেও ইঁহার বোধ স্বতঃপ্রবৃত্ত বলিয়া ইনি অকল্পিত। এই গুরুকে 'কল্পিতা-কল্পিত' নামে অভিহিত করা যায়। ইঁহার কল্পিতাংশ অপেক্ষা অকল্পিতভাগই শ্রেষ্ঠ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চারিপ্রকার গুরুই মূলে কল্পিত ও অকল্পিত এই দুইপ্রকার ভেদের পরস্পর মিশ্রণজন্য অবান্তর বিভাগমাত্র। ফলতঃ কল্পিত ও অকল্পিত গুরুতেও কোন প্রভেদ নাই — কল্পিত গুরুও শিষ্যের পাশচ্ছেদনপূর্বক শিষ্যত্বের অভিব্যক্তি করিতে সমর্থ। কারণ, স্বয়ং পরমেশ্বরই আচার্যদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবের বন্ধনমোচন করিয়া থাকেন — নতুবা এক জীব অন্য জীবকে উদ্ধার করিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে —

> যস্মান্ মহেশ্বরঃ সাক্ষাৎ কৃত্বা মানুষবিগ্রহম্।
> কৃপয়া গুরুরূপেন মগ্নাঃ প্রোদ্ধরতি প্রজাঃ ॥

অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বর মানবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কৃপাপূর্বক গুরুরূপে (মায়া) মগ্ন জীবসকলকে উদ্ধার করেন।

এখানে আমরা মনুষ্যগুরুর কথা বলিতেছি। বস্তুতঃ সিদ্ধগুরু ও দিব্যগুরুও আছেন। মূলে কিন্তু সর্বত্র পরমেশ্বরই একমাত্র অনুগ্রাহক। তিনি ভিন্ন আর কেহ অনুগ্রহ করিতে পারেন না। তবে যে গুরুর প্রকারভেদ করা হইয়াছে তাহার কারণ আছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির প্রণালী-ভেদমূলক যে কোন উপায়ে হউক্ অথবা বিনা উপায়েই হউক্ — জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তাহার কার্য হইবেই। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করাও যাহা, জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করাও তাহাই — যেভাবেই অগ্নি জ্বলুক, দাহিকাশক্তি উভয়ে সমানই থাকে। অবশ্য দুই অগ্নিতে কিছু পার্থক্যও থাকে। সেইজন্য ফল ও সামর্থ্যগত অভেদসত্ত্বেও অকল্পিত গুরুকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। নিত্যসিদ্ধ পরমশিব ও যিনি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্বলাভ করেন, এই উভয়ের মধ্যে সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম সমান থাকিলেও যেমন পরমশিবের উৎকর্ষ অধিক মানিতে হয়, অকল্পিত গুরুর মহিমাও তদ্রূপ অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ অকল্পিত গুরুর সম্মুখে কল্পিতাদি গুরু হয় চুপ করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকেন, নতুবা তাঁহার অনুবর্তন করেন।

অতএব সদ্‌গুরু বলিতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অথবা তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্ত তৎসাধর্ম্যাপন্ন জীবন্মুক্ত অধিকারী পুরুষ বুঝিতে হইবে। এই অধিকারী দেবতা, সিদ্ধ ও মনুষ্য — তিনই হইতে পারেন।

প্রশ্ন হইতে পারে ঃ অসদ্‌গুরুতে গুরুত্ব কোথায়? গুরু শব্দের বাস্তবিক অর্থ গ্রহণ করিলে এইপ্রকার শংকা হইতে পারে। 'গুরু' শব্দের অর্থ সংকুচিত ভাবে লইলে বলা যায় যে, মায়া হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলেও যিনি ঊর্ধ্বলোকের ভোগৈশ্বর্য ও অজরত্ব, অমরত্ব প্রভৃতি পরিমিত সিদ্ধি দিতে পারেন তাঁহাকেও ব্যবহারদৃষ্টিতে 'গুরু' বলা যাইতে পারে। মায়িক জগতেও ভিন্ন ভিন্ন ঊর্ধ্বস্তরসমূহে আনন্দ ও ভোগের ন্যূনতা নাই। পৃথিবীতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কলাতত্ত্ব পর্যন্ত প্রতি তত্ত্বেই ভোগ্যবিষয় ও ভোগোপকরণসমন্বিত নানা ভুবন আছে। ঐ সকল ভুবনেও গুরু আছেন। তাহা ছাড়া ভুবনেশ্বরগণও জ্ঞানসম্পন্ন অধিকারী পুরুষ। যোগী সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার পূর্বে এমন সামর্থ্য লাভ করেন, যাহা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে, যে তত্ত্বে সে আছে, সেখান হইতে উঠাইয়া অন্য অভিলষিত তত্ত্বে এবং ঐ তত্ত্বস্থ ভুবনবিশেষে ঐ স্থানের ঐশ্বর্যভোগের জন্য নিয়োজিত করিতে পারেন। ইহার জন্য দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। তত্তদ্ ভুবনেশ্বরের আরাধনা দ্বারাও অবশ্য ঐ সকল ভুবনে যাওয়া ও থাকা যায়।[৮] ঐসব

৮ তন্ত্রশাস্ত্রে ভোগদীক্ষার কথাও আছে, তবে তাহা আলাদা। তাহা সদ্‌গুরুপ্রদত্ত। শিষ্য ভোগার্থী বলিয়া সদ্‌গুরু তাহাকে দীক্ষার দ্বারা অভিলষিত

ভোগলোক। ঐস্থান হইতে ভোগান্তে পতন অবশ্যম্ভাবী, তবে ওখানে যদি সদ্‌গুরু লাভ করিয়া পথ পাওয়া যায় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। এইসব গুরু শুধু ভোগপ্রদ। ইঁহারা দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন না। তাই মায়া পার করাইতে পারেন না। ইঁহারাই পূর্বোক্ত অসদ্‌গুরু।

আবার এমন গুরু আছেন যিনি জ্ঞান দিতে পারেন, কিন্তু ভোগ বা বিজ্ঞান দিতে পারেন না। জ্ঞান দিয়া তিনি মায়া হইতে মুক্ত করিয়া দেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবে জ্ঞানী অধিকার লাভ করিতে পারেন না। তিনি নিজে মুক্ত হন কিন্তু অন্যকে মুক্ত করিতে পারেন না, তাই পরোপকার করিতে সমর্থ হন না। এই গুরু জ্ঞানী গুরু, তিনি যোগী নহেন। প্রকৃত সদ্‌গুরু ইনিও নহেন। যিনি সিদ্ধ যোগী বলিয়া একাধারে যোগী ও জ্ঞানী উভয়াত্মক, তিনি সদ্‌গুরু। তিনি বিজ্ঞান দান করেন বলিয়া শিষ্যের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই বিধান করিতে পারেন। পূর্ণত্বলাভ তাঁহার কৃপাতেই হইতে পারে।

'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং' বলিয়া যে সদ্‌গুরুর নমস্কার করা হয় এবং যাঁহাকে গুরুপ্রণামে 'তৎ' পদের প্রদর্শক বলিয়া ও জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধের জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচক বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাঁহারা উভয়ই এক। সাধারণতঃ গুরুশব্দে সদ্‌গুরুই বুঝায়। কারণ গুরুরূপী ভগবান্ অথবা গুরুদেহে অধিষ্ঠিত ভগবান্ আপন ক্রিয়াশক্তির দ্বারা (দীক্ষার দ্বারা) পশুর স্বতঃসিদ্ধ দিব্য জ্ঞানরূপ চক্ষুর অবরোধক অনাদি মল অপসারণ করিয়া দেন। ফলে তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া গিয়া সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব অভিব্যক্ত হয় ও শিবসাধর্ম্যের প্রাপ্তি ঘটে।

এই ক্রিয়াশক্তি দর্শনাদি নানা উপায়েই প্রযুক্ত হইতে পারে এবং তদনুসারে দীক্ষারও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। শিষ্যের উদ্ধারসামর্থ্য গুরুর লক্ষণ। যোগবাশিষ্ঠে আছে ঃ

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েৎ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ ॥

(নির্বাণ প্রকরণ)

ভোগের জন্য তদুচিতলোকে প্রেরণ করেন। ক্রমশঃ ভোগক্ষয় করিয়া উঠিতে উঠিতে সেও অন্তে পূর্ণত্বলাভ করে, তবে দীর্ঘকাল পরে।

অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্বক দর্শন, স্পর্শন ও শব্দের দ্বারা শিষ্যের দেহে শিবভাবের আবেশ উৎপাদন করিতে পারেন তিনিই 'দেশিক' বা গুরু। কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া ষট্‌চক্রভেদনপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে পরশিবের সঙ্গে মিলিত হইলে এই আবেশ ঘটে। সত্যসংকল্প গুরু শুধু একবার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াও এই সুমহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন।

যোগ্য শিষ্যকে উদ্ধার করা এবং অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া উদ্ধার করা, ইহাই গুরুর কার্য। বোধসারে নরহরি বলিয়াছেন ঃ

তৎতদ্বিবেকবৈরাগ্যযুক্তবেদান্তযুক্তিভিঃ।
শ্রীগুরুঃ প্রাপয়ত্যেব অপদ্মমপি পদ্মতাম্ ॥
প্রাপয্য পদ্মতামেনং প্রবোধয়তি তৎক্ষণাৎ ॥

অর্থাৎ শ্রীগুরু বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত বেদান্তযুক্তির দ্বারা অপদ্মকেও পদ্মরূপে পরিণত করেন। পরে তাহাকে মূহূর্তের মধ্যে জাগাইয়া তোলেন। ভাস্কর রায় ললিতাসহস্রনামের ভাষ্যে ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন—

"অযোগ্যেপি যোগ্যতামাপাদ্য শ্রীগুরুসূর্যঃ বোধয়তি" — অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপী সূর্য অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া প্রবুদ্ধ করেন।[৭]

---

৯ নবচক্রের তন্ত্রে আছে ঃ

"পিণ্ডং পদং তথা রূপং রূপাতীতং চতুষ্টয়ং।
যো বৈ সম্যক্ বিজানাতি স গুরুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ যিনি পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত — এই চারিটিকে সম্যক্ রূপে অবগত আছেন তিনি গুরু।

গুরুগীতানুসারে—কুণ্ডলিনী শক্তি, হংস, বিন্দু এবং নিরঞ্জন এই চারিটিকে যথাক্রমে পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত বলা হয়। যথা—

"পিণ্ডং কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্।"

স্বচ্ছন্দসংগ্রহেও এই শ্লোকটি আছে। তবে সেখানে শেষ পদে আছে— "রূপাতীতং হি চিন্ময়ম্।" যোগিনীহৃদয়তন্ত্রে এই ক্রমেই চারিটির উল্লেখ আছে। কিন্তু দাদূদয়ালজীর শিষ্য সুন্দরদাস তাঁহার "জ্ঞানসমুদ্র" নামক গ্রন্থে ধ্যানের বর্ণনা প্রসঙ্গে—পিণ্ডস্থ, পদস্থ, রূপস্থ ও রূপাতীত, এই পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, (শ্লোক—৭৮-৮৪)। জৈনগ্রন্থেও এই চারিপ্রকার ধ্যানের কথা পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—পূর্ণ ও শুদ্ধতম জ্ঞানই গুরুর লক্ষণ।

৬

বৈদিক শাস্ত্রের ন্যায় আগমেও শ্রৌত, চিন্তাময় এবং ভাবনাময় — এই তিন প্রকার জ্ঞানের বিবরণ পাওয়া যায়।[১০] ইহার মধ্যে পূর্ব পূর্ব জ্ঞান উত্তরোত্তর জ্ঞানের প্রতি হেতু। বিক্ষিপ্তচিত্তের শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞানকে শ্রৌতজ্ঞান বলে। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শাস্ত্রার্থ আলোচনা-পূর্বক 'ইহাই এই স্থলে উপযোগী' এই প্রকার আনুপূর্বী দ্বারা ব্যবস্থাই চিন্তাময় জ্ঞান। ইহা মন্দাভ্যস্ত ও স্বভ্যস্ত-ভেদে দুই প্রকার। স্বভ্যস্ত চিন্তাময় জ্ঞান হইতে ভাবনাময় জ্ঞান জন্মে, যাহাকে মোক্ষের একমাত্র কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। ইহা হইতেই যোগ ও যোগফল লাভ হয়। ভাবনাময় জ্ঞানের অভাবে অশুদ্ধ শিষ্যকে মায়িক তত্ত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া ইচ্ছানুসারে স-কল সদাশিবে অথবা নিষ্কল পরমশিবে যুক্ত করা সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ গুরু স্বভ্যস্তজ্ঞানী হইলেও ভাবনাবিশেষের অভাবে ঐ তত্ত্ববিশেষের সাক্ষাৎকার না করিয়া অশুদ্ধ থাকিলে পূর্বোক্তপ্রকার উদ্ধার ও যোজন-কার্য করিতে সমর্থ হন না। আবার সিদ্ধযোগী ঐ মায়িক তত্ত্বের সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াও সদাশিবাদি উত্তম পদে স্বভ্যস্ত জ্ঞানী বলিয়াই যোজনা করিতে পারেন। যদি যোগী যোগবলে তত্তৎ তত্ত্বের সিদ্ধি লাভ করেন, তথাপি যোগবলে তত্তৎ তত্ত্বে শিষ্যের যোজনা করিতে পারেন না। কারণ, নিম্নবর্তী তত্ত্বে যে যোগজ সিদ্ধি হয়, তাহা বিমোচনের উপায় নহে।

প্রশ্ন এই ঃ যোগীর সদাশিবাদি উর্ধ্ববর্তী তত্ত্বে যোগজ সিদ্ধি হয় না কেন, যাহার প্রভাবে যোগী সকল জগতের উন্মোচক হইতে পারে? ইহার সমাধান এই যে, যদিও যোগীর ন্যায় জ্ঞানীও

---

১০ বৌদ্ধগ্রন্থেও শ্রুতচিন্তাভাবনাময়ী প্রজ্ঞার কথা আছে। শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতারের প্রজ্ঞাকরকৃত পঞ্চিকানাম্নী টীকাতে এই প্রজ্ঞাকে ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অভিধর্মকোশেও শ্রৌত জ্ঞানাদির বিবরণ আছে। বৈভাষিক মতে শ্রুতময়ী প্রজ্ঞার বিষয় নাম ও অর্থ এবং ভাবনাময়ী প্রজ্ঞার বিষয় অর্থ। সৌত্রান্তিক মতে শ্রুতপ্রজ্ঞা=আপ্তপ্রমাণজ নিশ্চয়; চিন্তাপ্রজ্ঞা=যুক্তি নির্ধ্যানজ নিশ্চয়; ভাবনাপ্রজ্ঞা=সমাধিজ নিশ্চয়। যে শীলবান্ ও শ্রুতচিন্তাপ্রজ্ঞাবান্, সে ভাবনার অধিকারী। (দ্রষ্টব্য—অভিধর্ম্ম কোশ [৬])।

অভ্যাসহীন বটে, তথাপি জ্ঞানী সর্বদা স্বভ্যস্তভাবনাময় বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে শিবভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া দীক্ষাদিক্রমে যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে যোগীর প্রকারভেদ সম্বন্ধেও একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আগম-মতে সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধভেদে যোগী চারি প্রকার। যে সাধক যোগের উপদেশ মাত্র পাইয়াছে, তাহাকে 'সংপ্রাপ্ত' এবং যোগাভ্যাসে নিরত সাধককে 'ঘটমান' বলে। এই দুই জাতীয় সাধক স্বয়ংই যোগ অথবা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ নহে বলিয়া অন্যের কোন উপকার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। তবে যাঁহার যোগ সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার স্বভ্যস্ত জ্ঞানও অবশ্যই আছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি অন্যকে মুক্ত করিতে পারেন — অন্য প্রকারে অর্থাৎ সিদ্ধি প্রভাবে নহে। যোগী ও জ্ঞানীর মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগী হইয়াও ইনি জ্ঞানী। যিনি 'সুসিদ্ধ' যোগী, তিনি ব্যবহার-ভূমির অতীত। তিনি কোন সময়েই আপন স্বরূপ হইতে স্খলিত হন না। তিনি যে-কোন স্থানে অবস্থান করিয়া যে-কোন প্রকারে ফলভোগ করিয়াও হীন হন না, নির্বিকার থাকেন। তিনি নররূপী বিরূপাক্ষ। একমাত্র তাঁহারই সকলাধ্বার সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি গুরু-ভাব অবলম্বন করিয়া সাক্ষাদভাবে অমর্ত্যগণকে মোচন করেন না — বিদ্যেশ্বরগণের ভিতর দিয়া করেন।

অতএব জ্ঞান ও যোগের বিচার করিয়া মালিনীতন্ত্র বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুর পক্ষে স্বভ্যস্তজ্ঞানবান্ গুরুই শ্রেষ্ঠ। তাই স্বভ্যস্তবিজ্ঞানতাই গুরুর একমাত্র লক্ষণ — যোগিত্ব গুরু-লক্ষণ নহে।

তবে যোগীগুরুও আছেন। ইহা সত্য যে, জ্ঞানী যোগী অপেক্ষা বিশিষ্ট। কোন্ স্থলে জ্ঞানীগুরু কর্তব্য, কোন্ স্থলে যোগীগুরু কর্তব্য বা ত্যাজ্য, আচার্য অভিনবের গুরু শম্ভুনাথ স্ব-মুখে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে মোক্ষজ্ঞানার্থী, তাহার গুরু স্বভ্যস্তজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। অন্যবিধ গুরু প্রাপ্ত হইলেও তাহার পক্ষে ঐ গুরু পরিহার্য। কারণ, —

'আমোদার্থী যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
বিজ্ঞানার্থী তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।'

অর্থাৎ যে গুরু বিজ্ঞান দানে অসমর্থ, তিনি শক্তিহীন। যিনি স্বয়ং অজ্ঞ, তিনি অন্যের উপকার কি প্রকারে করিতে পারেন? প্রশ্ন

হইতে পারে — ভাবনাই ত' মুখ্য, অজ্ঞ গুরুতেও শিষ্যের ভাবনাবশতঃ সুফল হইতে পারে। সুতরাং অজ্ঞ গুরুর ত্যাগে প্রয়োজন কি? যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ দেখিয়াও অধম পদে স্থিত থাকে, সে দুর্ভাগ্য। যে ভোগ, মোক্ষ ও বিজ্ঞানপ্রার্থী, তাহার গুরু স্বভ্যস্তজ্ঞানী যোগসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ইনিই তৃতীয় প্রকার যোগী। যে মোক্ষ ও বিজ্ঞানার্থী, তাহার গুরু জ্ঞানী। এই গুরু হইতে ভোগসিদ্ধি হয় না। আর যিনি মিত যোগী, অর্থাৎ যে যোগী ঘটমান ও সিদ্ধাবস্থার মধ্যবর্তী, তিনি গুরু হইলেও শুধু ভোগাংশ দানে সমর্থ — তিনি মোক্ষ ও বিজ্ঞান দান করিতে পারেন না। আর যে যোগী শুধু সংপ্রাপ্ত ও ঘটমান অবস্থায় বর্তমান, তিনি শিষ্যের মোক্ষ ও বিজ্ঞান বিধানের কথা দূরে থাকুক, তাহাকে ভোগ মাত্র দানেও সমর্থ নহেন — তিনি শুধু উপদেশে কুশল। যিনি মিতযোগীও নহেন, এমন যোগাভ্যাসী অপেক্ষা বরং মিতজ্ঞানীও গুরু হিসাবে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনি জ্ঞানের উপায় উপদেশ দ্বারা ক্রমশঃ মুক্ত করিতে সমর্থ।

এইপ্রকার মিতজ্ঞানী যদি গুরু হন, তাহা হইলে শিষ্যের কর্তব্য কি? একজন পূর্ণ জ্ঞানশালী গুরু অর্থাৎ 'সদ্‌গুরু' না পাইলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমিতজ্ঞান গুরু হইতে অংশাংশিকা ক্রমে জ্ঞান আহরণ করিয়া স্বাত্মায় অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণ-জ্ঞান সম্পাদন করিবে। একজন মিত-জ্ঞানী হইতে পূর্ণজ্ঞান লাভ হইতে পারে না বলিয়া স্বকীয় জ্ঞান পূরণ করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন সহকারে অসংখ্য গুরুকরণের আবশ্যকতা হয়। তাহাতে প্রত্যবায় নাই।

সদগুরুপ্রাপ্তি ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন হয় না। তীব্রশক্তিপাতস্থলে পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন গুরু পাওয়া যায় — যাঁহার কৃপাতে অনায়াসে স্বাত্ম-বিজ্ঞান পূর্ণভাবে উদিত হয়। তখন আর পুনঃ পুনঃ গুরুকরণের আবশ্যকতা থাকে না।

———

সদ্‌গুরুতত্ত্ব

সদ্‌গুরু লাভের জন্য আপনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, কারণ চিত্তের আত্যন্তিক ব্যাকুলতাই সদ্‌গুরু লাভের অব্যর্থ নিদর্শন। সদ্‌গুরুর কৃপা না হইলে এই জাতীয় ব্যাকুলতা চিত্তক্ষেত্রে উদ্ভূত হয় না। অভাবের তীব্র বোধই স্বভাব প্রাপ্তির পূর্ব সূচনা। আপনি এখনও হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন না কবে এবং কিভাবে সদ্‌গুরু লাভ হইবে। কিন্তু যিনি আপনাকে গ্রহণ করিবেন তিনি পূর্ব হইতেই আপনাকে জানেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমগ্র দৃষ্ট জগৎ কালের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে কালকে উপেক্ষা করিয়া কোনো কার্য করা চলে না। সকল কার্যের জন্যই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময়টি সমাগত হইলে কার্যের উৎপত্তির উপযোগী বিভিন্ন কারণসমূহ স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনিই সংঘটিত হয়। সুতরাং ধৈর্য অবলম্বন করিয়া কালের প্রতীক্ষা করাই উচিত। ব্যাকুলতা এবং আন্তরিকতার মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্ত্তীকালও নিকটবর্তী হইয়া আসে। সদাকাঙ্খা এবং ব্যাকুলতা ভাল জিনিষ কিন্তু চঞ্চলতা ভাল নহে।

একমাত্র ভগবানই সদ্‌গুরু। যিনি তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হন তাঁহাকেও এইজন্যই সদ্‌গুরু বলা হয়। সদ্‌গুরু কোনরূপে কাহার নিকট প্রকট হইবেন তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার অনন্তরূপ। যে কোনোরূপে তিনি প্রকট হইতে পারেন। কোন রূপকে আশ্রয় না করিয়াও যে তিনি কৃপা করিতে পারেন না এমন নহে। তবে সে নিরাধার মহাকৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা এ জগতে কম লোকেরই আছে। এইজন্যই সিদ্ধ নরদেহকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের করুণাশক্তি সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরুদেব পূর্বে যেরূপ ছিলেন এখনও তেমনি আছেন। যোগ্য অধিকারীর সহিত তাঁহার প্রকট সম্বন্ধ এখনও তেমনিই আছে। বরং পূর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। যে সকল গুহ্যতত্ত্ব তিনি দেহে থাকিতে প্রকাশ করেন নাই এখন তাহাও করিতেছেন। ইহাও কালেরই

মাহাত্ম্য জানিবেন কারণ, তখন ঐ সকল রহস্য প্রকাশিত করিবার সময় হয় নাই কিন্তু এখন হইয়াছে।

আপনি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া নিজেকে সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র করিতে চেষ্টা করুন। আধার নির্মাণ প্রথমেই আবশ্যক। কারণ কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে যে অনন্তের দ্বার খুলিয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। কৃপা যখনই আসুক নিজে তাহার জন্য সর্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। আধ্যাত্মিক জগৎ রহস্যময়। এই রহস্য ভেদ করা লৌকিক বুদ্ধি অথবা বিচার শক্তির অতীত। তবে মহাশক্তির কৃপা পাইলে এই দুর্ভেদ্য রহস্যও সরল হইয়া যায়। কোন তত্ত্বের উপর কোন প্রকার আবরণ আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ অর্ন্তজগতে প্রবিষ্ট না হওয়া যায় ততক্ষণ রহস্যের সমাধান সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম উপায়ে জাল ভেদ করার চেষ্টা করাও উচিত নহে। কারণ তাহার ফল বিষময় হয়।

আপনার বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে পত্র লিখিবেন। এইসব বিষয় যদি কখনও সাক্ষাৎ হয় তখন বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে।

অধ্যাত্মজীবনে গুরুর স্থান

এক

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মুখেই একটি প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যায় — এই প্রশ্নটি গুরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে। ইঁহারা অনেকেই মনে করেন, মানুষ জীবনের পথে স্বাবলম্বী হইয়া চলিবে, তাহার শক্তি ও ভাবের বিকাশের জন্য দ্বিতীয় কোন আশ্রয় অপেক্ষিত নহে। আধ্যাত্মিক জীবনের পথেও মানুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ শ্রীভগবানের সহিত অথবা ভগবৎশক্তির সহিত। এই উভয়ের মধ্যবর্তী গুরু-নামক কোন ব্যক্তি বিশেষের স্থান কোথায়? এই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে গুরুর প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহারা গুরু সম্বন্ধে সংশয়বাদী।

অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে গুরুর আবশ্যকতা আছে কিনা তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে সাধারণ ভাবে বিচার করিলে আমরা সর্বত্র ইহাই দেখিতে পাই যে জীবনের পথে প্রথম দিকে এমন একটি অবস্থা বর্তমান থাকে যখন জীব শক্তি, জ্ঞান, ভাব প্রভৃতি সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী থাকিতে বাধ্য হয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। তাহার পর ভিতর হইতে শক্তির এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সাহায্য ততটা অপেক্ষিত হয় না। না হইলেও ভিতর হইতে অচিন্ত্য কোন শক্তির অধীনতা তখনও তাহার থাকে। তাহার পর জীবনের পথে পূর্ণ এবং চরম স্থিতি প্রাপ্ত হইলে স্বাধীনতার বিকাশ হয় এবং দ্বিতীয় কাহারও প্রতি অপেক্ষা থাকে না। স্বভাব হইতেই যাহা হইবার নিরপেক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে।

সাধারণ শিক্ষার পথেও যখন প্রথম অবস্থায় পথের নির্দ্দেষ্টা হিসাবে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হয় — অবশ্য সকলের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা স্বয়ম্ভু, স্বয়ং-উদ্ভুত জ্ঞান-সম্পন্ন তাঁহাদের কথা বলিতেছি না — তখন অধ্যাত্ম জীবনের অত্যন্ত গহন ও দুর্গম পথে প্রথম অবস্থায় বাহ্য-শক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার পূর্বে গুরুতত্ত্ব কি, গুরুর প্রকৃত কার্য

কি, গুরুর প্রকার ভেদ কি, গুরুর সহিত শিষ্যের এবং শিষ্যের সহিত গুরুর বাস্তব সম্বন্ধ কি, গুরু-শিষ্য ভাবের চরম পরিণতি কোথায় — ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় প্রয়োজন অনুরূপ আলোচনা করিতে হইবে। আলোচনার ফলে একটি প্রকরণের সহিত অন্য প্রকরণের কোন কোন বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে। কারণ অবান্তর প্রকরণগুলি সবই পরস্পর সম্বদ্ধ। কিন্তু বুঝিবার সময় প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে বিবেচনা করিয়া ধারণা করিতে হইবে।

আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি গুরু জ্ঞানদাতা। গুরুকে জ্ঞান-দাতা ভিন্ন অন্যরূপে আমরা সাধারণতঃ কল্পনা করি না। কিন্তু বস্তুতঃ গুরু জ্ঞানদাতা ত বটেনই — পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যাবতীয় জ্ঞান গুরু হইতেই উদ্ভূত হয়। তা' ছাড়া, গুরু কর্মদাতা এবং ভক্তিরসের দাতাও বটেন। ইহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব। গুরু এবং সদ্‌গুরু দুইটি শব্দই সাধন জগতে প্রচলিত আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে গুরু এবং সদ্‌গুরু অভিন্ন, অর্থাৎ গুরু বলিতে সদ্‌গুরু বুঝিতে হইবে। কারণ পূর্ণ আদর্শের দৃষ্টিতে অসদ্‌গুরু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তথাপি ব্যবহারের সৌকর্যের দিক দিয়া সদ্‌গুরু শব্দের একটি সার্থকতা আছে। পূর্ণ সত্যই যদি সত্যের অখণ্ড স্বরূপ হয়, তাহা হইলে যাঁহার অনুগ্রহে এই অখণ্ড সত্যের স্বরূপ প্রকাশিত হয় তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু; সত্যের খণ্ডরূপ অখণ্ড সত্য হইতে বস্তুতঃ পৃথক না হইলেও বুদ্ধির দিক হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য-বিশিষ্ট বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। যিনি এই খণ্ড সত্যের উপদেষ্টা তিনি খণ্ড জ্ঞানের প্রদাতা — তিনি খণ্ড গুরু। গুরুশব্দে খণ্ড ও অখণ্ড উভয় সত্যের প্রকাশককেই বুঝাইয়া থাকে। অখণ্ড সত্যের প্রকাশককে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইলে সদ্‌গুরু অথবা এই জাতীয় কোন শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। শুধু গুরুশব্দে খণ্ডসত্যের উপদেষ্টা বুঝাইয়া থাকে। খণ্ডসত্যের ব্যাপ্য-ব্যাপক দৃষ্টিতে একটি ক্রম আছে। অর্থাৎ খণ্ডসত্যের মধ্যে কোনটি নিম্নস্তরের, কোনটি উর্দ্ধস্তরের, কোনটি আরও অধিক উর্দ্ধস্তরের, এই প্রকার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস রহিয়াছে। তদনুসারে মূলে গুরুতত্ত্ব এক হইলেও গুরুবর্গের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ সম্ভবপর। এই শ্রেণী-বিভাগ গুরুর উপদেশ ক্ষেত্রের নিম্নোচ্চ বিভাগরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা গুরুর জ্ঞান-বিতরণ শক্তির তারতম্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ জ্ঞান

স্বরূপতঃ এক হইলেও উপাধির সংস্রব বশতঃ নানারূপে প্রতীত হয়।

দুই

সমগ্র সংসার মায়া হইতে উদ্ভূত। মলিন সংসার অশুদ্ধ মায়া সঞ্জাত, এবং শুদ্ধ জগৎ — যাহা সংসার না হইয়াও সংসাররূপে পরিগণিত হয় — শুদ্ধ মায়া হইতে আবির্ভূত হয়। মলিন সংসারের মূলে আছে অবিদ্যা এবং তাহার সহজাত গুণ আসক্তি। শুদ্ধ জগতের মূলে আছে বিদ্যা এবং উহারই সহিত অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট শক্তি ও আনন্দ। মায়া ও মহামায়ার রাজ্যের অতীত বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ। ঐ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ বিশ্বের অতীত হইয়াও বিশ্বের প্রতি বস্তুর সহিত অভিন্ন, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহাই পূর্ণ সত্তা। ইহারই কল্পিত খণ্ডরূপ সুখদুঃখরূপে অজ্ঞানময় জগতে এবং আনন্দ ও শক্তির লীলা-রূপে শুদ্ধ জগতে আত্মপ্রকাশ করে। আত্মার পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে একপক্ষে বিশ্বকে, শুধু মলিন জগৎ নহে, শুদ্ধ জগৎকেও, অতিক্রম করিয়া আত্মার কেবল স্বরূপে উপনীত হইতে হয়। তাহার পর পূর্ণশক্তির বিকাশের পথে আত্মার শিবময় মহেশ্বর রূপ সাক্ষাৎকার করিতে হয়। তখন আত্মা ও আত্মশক্তির অদ্বয় তত্ত্ব অর্থাৎ অভিন্নতা ও একরসতা স্বাভাবিকরূপে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে।

গুরুর প্রাথমিক কৃত্য শিষ্যরূপী জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির ব্যবস্থা। মায়িক জগতে ভেদজ্ঞানের অধীন হইয়া কর্মসংস্কারসম্পন্ন কর্তৃত্বাভি-মানে পুষ্ট জীব অনাদিকাল হইতে কর্ম করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে কৃত-কর্মের ফল ভোগ করিয়া আসিতেছে। জন্মজন্মান্তর হইতে সংসারের এই ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ভেদজ্ঞান ও কর্তৃত্বাভিমান বিগলিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংসার-লীলার অবসান ঘটে না এবং জন্ম-মৃত্যুর ও কালচক্রের আবর্তন নিবৃত্ত হয় না। জীব চিদাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মায়ার প্রভাবে সে জড় সত্তাকে নিজের চিৎসত্তা বলিয়া ভুল করিয়া আসিতেছে। এই ভুলের ফলেই কর্মক্ষেত্রে পতন ও অনুরূপ ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিতা। ঊর্ধ্বে দেবলোক হইতে নিম্নে তির্যক্ ও স্থাবর সীমা পর্যন্ত অসংখ্য প্রকার জীব রহিয়াছে। সকলেই এই দুঃখময় সংসারের আবর্তনে ঘূর্ণিপাক খাইতেছে। সাময়িক

উর্ধ্বগতি বা অধোগতি প্রকৃত পথের কোন সূচনা দান করে না। চেতন আত্মা যতক্ষণ নিজকে জড় হইতে পৃথক্ বলিয়া চিনিতে না পারিবে ততক্ষণ এই দুঃখময় কালচক্র হইতে উদ্ধারের কোন আশা নাই। যিনি অনুগ্রহ পূর্বক জ্ঞানদান করিয়া জীবকে এই অজ্ঞান হইতে মোচন করেন অথবা মুক্ত হইতে সাহায্য করেন, তিনি গুরু। এই জ্ঞানকে বিবেক-জ্ঞান বলে। জড় সত্তা বিভিন্ন স্তরের। তাই বিবেক-জ্ঞানেও তারতম্য আছে। যেটি বিশুদ্ধতম বিবেক-জ্ঞান তাহার ফলে আত্মার নির্মল স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাকেই কৈবল্য অথবা মুক্তি বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে নির্বাণও বলিয়া থাকেন।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যাত্মজীবনের ইহা পূর্ণ আদর্শ নহে। কারণ আত্মা মায়িক দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইলেও পূর্ণতা লাভ করে না। আত্মার একটি স্বাভাবিক স্বাধীনতা আছে, একটি স্বরূপভূত আনন্দের প্রকাশ আছে। যতক্ষণ সেই নিরপেক্ষতা বা স্বাতন্ত্র্য সে ফিরিয়া প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ তাহার সঙ্কোচ দূর হইল কোথায়? আত্মাই ত পরমাত্মা বা মহেশ্বর। আত্মা কৈবল্য বা মুক্তিলাভ করিলেও ত মহেশ্বরত্ব লাভ করে না। তাহার জন্য তাহার অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির পূর্ণতম জাগরণ আবশ্যক। সে শক্তি না জাগিলে আত্মা শুদ্ধ হইলেও শব মাত্র, শিব নহেন। কারণ শিব কখনও শক্তিবিহীন হন না। বস্তুতঃ শিব ও শক্তি অভিন্ন। তথাপি ইহা সত্য যে শিবের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবের মধ্যে পার্থক্য নাই। এক হিসাবে শিব মহা-প্রকাশাত্মক বলিয়া চির-ব্যক্ত। শক্তি যতক্ষণ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাব ধারণ না করে এবং ব্যক্ত ভাব ধারণের ক্রম ধরিয়া অথবা অক্রমে যতক্ষণ পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ না করে ততক্ষণ শক্তি শিবের সহিত অভিন্ন হইয়াও তাহার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারে না, একত্ব-লাভ ত দূরের কথা। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই একত্বলাভ অবশ্যম্ভাবী। তখন শিবে ও শক্তিতে পার্থক্য থাকে না, শিবে ও জীবেও পার্থক্য থাকে না, এবং জীব ও শিবেও পার্থক্য থাকে না। এই তিনটি তখন একই অভিন্ন অখণ্ড আত্মস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই পরমস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে যিনি সাহায্য করেন তিনিই সদ্‌গুরু। বস্তুতঃ আত্মাই সদ্‌গুরু। তিনিই সদ্‌গুরুরূপে মায়ান্ধ জীবকে মায়া হইতে মুক্ত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে

সম্যক্ প্রবুদ্ধ করিয়া নিজস্বরূপে অর্থাৎ শিব-স্বরূপে নিয়া আসেন। ইহাই সঙ্কোচহীন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য।

তিন

যে অন্ধ সে যেমন অন্যকে পথ দেখাইতে পারে না, আর দেখাইতে গেলেও উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনি যে অজ্ঞানী সে নিজেও পথ চিনে না — কারণ তার পথ-যাত্রার অবসান হয় নাই — সে অন্যকে পথ দেখাইবে কিরূপে? সুতরাং নিজে সম্যক জ্ঞান অপরোক্ষ ভাবে লাভ করিয়া তবে গুরুরূপে অন্যকে সেই জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, পরোক্ষ জ্ঞান ত দূরের কথা, অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেই কি তাহা অন্যকে দেওয়া যায়? ইহার উত্তর — যায় না। জ্ঞানের সহকারিরূপে দুইটি শক্তির প্রয়োজন হয় — একটি ইচ্ছা এবং অপরটি ক্রিয়া। অন্যের দুঃখ দূর করিবার যে ইচ্ছা, তাহাকে কৃপা অথবা করুণা বলে। যিনি জ্ঞানী হইয়াও এইপ্রকার ইচ্ছা-বিরহিত অর্থাৎ কৃপাহীন, তিনি অন্যকে তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য জ্ঞানোপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? করুণাই একমাত্র প্রবর্তক। ইচ্ছাহীনের করুণা কোথায়? কিন্তু শুধু ইচ্ছা থাকিলেই কার্যসিদ্ধি ঘটে না, যদি সেই ইচ্ছাকে সফলরূপে পরিণত করিবার সামর্থ্য না থাকে। শুধু ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তি নহে। ইচ্ছা অপ্রতিহত হইলেই তাহা ক্রিয়ারূপে স্থূলাকার ধারণ করে। তখন ঐ ইচ্ছা হয় অমোঘ অর্থাৎ অব্যর্থ। সুতরাং ঠিক ঠিক অমোঘ হইতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত ইচ্ছা ও ক্রিয়ার যোগ থাকা চাই। ইহাই সদ্‌গুরু অথবা আপ্ত পুরুষের লক্ষণ। এই অবস্থায় গুরুর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞান ফুটিয়া উঠে এবং তাঁহার ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে শিষ্যের জীবন-পথে বা সাধন মার্গে যাবতীয় অন্তরায় দূর হইয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ এইপ্রকার মহাপুরুষকে আপ্ত পুরুষ বলিয়াছেন। এই আদর্শেরই পূর্ণ রূপ সদ্‌গুরু।

চার

গুরু, গুরুকৃত্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে গুরুভাবের যেটি মূল উৎস সেই স্থানের এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিবার আবশ্যকতা মনে

করিতেছি। জীব অনাদিকাল হইতে মল, মায়া এবং কর্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পরমপদ হইতে চ্যুত রহিয়াছে। পরমস্থিতি পূর্ণস্থিতি। জীব-মাত্রেরই এই মহাস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু অধিকার থাকিলেও এই স্থিতিলাভ অত্যন্ত কঠিন। জীব স্বভাবতঃ প্রতিকূলবেদনীয় দুঃখের তাড়নায় বিতাড়িত হইয়া দুঃখ-নিবৃত্তির অন্বেষণে ও আনন্দের কিঞ্চিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। দুঃখ-নিবৃত্তি অথবা আনন্দ-প্রাপ্তি সাময়িক ভাবে যে না হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃত দুঃখনিবৃত্তি এবং চিরস্থায়ী আনন্দলাভ তাহার হইতেছে না। বস্তুতঃ হওয়ার উপায়ও নাই। কারণ জীব নিজে পশুস্বরূপ। পাশব জ্ঞানের দ্বারা পশুত্ব হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করা যায় না। পাশ বন্ধনেরই হেতু। পাশজ্ঞান প্রকৃত মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না। লৌকিক বা অলৌকিক জ্ঞান বা কোন শক্তি বা সত্তার অনুগ্রহ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা হইতে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না, ভগবত্তা লাভ ঘটে না। পূর্ণ শিবজ্ঞান একমাত্র শিব হইতেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর, তাহাতে পশুর অথবা পাশব কোন উদ্যম বা ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। কারণ পরমেশ্বর স্বতন্ত্র। অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে মহাকরুণারূপে তিনি যখন ক্লিষ্ট ব্যথিত জীবের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করেন তখন হইতেই জীবের জীবনের পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। এই পরিবর্তন অবস্থানুসারে বহুস্তরের ভিতর দিয়াও হইতে পারে, আবার একই ক্ষণে সিদ্ধ হইতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ মহাকৃপার প্রভাবে জীবের নিজ স্বরূপ যে শিবত্ব তাহা পুনর্বার অভিব্যক্ত হয়। ইহাই তাহার নিজ শক্তির বিকাশ। জীব শক্তিমান্ হইয়া শিবরূপে নিজেকে চিনিতে পারে। ইহাই জীবের ভগবত্তা লাভ।

এই যে পূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তির কথা বলা হইল ইহার মূল শিবজ্ঞান ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। ইহা পশুজ্ঞান অথবা পাশবজ্ঞান নহে। এই শিবজ্ঞান একমাত্র শিব হইতেই উদ্ভূত হয় এবং জীবকে পুনর্বার শিবরূপে স্থাপিত করে। আমরা যে গুরুতত্ত্ব নিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি পূর্ববর্ণিত শিবই সেই গুরুভাবের পরিপূর্ণতম আদর্শ। এখন এই আদিগুরু নিত্যগুরু, সমগ্র বিশ্বের পরমগুরু। পরমেশ্বর গুরুরূপে কি কার্য করেন এবং কি প্রণালীতে তাঁহার

অনুগ্রহ-শক্তি সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া চিদানন্দময় নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাই আলোচনার বিষয়। খণ্ডভাবে এবং বিভক্ত-ভাবে আনুষঙ্গিক আলোচনা যথাসময়ে পরে করা যাইবে।

শিব অর্থাৎ গুরু সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ। তাঁহাতে যে নিত্যশক্তি অভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন তিনিও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। উভয়ই এক — অবশ্য স্বরূপতঃ। কিন্তু প্রকাশের দিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। শিব নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা এবং কর্তা। শক্তি তাঁহার সহিত পূর্ণভাবে অভিন্ন হইয়াও দৃষ্টিস্বরূপ এবং করণস্বরূপ। সৃষ্টির পূর্বে শিব ও শক্তিতে কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। আপাততঃ আমরা দ্বৈত দৃষ্টি নিয়াই আলোচনা করিতেছি। তদনুসারে জীবও অনাদিকাল হইতেই অণুরূপে বিদ্যমান। জীব স্বরূপতঃ শিব হইতে অভিন্ন। তথাপি অনাদিকালের মল-সম্বন্ধবশতঃ শিবের অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পরিচ্ছিন্ন হইয়া অণুভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই চিদণু জীব বা পশু নামে বিখ্যাত। জীবের সংখ্যা অনন্ত। অনাদি-কাল হইতেই এই অনন্ত জীবাণুসকল মুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে জীবের এমন একটি আবরণ আছে যাহা অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান। এই আবরণটিকে জীবত্ব বা পশুত্ব বলা হয়। ইহার নাম মল। ইহা না থাকিলে জীব শিবরূপেই নিজেকে চিনিতে পারিত, বদ্ধরূপে নহে। এই আবরণের ন্যায় কোন স্থলে ইহার উপর দ্বিতীয় আবরণও দেখিতে পাওয়া যায়। এই আবরণটিকে কর্ম বলিয়া বর্ণনা করা চলে। আবার আণব মল ও কর্ম এই দুইটির পরেও কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি আবরণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই আবরণটি কর্মময় জীবের মায়িক দেহ। মায়া আবরণ-রূপা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সৃষ্টিরূপে যেমন শিব ও শক্তিতে ভেদ লক্ষিত হয় না তেমন চিৎশক্তি এবং মায়াতে ভেদ লক্ষিত হয় না। কেবল তাহাই নহে, জীব ও শিবেও কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, এবং একটি জীব ও অপর একটি জীবের মধ্যে পরস্পর ভেদ লক্ষিত হয় না। তখন আলোও থাকে না, অন্ধকারও থাকে না। কি যে থাকে, কি যে থাকে না কিছুই বলা যায় না। সৎ ও অসৎ কোন বিশেষণই সেই অবস্থার বর্ণনার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সেই অবস্থাটি চিৎশক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। বাস্তব স্থিতিতে শক্তির নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অবস্থাতে কোন ভেদ নাই। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা

বুঝিতে হইলে উভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার না করিলে গত্যন্তর থাকে না। এই নিষ্ক্রিয় শক্তি যখন সক্রিয়রূপ ধারণ করেন তখন সব যেন আপন আপন স্বরূপ নিয়া ফুটিয়া উঠে। পূর্বেও যে সব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অস্ফুটভাবে না থাকার মত ছিল। অন্ধকারের মধ্যে যেমন সকল বস্তুই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ঐ অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান হয়, নিজের নিজের পৃথক্ সত্তার ভান হয় না, সৃষ্টির পূর্বাবস্থাও কতকটা ঐরূপ। কিন্তু শক্তি সক্রিয় হইলে ভেদগুলি স্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠে। তখন শিব ও শক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি নিত্য-সম্বদ্ধ হইয়াও পৃথক ভাবে লক্ষিত হয়। এই শক্তিকে আমরা পরাশক্তি নামে নির্দেশ করিব। এই যে পরাশক্তি ইহাই পরশিবের নিজশক্তি। ইহাই অখণ্ড অনুগ্রহরূপ, বিশাল করুণারূপ ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এই মহাকরুণাই ভগবানের মহাপ্রেম, যে করুণায় ও প্রেমে বিগলিত হইয়া তিনি অনাদিকালের বদ্ধ জীবকে মুক্ত করিয়া নিজের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নভাবে আনিবার জন্য ক্রিয়া করেন। তিনি নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও এইপ্রকারে নিরন্তর ক্রিয়া করিতেছেন। এই ক্রিয়াটি বাহ্যরূপে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইলেও ইহার মূলরূপ এক ও অভিন্ন। এই মূল রূপটি অনুগ্রহ। এই শক্তি পরম অনুগ্রহরূপা বলিয়া ইহাকে সর্বমঙ্গলা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ইহারই আত্মপ্রকাশ মাত্র, ইহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব। শাস্ত্র বলিয়াছেন অনুগ্রহ-শক্তিই গুরুর স্বরূপ। পরম শিবই গুরু এবং এই অনুগ্রহ-শক্তিই তাঁহার পরাশক্তি। এই অনুগ্রহ শক্তি অণুরূপী জীবসকলকে মুক্ত করিয়া নিজের শিবস্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথম উন্মেষকালে ঐ সকল জীব পরস্পর পৃথক্‌ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। কারণ সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় উহারা অভিন্ন পিণ্ডবৎ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ক্রিয়াশক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই সময়ে পরাশক্তি হইতে বিশ্বসৃষ্টির ভাবী কার্য-নির্বাহের জন্য একটি শক্তি নির্গত হয়। ইহার নাম আদিশক্তি বা আদ্যাশক্তি। আদিশক্তি আবির্ভূত হইয়া সর্বপ্রথম মায়ার বিভাগ সম্পাদন করেন। অর্থাৎ মায়াকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভাগে বিভক্ত করেন। আদিশক্তির উদয় যখন হয় নাই তখন শুদ্ধ ও অশুদ্ধ মায়া অবিভক্ত-রূপে বিদ্যমান ছিল। আদিশক্তি আবির্ভূত হইয়া উভয়কে পৃথক্

করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, শুদ্ধ ও অশুদ্ধের অন্তরালবর্তী একটি মিশ্র অবস্থারও আবির্ভাব তখন বুঝিতে পারা যায়। এইপ্রকারে বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে প্রথমে তিনটি স্তরের বিকাশ হয়। একটি শুদ্ধ মায়া, উহা জ্যোতির্ময় ; একটি অশুদ্ধ মায়া, উহা তমোময় ; এবং একটি মিশ্র, তাহাতে আলো এবং অন্ধকার উভয়ই মিশ্রিতভাবে প্রকাশ পায়। মায়া বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে পিণ্ডীভূত জীবরাশি বিভক্ত হওয়ার পর আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে আপন আপন স্থান লাভ করিতে পারে।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। জীবসকলের মধ্যে কোন কোন জীব শুধু একটি আবরণে আবদ্ধ। আবার কোন জীব এক সঙ্গে দুইটি আবরণে আবদ্ধ। এই দুইটি আবরণের মধ্যে অবান্তর ভেদ আছে। আবার কোন কোন জীব যুগপৎ তিনটি আবরণেই আবদ্ধ। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। কিন্তু কিঞ্চিৎ তত্ত্ব প্রকাশ না করিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে না। এমন সকল অণুরূপী জীব আছে যাহারা দেহ হইতে মুক্ত এবং দেহের বীজ কর্মসংস্কার হইতে মুক্ত অথচ তাহারা দিব্যজ্ঞানের অভাবে নিজের স্বভাবসিদ্ধ শিবত্ব অনুভব করিতে পারে না বলিয়া বিদেহ অবস্থায় কেবলরূপে স্থিত রহিয়াছে। এই সকল জীবের অশুদ্ধমায়ার জগতে আর কখনও জন্ম হইবে না। অথচ ইহারা পরামুক্তি লাভও করে নাই। ইহাদের অধোগতি নাই ইহা সত্য কিন্তু ঊর্ধ্বগতিও হইতেছে না। তাই ইহারা অনুগ্রহের পাত্র। ঐ সব অণুরূপী জীব একপ্রকার বিশুদ্ধ মায়ার স্তরে বিদ্যমান থাকে। ইহারা অশুদ্ধ মায়া অথবা মিশ্রমায়া কোনটাতেই অবস্থান করে না। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও সবগুলি জীব ঠিক এক শ্রেণীর নহে। ইহারা সকলেই মায়াতীত এবং মুক্তবৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের মলরূপী আবরণ অপসারিত না হইলে ইহারা নিজের পরম স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। তাই পরম শিবরূপী গুরুর দৃষ্টিতে ইহারাও অনুগ্রহের পাত্র। জগতের দৃষ্টিতে ইহারা মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু পরামুক্তি ইহাদের হয় নাই। এইপ্রকার কোন কোন জীব বিদেহ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের পুনর্বার দেহপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ তাহাদের মল ত আছেই, তাছাড়া কর্মের আবরণও রহিয়াছে। কর্মের উপযোগী মায়িক দেহ

পুনর্বার তাহাদিগকে ধারণ করিতে হইবে। এই সকল জীব বিশুদ্ধ মায়াস্তরে কি করিয়া থাকিবে ? তাহারা বিশুদ্ধ মায়ার নিম্নে অশুদ্ধ মায়ার স্তরবিশেষে বিদ্যমান থাকে। এই যে মায়ার বিভাগের কথা বলা হইল এই বিভাগের চরম বিকাশ ত্রিবিধ স্তরের পঞ্চবিধ স্তরের পরিণতিতে। তত্ত্বের বিকাশের পূর্বে কলার বিকাশ আবশ্যক। যেমন গৃহ রচনার পূর্বে ইষ্টকাদির রচনা আবশ্যক হয় এবং ইষ্টক রচনার পূর্বে মৃৎসংগ্রহ আবশ্যক, তদ্রূপ দেহাত্মক বিশ্ব রচনার পূর্বে বিশ্বের সাক্ষাৎ উপাদান তত্ত্বসকলের রচনা আবশ্যক হয় এবং তত্ত্ব-রচনার পূর্বে তত্ত্বের মূল উপাদানভূত কলা বা শক্তির বিকাশ আবশ্যক।

আমরা নিম্নস্তরের স্থূল দৃষ্টিতে যেমন পঞ্চভূত অনুভব করিয়া থাকি তেমনি অতি শুদ্ধ ও সুক্ষ্মতম স্তরেও এই পঞ্চভূতেরই অনুরূপ পঞ্চশক্তির অবস্থান অনুভব করিয়া থাকি। এই পঞ্চশক্তি পঞ্চকলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাম নিম্ন হইতে গণনা করিলে — নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীত। এই পাঁচটি কলা ৩৬টি তত্ত্বের মূল উপাদান। নিবৃত্তির কার্য পৃথিবী, প্রতিষ্ঠার কার্য জল হইতে প্রকৃতি পর্যন্ত ২৩টি তত্ত্ব, বিদ্যার কার্য পুরুষ হইতে মায়া পর্যন্ত ৭টি তত্ত্ব, শান্তির কার্য শুদ্ধ বিদ্যা হইতে শক্তি পর্যন্ত ৪টি তত্ত্ব এবং শান্ত্যতীতা হইতে শিবতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। এই ভাবে বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে পাঁচ কলারূপ ৫টি বিরাট্ ভুবন ফুটিয়া উঠে। ইহার প্রত্যেকটি ভুবনেই অসংখ্য অন্তর্বিভাগ রহিয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে জীবগত ভেদের কোনই প্রসঙ্গ ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিলে তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্র আবশ্যক হইয়া পড়ে। অণুরূপী জীবসকল আদিশক্তির প্রভাবে বিভক্ত হইয়া আপন আপন ভুবনে স্থান লাভ করে। কারণ-মায়া হইতে কার্য-মায়ার আবির্ভাব এখনও হয় নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। কার্যমায়া জীবের আবরণ স্বরূপ। কিন্তু কর্ম করিতে হইলে এই আবরণ থাকা আবশ্যক।

পরমেশ্বরের ৫টি মুখ্যকর্ম তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। ইহাদের নাম পঞ্চকৃত্য বা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ। নিগ্রহের নামান্তর তিরোধান। সাধারণতঃ দার্শনিকগণ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এই তিনটিকে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সৃষ্টির মূলে তিরোধানের

একটি ব্যাপার অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তিরোধান বা নিগ্রহ শব্দে আত্মস্বরূপের আচ্ছাদনকে বুঝাইয়া থাকে। অদ্বৈত মতে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই। তিনি লীলাচ্ছলে নিজেকে আপন স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে সঙ্কুচিত করিয়া অণুরূপ ধারণ করেন এবং এক হইয়াও বহু সাজেন। এই যে অণুভাব বা আত্মসঙ্কোচ ইহাই আণব মল নামে প্রসিদ্ধ। তিনি স্বরূপে যথাপূর্ব অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও লীলারূপে সঙ্কোচ গ্রহণ করেন। কারণ এখান হইতেই তাহার অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। দ্বৈতমতে অনাদিকাল হইতেই আত্মাতে একটি আবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ধান্যের মধ্যে যেমন তণ্ডুল ও তুষ দুইটি অংশ থাকে তদ্রূপ আত্মস্বরূপে অনাদিকাল হইতে একটি আবরণও আছে। এই আবরণটি ঠিক তুষের অনুরূপ। ইহার আদি প্রবৃত্তি কোন নির্দিষ্ট কালে হয় নাই বলিয়া ইহাকে অনাদি বলা হইয়া থাকে। দ্বৈতমতে এই আণব মলটি একজাতীয় দ্রব্যবিশেষ। চক্ষুতে যেমন পর্দার আবরণ কারণবিশেষে ঘটিয়া থাকে, আবার চিকিৎসকের অস্ত্রদ্বারা ঐ পর্দা পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হইলে ছিন্ন করা হয়, তদ্রূপ আত্মার স্বাভাবিক শিবত্বের উপর এই মলরূপ পর্দা অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাই তাহার পশুত্ব। আত্মা স্বরূপে শিবরূপী হইলেও এই পর্দার জন্য পশু হইয়া রহিয়াছে এবং শিবভাবের উপযোগী অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অপ্রতিহত ক্রিয়া তাহাতে ফুটিতে পারিতেছে না। ইহা অর্থাৎ এই অণুত্বরূপী পর্দা অপসারিত হইলে আত্মা পুনর্বার নিজের শিবত্ব ও ভগবত্তা প্রাপ্ত হইয়া পরাগতি লাভ করে। এই আবরণরূপী পর্দা ভগবানের তিরোধান শক্তির প্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অদ্বৈত মতে পরমশিব স্বয়ংই স্বাধীনভাবে ইহা গ্রহণ করেন এবং স্বরূপে শিব থাকিয়াও খেলা করিবার জন্য পশু সাজেন। দ্বৈতমতে ইহার প্রবৃত্তির প্রথম অবধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি ইহা যে ভগবানের নিগ্রহ-শক্তির ব্যাপার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ অদ্বৈতদৃষ্টিতে একের বহু হওয়া এবং বহুরূপে অণুভাব পরিগ্রহ করা তাঁহার তিরোধান-শক্তির ক্রিয়া। দ্বৈতমতে বহু অণু অনাদিকাল হইতে স্বভাবসিদ্ধভাবে আছে। কিন্তু তাহাদের স্বভাবের বা স্বরূপের আবরণ পরমেশ্বরের তিরোধান-শক্তির ফলে ঘটিয়া থাকে।

অধ্যাত্ম বিকাশের ক্রম

স্থূলভাবে অধ্যাত্ম বিকাশের ক্রম এই ঃ (১) কর্মাভ্যাস — ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দিলাম না।

(২) যথাবিধি কর্ম করিতে করিতে চিত্রক্ষেত্র অর্থাৎ হৃদয় শুদ্ধ হয়। আকাশ হইতে মেঘ সরিয়া গেলে যেমন শুদ্ধ নীলাকাশ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, ঠিক তদ্রূপ হৃদয় হইতে সংস্কার মল তিরোহিত হইলে হৃদয়টিও স্বচ্ছ আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

(৩) ইহার পর স্বচ্ছ হৃদয়াকাশে সূর্যোদয়ের ন্যায় ইষ্টস্বরূপ উদিত হয়। তখন ইষ্টের আলোকে সমগ্র আকাশ আলোকিত হয়। ইহারই নাম হৃদয়ে ইষ্ট দর্শন।

(৪) নিরন্তর এই ইষ্ট দর্শন হইতে থাকিলে দীর্ঘকাল পরে ইহা অন্তরে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ এই অবস্থা সাধকের ইষ্টলোকে স্থিতিলাভেরই নামান্তর।

(৫) এই স্থিতির পর হৃদয়স্থিত ইষ্ট হইতে তাহার একটি আভাস স্ফুরিত হইয়া বহিরাকাশে প্রকাশিত হয়। তখন অন্তরাকাশের ন্যায় বহিরাকাশেও অবাধিতরূপে ইষ্টদর্শন হইয়া থাকে। এই ইষ্টরূপ বাহ্য কোনও পদার্থের সহিত সংসক্ত অর্থাৎ জড়িত রূপে প্রকাশিত হয় না। ইহা নির্লিপ্তভাবে বাহ্যাকাশে দৃশ্যমান হয়। কোনও বস্তুর সহিতই ইহার যোগ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না।

(৬) ইহার বাহ্যপদার্থের প্রত্যেকটিতেই জড়িতরূপে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও দিকেই দৃষ্টি পতিত হউক — তাহাই যেন ইষ্টের আসন অথবা অধিষ্ঠান। ইষ্টরূপই তখন মুখ্য, পদার্থের রূপটি তখন গৌণ। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

(৭) ইহার পর বাহ্যরূপটির গৌণভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুপাতে ইষ্টের রূপ প্রাধান্য লাভ করে। চরমাবস্থায় শুধু ইষ্টের রূপই থাকে, বাহ্যরূপ আর থাকে না। ইহাই কৈবল্যাবস্থা। সাধক দ্রষ্টারূপে স্থিতিলাভ করে।

(৮) এই ইষ্ট রূপ দৃক্‌শক্তির দ্বারা ভিন্ন হইলে ইহার মধ্যে জগতের যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলে। একমাত্র ইষ্টরূপেই অনন্ত জগৎ প্রতিভাসমান হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় ঐ এক ইষ্টই যেন ইষ্ট থাকিয়াও অনন্ত আকারে প্রকাশমান হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই অনন্তরূপ চিন্ময়। কারণ ইহা ইষ্টের স্বরূপ দর্শনের পর আবির্ভূত। ইষ্টের স্বরূপ দর্শন হইলে অচিদংশ অবশিষ্ট থাকিতে পারে না।

(৯) ইহার পর ইষ্টরূপ তিরোহিত হইয়া যায়। তখন অনন্তরূপেই ইষ্ট থাকেন। ইষ্টের পৃথক সত্তা থাকে না। ইহাই পূর্ণত্ব বা নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। দ্রষ্টা কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তখনও থাকে।

(১০) ইহার পর ইষ্ট বা ব্রহ্ম সাধকের আত্মস্বরূপে প্রতিভাসমান হন। ইহাই সর্বাত্মভাব। এই অবস্থায় সর্বত্রই নিজেকে দেখা যায়। বেশ অনুভব করিতে পারা যায় আমিই সব হইয়া আছি এবং খেলা করিতেছি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া পৃথক বস্তু তখন থাকে না।

(১১) ইহার পর সবের বোধ থাকে না। একমাত্র আমিই আছি — অখণ্ড অব্যক্ত অনন্ত আমি। ইহাই থাকে — দ্বিতীয় কিছুই নাই। এইটি চিদানন্দঘন অবস্থা।

(১২) ইহার পর এই মহান আমিও থাকে না। সে অবস্থাকে চিদানন্দ বলা যায় না, পূর্ণ অহং বলা যায় না, পরব্রহ্ম বলা যায় না। কারণ উহা অনন্তের অতীত, ভাষা দ্বারা তাহার প্রকাশ চলে না। ইহাও স্বয়ংপ্রকাশ অবস্থা। এই অবস্থার বিশ্লেষণ এখানে করা হইল না। ইহার অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতাবস্থা।

(১৩) ইহারও পরাবস্থা আছে।

দীক্ষার স্বরূপ

দীক্ষা বস্তুতঃ আত্মসংস্কারেরই নামান্তর। আণব, মায়ীয় ও কার্মমল অথবা পাশ দ্বারা সংসারী আত্মা আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের প্রভাববশতঃ তাহার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে আত্মা পূর্ণ ও শিবস্বরূপ হইলেও আণবমলের আবরণ-বশতঃ স্বরূপগত সঙ্কোচ নিবন্ধন নিজেকে অপূর্ণ মনে করে। নিজে অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও নিজেকে সর্বপ্রকারে পরিচ্ছিন্নবৎ অনুভব করে[১]। এই পরিচ্ছিন্নতা অথবা আণবভাব প্রাপ্ত হওয়ার পর উহাতে শুভাশুভ বাসনার উদ্‌ভব হইয়া থাকে। এই সকল কারণের বিপাকে জন্ম (দেহসম্বন্ধ), আয়ুঃ (দেহের স্থিতিকাল) ও ভোগ (সুখ-দুঃখের অনুভব) অনিবার্য হয়। ইহারই নাম কার্মমল। ইহা কর্ম হইতে উৎপন্ন কঞ্চুকরূপ আবরণ। কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এবং ইহাদের সমষ্টিভূত মায়া। পুর্যষ্টক ও স্থূলভূতময় বিভিন্ন জাতীয় কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ, এই সকল দেহের আশ্রয়ভূত বিচিত্র ভুবন ও নানাপ্রকার ভোগ্যপদার্থের অনুভবের কারণ মায়ীয় মল রূপে প্রসিদ্ধ[২]। বদ্ধ আত্মাতে এই তিন প্রকার আবরণ সর্বদাই থাকে। দীক্ষার দ্বারা মলিন আত্মার সংস্কার হইয়া থাকে। মলনিবৃত্তি তো হয়ই, নিবৃত্তির সংস্কার পর্য্যন্ত শান্ত হইয়া যায়।

১। ইহারই পারিভাষিক নাম "অভিলাষ"। ইহাকে ভ্রমবশতঃ অনেকে রাগতত্ত্ব মনে করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা রাগ নহে। রাগ বলিতে বোঝায় বিষয়াসক্তি, যাহা "আমি কিছু চাই" এইরূপ ভাষার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। এই রাগসম্বন্ধবশতঃই পুরুষ ভোক্তারূপে পরিণত হয়। কিন্তু অভিলাষ বলিতে এইরূপ কোন ভাব বুঝায় না। ইহা শুধু অপূর্ণতার বোধ-মাত্র এবং ইহাই অন্যান্য মলের ভিত্তিস্বরূপ।

২। স্বরূপে শরীর, ভুবন, ভাব ও ভূত যাহা কিছু প্রতিভাত হয় সবই মায়ীয় মলের অন্তর্গত। নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে কোন পদার্থের ভানকে মায়ার রূপ বলিয়া জানিতে হইবে। কলা হইতে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্বই দেহস্থিত মায়ীয় পাশরূপ জানিতে হইবে। এই পাশ শরীর, ইন্দ্রিয়, ভুবন, ভাব প্রভৃতিকে ভোগসম্পাদনের জন্য আকার প্রদান করে। কলা হইতে পৃথিবী পর্যন্তই সংসার।

"দীয়তে জ্ঞানসদ্‌ভাবঃ, ক্ষীয়তে পশুবাসনা।
দানক্ষপণসংযুক্তা দীক্ষা তেনেহ কীৰ্ত্তিতা ॥"

অর্থাৎ যাহার দ্বারা জ্ঞান প্রদত্ত হয় এবং পশুবাসনার ক্ষয় হয় এই-প্রকার দান ও ক্ষপণযুক্ত ক্রিয়ার নাম দীক্ষা। ইহাই দীক্ষার স্বরূপ। শক্তিপাতের তীব্রতাদি ভেদ এবং শিষ্যের অধিকার-বৈচিত্র্যানুসারে দীক্ষা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। শক্তিপাতের স্বরূপ, লক্ষণ, প্রকার-ভেদ এবং চিহ্ন প্রভৃতির বিবরণ শক্তিপাত-রহস্য প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। পাশের প্রশমন এবং শিবত্বের অভিব্যক্তির যোগ্যতা দীক্ষা হইতে উৎপন্ন হয়। ভর্জিত বীজ যেমন অংকুরিত হয় না সেইপ্রকার মন্ত্রের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে প্রভাবিত পাশ-সকলেরও পুনরায় প্ররোহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

জীবের মোক্ষদাতা ঈশ্বর। পাশের বিচ্ছেদ এবং সর্ববিষয়ক জ্ঞান-ক্রিয়ার উদ্‌ভব অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব ও কর্তৃত্বের স্ফুরণ, ইহাই মোক্ষের স্বরূপ। পরমেশ্বর নিজের ক্রিয়াশক্তিরূপ দীক্ষার দ্বারা পশু-আত্মাকে মুক্ত করিয়া থাকেন। কোন একটি অথবা দুইটি পাশের বিচ্ছেদকে মোক্ষ বলে না। মোক্ষ অবস্থাতে অজ্ঞতা, অকর্তৃত্ব প্রভৃতি আত্মাতে থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত পশু-আত্মা স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না। সেইজন্য তাহার নিজের ক্রিয়া, জ্ঞান প্রভৃতি উপায় দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। প্রকৃতি প্রভৃতি পাশেরই অন্তর্গত। এই সকল পদার্থ হইতেও মোক্ষের উদয় হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করা চলে না। একমাত্র পরমেশ্বরই জীবকে মুক্তিদান করিতে পারেন। কেননা আর কাহারও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই।

আরও একটি কথা আছে ঃ সিদ্ধান্তে মোক্ষ মোচনীয় জীবের অবস্থাবিশেষের নাম। ইহা মোচনকারী বস্তুর অবস্থাবিশেষ নহে। কারণ, এই মতে মোচনকারী বস্তু একমাত্র পরমেশ্বর। পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত বলিয়া কোন সময়েই তাঁহাতে কোন বিশেষ ধর্মের আধান হইতে পারে না। কোন কোন আচার্য মনে করেন যে অজ্ঞানরূপ মলে আচ্ছন্ন পুরুষই ভ্রমবশতঃ সংসারে ভ্রমণ করিতেছে এবং সে স্বয়ংই উহার বিরুদ্ধ-ভাবনার অভ্যাসের বলে বিবেক ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পর অজ্ঞাননিবৃত্তিবশতঃ সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্বরূপধর্ম প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠাতামাত্র। এই মতে মোক্ষের কর্তৃত্ব পুরুষের। কিন্তু অধিকাংশ আচার্য এই মত সমর্থন করেন না।

তাঁহারা বলেন যে ধর্মাধর্মের কর্তৃত্ব পুরুষে আছে ইহা খুবই সত্য, কারণ কলা প্রভৃতির দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মার মল অপসারিত হইলে উহার সম্বন্ধবশতঃ পুরুষের জ্ঞানক্রিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিকসিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিকাস কখনই এত অধিক পরিমাণে হইতে পারে না যে উহার দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণের স্ফুরণ হইতে পারে। অতএব কলা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমান নিবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া পুরুষের কর্তৃত্বাদি ধর্ম অবিচ্ছিন্নই থাকিয়া যায়।

কোন কোন আচার্য পাশের নিবর্তনস্বভাব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে পাশসকল নিজ স্বভাববশতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না, কারণ জীব অথবা পাশের নিজ হইতে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির কোন ক্ষমতা নাই। ঈশ্বরের প্রেরণা সর্বত্রই আবশ্যক। এইজন্য মোক্ষের কর্তৃত্ব ঈশ্বরেই স্বীকার করা উচিত। ইহ অবশ্যই সত্য যে সংসারদশাতে কার্য এবং কারণরূপী পাশসমূহ নানাপ্রকারে আত্মাতে জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে মোক্ষ বিষয়ে পাশের স্বয়ংকর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। মোক্ষ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। যে ব্যঞ্জকে যে প্রকার ব্যঞ্জনাশক্তি প্রতীত হয় উহাকে অন্যত্র অজ্ঞাত বিষয়েও ঐ প্রকার ব্যঞ্জনাশক্তিযুক্ত বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। সুতরাং কার্য ও করণরূপে প্রতীয়মান অচেতন পাশে ঈশ্বরের প্রেরণা এবং স্বতঃসিদ্ধ ব্যঞ্জনাশক্তি বর্তমান থাকিলেও দেহাদিতে আত্মবোধ থাকার দরুণ উহা যে-প্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি করিবে তাহা নিজের আবরণাত্মক আকারের সহিত সম্বদ্ধ, স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে অনুরাগযুক্ত, কোন সময়ে, কোন স্থলে এবং কোন বিষয়ে রাগদ্বেষাদি বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা দ্বন্দ্বযুক্ত এবং শরীরাদি নাশের সঙ্গে সঙ্গে নাশশীল। পূর্ণ জ্ঞানক্রিয়ার নাম মোক্ষ। এইজন্য পাশের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। দীপ ঘরকে প্রকাশিত করে, তাই বলিয়া উহা ব্রহ্মাণ্ডকেও প্রকাশিত করিবে ইহা বলা চলে না। সিদ্ধপুরুষের জ্ঞানক্রিয়াশক্তি পরমেশ্বরের শক্তির ন্যায় পাশসকলকে নষ্ট করে। পশুদের মত উহা পাশের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না এবং শরীরাদিতে আত্মবোধ ও অনুরাগাদি যুক্তও নহে।

সময়দীক্ষা

তান্ত্রিকগণ বিভিন্ন গ্রন্থে দীক্ষার প্রকারভেদ বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বিভিন্ন দীক্ষার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে। শিষ্যের যোগ্যতা-মূলক অধিকারভেদেই এই ক্রমের মুখ্য কারণ। কিন্তু এই ক্রম স্বাভাবিক বলিয়া অপরিহার্য হইলেও অনেকস্থলে যথাবৎ অনুসৃত হয় না। ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয় ক্রমবদ্ধ হইলেও যেমন তীব্র বৈরাগ্যস্থলে মধ্যবর্তী এক বা দুই আশ্রম লঙ্ঘনপূর্বক পূর্ববর্তী কোনো আশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার জন্মে, ঠিক সেইপ্রকার দীক্ষাক্রম বিষয়েও বলা চলে।

সকলপ্রকার দীক্ষার মধ্যে প্রথমে সময়দীক্ষাই আলোচ্য। এই দীক্ষাতে সকল পশু আত্মার সমান অধিকার আছে। ইহাতে কাল ও আশ্রমাদির নিয়ন্ত্রণ নাই। আত্মার অনাদি মল কিঞ্চিন্মাত্র পক্ব হইলেই যখন ভগবানের কৃপাশক্তি অত্যন্ত মন্দরূপে জীবে অবতীর্ণ হইতে থাকে তখনই এই দীক্ষা হইতে পারে। গুরুকর্তৃক শিষ্যের মস্তকে শিবহস্তের অর্পণই সময়দীক্ষার স্বরূপ। এই দীক্ষার পর গুরুশুশ্রূষা ও বিভিন্ন দেবপূজাতে অধিকার জন্মে। তাহা ছাড়া ভগবানের প্রতি ভক্তির উন্মেষও হইতে থাকে। এই দীক্ষার প্রধান ফল প্রাক্তন কর্মসমূহের পরিপাক। কর্ম পরিপাক না হইলে নষ্ট হইতে পারে না। যদিও কালরূপী অগ্নিদ্বারা নিরন্তরই কর্মসমূহ পক্ব হইতেছে তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কাল ক্রমধর্মক বলিয়া কালকৃত পাকও ক্রমিক ভোগের দিকে চিত্তের উন্মুখতামাত্র। ক্রমিক ভোগ দ্বারা কর্মক্ষয় অবশ্য হয় সত্য, তবে ক্রমশঃ হয়, একসঙ্গে হয় না, হইতে পারেও না। তাহা ছাড়া উহা দ্বারা কর্ম কোনো সময়েই নিঃশেষ হইতে পারে না, কারণ কর্মের মূল নষ্ট না হওয়ার দরুণ নূতন কর্মের সঞ্চয় হইতেই থাকে। অনাদিকাল হইতে অসংখ্য কর্ম উপচিত হইতেছে — ঐগুলিকে এক একটি করিয়া ক্রমশঃ নষ্ট করা যায় না। এইজন্য দীক্ষা আবশ্যক, কারণ দীক্ষা সমষ্টিরূপে কর্মবন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ। সর্বান্তে কখনও না কখনও কর্ম একসঙ্গে নষ্ট হইতে পারে। উহাকেই পূর্ণতম জ্ঞানোদয় বলা হইয়া থাকে। অপূর্ণ জ্ঞানোদয়কালে সঞ্চিত কর্মরাশি নষ্ট হয় এবং দেহারম্ভক কর্ম বাকী থাকিয়া যায়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে

বুঝা যাইবে যে কালশক্তিও ভগবানের ক্রিয়াশক্তিরই রূপান্তর। কাল রুদ্রবিশেষ (কালাগ্নিরুদ্র) বলিয়া কালশক্তি রৌদ্রীশক্তি। দীক্ষাও রৌদ্রীনাম্নী ক্রিয়াশক্তিরই ব্যাপার। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে মাত্রা ও বিকাশাদিগত পরস্পর বৈশিষ্ট্য আছে।

"সময়" বলিতে বুঝায় আগমশাস্ত্রীয় মর্যাদার পালন। প্রথম বা সময়দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে শাস্ত্রের অধ্যাপনা, শ্রবণাদি ও হোম, জপ, পূজন, ধ্যানাদিতে যোগ্যতালাভ হয়। সময়ীর আত্মা চর্যা ও ধ্যান দ্বারা শুদ্ধ হয়। গুরূপদিষ্ট শাস্ত্রোক্ত আচারাদির পালনকে চর্যা বলে। ধ্যান যোগাভ্যাসের নামান্তর। এই দীক্ষার প্রভাবে পূর্ণত্বলাভ হয় না এবং মন্ত্রারাধনক্রমে ভোগলাভ হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে ঈশ্বরপদপ্রাপ্তি বা অপরামুক্তি লাভ হইতে পারে এবং পুত্রকাদি ভাবীপদ লাভ করার যোগ্যতা জন্মে। পাশশুদ্ধিই ঐশ্বর্যের কারণ — এই দীক্ষা দ্বারা ঈশ্বরসম্বন্ধ হইলে উহা হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে পাশশুদ্ধি পাশসকলের সমূল নিবৃত্তি নহে। কারণ কলা, তত্ত্ব ও ভুবন প্রভৃতি ছয় অধ্বার শুদ্ধি ও পরতত্ত্বের যোজনা এই দুইটি ব্যাপার যতক্ষণ সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ সম্পূর্ণ পাশের অপগম ঘটেনা এবং পূর্ণত্বলাভও হয় না, উহার জন্য সূক্ষ্ম বিধান আছে। কিন্তু সময়ীর জন্য এইপ্রকার বিধান নাই, আবশ্যকও হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে — সময়ীর ঈশ্বরারাধনযোগ্যতা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? ইহার উত্তর এই — এইপ্রকার যোগ্যতাপ্রাপ্তির জন্য শুধু অধিষ্ঠাতৃকারণবর্গের বিশ্লেষণই পর্যাপ্ত। ঐ পর্যন্ত সময়ীর সীমা।

ভোগদীক্ষা ঃ সাধকদীক্ষা

সময়ীদীক্ষার পর পুত্রকাদি অন্যান্য দীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রথমেই পুত্রকাদি দীক্ষাও হইতে পারে। এই সময়ে দীক্ষাতে অধ্বাশুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু সম্পূর্ণ পাশশুদ্ধি না হইলে তাহা হইতে পারে না এবং পরতত্ত্বযোজন ব্যতীত পাশসকলের উন্মূলন অসম্ভব। তাহার অভাবে ভোগ বা মোক্ষ কোনো ফলের প্রাপ্তি হইতে পারে না। সময়ীদীক্ষাতে পাশশুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, কারণ দীক্ষা দ্বারাই অংশতঃ পাশশুদ্ধি ঘটে।

ফলার্থী শিষ্য ভোগ ও মোক্ষভেদে ভোগার্থী ও মোক্ষার্থী এই দুইপ্রকার। মোক্ষার্থী বা মুমুক্ষু পুত্রক ও আচার্যভেদে দুইপ্রকার।

শিষ্যের দীক্ষার পূর্বে গুরুকে দেখিতে হয় সে স্ব-প্রত্যয়ী অথবা গুরু-প্রত্যয়ী। স্ব-প্রত্যয়ী হইলে গুরুকে তাহার বাসনা অনুসারেই দীক্ষা দিতে হয়। গুরু-প্রত্যয়ী হইলে ও গুরুতে নির্ভরশীল হইলে গুরুর কর্তব্য প্রথমে তাহার ভোগদীক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া মোক্ষদীক্ষার ব্যবস্থা করা।

সবীজ ও নির্বীজ দীক্ষা

মুমুক্ষুর দীক্ষা সবীজ, নির্বীজ ও সদ্যোনির্বাণদায়িনী ভেদে তিন-প্রকার। ইহার মধ্যে তৃতীয়টি দ্বিতীয়রই প্রকারভেদমাত্র। তাই মুমুক্ষুর দীক্ষা বস্তুতঃ দুইপ্রকার। সাধারণতঃ নির্বীজ দীক্ষা বালক, মূর্খ, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও ব্যাধিগ্রস্তাদির জন্য। অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রবিচারে কুশল নহে তাহাদের জন্য নির্বীজ দীক্ষার বিধান আছে। তাহাদের জন্য সময়াচার পালনের আবশ্যকতা থাকে না। এই দীক্ষার প্রভাবে কেবল গুরুভক্তির ফলেই মুক্তিলাভ হয়।

দীক্ষামাত্রেণ মুক্তিঃ স্যাদ্ ভক্তিমাত্রাদ্ গুরোঃ সদা।
(স্বচ্ছন্দতন্ত্র)

ইহাতে গুরুভক্তিমাত্রই সময়, অন্য সময় নাই।

সদ্যোনির্বাণদীক্ষা মুমূর্ষু অবস্থাতে দিতে হয়; কারণ এই দীক্ষা অতি প্রদীপ্ত মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া অতীতাদি ত্রিবিধ পাশই নষ্ট করে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দেহশুদ্ধি ও দেহপাতের পর পরমপদপ্রাপ্তি হয়।

দৃষ্ট্বা শিষ্যং জরাগ্রস্তং ব্যাধিনা পরিপীড়িতম্।
উৎক্রময্য ততস্ত্বেনং পরতত্ত্বে নিয়োজয়েৎ॥

শিষ্য জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গুরু তাহাকে শরীর হইতে উৎক্রমণ করাইয়া পরমতত্ত্বে নিয়োজিত করেন।

সবীজ দীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্বান্ ও কষ্টসহিষ্ণু শিষ্যের জন্য। এই দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিহিত আচার ঠিক ঠিক পালন করিতে হয়, না করিলে নিজের শিবময়ী সত্তা হইতে কিছু সময়ের জন্য ভ্রষ্ট হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়।

মুমুক্ষুর সবীজ ও নির্বীজ উভয় প্রকার দীক্ষারই একমাত্র প্রয়োজন মোক্ষ। আচার্যের দীক্ষা হয় সবীজ। বুভুক্ষু সাধক-দীক্ষাও সবীজ হয়। সবীজ দীক্ষা হইলেই অভিষেক হইতে পারে।

বিদ্বান্ ও কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিকে সবীজ দীক্ষা দিয়া আচার্য ও সাধকপদে অভিষিক্ত করিতে হয়। আচার্য মুমুক্ষু, কিন্তু সাধক ভোগার্থী। অভিষেক ব্যতীত ভোগ ও মোক্ষে অধিকার হয় না। কেবল সবীজদীক্ষাই পরমেশ্বরের সঙ্গে যোজন-সাধক। এইজন্য সাধক ও ভোগার্থীরও প্রথমে শিব বা পরমেশ্বরের নিষ্কল রূপের সঙ্গে যোগ হয়। তারপর ভোগসিদ্ধির জন্য সদাশিব অর্থাৎ পরমেশ্বরের স-কল রূপের সঙ্গে যোগ হয়। সর্বপ্রথম নিষ্কলরূপের সঙ্গে যোগের উদ্দেশ্য এই যে, স-কল রূপ সিদ্ধিবহুল হইলেও এই নিষ্কল-যোজন ক্রিয়ার প্রভাবে স-কল পদে অবস্থানকালে সিদ্ধি বা ঐশ্বর্যভোগ থাকিলেও ভোগান্তে পরমপদ প্রাপ্তিতে কোন বাধা ঘটে না।

ক্রিয়াদীক্ষা

ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে দীক্ষা দুইপ্রকার। উভয় দীক্ষারই এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে তাহা বুঝা যায়। ক্রিয়াদীক্ষা নানাপ্রকার — কিন্তু জ্ঞানদীক্ষা একই প্রকার। ক্রিয়াদীক্ষা সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুইপ্রকার। তাহার পর অসাধারণ দীক্ষা অধ্বাভেদে ভিন্ন ভিন্ন — যেমন কলা-দীক্ষা, তত্ত্বদীক্ষা, ভুবনদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, মন্ত্রদীক্ষা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে তত্ত্বদীক্ষা সাধারণতঃ চারি প্রকার — ছত্রিশ তত্ত্বদীক্ষা, নবতত্ত্ব-দীক্ষা, পঞ্চতত্ত্বদীক্ষা ও ত্রিতত্ত্বদীক্ষা। তারপর একতত্ত্বদীক্ষার কথাও পাওয়া যায়। ছত্রিশতত্ত্বকে নবতত্ত্বে পরিণত করিতে পারিলে নবতত্ত্বদীক্ষা দ্বারাও ছত্রিশ তত্ত্বের শুদ্ধি হইতে পারে। নবতত্ত্ব হইতেছে — প্রকৃতি, পুরুষ, নিয়তি, কাল, মায়া, বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব ও শিব। ছত্রিশ তত্ত্বকে পাঁচ বা তিন তত্ত্বে পরিণত করিতে পারিলে পঞ্চতত্ত্ব বা ত্রিতত্ত্বদীক্ষা দ্বারা ঐ একই ফললাভ হইতে পারে। পঞ্চতত্ত্ব হইতেছে পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ। ত্রিতত্ত্ব হইতেছে — শিব, আত্মা ও মায়া। একতত্ত্ব-দীক্ষাতে ছত্রিশতত্ত্বের সমষ্টিরূপে একতত্ত্ব গ্রহণ করা হয়। ইহারই নাম 'বিন্দু'। উহার শুদ্ধিতে সকল তত্ত্বেরই শুদ্ধি হয়। পদ-দীক্ষার প্রণালী নব তত্ত্বদীক্ষার অনুরূপ। বর্ণ, মন্ত্র, ভুবনদীক্ষার প্রণালী কলাদীক্ষার মতন। অতএব অধ্বার বৈচিত্র্যবশতঃ ক্রিয়াদীক্ষা একাদশ প্রকার।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানদীক্ষা এক ও অভিন্ন। ইহাতে বৈচিত্র্য নাই। সর্বসমেত বারো প্রকার দীক্ষা। পুত্রকের দীক্ষা সবীজ, নির্বীজ ও সদ্যোনির্বাণদায়িনী ভেদে তিনপ্রকার। মোট (১২×৩) ছত্রিশ প্রকার। আচার্যদীক্ষা শুধু সবীজ, তাই বারো প্রকার। শিবধর্মী ও লোকধর্মী সাধকের দীক্ষা একসঙ্গে (১২+১২) চব্বিশ প্রকার। সময়ীর দীক্ষাতে অধ্বন্যাস থাকে না। জ্ঞান দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি ভেদ হইলে একপ্রকার, ক্রিয়া দ্বারা গ্রন্থি-ভেদ হইলে এক — মোট দুইপ্রকার। সমষ্টি সংখ্যা (৩৬+১২+২৪+২=৭৪) চুয়াত্তর। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যের আশয় ভিন্ন বলিয়া কোনো সাধকে কোনো অধ্বার প্রাধান্য থাকে, অন্য সকল অধ্বার গৌণত্ব থাকে। এইভাবে দীক্ষা অনন্তপ্রকার। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন —

যত্র যত্র হি ভোগেচ্ছা তৎ প্রাধান্যোপক্ষেপতঃ।
অন্যান্তর্ভাবনাতশ্চ দীক্ষাঽনন্তবিভেদভাক্।

এইরূপ তত্ত্বাধ্বাতেও কোনো তত্ত্বের প্রাধান্য ও অন্য তত্ত্বের গৌণত্ব হইতে পারে। দীক্ষা তাই স্বভাবতই বিচিত্র, তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ছত্রিশ তত্ত্বদীক্ষা অপেক্ষা নবতত্ত্বদীক্ষার অধিকারী ও গুরু শ্রেষ্ঠ। নবতত্ত্ব হইতে পঞ্চতত্ত্ব, তাহা হইতে ত্রিতত্ত্ব, তাহা হইতে একতত্ত্বদীক্ষার অধিকার বিরল। বস্তুতঃ একতত্ত্বদীক্ষার গুরু ও শিষ্য উভয়ই দুর্লভ।

কলাদীক্ষার বিজ্ঞান (পাশক্ষপণ ও শিবত্বযোজন)

দীক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য এখানে দৃষ্টান্তরূপে কলাদীক্ষার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সকল অধ্বার মূলে কলার প্রাধান্য ও শিষ্যাধিকারের প্রকারভেদের দৃষ্টিতে পুত্রকের প্রাধান্য। তাই এস্থলে পুত্রকের কলাদীক্ষার বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

বাগীশ্বরীগর্ভে জন্মলাভের পরে সংসার উপশম ঘটে বলিয়া পুত্রক নামের সার্থকতা। পৃথিবী হইতে কলাতত্ত্ব পর্যন্ত মায়ার অধিকার।

উপসংহার

দীক্ষা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান প্রায় সকল কথাই বলা হইল। তবে অবান্তর অনেক বিষয়ই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় উপেক্ষা

করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে ক্রিয়াবতী, বর্ণাত্মিকা, কলাবতী ও বেধময়ী দীক্ষার কথা বলা হইয়াছে (শারদাতিলক পঞ্চম অধ্যায়)। ক্রিয়াবতী দীক্ষা বাহ্য। বর্ণময়ী দীক্ষার প্রভাবে শিষ্যের দিব্যদেহ প্রাপ্তি ঘটে। গুরু শিষ্যের শরীরে তৎতৎ স্থানে বর্ণসকল ন্যাস করেন ও প্রতিলোমে সংহার করেন। ইহাই বর্ণময়ী দীক্ষা। কলাবতী দীক্ষা ইহা হইতে ভিন্ন। ইহাতে কলার উপযোগ করা হয়। বেধদীক্ষার তত্ত্বটি এইপ্রকার ঃ গুরু শিষ্যের দেহে মূলাধারে চতুর্দলকমলে ত্রিকোণের মধ্যে বলয়ত্রয়যুক্ত তড়িৎকোটিসমপ্রভা চিদ্-রূপা শৈবীশক্তি কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবেন যেন ঐ শক্তি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মধ্যপথে পরমশিব পর্যন্ত উত্থান করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মূলাধারের চারিটি বর্ণ ব্রহ্মাতে উপসংহৃত হইতেছে ও ব্রহ্মা ষড়্‌দলময় স্বাধিষ্ঠানে যুক্ত হইতেছেন। তারপর স্বাধিষ্ঠানের ছয়টি বর্ণ বিষ্ণুতে উপসংহৃত হইতেছে ও বিষ্ণু দশদলময় নাভিকমলে যুক্ত হইতেছেন। অনন্তর মণিপুরের দশটি বর্ণ রুদ্রে সংহৃত হইতেছে। এইপ্রকারে সর্বান্তে সদাশিবকে 'হ-ক্ষ'ময় দ্বিদলে যুক্ত করিবে। পরে ঐ দুইটি বর্ণকে বিন্দুতে সংহার করিবে। বিন্দুই শিব। তখন আর কোন বর্ণ নাই। বিন্দুকে যোগ করিবে নাদে, নাদকে নাদান্তে এবং নাদান্তকে উন্মনীতে। উন্মনীকে যোগ করিতে হয় গুরুবক্ত্রে। কলা, নাদ, নাদান্ত, উন্মনী ও গুরুবক্ত্র এইসব ভ্রূ-মধ্যের উপরে চক্রসংস্থান। তাই সহস্রারকে কেহ কেহ দ্বাদশান্ত বলেন।

এইভাবে শিষ্যের জীবাত্মার সঙ্গে শক্তিকে শিবে বেধ করিতে হয়। শক্তি ব্যতীত বেধক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বেধের ফলে শিষ্য ছিন্নপাশ হইয়া ভূপতিত হয়। পরে দিব্যবোধ প্রাপ্তি ঘটে। ফলে 'তৎক্ষণাৎ' শিষ্য 'সর্ববিৎ' হয় — সাক্ষাৎ শিবভাব প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ সহজ, আগন্তুক ও প্রাসঙ্গিক ভেদে পাশকে তিন প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন (প্রয়োগসার)। বেধদীক্ষাপ্রসঙ্গে রাঘবভট্ট বলিয়া-ছেন যে সোমানন্দ বেধ দ্বারা উৎপলাচার্যকে শিবাত্মক করিয়াছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শারদা-তিলককার লক্ষ্মণ এই উৎপলাচার্যের শিষ্য।

ষড়ন্বয়মহারত্ন গ্রন্থে আণবীদীক্ষার দশটি প্রকারভেদের বর্ণনা আছে। শাক্তেয়ীদীক্ষা একপ্রকার, শাম্ভবীও একপ্রকার। আণবীয়

দশটি ভেদের নাম — স্মার্তী, মানসী, যৌগী, চাক্ষুষী, স্পর্শিণী, বাচিকী, মান্ত্রিকী, হৌত্রী, শাস্ত্রী ও আভিষেচিকী।[৩]

মধ্যযুগে বৌদ্ধগণের মধ্যে কেহ কেহ দীক্ষা সম্বন্ধে ততটা অনুকূল মত পোষণ করিতেন না। প্রসিদ্ধি আছে, আচার্য ধর্মকীর্তি নাকি দীক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া কিছু লিখিয়াছিলেন। ইহাও প্রসিদ্ধি আছে, সুবিখ্যাত তান্ত্রিক আচার্য্য খেটপাল ধর্মকীর্তির মত খণ্ডন করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ধর্মকীর্তির মূলগ্রন্থ যেমন পাওয়া যায় না, খেটপালের প্রতিবাদ গ্রন্থও তেমনি পাওয়া যায় না (দ্রষ্টব্য — বর্তমান লেখক-রচিত 'তান্ত্রিক বাঙ্ময় মেঁ শাক্তদৃষ্টি', পৃ. ৪১)।

৩। স্মার্তী=গুরু বিদেশস্থ শিষ্যকে স্মরণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার পাশত্রয় বিশ্লেষ করেন ও লয়যোগাঙ্গবিধানে তাহাকে পরমশিবে যোজন করেন।

মানসী=শিষ্যকে নিজের নিকটে বসাইয়া মনে মনে তাহাকে আলোচন দ্বারা তাহার মলত্রয় মোচন।

যৌগী=যোগোক্ত ক্রমে গুরু শিষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার আত্মাকে নিজের আত্মাতে যুক্ত করেন। ইহা যোগদীক্ষা।

চাক্ষুষী='শিবোহং' ভাবে সমাবিষ্ট হইয়া গুরু করুণাদৃষ্টিতে শিষ্যকে দেখেন। তাই ইহার নাম চাক্ষুষী দীক্ষা।

স্পর্শিনী=গুরু স্বয়ং পরমশিবরূপে নিঃসন্দেহে শিবহস্ত দ্বারা শিষ্যের মস্তকে মন্ত্রসহ স্পর্শ করেন। তাই এই নাম।

বাচিকী=গুরুবক্ত্রকে নিজ বক্ত্র মনে করিয়া শ্রদ্ধার সহিত গুরুবক্ত্র প্রয়োগে দিব্য মন্ত্রাদি দিবেন (মুদ্রান্যাসাদি সহ)।

মান্ত্রিকী=মন্ত্রন্যাসযুক্ত অবস্থায় গুরু স্বয়ং মন্ত্রতনু হইয়া মন্ত্রদান করিবেন।

হৌত্রী=কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন করিয়া লয়যোগের ক্রমে প্রতি অধ্বার শুদ্ধির জন্য হোম করিবেন।

শাস্ত্রী=যোগ্য ভক্ত শুশ্রূষু অর্চনশীল শিষ্যকে শাস্ত্রদান। ইহাও একপ্রকার দীক্ষা।

আভিষেচিকী=শিব ও শিবাকে কুম্ভে পূজন করিয়া শিবকুম্ভাভিষেক দীক্ষা সিদ্ধ হয়।

শক্তিপাতরহস্য

১

শ্রীভগবান্‌রূপী শ্রীগুরুর শক্তিপাত বা কৃপা সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা আবশ্যক।

আত্মার স্বরূপাবস্থান অথবা মোক্ষপ্রাপ্তিই মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ধারণাশক্তির অভাবে সাধারণ লোক ইহা স্বীকার না করিলেও ইহার সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস না করিবার কারণ নাই। যথাসময়ে এই সত্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। যতদিন মানুষ নিজের স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে না পারে, অন্ততঃ স্থিতিলাভের সত্যমার্গে পদার্পণ করিতে না পারে ততদিন তাহাকে তাহার শুভাশুভ কর্মের অধীন থাকিয়া সুখদুঃখরূপ ফলভোগের জন্য অনুরূপ বিবিধ ভোগস্থানে গমন এবং ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিতেই হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে জন্মমরণের চক্রে নিরন্তর আবর্তন করিতেই হইবে। ইহারই নাম সংসার। স্বরূপে স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত ইহা হইতে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

তবে কি স্বরূপস্থিতির কোন উপায় নাই? আছে, অবশ্যই আছে এবং জীব উহা প্রাপ্ত হইতেও পারে। যখন জীব উহা প্রাপ্ত হয় তখন ঐ উপায়ের তারতম্য অনুসারে, শীঘ্র অথবা বিলম্বে, ক্রম অবলম্বন-পূর্বক অথবা অক্রমে, সে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া নিজের পূর্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আত্মার এই পূর্ণস্বরূপই ভগবৎতত্ত্ব অথবা পূর্ণ ব্রহ্মভাব জানিতে হইবে।

তান্ত্রিক আচার্যগণের পরিভাষাতে এই উপায়ের নাম শক্তিপাত। ইহার নামান্তর কৃপা অথবা ভগবদনুগ্রহ। ইহা ব্যতীত কেবলমাত্র পৌরুষপ্রযত্ন হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবন্মুখী বৃত্তির মূলে সর্বত্রই ভগবৎকৃপার প্রভাব স্বীকার করিতেই হয়। কারণ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার দিকে চিত্তের গতিই হইতে পারে না।

শক্তিপাত অথবা কৃপা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুস্থলে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় 'নোষ্টিক' (Gnostic) প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থেও এই বিষয়ে বহু বিবরণ দৃষ্ট হয়। বর্তমান

প্রবন্ধে আমরা শুধু তন্ত্রশাস্ত্রের দিক্ হইতে এই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

২

শক্তিপাত অথবা কৃপা কখন ও কেন হয় উহার উত্তর বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্নপ্রকারে প্রদত্ত হয়।

কাহারও কাহারও মতে জ্ঞানের উদয় হইলে শক্তিপাত হয়। অজ্ঞানে সংসারের উদ্ভব হয় এবং জ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া শক্তিপাত ঘটে। জ্ঞানাগ্নি সকল প্রকার কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া শক্তিপাতের ভূমি রচনা করে। ইঁহারা বলেন যে কর্মফলের ভোগ ক্রমশঃ হোক্ অথবা অক্রমে হোক্, উহার দ্বারা কর্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভোগ ক্রমশঃ হয় ইহা স্বীকার করিলে কর্মান্তরের প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং নিরন্তর নূতন কর্ম হইতে থাকে বলিয়া কোন সময়েই সমস্ত কর্মের ক্ষয় হইতে পারে না এবং কর্মফলভোগকে ক্রমিক না মানিয়া যুগপৎ মানিলেও এই সন্দেহের নিবৃত্তি হয় না। ক্রমশঃ ফল দেওয়াই কর্মের স্বভাব। একই সময়ে সকল কর্মের ফলভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিলে কর্মের স্বভাবই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু স্বভাবের নাশ কখনও সম্ভব নহে। তাই যে কোন প্রকারে হোক্ ভোগদ্বারা কর্মক্ষয় হওয়া সংগত হয় না। সেইজন্য জ্ঞানবাদী আচার্যগণের মতে জ্ঞানকেই কর্মক্ষয়ের কারণ স্বীকার করিয়া উহার সঙ্গে শক্তিপাতের কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়।

কিন্তু এই জ্ঞানের আবির্ভাব কি প্রকারে হয় তাহার ঠিক ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি কর্মকে জ্ঞানের কারণ মানা হয় তাহা হইলে জ্ঞানকে কর্মের ফল স্বীকার করিতে হয়। এই অবস্থায় জ্ঞান ও কর্মফল সমানার্থক হইয়া পড়ে এবং জ্ঞানীকে কর্মফলভোগী বলিয়া মনে করিতে হয়। অতএব জ্ঞানোদয়বশতঃ শক্তিপাত স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ভোগের মধ্যেও শক্তিপাত মানা আবশ্যক হয়। তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ আসে। কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান কর্মের ফল হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ তাহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। স্বর্গাদি-রূপ কর্মফল কর্মান্তরকে দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান স্বয়ং কর্মফলাত্মক হইলেও কর্মান্তরকে দগ্ধ করে। ইহাই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

এই মতে জ্ঞানোদয়ে অন্যোন্যাশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হইতে ঈশ্বরেচ্ছার নিমিত্ততার অনুমান এবং ঈশ্বরেচ্ছার অনুমান হইতে জ্ঞানোদয় — এইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয় ও ব্যর্থতা দোষ আসে এবং ঈশ্বরে রাগাদি-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আসে। এইজন্য এই মত গ্রাহ্য নহে।

৩

কোন কোন আচার্যের মত এই যে শক্তিপাতের প্রকৃত কারণ জ্ঞান নহে কিন্তু কর্মসাম্য। দুইটি সমান বলশালী কর্মের পরস্পর প্রতি-বন্ধবশতঃ কর্মের সাম্য হয়, এই সাম্য হইতেই শক্তিপাত হয়। ক্রমিক ভোগের প্রভাবে বহু কর্ম ক্ষীণ হইয়া গেলে কোন অনিশ্চিত সময়ে যদি পরিপক্ব ও সমান বলবিশিষ্ট বিরুদ্ধকর্ম ফলোৎপাদনে রুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিজ নিজ ফল প্রদান না করে বা নিয়ত ভোগবিধান না করে এবং তাহার পরবর্তী সকল কর্ম অপরিপক্ব থাকার দরুণ ভোগোন্মুখ না হয় তাহা হইলে এইপ্রকার বিরুদ্ধ কর্মের সাম্যভাব ঘটিয়া থাকে।

এই মতের বিরুদ্ধে ইহাই বক্তব্য যে যদি কর্মকে ক্রমিক মানা হয় তাহা হইলে উহার ফলদানও ক্রমিক মানিতে হইবে। এই অবস্থাতে যে কোন দুইটি কর্মের পরস্পর বিরোধ কি প্রকারে সম্ভব? এক কর্মের স্বরূপে দ্বিতীয় কর্মের স্থিতি তো হইতে পারে না। এইজন্য যে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ কর্মের এক সঙ্গে থাকাই সম্ভব নহে। এই আলোচনা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে কর্ম সর্বথা ক্রমের অধীন। দুইটি কর্মের পরস্পর বিরোধ বলিতে ইহাই বুঝা উচিত যে এই দুইটির মধ্যে একটি অপরটির ফলকে বাধা দেয়, যাহার জন্য যে-কোন ক্ষণে ইহাদের যুগপৎ প্রবৃত্তির উদয় হয় না। আরও একটি কথা আছে। বিরোধ স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার্য যে ঐ সময়ে একটি দ্বিতীয় অবিরুদ্ধ কর্ম ভোগাত্মক ফল দিতে থাকে। যদি ঐ অবস্থাতে কোনও অবিরুদ্ধ কর্মের প্রবৃত্তি স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে ঐ ক্ষণেই দেহপাত হওয়ার কথা; কারণ ভোগায়তন দেহ একটি ক্ষণও ভোগ ব্যতীত থাকিতে পারে না। যদি বলা যায় যে জাতি ও আয়ুঃ এই দুইটি ফলদাতা কর্ম প্রতিবদ্ধ হয় না, কেবল ভোগপ্রদ কর্মই প্রতিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে — যদি জাতি ও আয়ুপ্রদ কর্ম থাকা সত্ত্বেও শক্তিপাত হইতে পারে তবে ভোগপ্রদ কর্ম থাকিতে শক্তিপাত হইতে পারে না, ইহার কারণ কি?

৪

দ্বৈতবাদী তান্ত্রিক আচার্যগণের মত এই যে জ্ঞান অথবা কর্মসাম্য শক্তিপাতের কারণ নহে — শক্তিপাতের প্রকৃত কারণ মলপাক। ইঁহারা বলেন —

পরস্পরবিরোধেন নিবারিতবিপাকয়োঃ।
কর্মণোঃ সন্নিপাতেন শৈবী শক্তিঃ পতত্যসৌ ॥[১]

দুইটি বিরুদ্ধকর্মের মধ্যে দুইটিই ধর্মাত্মক হইতে পারে, যেমন একটি স্বর্গপ্রাপক এবং অপরটি ব্রহ্মলোকপ্রাপক কর্ম; দুইটিই অধর্মাত্মক হইতে পারে, যেমন একটি অবীচি নরকপ্রাপক এবং অপরটি রৌরব নরকপ্রাপক কর্ম; অথবা একটি কর্ম ধর্মরূপ এবং অপরটি অধর্মরূপ হইতে পারে, যেমন — অশ্বমেধ ও ব্রহ্মহত্যা। এইপ্রকার দুইটি বিরুদ্ধকর্মের সন্নিপাত হইলেও শিবত্বদায়িনী অনুগ্রহ শক্তির পাত আত্মাতে হয় না। মলপাক না হইলে শক্তিপাত হইতেই পারে না। মতঙ্গাগমে আছে — মলপাকের অবিনাভূত দীক্ষা কর্মক্ষয়দ্বারা মোক্ষ-প্রাপ্তির হেতু হয়। কিরণাগমে আছে —

অনেকভবিকং কর্ম দগ্ধবীজমিবাগ্নিভিঃ।
ভবিষ্যদপি সংরুদ্ধং যেনেদং তদ্ধি ভোগতঃ ॥[২]

মলপাকবশতঃ অনুগ্রহশক্তির পাত হয়। শক্তিপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মলের আবরণ সরিয়া যায় এবং নিত্যসত্য বিশুদ্ধ সর্বজ্ঞত্বাদিময়[৩] স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ শান্ত ও নির্মল আত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকার ঘটে। একই পরমেশ্বর জীবের বন্ধনও করেন, মোক্ষও করেন। যেমন একই সূর্য আপনার সান্নিধ্যদ্বারা দ্রবীভূত হওয়ার যোগ্য

১। যে সকল কর্মের ফলদান পরস্পর বিরোধবশতঃ রুদ্ধ আছে, উহাদের সন্নিপাত হইলে শৈবীশক্তিপাত হয়।

২। বহুজন্মের সঞ্চিত কর্ম অগ্নিতে ভর্জিত বীজের ন্যায় দগ্ধ হয়। ভাবী কর্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধ হয়, এবং যে কর্ম হইতে এই জন্ম হইয়াছে সেই কর্মের অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়।

৩। সর্বজ্ঞত্ব, সর্বকর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদে দুই প্রকার। অপরামুক্তিতে অর্থাৎ আধিকারিক শিবাবস্থাতে এইসকল ধর্ম স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও কিঞ্চিৎ ভিন্নবৎ প্রতীত হয়। কিন্তু পরামুক্তি অথবা পরম শিবাবস্থাতে শিব ও শক্তিতে পূর্ণ সামরস্য হইয়া যায় বলিয়া এইসকল ধর্ম স্বরূপ হইতে সর্বথা অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

মোমকে দ্রবীভূত করে ও শুষ্ক হওয়ার যোগ্য মৃত্তিকাকে শুষ্ক করে, সেইপ্রকার একই পরমেশ্বর মোক্ষাধিকারী পক্বমল জীবের জন্য মোক্ষদানের ব্যবস্থা করেন, বন্ধনযোগ্য অপক্বমল জীবের মলপাকের জন্য উহার বন্ধনের ব্যবস্থা করেন। মলপাকবশতঃ উপকার ও অপকাররূপ কর্মে সাম্যবুদ্ধি হয় — তখন মোক্ষ হয়। সকলপ্রকার কর্মের সাম্য হইলে বিজ্ঞানকৈবল্যমাত্র সিদ্ধ হয়, মোক্ষ হয় না। যথার্থ কর্মসাম্যের কারণ মলপাক। তাই মলপাকবশতঃ দীক্ষাপ্রভাবে মোক্ষলাভ হয়। পরমেশ্বর নিত্যনির্মল সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তা, কিন্তু পশুআত্মা মল, মায়া ও কর্মরূপ পাশে বদ্ধ। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া উহার এইসকল পাশ বা বন্ধন ছিন্ন করিয়া উহাকে নিজের মতন করিয়া লন। ইহারই নাম শিবসাধর্ম্যের অভিব্যক্তি। ইহাই মোক্ষ। কিন্তু যতক্ষণ পশুর চৈতন্যের উপরোধক অনাদি মলের অধিকার নিবৃত্ত না হয় ততদিন অনুগ্রহের প্রবৃত্তিই হয় না।

মৃগেন্দ্র আগমে আছে—

তমঃশক্ত্যধিকারস্য নিবৃত্তেস্তৎপরিচ্যুতৌ।
ব্যনক্তি দৃক্‌ক্রিয়ানন্ত্যং জগদ্বন্ধুরণোঃ শিবঃ ॥

তমঃশক্তি রোধশক্তি বা তিরোধানের নামান্তর। যতদিন এই শক্তির অধিকার থাকে[৪] ততদিন উদ্ধারের কোন উপায় নাই। অনাদিমল ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পক্ব হইতেছে, পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। পরিপক্বতা পূর্ণ হইলে উহার নিবৃত্তির সময় উপস্থিত হয়। চক্ষুতে ছানি পড়িলে অস্ত্রোপচারের দ্বারা উহাকে দূর করিতে হয়। কিন্তু যতদিন উহা ঠিক ঠিক পক্ব না হয় ততদিন অস্ত্রপ্রয়োগ চলে না। অপক্ব মলকে টানিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলে জীবের সর্বনাশ ঘটে। এইজন্য মঙ্গলময় ভগবান এইপ্রকারের বলপ্রয়োগ করেন না। তিনি মলপাকের জন্য অবসর প্রতীক্ষা করেন এবং মল পরিপক্ব হইলে দীক্ষার দ্বারা উহা অপসারণ করেন। তাঁহার জীবোদ্ধারের ক্রম ইহাই।

এই মতে মল দ্রব্যাত্মক বলিয়া ক্রিয়ার দ্বারা উহার নিবৃত্তি স্বীকার করা হয়। অবশ্য এই ক্রিয়া জীবের ব্যাপার নহে, ঈশ্বরের ব্যাপার।

৪। আবরণশক্তির অধিকার নিবৃত্ত হইলে ঐ শক্তির ক্ষয় হয়। তখন জগদ্বন্ধু পরমেশ্বর পশু বা বদ্ধজীবের প্রতি তাঁহার অনন্ত জ্ঞানক্রিয়া অভিব্যক্ত করেন অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন।

ইহাই দীক্ষা। কিন্তু মলপাক না হওয়া পর্যন্ত ইহার প্রবৃত্তি হয় না। মলপাকের জন্যই ভগবান জীবকে অলক্ষিতভাবে অনাদি কর্মভোগাত্মক সংসারে নিক্ষেপ করেন। ভগবানের এই কৃত্যের নাম তিরোধান বা রোধ। বস্তুতঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার তিনটি ব্যাপারই তিরোধানেরই প্রকারভেদ, তিনটিতেই তিরোধান অনুস্যূত থাকে। মলের ন্যায় মায়া ও কর্মের পাকও আবশ্যক।

মায়াপাকের উদ্দেশ্য মায়ার শক্তিসকলকে অভিব্যক্তির যোগ্য করা। এইপ্রকার কর্মও পক্ব হইলে নিজ নিজ ফল দিতে সমর্থ হয়। অপক্ব কর্ম ফলদান করিতে পারে না। সকল পাশেরই পাক বা পরিণাম পরমেশ্বরের সামর্থ্য বা স্বাতন্ত্র্য হইতে হয়। বহু জন্মের বাসনা ও পুণ্যপ্রভাবে যে কোন সময়ে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থানকালে অচিন্ত্য ভাগ্যোদয়বশতঃ কোন কোন আত্মার চৈতন্যশক্তির অনাদি আবরণভূত মল কিঞ্চিৎ পক্ব হইলে তদনুরূপ শক্তিপাত ঘটিয়া থাকে। ইহাকেই প্রচলিত ভাষাতে ভগবৎ কৃপা বলা হইয়া থাকে। ইহার মাত্রানুসারে ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাদি উৎপন্ন হয়। তখন ঐ শক্তিপাতের অনুরূপ দীক্ষার অবসর আসে। শক্তিপাতের তারতম্য-বশতঃ দীক্ষার ভেদ হয়। এইমতে শক্তিপাতের তারতম্যের মূল মলপাকের বিভিন্নতা জানিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে মলপাকের সিদ্ধান্ত হইতেই অনুগ্রহতত্ত্বের চরম রহস্য খোলে না। ভেদবাদী আচার্য মলের নাশ স্বীকার করেন না, কারণ মল এক বলিয়া উহার নাশ স্বীকার করিলে এক আত্মা মলহীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল আত্মারই মলহীন হইবার প্রসঙ্গ উঠে। তাহা হইলে একজনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুক্তি হইবার কথা। তাই ইঁহারা বলেন যে মলের পাকই হয়, নাশ হয় না। পাক মানে নিজ শক্তির প্রতিবন্ধ। প্রকৃত কথা এই যে এইপ্রকার বিচারেও পূর্বোক্ত দোষ নিবৃত্তি হয় না। অথবা অগ্নির নিজ শক্তি স্তম্ভিত হইলে যেমন উহা সকলের জন্যই সমান হয়, তেমনি মলের পাক মানিলেও মল অভিন্ন বলিয়া সকলের পক্ষে ঐ পাক সমান জানা আবশ্যক। আর এক কথা ঃ পাকের হেতু কি? কর্ম অথবা ঈশ্বরেচ্ছা হইতে পারে না। কারণ কর্ম কেবল ভোগের কারণ হয়, অন্য কোন কার্যের কারণ হয় না। ঈশ্বরেচ্ছা যদি হয় তবে প্রশ্ন এই, উহা স্বতন্ত্র অথবা পরতন্ত্র? পরতন্ত্র হইলে কর্মাদি

অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে। তাহা হইলে তো পূর্বোক্ত দোষ থাকিয়াই যায়। পক্ষান্তরে যদি ঈশ্বরেচ্ছা স্বতন্ত্র হয় তাহা হইলে এই স্বতন্ত্রেচ্ছার ফলস্বরূপ মলপাক সকলেরই সমান হইবার কথা। ঈশ্বরে রাগ-দ্বেষ নাই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ কাহারও মল পক্ব হয়, কাহারও হয় না, অথবা কাহারও শীঘ্র হয়, কাহারও বিলম্বে হয়, এই বৈষম্যের কারণ কি? বৈষম্য বা পক্ষপাত দোষ ঈশ্বরে হইতে পারে না। অবশ্য এই আলোচনা দ্বৈতদৃষ্টি হইতে করা হইতেছে। অতএব বুঝা যায় যে মলপাকের কোন হেতু নাই, অথচ উহাকে অহেতুকও বলা চলে না। বিনা কারণে কার্যসিদ্ধি মানিলে সংশয় থাকে — এতদিন পর্যন্ত মলপাক হয় নাই কেন? বস্তুতঃ অহেতু পক্ষে মলের স্থিতিই হইতে পারে না। অতএব শক্তি-পাত বিষয়ে মলপাককেও চরম সিদ্ধান্ত মানা যাইতে পারে না।

কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব

বহুদিন হইতে বিদ্বৎ-সমাজে, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনের তুলনা-মূলক সমালোচনাপ্রিয় পণ্ডিত-মণ্ডলীতে, একটি সংশয় জাগরূক রহিয়াছে। নানা গ্রন্থে নানাপ্রকার আলোচনাও হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব আলোচনায় সমস্যার সমাধান হয় নাই। এমন কি মনে হয় অনেক স্থলে সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই সংশয়টির উত্থাপন করিয়া, তাহার সমাধানের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি যথাসম্ভব সন্তর্পণে প্রয়োগ করিব। বিষয়টি সাধনা-জগতের একটি গভীর রহস্য। ভাষার সাহায্যে এই সকল বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হইতে পারে না। তথাপি কিছুমাত্র আলোচনা না করিলে একটি ভ্রান্ত ধারণার স্থায়িত্বের অবকাশ দেওয়া হয়। সেইজন্য যথাশক্তি স্পষ্টভাবে নিজের অনুভূতি এবং শ্রীগুরু-দেবের "মৌন ব্যাখ্যান" অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণপূর্বক এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। সহস্র বৎসর পূর্বে কাশ্মীর প্রদেশের উপত্যকা-ভূমিতে বোধচক্ষুঃ শ্রীতাৎপর্যাচার্যদেব "সংবিদেব হি ভগবতী বস্তূপগমে নঃ শরণম্" বলিয়া যাঁহার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই ভগবতী সংবিদ্দেবীই বস্তু-নির্দেশের পথ-প্রদর্শক। যাঁহারা অনুভবরসিক, তাঁহারা শব্দমোহ পরিত্যাগপূর্বক তত্ত্বাংশের দিকে লক্ষ্য করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ সকলেই একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, মুক্তিই পরম পুরুষার্থ — ধর্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থ হইলেও তাহা অপর অথবা নিকৃষ্ট, তাহা 'পরম পুরুষার্থ'-রূপে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। আপাততঃ আমরা প্রেমের স্বরূপ-নির্বচন অথবা তাহার পুরুষার্থত্বনির্ণয় সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। পঞ্চম পুরুষার্থবাদী সম্প্রদায় বহু প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান আছে — একথা অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না — যাঁহারা ভক্তিবাদী তাঁহাদিগকেও কোন না কোন প্রকারে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, জ্ঞান অথবা ভক্তি যাহাকেই সাক্ষাদ্ভাবে মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার

করা যাক্, তাহা কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি হঠমার্গ-প্রবর্তক নাথাচার্যগণ এবং আগমবিদ্‌গণ বলেন যে, মূলাধারে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ না করিলে কর্ম, জ্ঞান কিংবা ভক্তি কোনটিই মুক্তি বা অনর্থনিবৃত্তির উপায়রূপে পরিণত হইতে পারে না। যে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের সহায়তা করে, তাহাই যথার্থ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, — তাহাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তদ্ভিন্ন কর্মাদি ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। তাহা কখনই সিদ্ধিদায়ক হয় না। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত আত্মা অথবা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে।

এখানে প্রশ্ন এই ঃ কুণ্ডলিনীবাদ নবীন বাদবিশেষ অথবা ইহা নিত্য সত্য? আপাততঃ মনে হয়, এই তত্ত্ব ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে কালবিশেষে কারণবশতঃ স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ ইহা বৈদিক সিদ্ধান্ত নহে, এবং বেদানুকূল দর্শন-শাস্ত্রে ইহা পরিগৃহীত হয় নাই। এমন কি পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে কুণ্ডলিনী কিংবা ষট্‌চক্রাদির কোন উল্লেখ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ও জৈনাদির গ্রন্থেও কুণ্ডলিনীর কোন আলোচনা নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা তন্ত্রের নিজস্ব, কেহ বলেন, ইহা এবং এতৎসম্পর্কীয় বর্ণোপাসনাপ্রণালী ভারতের বহির্দেশ হইতে (সম্ভবতঃ মগ দেশ হইতে) সমাগত। ভারতবর্ষে হঠযোগ এবং অক্ষর উপাসনা লইয়া যখন একটা নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তখনই ইহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়। আবার কেহ মনে করেন, এই কুণ্ডলিনীযোগ উপায়বিশেষ — ইহা অবলম্বন না করিয়া, উপায়ান্তর দ্বারাও মোক্ষলাভ সম্ভবপর।

এইপ্রকার নানারূপ সংশয়ের অবতারণা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল সংশয় কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানাভাবের ফলমাত্র[১]। শুধু "বাগ্‌ বৈখরী শব্দঝরী"র দিকে লক্ষ্য করিয়া

১। 'The Six Centres and the Serpent Power' নামক গ্রন্থে Arthur Avalon বলিয়াছেন — "But whereas the Jnana Yogi attains Svarupa Jnana by his mental efforts *without rousing* Kundalini, the Hatha Yogi gets this Jnana through Kundalini Herself" (p. 201). 'জ্ঞানযোগী' শ্রবণ মননাদি যে কোন উপায় অবলম্বন করুন্ না কেন, কুণ্ডলিনী চৈতন্য না করিলে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না। ইহা ধ্রুব সত্য।

তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের দিকে উদাসীন থাকিলে এইপ্রকার বৃথা সন্দেহ উদিত হয়। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস যে এইপ্রকার গ্রন্থমূলক বৈকল্পিক জ্ঞান হইতেই আমাদের মধ্যে যাবতীয় মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কুণ্ডলিনী-চৈতন্য কিছু নূতন জিনিষ নহে। কুণ্ডলিনী কি? তাহার চৈতন্যসম্পাদন কি?— তাহা না বুঝিলে তৎসম্পর্কে কোন আলোচনাই ফলপ্রদ হইবে না। কুণ্ডলিনীর অপর নাম আধারশক্তি — যে শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়া সকল পদার্থের মূল-সত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার চৈতন্যসম্পাদন করিলে ইহা নিরাধার হইয়া যায়। যখন কুণ্ডলিনী নিরাধার, তখন জগতের সকল বস্তুই নিরাধার। কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময় হইয়া যায়, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। সুতরাং যাহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা হয়, তাহা ও "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মময়তা অনুভবের সাধনা একই বস্তু। এই জাগরণ ক্রমশঃ হয়। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি এই জাগরণেরই অবস্থাভেদ মাত্র। যখন জাগরণ সম্পূর্ণ হয়, যখন নিদ্রা আর লেশ-মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, তখনই পরিপূর্ণ অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ হয়, তাহার পূর্বে দ্বৈতস্ফুর্তি অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকেই পূর্ণাহন্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

২

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন ভিন্ন জীবের ঊর্ধ্বগতি সম্ভবপর নহে। অরণিমন্থন করিয়া যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়, অর্থাৎ অরণিস্থ সুপ্ত (latent) অগ্নি যেমন সংঘর্ষণে উদ্দীপিত হয়, সেইপ্রকার সাধন-প্রণালী দ্বারা প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগাইতে হয়। অগ্নি প্রকটিত হইয়া যেমন ইন্ধনকে দগ্ধ করে, কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইলে তেমনই সাধনা বিলুপ্ত হয়। বাহ্য সাধনমাত্রই — বিচার, ভক্তি অথবা হঠ কিংবা মন্ত্রযোগাদি — পুরুষকার সাপেক্ষ, কর্তৃত্ববোধমূলক। এই কর্তৃত্ববোধ ক্রমশঃ কুণ্ডলিনীচৈতন্যের সহিত লুপ্ত হইয়া আসে, আবার কর্তৃত্ববোধ লুপ্ত হইতে হইতে কুণ্ডলিনী অধিকতর জাগ্রত হইয়া উঠে। যখন একবার কুণ্ডলিনী চেতন হইতে আরম্ভ হয়, তখন স্বভাবের

নিয়মেই সকল কার্য হইতে থাকে। অনুকূলস্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিলে, তাহাকে যেমন আর সমুদ্রে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, সেইপ্রকার কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তাহার প্রবাহে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিলে জীবকে আর ব্রহ্মাবস্থা লাভের জন্য পৃথক্ প্রয়াস করিতে হয় না[২]। সঙ্কোচশক্তি অথবা উর্ধ্ববিন্দুস্থিত আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অন্তর্মুখ গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে সাম্যাবস্থায় গিয়া স্থিতি লাভ করে।

কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে ইড়াপিঙ্গলায় প্রবহমান স্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্না পথে প্রবেশ করে, এবং সুষুম্না পথেও উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ আরও অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীব-শক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনাড়ী অথবা আনন্দময় কোষে গমন করে। ইহাই ঐশ্বর্য অবস্থা। আনন্দময় কোষেও যখন আর লক্ষ্য থাকে না, তখনই গুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে।

উর্ধ্বস্থ সত্ত্ববিন্দু এবং অধঃস্থ তমোবিন্দু পর্যন্ত রেখাকে মেরু (axis) বলা চলে। এই রেখার উর্ধ্ববিন্দু উত্তরমেরু এবং অধোবিন্দু দক্ষিণমেরু (North and South Poles)। উভয় বিন্দু আকর্ষণ-শক্তিবিশিষ্ট। অধোবিন্দুর আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ — ইহা ভূমধ্য হইতে প্রসৃত। উর্ধ্ববিন্দুর আকর্ষণ সংকর্ষণ নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম কৃপা। ইহা উর্ধ্ববিন্দু অর্থাৎ আদিসূর্য কিংবা ঈশ্বরোপাধির কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকে প্রসারিত। আজ্ঞাস্থ বিশুদ্ধ জীব বা কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ উভয় আকর্ষণের ঠিক মধ্যস্থলে তটস্থভাবে বর্তমান। তাঁহাদের উপাধি নির্মল বলিয়া তাঁহাদের প্রতি মাধ্যা-কর্ষণের ক্রিয়া হয় না — এইজন্য ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তাঁহাদের স্থিতি নাই। উর্ধ্বদৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের প্রতি ভগবৎকৃপাশক্তিও ক্রিয়া

২। প্রাচীন বৌদ্ধগণ ইহাকে "স্রোত-আপন্ন" নাম দিয়াছেন। বুদ্ধদেব শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক শিষ্যকে এই উর্ধ্বস্রোতে স্থাপন করিতেন। ইহা সুষুম্নাবাহী উর্ধ্বস্রোত ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই স্রোতে পড়িলে জীবকে আর 'অপায়' মধ্যে পতিত হইতে হয় না — কারণ, তখন তাহার সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা এবং শীলব্রতপরামর্শ নামক ত্রিবিধ বন্ধন বা 'সংযোজন' ছিন্ন হইয়া যায়। অবশ্য সঞ্চারিত শক্তির ন্যূনাধিকতা এবং সঞ্চিত কর্মবাসনাদির গাঢ়তার তারতম্য নিবন্ধন 'স্রোত-আপন্ন' অবস্থা বহুপ্রকার।

করে না। ইঁহাদিগকে সাংখ্যজ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে — ইঁহারা ঈশ্বরের শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ধামে স্থান লাভ করেন না। ইঁহারা মায়াতীত হইয়াও মহামায়ার অধীন। আগমে ইঁহাদের নাম বিজ্ঞানাকল দেওয়া হইয়াছে।

ইহার অবশ্য ক্রম আছে। যখন কোন অনির্বচনীয় কারণে এই তটস্থ বিন্দু ঊর্ধ্বমুখ হয় তখন অখণ্ড সত্ত্ববিন্দুর সহিত তাহার সান্মুখ্য হয়। ইহাকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার বলে। তখন আর সে তটস্থ নহে, তখন সে সহস্রারে প্রবিষ্ট হইয়া আপন রেখা অবলম্বন করিরা কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা ভাবের সাধনা — ইহাও স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। তমোবিন্দু যেমন পাঁচ ভাগে বিভক্ত, সেই-প্রকার এই শুদ্ধসত্ত্বস্তরও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক এক স্তরে একটি ভাবের প্রাধান্য। শান্ত হইতে মাধুর্য পর্যন্ত এই পাঁচ স্তর প্রসারিত রহিয়াছে। মাধুর্যই শুদ্ধসত্ত্ববিন্দুর অন্তরতম অথবা ঊর্ধ্বতম ভাব। যখন ইহাও অতিক্রান্ত হয়, তখনই পূর্ণাবস্থা লাভ হয়, তৎপূর্বে নহে। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য পূর্ণ হইল বলা যায়।

কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণে একমাত্র অদ্বিতীয় ও পূর্ণ বস্তুতেই স্থিতি হয়, সমগ্র জগৎ নিরাধার হইয়া ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়, আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ব্রাহ্মীস্থিতি, শাশ্বত পদে অবস্থান সুসিদ্ধ হয়।

———

মাতৃকা রহস্য

মাতৃকা শব্দের অর্থ 'মা'। মাতৃকা বা মহা-মাতৃকা বিশ্বজননী। একই পরম সত্তা বহুরূপে প্রকাশমান হন, শুধু ইহারই সম্বন্ধবশতঃ। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপে ঈয়তে' বেদে এই কথা আছে। একই পরমাত্মা 'মায়াভিঃ' মায়ার অসংখ্য বৃত্তি দ্বারা অসংখ্যরূপে প্রতিভা-সমান হন। মায়া ও মাতৃকা একই বস্তু। মায়া বিশ্বজননী, এ কথার যাহা তাৎপর্য মাতৃকা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহারও তাৎপর্য তাহাই। কিন্তু এই বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবন না করিতে পারিলে স্পষ্ট ধারণার উদয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মাতৃকা মূলে এক ও অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহা অক্ষরব্রহ্মের ক্ষরণাত্মক স্বরূপে ভূত শক্তি। প্রাচীন আগমে পরাবাক্‌রূপে ইহারই প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। আমরা এখানে প্রাচীন সিদ্ধ তান্ত্রিকগণের দৃষ্টি অনুসারে মাতৃকা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরাবাক্ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যোগীর ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে, ইহা সত্য। বৈদিক সাহিত্যে শব্দ-ব্রহ্মরূপে যাহার নির্দেশ পাওয়া যায়, ইহা তাহাই। এই শব্দব্রহ্মই অথবা পরমাতৃকাই বিশ্বের জননী।

মাতৃকা, মহামাতৃকা, বর্ণমালা — এসব মূলে এক অদ্বৈত মহাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুরূপ নাম। এই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পূর্বে মনে রাখিতে হইবে 'মাতৃকা' শব্দের অর্থ মাতা, অম্বা, অম্বিকা — একই জিনিষ। মাতৃকা বলিতে কি বুঝায়? যে অনন্ত অখণ্ড মহাসত্য জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, তাহার সেই স্বরূপ-ভূতা শক্তিই মাতৃকা নামে পরিচিত, মাতৃকাবিরোহিত অর্থাৎ স্বরূপ-ভূত শক্তিহীন সেই মহাপ্রকাশ প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশমান নহে। মহাজনগণ বলিয়াছেন — "বাগরূপতা চেজ্যক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী ন প্রকাশঃ, প্রকাশেত সা হি প্রত্যাবমশনী" অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধ ইহার একটি শাশ্বত বা নিত্যসিদ্ধ বাগ্‌রূপতা রহিয়াছে। তাই জ্ঞান বা প্রকাশ স্বয়ং প্রকাশরূপে পরিচিত হয়। অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপে যদি বাগ্‌রূপতা না থাকিত অর্থাৎ মাতৃভাব না থাকিত তাহা হইলে তাহা স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়াও প্রকাশমান হইতে পারিত না। কারণ

মাতৃকাই প্রত্যবমর্শনকারিণী শক্তি, অর্থাৎ প্রকাশ তখনই নিজেকে প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারে যখন তাহার সঙ্গে মাতৃকা যুক্ত থাকে। মাতৃকা অন্তর্লীন হইয়া গেলে প্রকাশ প্রকাশই থাকে, কিন্তু তাহা নিজেকে প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারে না। কারণ প্রত্যবমর্শন শক্তি মাতৃকাতেই থাকে। মাতৃকা স্বরূপভূতা শক্তি। এই যে শক্তি ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল সত্তা প্রকাশমান হয়।

সমগ্র জগৎ ঈশ্বর জীব এবং জ্ঞেয় জড়পদার্থ ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-ভাবে মাতৃকা হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ অহংরূপে যে প্রকাশমানতা তাহার মূলেও মাতৃকা। এই অহং পূর্ণ অহং হইতে পারে এবং অপূর্ণ পরিচ্ছিন্ন অহং হইতে পারে কিন্তু উভয়ত্রই মাতৃকার খেলা রহিয়াছে। পূর্ণাহং সম্পূর্ণ মাতৃকাময় — অ-কার হইতে হ-কার পর্যন্ত যে মহান্ চক্র — 'অ' বলিতে বুঝায় পরপ্রকাশ এবং 'হ' বলিতে বুঝায় বিমর্শ — এই 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকা সমষ্টিরূপে প্রকাশমান থাকিলে পূর্ণ অহং সত্তার অভিব্যক্তি থাকে। আদিতে 'অ'-কার এবং অন্তে 'হ'-কার এই মহামণ্ডলটি মাতৃকা-মণ্ডল। ইহার বিষয়ে পরে বিস্তারিতভাবে বলিব। ইহাই পূর্ণ অহংয়ের স্বরূপ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে সৎ এবং প্রকাশরূপে আত্মপ্রকাশরূপী এই অনন্ত মাতৃমণ্ডল। পূর্ণ অহং পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ নিজ স্বরূপ। এই স্বরূপ নিত্য প্রকাশমান স্বয়ংসিদ্ধ এবং পরিপূর্ণ — ইহার বাহিরে কিছু নাই, থাকিতেও পারে না এবং ইহার মধ্যে ইহার সহিত অভিন্নভাবে অনন্তসত্তা রহিয়াছে। তাহাতে পরম প্রকাশের পূর্ণত্বের ব্যাঘাত হয় না। এই প্রকাশের বাহিরে প্রকাশ কল্পনীয় নহে। কিন্তু মহাসিদ্ধ যোগীগণের নিজেদের খেয়াল-বশতঃ অথবা প্রয়োজন হইলে — যে প্রয়োজন আমরা বিশ্ববাসী বুঝিতে সমর্থ নহি — আমরা অভিনব বিশ্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। ইহা অতি গুহ্য ও গোপনীয় বিষয়। ঐসব স্থলে কূটাক্ষর 'ক্ষ' দ্বারা প্রবাহের সম্মুখ গতিকে প্রথম রোধ করিয়া নিতে হয়। তাহার পর যথাপূর্ব প্রকাশের অন্তর্বর্তী লীলা চলিতে থাকে। ইহা অতি গুহ্য — এখানে নামমাত্র উল্লেখ করিলাম।

পূর্ণ অহং এক ও অভিন্ন। ইহাতে ভিন্ন অবয়ব থাকিলেও তাহা 'সূত্রে মণিগণা ইব'। মালাতে যতই ফুল থাকুক্ পুষ্পের অন্তর্ভেদী সূত্র একই — তাই মালাকে এক বলে। এই স্থলেও অন্তর্ভেদী সূত্র

একই — যাহা অ-কার হইতে হ-কার পর্যন্ত প্রসৃত হয়। এই যে অহং ইহা একমাত্র অহংই বটে। ইহাতে কোনো পদার্থ নাই, থাকিলে এই অহং পূর্ণ অহং না হইয়া অহং-ইদংয়ের সমন্বয়েরূপে পরিণত হইত। পূর্ণ অহং চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে ইদন্তা নাই। একমাত্র অহন্তাই আছে। ইদন্তা স্বাতন্ত্র্যবলে সৃষ্টিমুখে আবির্ভূত হয়। সেই সৃষ্টির নাম মহাসৃষ্টি। আমাদের খণ্ডকালের জগতে অনন্ত লোক-লোকান্তরে যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, সকলই নিত্য বর্তমানরূপে ঐ মহাসৃষ্টিতে বিদ্যমান। ঐ স্থানে কাল নাই, অথচ কাল আছে। যে কাল পরিণামের সাধক, যে কালের ধর্ম পরিণাম-রূপে আমরা দেখিয়া থাকি — যাহা অতীত, অনাগত ও বর্তমান রূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, ঐ ভূমিতে সে কালের অস্তিত্ব নাই। অথচ কাল যে নাই তাহাও নহে। ইহা অতি গুহ্য বিষয়। তান্ত্রিকগণ ইহাকেই মহাকাল বলেন। অহং হইতে ইদংরূপে ভাসমান হইলেই তাহা সৃষ্টিরূপে বর্ণিত হওয়ার যোগ্য। ইহার আদি, অন্ত নাই বলিয়া ইহাকে মহাসৃষ্টি বলে। যে কোন সময়, যে কোন স্থানে যাহা কিছু ছিল বা হইবে ঐ মহাসৃষ্টিতে তাহা নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু তথাপি ঐ অবস্থা পূর্ণ অবস্থা নহে, সঙ্কুচিত অবস্থা, কারণ উহা ইদংরূপে ভাসমান, অহংরূপে নহে। পূর্ণ অহংয়ের সত্তা হইতেই এই মহাসৃষ্টির আবির্ভাব হয়। এই মহাসৃষ্টির সংহারই বস্তুতঃ মহাসংহার। পৌরাণিকগণ যাহাকে মহাপ্রলয় বা অতি-মহাপ্রলয় বলেন তাহা ইহার নিকট অতি তুচ্ছ — কারণ মহাসৃষ্টির অন্ত নাই। কাল হিসাবে তাহার অবসান কল্পনীয় নহে কিন্তু তাহারও অবসান আছে। তাহা হয় পূর্ণাহন্তা বোধের সঙ্গে সঙ্গে, কারণ তখন ইদংভাব মোটেই থাকে না। ইহাকে বলে পূর্ণতা-লাভ, পরমেশ্বরত্ব, পরমশিবভাব। এই পূর্ণসত্তাকে বেদান্তের ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা ঠিক নহে কারণ বেদান্তের অধিকারভুক্ত ব্রহ্মসত্তা অহংভাববর্জিত, আর এখানে আছে অহংভাবের পূর্ণত্ব। প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ উভয়ত্র একই, মহাশক্তির সর্বাত্মনা পরমশিবের সঙ্গে সামরস্য ভাব — এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। পূর্ণাহন্তা সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে হইবে — এখানে দিঙ্‌মাত্র নির্দেশ করা হইল। পূর্ণাহন্তাতে স্বাতন্ত্র্য অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে — এই স্বাতন্ত্র্যেরই নাম পরাবাক্ বা মহামাতৃকা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকাশের বাগ্‌রূপতা নিত্য-

সিদ্ধ। সুতরাং এই মহাপ্রকাশ স্বরূপশক্তি সমন্বিত। ইহা শুদ্ধ প্রকাশমাত্র নহে, তাহা হইলে অহংরূপে ইহার বিমর্শ হইত না।

মাতৃকা ভিন্ন স্বরূপকে ধরিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। মাতৃকা ভিন্ন পূর্ণ পরমেশ্বরের স্বরূপে, যাহাকে পূর্ণ অহং বলা হয় তাহার অনুভব হয় না। যাহাকে পশু বা জীবের স্বরূপ বলা হয় তাহার উপলব্ধিও মাতৃকাসাপেক্ষ। এই যে পরিচ্ছিন্ন জীব — ইহার অনন্তরূপ। পশুরূপী প্রত্যেক আত্মারই বৈশিষ্ট্য আছে। সব আত্মা মূলতঃ একই আত্মা হইলেও প্রত্যেক আত্মার বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা ভারতীয় দর্শন কেন, পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ দর্শনের পরম সম্পদ — ইহারই নাম individuality, অনেকে ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া মনে করেন ইহা কল্পিত, কল্পনানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা আর্য সিদ্ধান্ত অনুমোদিত নহে, মহাজন অনুভব-সিদ্ধ নহে। যাঁহারা বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ঐ সম্প্রদায়ের ঋষিগণ মুক্ত আত্মাতেও 'বিশেষ' পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মাই বিভু, ব্যাপক এবং যাবতীয় গুণ সম্পন্ন ইহা সত্য, কিন্তু এক আত্মা ঠিক অন্য আত্মার মত নহে। মুক্তির সময় আগন্তুক আবরণটি সরিয়া যায় কিন্তু স্বরূপটি থাকিয়াই যায়। তখন দেখা যায় প্রত্যেক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন, আত্মা নিত্য, মনও নিত্য এবং উভয়েতেই 'বিশেষ' আছে। 'বিশেষ' মানে quiddity — ইতরব্যাবর্তক ধর্ম। সংসার অবস্থার গুণ, ক্রিয়া, দেহ প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা পরস্পর ভেদ জানিতে পারা যায় কিন্তু মুক্ত অবস্থায় এসব ভেদ থাকে না। তথাপি স্বরূপগত ভেদ থাকে। বৈশেষিকগণ ইহারই নাম দিয়াছেন 'বিশেষ'। ঠিক এই ভাবের কথা উপনিষদেও আছে এবং ব্রহ্মসূত্রেও আছে। ছান্দোগ্যে আছে — 'পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে' অর্থাৎ তখন ব্রহ্মস্বরূপ পরম জ্যোতিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 'সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ' — ব্রহ্মসূত্রেও এই কথা বলা হইয়াছে।

শক্তির জাগরণ

মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্ন মনুষ্যের জীবনে স্বাভাবিক জাগিয়া উঠে। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপ কি ইহা জানিয়া সেই স্বরূপের উপলব্ধির চেষ্টা করা মানুষ্যের কর্তব্য। অনেকে মনে করেন, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিৎস্বরূপ আত্মা নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল বলা চলে। বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জড় হইতে অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া চিনিতে পারে। এই স্বরূপটি দ্রষ্টার স্বরূপ। এইপ্রকারে নিজের স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় দেহ থাকে না, অর্থাৎ দেহের বোধ পরিস্ফুটভাবে বিদ্যমান থাকে না — শুধু নিষ্ক্রিয় আত্ম-স্বরূপ মাত্র স্বপ্রকাশ ভাবে বিদ্যমান থাকে। দেহবীজ দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে আর অভিনব দেহ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থাকে সাধারণতঃ বিদেহ কৈবল্য নামে অভিহিত করা হয়। এই স্থিতিলাভের পর জন্মমৃত্যুর স্রোত হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পাওয়া যায়।

এইপ্রকার বিদেহ কৈবল্যলাভ মনুষ্য জীবনের পরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ইহাই অপর পক্ষের বক্তব্য। এই পক্ষের সমর্থক মনীষিগণ বলেন, মনুষ্য পরমেশ্বরের প্রভাববিশিষ্ট। জীব বস্তুতঃ শিব ভিন্ন অপর কেহ নহে। এই মতানুসারে মানুষ যতদিন পর্যন্ত অন্তর্নিহিত ভগবত্তাকে জাগাইতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। ভগবত্তা বলিতে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শিবভাবকে বুঝিতে হইবে। শিব অর্থাৎ পরমেশ্বর লীলা প্রসঙ্গে আপন স্বাতন্ত্র্যবলে নিজকে সঙ্কুচিত করিয়া পশুভাব অর্থাৎ জীবভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব এই সঙ্কোচের ফলে পশু অবস্থায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তাঁহার প্রভাব-সিদ্ধ ষাড়্গুণ্য পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্বরূপে সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা, বিভু, নিত্য ও আপ্তকাম হইলেও এই সঙ্কোচের প্রভাব অল্পজ্ঞ, অল্পকর্তা, পরিচ্ছিন্ন দেহ দ্বারা পরিমিত ও আয়ুবিশিষ্ট বলিয়া

নির্দিষ্ট কালের অধীন এবং নানা প্রকার বাসনারাশি দ্বারা কলঙ্কিত। জীব অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক। বিদেহ কৈবল্যে যদিও এই সীমাবদ্ধ গণ্ডীভাব থাকে না, তথাপি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানক্রিয়া শক্তির উন্মেষও হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল দিব্যগুণের পূর্ণবিকাশ না হইলে শুধু কৈবল্য লাভ করিলেই মনুষ্যের পূর্ণত্ব লাভ হইল, ইহা বলা চলে না। পূর্ণত্ব লাভের জন্য অপরিচ্ছিন্ন শক্তির নিত্য সংযোগ থাকা আবশ্যক। ভগবৎ শক্তি মূলে চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তিরূপা হইলেও বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ঐ মূল অব্যক্ত-শক্তিরই অভিব্যক্ত প্রকাশ মাত্র। ভগবানের অনন্ত শক্তি চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে প্রধানতঃ বিভক্ত। ইহার মধ্যে চিৎ ও আনন্দ তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গত এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও প্রমাতা-প্রমেয়ের সম্বন্ধনিবন্ধন ইচ্ছাদি-রূপে নিত্য সমবেত হইয়া বিরাজ করে। মূল শক্তি যে চিৎশক্তি তাহা বলাই বাহুল্য।

এই চিৎশক্তি মনুষ্যদেহে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম শক্তিরূপে বিরাজ-মান। আনন্দ এই চিতেরই স্বাভিমুখ বিশ্রাম মাত্র। স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিৎ যেমন আনন্দরূপে পরিণত হয় তদ্রূপ আনন্দ বহির্মুখে উচ্ছলিত হইলে ক্রমশঃ ইচ্ছা, জ্ঞান ও সর্বান্তে ক্রিয়ারূপে পরিণতি লাভ করে। যাহাকে আমরা বর্ণমাতৃকা (letters of alphabets) বলি তাহা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবেরই শাব্দিক দ্যোতনা মাত্র। তদনুসারে 'অ' হইতেছে অনুত্তর বা চিৎশক্তি, আ — আনন্দশক্তি, ই—ইচ্ছাশক্তি, উ—উন্মেষ বা জ্ঞানশক্তি এবং এ, ঐ, ও, ঔ — অস্ফুট স্ফুট প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়া-শক্তি। ক্রিয়া-শক্তির পর আর শক্তির বিস্তার হয় না। তখন উহা প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তরালবর্তী সকল শক্তিকে গুটাইয়া লইয়া সমষ্টিভাবে বিন্দু অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ বিন্দু অনুত্তর চিৎ-শক্তির সহিত যুক্ত হয়। বস্তুতঃ ইহা শিববিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর ঐ বিন্দু নিজেকে বিভক্তবৎ করিয়া দুইটি বিন্দুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই বিন্দুর বিসর্গ লীলা। এই বিসর্গ লীলা প্রসঙ্গে তত্ত্ব ও ভুবনের সৃষ্টি হয় এবং শিববিন্দু বিসর্গের প্রভাবে হকার পর্যন্ত প্রসৃত হইয়া অহং ভাবের বিকাশ করে। ইহাই পূর্ণ অহন্তা। এই অহং এর প্রতিযোগিরূপে ইদং ভাবের বিকাশ তখনও হয় না। ইদং ভাবই বিশ্বের প্রতীক। সর্বপ্রথম স্বাতন্ত্র্য প্রভাবে অহং

হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথক্‌ভাবে ইদংএর প্রকাশ হয়। ইহাই মহাসমষ্টি সৃষ্টির পূর্বাভাস। ইদংএর এই প্রথম রূপটিকে — মহাশূন্যেরও অতীত পরমশূন্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মহাসমষ্টি সৃষ্টি হইতে সমষ্টি এবং সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির উদয় ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত শূন্যের পর বুদ্ধি, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমশঃ সাজান রহিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়াই সৃষ্টির বহির্মুখী ধারা বহিয়া চলিয়াছে। বিষয়সৃষ্টির মূলে প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম হইতে বিসদৃশ পরিণামের উদ্ভব আছে জানিতে হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

দুই

পূর্বে যে চিৎশক্তি বা অনুত্তরের কথা বলা হইল অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাই অকুল স্বরূপের আদিভূত কৌলিকী শক্তি। এই কুলশক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহা যে বিসর্গশক্তিরই সূক্ষ্মতমরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিখিল বিশ্বের স্ফুরণ এই শক্তি হইতেই হইয়া থাকে। সৃষ্টি ভেদ, ভেদাভেদ এবং অভেদ এই তিন প্রকার। ভেদ সৃষ্টি স্থূল, ইহার নাম আণব বিসর্গ। ভেদাভেদ সৃষ্টি সূক্ষ্ম, ইহার নাম শাক্ত বিসর্গ। এবং অভেদ সৃষ্টি পরম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ইহার নাম শাম্ভব বিসর্গ। এই তিনটির মধ্যে স্থূল বিসর্গটি সঙ্কুচিত জ্ঞানাত্মক চিৎএর বিসর্গ মাত্র। যে স্ফুরণে ভেদোন্মুখ অবস্থা জাগ্রত থাকে তাহাতে প্রমাতা প্রমেয় প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বই সৃষ্টির বিষয়রূপে প্রকাশ পায়। সূক্ষ্ম বিসর্গকে চিত্তের সংবোধ বলে। এই অবস্থায় চিত্ত নিজের নিষ্কল স্বরূপে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই অবস্থায় অখণ্ড প্রকাশের মধ্যে সমগ্র চরাচরের আহুতি হইতেছে এইরূপ মনে হয়। ইহাই শক্তির অবস্থা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিসর্গে চিত্ত থাকে না, উহা আনন্দাত্মক অভেদ অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত প্রলীন হইয়া যায় এবং সংবিৎ বা চৈতন্যমাত্র বিদ্যমান থাকে।

এই বিসর্গ শক্তি অখণ্ডপ্রকাশের পরাশক্তি নামে পরিচিত। ইহা পর প্রমাতার সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে। অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহা ইচ্ছারূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। কামকলা বিজ্ঞানে ইহাকেই কামকলারূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কামকলার স্বরূপ তত্ত্বসৃষ্টির

পূর্বাবস্থার কথা। এই ইচ্ছা যখন বাহিরের দিকে উন্মুখ হয় তখন ইহাকে বিসর্গ বলে। ইহার কারণ ক্ষোভ। ক্ষোভের পূর্বাবস্থা অ, পরাবস্থা আ। অ চিৎশক্তি এবং আ আনন্দশক্তি ধীরে ধীরে ক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এই বহিরুল্লাস খেলা করিতে থাকে।

তিন

এই যে পরাশক্তি 'অ' এর কথা বলা হইল, ইহারই নামান্তর সপ্তদশী কলা অমা। ইহা নিত্যোদিত, কারণ ইহার তিরোধান কখনই হয় না, ইহাই অমৃতকলা। ইহাই অন্তঃকরণ প্রভৃতি ষোড়শ-কলার আপ্যায়ন করিয়া থাকে। বিসর্গ দুইটি। যেটি পর বিসর্গ — তাহাই আনন্দ বা 'আ' এবং যেটি অপর বিসর্গ — তাহাই 'হ'। এই দুইটি বিসর্গের স্ব-স্বরূপস্থ বা আত্মভূত দুইটি বিন্দু আছে। এই দুইটি বিন্দুর গতির দ্বারা অর্থাৎ দুইটি বিন্দু অবভাসন পূর্বক প্রসৃত হইয়া অমাকলা উল্লসিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'অ' তত্তৎরূপের অবভাসনপূর্বক ইচ্ছাপুরঃসর বহির্মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় এই অমাকলা হইতে অভিন্ন। তথাপি অমাকলা তাহাদিগকে তত্তৎরূপে, ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত প্রকাশরূপে, প্রকাশিত করে।

এই অমাকলা যখন বিসর্গ হয় অর্থাৎ যখন ইহা বহির্মুখে থাকে না তখন ইহাকে শক্তিকুণ্ডলিনী বলা হয়। ইহা প্রসুপ্ত ভুজগাকার স্বাত্মমাত্রবিশ্রান্ত পরাসংবিৎ। বিসর্গের দুই প্রান্তে আছে দুইটি কুণ্ডলিনী। আদি কোটিতে যে কুণ্ডলিনী আছে তাহার নাম প্রাণ-কুণ্ডলিনী। কারণ বহির্মুখে সংবিৎ এখানে প্রাণরূপেই প্রকাশিত হয়। অন্তিম কোটিতে যে কুণ্ডলিনী আছে তাহার নাম পরা-কুণ্ডলিনী। ইহাই স্বাত্ম-বিশ্রান্ত পরাসংবিৎ। ইহা অন্তরুন্মুখ। এই সপ্তদশী কলা শিব-ব্যোম পরব্রহ্ম অথবা শুদ্ধাত্ম স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

যদি সংবিৎ ভিন্ন আর কিছু না থাকে তাহা হইলে পরাশক্তি কিসের সৃষ্টি বা সংহার করিয়া থাকে ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা যে অবস্থার কথা বলিতেছি সেখানে মায়া প্রকৃতি প্রভৃতি ভিন্ন উপাদানের কোন স্থান নাই। কারণ আত্মা নিজ হইতে সৃষ্টি করেন, নিজের মধ্যেই করেন (কারণ দেশ কালাদি তাহা হইতে

ভিন্ন নহে) এবং নিজেকেই দ্রষ্টব্য বিষয়রূপে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করেন। যে কোন প্রমাতা বা প্রমেয় সৃষ্ট হউক না কেন, বস্তুতঃ সবই নিজস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই স্বতন্ত্র পূর্ণচৈতন্য শক্তি ক্রমশঃ 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত স্ফুরিত হইয়া থাকে।

চার

মনুষ্যদেহে সুপ্তরূপে এই কুণ্ডলিনীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃ উর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতে থাকে। এই ক্রমিক উত্থানের কালে মনুষ্যের বিকাশের পরিপন্থী যাবতীয় বিকল্প-জ্ঞান উপশম প্রাপ্ত হয়। চক্রের পর চক্র ভেদের ইহাই উদ্দেশ্য। কয়েকটি চক্রভেদ সম্পন্ন হইলে আত্মার তৃতীয় নেত্র মলশূন্য হইয়া স্বচ্ছ ও প্রসন্নরূপ ধারণ করে। বিকল্প সমূহের নিবৃত্তির ফলে নির্বিকল্পক স্বরূপ দর্শন আপনিই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ তখন জ্ঞান নেত্রের উন্মীলন হয় এবং শিবোহং রূপে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়।

শিবরূপী আত্মা যখন সৃষ্টির আদিতে পশু সাজিয়াছিলেন তখন মাতৃকার সাহায্যেই নিজের স্বরূপ গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতৃকাগুলি স্বভাবসিদ্ধরূপে 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত উল্লসিত হয়। এই উল্লাসে কোন বৈষম্য থাকে না, ক্রম থাকে না, এবং বেগের মন্দতা বা তীব্রতাও থাকে না। ইহাই অহন্তারূপী মহাশক্তির প্রকাশ, যাহাতে সর্বশক্তির সমাবেশ রহিয়াছে। পশু সাজিবার সময় এই উল্লাস খণ্ড এবং বিষমভাবে হইয়া থাকে। সেইজন্য পশুগত অনন্ত-প্রকার প্রকৃতির বিকাশ হয়। এই সব প্রকৃতিই পশুপ্রকৃতি। পশুস্থলে শিবভাব আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে পারতন্ত্র্য আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ শিব নিজ শক্তি দ্বারা ব্যামোহিত হইয়াই পশু সাজেন এবং পশুভাব ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শিবভাবের উন্মেষ দেদীপ্যমান হয়। তন্ত্রে আছে — "শব্দরাশিসমুত্থস্য শক্তিবর্গস্য ভোগ্যতাম্। কলাবিলুপ্ত-বিভবো গতঃ সন্ সঃ পশুঃ স্মৃতঃ ॥" ইহার তাৎপর্য এই — ভিন্ন ভিন্নরূপে স্ফুরণশীল অকারাদি নিজের অবয়ব সমূহই কলাপদবাচ্য। আত্মার যে ঐশ্বর্য তাহার তাৎপর্য এই যে ইহাতে যাবতীয় বর্ণ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত কলার প্রভাবে বিষম স্ফুরণ বশতঃ আত্মার এই স্বাভাবিক ঐশ্বর্য লুপ্ত হইয়া

যায়। তখন এই আত্মা দৈন্য প্রাপ্ত হয় এবং নিজস্বরূপ হইতে সম্ভূত শক্তিবর্গের অধীন হইয়া পড়ে। পশু অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক।

কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইলে চিৎশক্তি নিজের সম্বিৎরূপ মাত্র প্রকাশ করে। ইহা অতি প্রবল অগ্নিস্বরূপ। ইহাকেই চিদগ্নি বলা হয়। গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা, কালের পরিপাক, পুরুষকার অথবা অন্য কোন কারণে এই শক্তি জাগ্রত হইতে পারে। এই জাগরণের মূলে প্রাণ ও অপান শক্তির সাম্য স্থাপন বলিতে হইবে। প্রাণ ও অপান বলিতে এখানে যাবতীয় বিরুদ্ধ শক্তি বুঝিয়া লইতে হইবে। বিরুদ্ধ শক্তির সাম্যভাবের নামই সমান বায়ুর ক্রিয়ার ফল প্রাপ্তি। এই সময় নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠে এবং সাধকের মন ও প্রাণ এই জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীরূপা অগ্নিশক্তির সহিত একীভূত হয়। এই একীভূত শক্তির দ্বারা দেহস্থিত ছয়টি চক্রের মধ্যে প্রত্যেকটি চক্রকে আয়ত্ত করিতে হয়। এই ছয়টি চক্র পঞ্চভূত ও চিত্তের প্রতীক। এই ছয়টি চক্রের ক্রিয়া হওয়া মানেই পঞ্চভূতের শোধন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত শোধন। পঞ্চভূত শুদ্ধ হইলে তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহার ফলে পঞ্চভূতের শুদ্ধি হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই ছয়টি চক্র ভৌতিক চৈত্য সংস্কারের বিকল্প জালের প্রসার ক্ষেত্র। এই চক্রগুলি জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীরূপা চৈতন্যশক্তি দ্বারা আপূরিত করিতে হইবে। সৃষ্টিক্রমে বিন্দু, নাদ ও কলা অর্থাৎ মাতৃকা এই তিনটি স্তরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, প্রত্যেকটি দৈহিক চক্রই বহির্মুখে দেখিতে গেলে এক একটি কমলের আকার। ইহাতে কমলের দলরূপে মাতৃকা-বর্ণগুলি রশ্মির আকারে নিঃসৃত হইতেছে। ইহার পর একটা ব্যাপক ঢালা প্রকাশ ঊর্দ্ধবাক্‌রূপে নাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। সর্বান্তে কমলের কর্ণিকা হইতে বিন্দুরূপে চক্রেশ্বর ও চক্রেশ্বরীর আসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জাগ্রৎ চিৎশক্তি দেহ হইতে উত্থিত হইয়া প্রত্যেকটি চক্রকে আক্রমণ করে। প্রথমে মূলাধার চক্রে এই আক্রমণ ঘটে। ইহার ফলে চক্রস্থিত চারিটি বর্ণ উক্ত চিদগ্নির প্রভাবে বিগলিত হইয়া প্রদক্ষিণক্রমে ধারা বহিতে থাকে। এই ধারা নিজ প্রভাবে পর পর চারিটি বর্ণকে জাগাইয়া এবং নিজের সহিত মিলিত করিয়া মধ্যবিন্দুর দিকে ক্ষিপ্র অথবা মন্দবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যবিন্দুতে প্রবিষ্ট হইলে নাদ উপসংহৃত হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হয়। প্রতি চক্রের বিন্দুটি অধঃ-উর্ধ্ববাহী

মধ্যমার্গ বা শূন্য পথে বিরাজ করে। বর্ণ, নাদ ও বিন্দু প্রতিকমলেই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম কমলের বিন্দুটি সমস্ত কমল গ্রাস করিবার পর ব্রহ্মনাড়ীর আকর্ষণের ফলে উপরকার চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্বের ন্যায় উহার বর্ণ, নাদ ও বিন্দুকে গলাইয়া ও নিজের সঙ্গে একীভূত করিয়া পূর্ববৎ মধ্যনাড়ীর একীভূত বিন্দু পথে ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্ধ্ব আকর্ষণের ফলে ঊর্ধ্বদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। পৃথক্ পৃথক্ বিন্দু তখন এক বিন্দুতেই পর্যবসিত হয়। এইভাবে ঐ বিন্দুও অন্য বিন্দুর সহিত অভিন্ন হইয়া জীবকল্যাণের জন্য ক্রমশঃ মধ্যনাড়ীর দিকে ধাবমান হয়। পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চচক্র ও মনোময় ষষ্ঠ চক্র বিধ্বস্ত হইয়া যায়। পঞ্চভূত ও যোগীর চিত্ত শুদ্ধ হইয়া নির্বিকল্প স্বচ্ছ প্রজ্ঞাতে ডুবিয়া যায়। তাহার পর আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে দিব্যজ্ঞানের কেন্দ্র উন্মুক্ত হয়। ইহা বস্তুতঃ কুণ্ডলিনীশক্তিরই উন্মেষপ্রাপ্ত অবস্থা।

ষট্চক্রভেদের পর ভ্রূমধ্যে নিম্নদেশ হইতে যাবতীয় বিকল্প তিরোহিত হইতে থাকে। তখন ললাটপ্রদেশে দেহাভিমান বর্জিত হইয়া পরম জ্যোতির অনুভবের শক্তি জন্মে, এবং প্রতিদিন ঐ মহা-জ্যোতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অন্তরতম ভাবে মহাশূন্যের মধ্যে সহস্রদল কমলের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূমধ্যস্থ বিন্দু হইতে সহস্রারের মহাবিন্দু পর্যন্ত অনেকগুলি স্তর আছে। এই সকল স্তর ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া মহাশক্তি মহাবিন্দুস্থ পরম শিবকে আলিঙ্গন করেন। সুদীর্ঘকালের বিরহের পর শিবশক্তির এই মহামিলন সংঘটিত হয়। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি কুণ্ডলভাব ত্যাগ করিয়া দণ্ডরূপ ধারণ করেন এবং অন্তে মহাবিন্দুতে পরমশিবের সহিত সামরস্য লাভ করেন। এই মিলনের ফলে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হয় সেই সুশীতল ধারাতে মন ও প্রাণ অভিষিক্ত হয়, ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই ধারা পান করিতে থাকে। সমানবায়ুর ক্রিয়ার পর উদান-বায়ুর ক্রিয়ানিবন্ধন কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি নিষ্পন্ন হয়। এই ঊর্ধ্বগতি বস্তুতঃ সহস্রারে পরিসমাপ্ত না হইয়া— ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহার পর আর ঊর্ধ্বগতি থাকে না। তখন ব্যান-শক্তির প্রভাবে নিজের খণ্ডসত্তা অনন্ত ব্যাপকরূপ ধারণ করে। ইহাই সংক্ষিপ্তভাবে আত্মার নিজস্বরূপে ফিরিয়া যাওয়ার ইতিহাস। বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা এবং সন্তান তখন একই মহাসত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাই পরিপূর্ণ অদ্বৈত স্থিতি এবং নিজের পূর্ণতা লাভ।

কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই মহাপথে চলা সম্ভবপর হয় না, পরম লক্ষ্যের প্রাপ্তি ত দূরের কথা। মনুষ্যজীবনের ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। শুধু খণ্ড কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর আবর্ত হইতে ঊর্ধ্বে স্থান লাভ মানুষের লক্ষ্যপ্রাপ্তি নহে। নিজের সুপ্ত ভগবত্তা পূর্ণভাবে জাগিয়া না উঠা পর্যন্ত মানুষ-জীবনের প্রকৃত সফলতা কোথায়? কুণ্ডলিনী না জাগিলে চিৎ ও অচিতের দ্বন্দ্বভাব কাটিতে পারে না। বিবেক জ্ঞান-পথে আরূঢ় হইবার একটি সোপান মাত্র, শক্তির সাধনা ব্যতীত শিবভাবের প্রাপ্তি দুর্ঘট এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণ ব্যতীত শক্তি-সাধনার কোন অঙ্গই বশীভূত হয় না।

———

ইচ্ছাশক্তি

যাঁহারা যোগশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত নহেন তাঁহাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যে Will Power নামে যে শক্তির বিবরণ দৃষ্ট হয়, অনেকে তাহাকেই যোগীর ইচ্ছাশক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। যোগিগণ যাহাকে ইচ্ছাশক্তিরূপে গ্রহণ করেন তাহা সাধারণ শক্তি নহে — তাহাই সৃষ্টির মূল শক্তি, কারণ সেই শক্তির প্রভাবেই সৃষ্টির প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিয়া থাকে। সাধারণ মনুষ্যে ইচ্ছাশক্তি তো দূরের কথা, কোন শক্তিরই বিকাশ নাই। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, সবই সুপ্ত। এইজন্য সুপ্তা মহাশক্তির উদ্বোধন না হওয়া পর্যন্ত কোন শক্তিরই স্ফুরণ অনুভব করিতে পারা যায় না। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আগমের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইচ্ছা-শক্তি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ইহা হইতে যোগের প্রকৃত রহস্য কি এবং উহার মাহাত্ম্য কোনখানে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। শাস্ত্রে আছে —

> চিদাত্মা হি দেবোঽন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ।
> যোগীব নিরুপাদানামর্থজাতং প্রকাশয়েৎ ॥

ইহার তাৎপর্য এই যে সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপস্থিত পদার্থ সমূহকে উপাদান ব্যতীতই বাহ্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যোগী যেমন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বাহ্য উপাদান সংগ্রহ না করিয়াও কেবল ইচ্ছামাত্রের দ্বারা বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকেন ইহাও সেইরূপ। চৈতন্যরূপী পরমাত্মাই বিশ্বের মূল কারণ। তিনি অখণ্ড এক ও অদ্বিতীয়। সেখানে নিমিত্ত ও উপাদানের কোন ভেদ নাই। লৌকিক জগতে কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে হইলে একদিকে যেমন সেই বস্তুর উপাদান আবশ্যক হয়, অপর দিকে তেমনি সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা প্রভৃতিও আবশ্যক হয়। ইহাদের মধ্যে একটি উপাদান ও অপরটি নিমিত্ত। সর্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু আদি সৃষ্টিতে নিমিত্ত ও উপাদানের বিভাগ থাকে না বলিয়া স্রষ্টার আত্মস্বরূপ হইতেই শুধু

তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে যে কোন পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে। বস্তুতঃ উপাদান এবং নিমিত্ত এই স্থলে অভিন্ন।

বিশ্বের মূলে অদ্বৈত দৃষ্টিতে একমাত্র অদ্বৈত পরমসত্তাই আছে, দ্বিতীয় কিছু নাই। এই পরমসত্তা বাক্য ও মনের অগোচর এবং মন-বুদ্ধির অতীত। আমরা সচরাচর যে ব্রহ্ম বস্তুকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি তাহা এই পরমসত্তার সহিত অভিন্ন। বস্তুতঃ এই অখণ্ড সত্তার মধ্যেও এক হিসাবে স্তরবিন্যাস লক্ষিত হয়। এই পরম বা পূর্ণ সত্তাই বস্তুতঃ সৎ নামে বর্ণিত হইবার যোগ্য। ইহা অখণ্ড এক সমরস ও নিষ্কল। ইহা নিরঞ্জন ও অলখ তত্ত্ব। বস্তুতঃ ইহা তত্ত্ব নহে, তত্ত্বাতীত। শুধু যে তত্ত্বেরও অতীত তাহা নহে, কলারও অতীত। কৌলগণ এই পরম শান্ত স্থিতিকেই কুল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন — সমগ্র বিশ্ব ইহা হইতেই উদ্ভূত হয়, ইহাতেই স্থিত থাকে এবং কালক্রমে অন্তে ইহাতেই লীন হয়। শুধু বিশ্ব নহে, বিশ্ব-পিতা এবং বিশ্ব-মাতা যাঁহাদিগকে বলা হয় তাঁহারাও এই অব্যক্ত কুল হইতেই আত্মপ্রকাশ করেন। যিনি বিশ্বপিতা শিব তিনি অকুল এবং যিনি বিশ্বমাতা শক্তি তিনি কৌলিকী। উভয়ই চিৎস্বরূপ। শিব প্রকাশরূপী চিৎ এবং শক্তি ঐ প্রকাশের আত্মবিমর্শরূপী চিৎ। উভয়ই মূলতঃ এক বলিয়া অভিব্যক্ত অবস্থাতেও উভয়ের মধ্যে এমন সম্বন্ধ থাকে যে একটিকে বাদ দিয়া অপরটির স্ফুরণ হয় না অর্থাৎ শিব ব্যতিরেকে শক্তির অস্তিত্ব কল্পিত হয় না এবং শক্তি ব্যতিরেকে শিব শব মাত্র। কিন্তু উভয়ই চিদ্‌রূপ হইলেও উভয়ের স্থিতিতে বৈলক্ষণ্য আছে। একটি স্থিতি শাস্ত্রানুসারে 'একবীর' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থিতিতে শিব ও শক্তির মধ্যে পরস্পর কোন অংশে কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকে না। দ্বিতীয় স্থিতিতে উভয়ের মধ্যে পরস্পর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধ হয়। তদনুসারে একটি চিৎ বিম্বস্থানীয় হয় অপরটিও তাহারই আত্মপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থাতে উভয় চিতের পরস্পর আভিমুখ্য লক্ষিত হয়। যেমন একটি লোক সম্মুখবর্তী দর্পণে তাহার নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই উভয় চিৎ মূলে একই চিৎ তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এক হইলেও স্ফূর্তি অনুসারে তাহাকে দুই বলিয়া ধরিতে হইবে। এই আভিমুখ্যের ফলে উভয়ের মধ্যে তীব্র আকর্ষণের ক্রিয়া অনুভূত হয়। তাহার প্রভাবে একটি মন্থনের ব্যাপার প্রকাশ

পায় যাহার ফলে আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। এই হিসাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে পরম সত্তার 'যামল' অবস্থায় একটি চিৎ এবং অপরটি আনন্দরূপে আবির্ভূত হয়। দুইটিই কিন্তু কলা — চিৎকলা ও আনন্দকলা — উভয়েই নিষ্কল পরম সত্তাকে পৃষ্ঠভূমিতে রাখিয়া উদিত হয়। সেই নিষ্কল পরম সত্তা যদি সৎ হয় তাহা হইলে এই দুইটি কলা তাহার অন্তরঙ্গ কলা চিৎ ও আনন্দরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। এই তিনটিকে মিলিতভাবে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলে। মনে রাখিতে হইবে চিৎকলার অভাবে সদ্ বস্তু সৎ হইয়াও অসৎ। চিৎ ও আনন্দ সতের অন্তরঙ্গ কলা কিন্তু তাহার বহিরঙ্গ কলাও আছে। তাহাই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া নামে অভিহিত হয়।

চিৎ ও আনন্দ এক হইয়াও ঠিক এক নহে, কারণ আনন্দ চিৎ হইয়াও শুধু চিৎ নহে, তাহাতে ভবিষ্যতে যে বিশ্ব সৃষ্ট হইবে তাহার আভাস বিদ্যমান থাকে। আনন্দ ভাবী বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করে। গর্ভবতী নারী যেমন গর্ভস্থ সন্তানের প্রসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ইহাও কতকটা সেই প্রকার। কিন্তু চিৎ অবস্থা সেরূপ নহে। চিৎ ও আনন্দ উভয়ই চৈতন্যস্বরূপ হইলেও একটি নিরাভাস ও অপরটি সাভাস। কিন্তু এই আভাস অন্তঃস্থিত আভাস মাত্র, তাই ইহা চিদাত্মক। যতক্ষণ ইহা বাহিরে প্রকটিত না হয় ততক্ষণ ইহা পরমস্বরূপেরই অন্তর্গত জানিতে হইবে। কিন্তু ইহা চিদ্-অবস্থা নহে, আনন্দ অবস্থা। উপনিষৎ বলিয়াছেন —

"আনন্দোদ্ধেৎব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ চিতের আনন্দাত্মক অবস্থা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়। আনন্দের মধ্যে বিশ্ব আনন্দে লীন হইয়া বিদ্যমান থাকে। এই আনন্দাত্মক আত্মার অন্তঃস্থিত বিশ্বকে বাহিরে নিয়া আসাই বিসর্গ পদবাচ্য। ইহার জন্য পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া আবশ্যক হয়, কারণ ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে আত্মার অন্তঃস্থিত সত্তাকে অর্থাৎ পদার্থকে বাহিরে আনা যায় না।

যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ হয় তখন বিশ্ব ইদংরূপে অর্থাৎ বাহ্যভাবে বাহিরে প্রকাশমান হয়। 'বাহিরে' শব্দের অর্থ আত্মস্বরূপের বাহিরে। আত্মা যদি অদ্বৈত হয়, যদি তদ্‌ভিন্ন অতিরিক্ত কিছু না থাকে, তাহা হইলে আত্মা হইতে বাহির কিরূপে

হইবে, এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হয়। ইহার উত্তর এই যে মূলে বাহির বলিয়া কিছু না থাকিলেও ভগবানের আত্মসঙ্কোচের ফলে ইদংরূপে বাহ্যভাবের স্ফুরণ হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে পূর্ণ অহংভাব খণ্ডিত হইয়া যায়। ইহারই নাম মহাশূন্যের সৃষ্টি। বিশ্ব আবির্ভূত হইয়া এই মহাশূন্যকে আশ্রয় করিয়া ইচ্ছাশক্তিতে প্রকাশ পায়। বিশ্ব ইচ্ছার বিষয়ীভূত, কারণ ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণে ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইলেও ইহা প্রথম অবস্থায় ইচ্ছার সঙ্গে অভিন্ন রূপে বিদ্যমান থাকে। এইটি বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থা। ইহার পর সৃষ্টির বহির্মুখ প্রভাবে ইচ্ছাশক্তি হইতে তদনন্তর জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয়। জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হইলে বিশ্ব অব্যক্ত অবস্থা পরিহার করিয়া অভিব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়। এই অবস্থায় বিশ্ব জ্ঞানরূপে যোগিগণের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ভাসমান হয়। যে বিশ্ব প্রথমে আনন্দ অবস্থায় সম্বিদের সহিত অভিন্ন ছিল, ইচ্ছাশক্তির বিকাশে যাহা ইচ্ছার মধ্যে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল, জ্ঞানশক্তির বিকাশে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত হয়। ইহার পর জ্ঞানের তরঙ্গিত অবস্থায় উহা জ্ঞানে অবস্থিত হইয়াও জ্ঞেয়রূপে পৃথক্ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই আকারটি জ্ঞানেরই আকার তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ হইলে ঐ আকারটি জ্ঞান হইতে চ্যুত হইয়া কার্য আকার ধারণ করে। ইহাই আমাদের পরিচিত স্থূলাকার। ইহা মায়িক বা প্রাকৃত রূপ। অবশ্য ইহার মধ্যেও স্থূলসূক্ষ্মের বিভাগ আছে।

সমষ্টিভাবে সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তিও সেইরূপ। মোট কথা, আত্মস্বরূপ বা ভগবৎস্বরূপ হইতে বিশ্বকে বাহির করিয়া আনিবার একমাত্র উপায় ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া। ইচ্ছাশক্তি ভেদ হইয়া গেলে বিশ্ব ভেদ হইয়া যায়, তখন বিশ্ব আত্মস্বরূপে অভিন্ন রূপে প্রতিবিম্ববৎ উপলক্ষিত হয়। এইটি আনন্দের অবস্থা। অভিন্ন সর্বজ্ঞত্ব এই স্থিতির লক্ষণ। যোগীর জাগতিক স্থিতিতে ইচ্ছাশক্তি প্রধান, কিন্তু পারমার্থিক স্থিতিতে আনন্দ ভেদ করিয়া চিৎশক্তি প্রধান — মূলে কিন্তু সব এক মহাশক্তিরই খেলা।

অগ্নীষোম তত্ত্ব

অগ্নীষোম বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পূর্বে অগ্নি ও সোমতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈদিক দৃষ্টি অনুসারে জগতের মূল ভোক্তা এবং ভোগ্য যথাক্রমে অগ্নি এবং সোম-বদবাচ্য অর্থাৎ অগ্নিই একমাত্র ভোক্তা ও সোমই একমাত্র ভোগ্য। যিনি নিজেকে ভোক্তা মনে করেন তিনি বস্তুতঃ অহঙ্কারের মোহবশেই করিয়া থাকেন। কর্তৃত্বাভিমান বিগলিত হইলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে তিনি যেমন কর্তা নন, কর্তৃত্ব তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র, ঠিক সেইপ্রকার তিনি বস্তুতঃ ভোক্তাও নন, ভোক্তৃত্বও তাহাতে আরোপিত হয়। যিনি জগতের একমাত্র ভোক্তা, তিনিই সকল আধারে থাকিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ সকল আধারের অভিমানী পুরুষ নিজেকে বৃথাই ভোক্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। জগতের এই মূল ভোক্তাকে বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ঠিক এইপ্রকার ভোগ্য সম্বন্ধেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যিনি যখন যাহাই ভোগ করুন না কেন, ভোগ্য মূল বস্তু একই। দেশভেদে, কালভেদে, আধারভেদ ও যোগ্যতার ভেদ-অনুসারে ঐ একই ভোগ্য বস্তু বৈদিকগণ সোম বলিয়া বর্ণনা করিতেন। সোমের অপর নাম অমৃত। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই সোম অথবা অমৃতকণাই জীবমাত্রের ভোগের বিষয়। সকলেই একমাত্র ইহারই আহরণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে আহার বা আহার্য বলে। যে যেমন জীব যে কোন প্রকার খাদ্যবস্তু গ্রহণ করুক তাহার সার সত্তাটি সোম। সোমহীন খাদ্য হইতে পারে না, সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যেই মাত্রাভেদে এই সোম অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে সমগ্র জগৎ অগ্নি ও সোম এই দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এবং কর্তা ও কর্ম যে প্রকার পরস্পর সংশ্লিষ্ট, সেইপ্রকার ভোক্তা ও ভোগ্যও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ভোক্তা ভিন্ন ভোগ্য এবং ভোগ্য ভিন্ন ভোক্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। শিব ও শক্তির মধ্যে যেমন নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় ঠিক সেই প্রকার ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাহাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করি তাহা বস্তুতঃ এই নিত্যসিদ্ধ পরম ভোক্তার নিকট ভোগ্য পদার্থের অর্পণ ভিন্ন অপর কিছু নহে। অগ্নিতে সোমের আহুতি প্রদানই যজ্ঞের তত্ত্ব। তিল, তণ্ডুল, আজ্য, সমিধ যাহাই কিছু অগ্নিতে হবন করা হউক, ফলে সোমপ্রধান পদার্থ বলিয়াই হবনের যোগ্য। সোমাংশ না থাকিলে অগ্নি তাহা গ্রহণ করেন না। সাক্ষাৎভাবে সোম অর্পণ করিবার যোগ্যতা সাধারণ লোকের নাই বলিয়া সোমপ্রধান বস্তু সোমের প্রতীকরূপে অর্পণ করা হইয়া থাকে। দেবতামাত্রই ভোক্তা, এইজন্য সকল দেবতাই সোম বা অমৃতের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেদে আছে 'অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখং' অর্থাৎ অগ্নিকে সকল দেবতারই মুখরূপে গণনা করা হয়। এইজন্য অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিলে তাহা সকল দেবতার নিকটেই ভোগার্থ উপনীত হইয়া থাকে। দেবগণ আত্মরূপী মহাসবিতার রশ্মিস্বরূপ — ইহা নিরুক্ত আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। অগ্নিতে যখন আহুতি অর্পণ করা হয় তখন উহা অগ্নির দাহিকাশক্তির প্রভাবে বিগলিত হইয়া যায়। উহার অশুদ্ধাংশ দগ্ধ হয় এবং শুদ্ধাংশ বা সোমাংশ অমৃতরূপে উর্ধ্বে উন্নীত হইয়া আদিত্য মণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহার পর উক্ত মণ্ডল হইতে সোমাংশ রশ্মিযোগে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়। এইভাবে দেবগণ সোমাংশ প্রাপ্ত হইয়া আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। এইজন্য শাস্ত্রে আছে ঃ 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে'।

মনুষ্য যাহাকিছু যে কোন কোষে আশ্রয় করিয়া ভোগ করিয়া থাকে তাহাও ঐ প্রকার অমৃতস্বরূপ এবং তৎতৎ কোষস্থ অগ্নি গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোষের সহিত পাঁচটি অগ্নির সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার সম্যক পরিজ্ঞানই পঞ্চাগ্নি বিদ্যার রহস্য উদ্ঘাটন। অগ্নি যেমন ৫ প্রকার অগ্নির ভোগ্য সোম বা অমৃতও তদ্বৎ ৫ প্রকার। ইহারই নাম পঞ্চামৃত। প্রথম অগ্নিতে প্রথম সোমাংশের আহুতি হয়, দ্বিতীয় অগ্নিতে হয় অমৃতের, এইপ্রকার শেষ পর্যন্ত বুঝিতে হইবে।

জীব যখন যাহাই কিছু ভোগ করুক না কেন, বস্তুতঃ সে কিছুই ভোগ করে না, কারণ স্বরূপতঃ সে ভোক্তা নহে, সাক্ষী মাত্র। সে শুধু ঐ ভোগের দর্শন করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,

শুদ্ধ দেবগণ দর্শনের দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করেন। জীবও যখন সাক্ষী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শুধু দর্শন হইতে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। অভিমান ত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত এই দ্রষ্টা ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না। এইরূপে স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত দৃষ্টিজনিত তৃপ্তি লাভ হওয়া অসম্ভব। সাধনার সুকৌশলে ভোগকালেও নিজেকে ভোক্তা না মনে করিয়া দ্রষ্টারূপে অবস্থিত মনে করা, ইহাই অগ্নীষোম বিদ্যার তাৎপর্য। অর্থাৎ ভোগকালে উপলব্ধি করিতে হইবে যে আমি ভোক্তা নহি। যিনি নিত্য ভোক্তা, সর্ব যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই এই আধারে অগ্নিরূপে উপবিষ্ট থাকিয়া সোমরূপী ভোগ্য বস্তু নিরন্তর ভোগ করিতেছেন। আমি তটস্থ এবং উদাসীন সাক্ষীরূপে উহা দর্শন করিতেছি মাত্র। এই দর্শন হইতে যে তৃপ্তি তাহাই বিশুদ্ধ আনন্দ। ভোগজনিত আনন্দ জীবের পক্ষে কাম্য নহে।

যাহারা উপাসক এবং ভক্ত তাহারা সূক্ষ্মতর কৌশল অবলম্বন করিয়া ঈশোপনিষদের প্রক্রিয়া অনুসারে ভোগ করিলেও ঐ ভোগের দ্বারা তাঁহারা লিপ্ত হন না। উহা তাঁহাদের পক্ষে প্রসাদ গ্রহণ মাত্র ; উপভোগ নহে। ঐ জাতীয় ভোগের দ্বারা ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ উহা ভোগ হইয়াও ভোগের নিবর্তক। শাস্ত্রকারগণ উহাকে বৈধ ভোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহার রহস্য সংক্ষেপে এইভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন ঃ ভোগ্য বস্তু প্রকৃতি-স্বরূপ। ভোক্তা যিনি তিনি পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম। জীব প্রকৃতির ভোক্তা নহে। প্রকৃতির ভোগসম্ভার স্বাভাবিক স্রোতে নিরন্তর পরম পুরুষের দিকে ধাবিত হইতেছে। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময় বাহ্য জগৎ হইতে উত্থিত হইয়া দেহস্থিত নাড়ী অবলম্বন-পূর্বক নিরন্তর ঊর্ধ্বমুখে সহস্রদল কমলের কলিকাস্থিত পরমপুরুষের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ তাহার দৃষ্টিতে পবিত্রীকৃত হইয়া অধোমুখে অথবা বহির্মুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। এই ব্রহ্মচক্রে আবর্তন নিরন্তর হইতেছে। কিন্তু তটস্থ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জীব আজ্ঞাচক্রে অবস্থানপূর্বক ঐ অধোমুখে সঞ্চালিত শুদ্ধ অমৃতধারা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ জীব ঊর্ধ্বমুখী হইয়া ঐ ধারাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয় ততক্ষণ ঐ প্রসাদরূপী ধারা তাহার ভোগে আসে না। সাধারণতঃ

জীব অধোদৃষ্টি সম্পন্ন। প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী আনন্দধারাকে সে মধ্য স্থান হইতে পূর্বে অপহরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভোক্তা সাজিয়া পরমেশ্বরের ভোগ্য বস্তুকে পরমেশ্বরে অর্পিত হইবার পূর্বেই নিজে উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই চৌর্য প্রকৃতির জন্য জীব নিরন্তর বদ্ধ হইয়া থাকে ইহার ফলে যে ভোগ্যবস্তু জীব প্রাপ্ত হয়, তাহা অশুদ্ধই থাকিয়া যায়। অশুদ্ধ ভোগ্যের ভোগকে উপভোগ বলে, ভোগ বলে না। কিন্তু যদি লোভদৃষ্টি ও তৃষ্ণা বর্জনপূর্বক অনাসক্ত-ভাবে ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া একমাত্র পরমপুরুষের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে ভোগ্য বস্তু না চাহিলেও পরমেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত আনন্দধারা সে স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রীভগবানের করুণা বা প্রসাদ। ইহা ভোগ করিলে তাহার ভোগতৃষ্ণা মিটিয়া যায় এবং পরমানন্দের আস্বাদন প্রাপ্তি ঘটে। ইহারই নাম প্রসাদ গ্রহণ। ইহাও অগ্নীষোম বিদ্যারই একটি অঙ্গ, অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিখিলাম। প্রয়োজন হইলে বিস্তারিত বিষয় পরে লিখিব।

যজ্ঞ রহস্য

পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অতীতকালে ভারতবর্ষে অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষি মুনিগণ নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়গণও আপন আপন অধিকার অনুরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। তখন সাধারণতঃ সকলে যজ্ঞকে লৌকিক এবং অলৌকিক সকল প্রকার ফলপ্রাপ্তির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য তখন আমাদের দেশ যজ্ঞের মহিমা সম্বন্ধে গাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল।[১]

কিন্তু কালবিপর্যয়ে যজ্ঞের তাৎপর্য ও রহস্য বর্তমান সময়ে অনেকেই অবগত নহেন। এক সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষিত সত্যরূপে সর্বত্র আদৃত হইত আজ তাহা সম্যক্ জ্ঞান এবং বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানের অভাবে একটি অর্থহীন আচাররূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন এবং প্রাচীন পরম্পরার পক্ষপাতী বলিয়া শ্রদ্ধালু তাঁহারাও যজ্ঞের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে মর্মজ্ঞ নহেন। তাই আজ যজ্ঞের বিজ্ঞান জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যজ্ঞের প্রতি অধিকাংশ স্থলে অনাদর এবং উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হইতেছে।

যজ্ঞ কাহাকে বলে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার ফলবত্তার ভিত্তি কোথায় — এই সব প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মনে স্বভাবতঃ উদিত হয়। ইহাদের সমাধানও শাস্ত্র হইতে হইয়া থাকে। কাত্যায়ন মুনি স্বরচিত শ্রৌতসূত্রে (১-২-২) দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগকে যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২] এই জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন। যে

১। গীতা (৪।৩১) বলিয়াছেন যে যজ্ঞহীনের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষে যে যে উপায় অবলম্বন করিতেন তন্মধ্যে স্বাধ্যায়, দান ও তপস্যার সঙ্গে যজ্ঞেরও উল্লেখ আছে—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন।" ছান্দোগ্যোপনিষদে যে তিনটি ধর্মস্কন্ধের উপদেশ আছে তন্মধ্যে যজ্ঞের বিশিষ্ট স্থান আছে।

২। ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র ইহারই অনুবর্তন করিয়া বলিয়াছেন—"দেবতামুদ্দিশ্য হবিরবমৃশ্য চ তদ্বিষয়সত্ত্বত্যাগ ইতি যাগশরীরম্।"

সকল সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় শক্তি ইহাকে সঞ্চালন করে ঋষিদিগের পরিভাষাতে তাহাদের নাম দেবতা — "দেবাধীনং জগৎ সর্বম্"। দেবতা সাকার কি নিরাকার তাহার নির্ণয়[৩] এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তবে ইহা সত্য যে দেবতা শক্তিস্বরূপ বলিয়া একদিকে স্বভাবতঃ নিরাকার হইলেও নিত্য সাকার, এবং অন্যদিকে সঙ্কল্পবশে এবং প্রয়োজনের অনুরোধে প্রকৃত আকারসম্পন্ন রূপেও প্রতীত হইয়া থাকেন। শক্তি যেমন মূলে এক হইলেও উপাধিভেদে নানাপ্রকার, এবং গুণবৈষম্য নিবন্ধন এই নানাত্বও বিচিত্র, তেমনি দেবতা এক এবং অভিন্ন হইলেও বাহ্যদৃষ্টিতে তাহার অবান্তর ভেদ অসংখ্য। "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি[৪] ইহা শ্রুতিরই (ঋঃ, সং, ১-১৬৪-৪৬) নির্দেশ। এই সকল ভেদ পারমার্থিক দৃষ্টিতে না থাকিলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে অসত্য নহে।

দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্রব্য অর্পণ করিবার নির্দিষ্ট বিধান আছে। এই দ্রব্যার্পণ এক দৃষ্টিতে দেখিলে দেবতাকে হবিঃ প্রভৃতি আহার্য সমর্পণ করা ভিন্ন অপর কিছু নহে। শক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দুই প্রকার। অব্যক্ত শক্তি দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয় না। কার্য সাধনের জন্য শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। যে শক্তি দ্বারা যে কার্য নিষ্পন্ন হয় সেই শক্তি জাগ্রৎ হইলে এবং ঠিক

৩। যাজ্ঞিকগণ ও বেদান্তদর্শন দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব (সাকারতা) স্বীকার করেন। ইহার অনুকূল যুক্তি বেদান্তদর্শনে দেবতা অধিকরণে শঙ্করভাষ্যে ও ভামতী প্রভৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৬-৩৩)। মীমাংসকগণ দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিয়া বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, এই মতভেদে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। যাস্ক দেবতার আকার চিন্তন প্রসঙ্গে দেবতা পুরুষবিধ (সাকার) ও অপুরুষবিধ (নিরাকার) এই উভয় পূর্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া "উভয়বিধ" নিজে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (নিরুক্ত ৭।৬।১-২ ; ৭।৭।১।৭)।

৪। নিরুক্ত মতে স্থানানুসারে মুখ্য দেবতার সংখ্যা তিন—পৃথিবী বা ভূলোকের দেবতা অগ্নি, অন্তরিক্ষ বা ভুবর্লোকের দেবতা বায়ু এবং দ্যুলোকের দেবতা সূর্য। অন্য সব দেবতা ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিরুক্তেই চরম সত্যের সন্ধানও দেওয়া হইয়াছে, এবং বৃহৎ দেবতাতে তাহারই সমর্থন আছে। এই মতে মুখ্য দেবতা এক ও অনন্ত—নানা রূপ তাঁহারই স্তুতি মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা একই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। ঋষিগণ একই প্রকৃতিকে নানারূপে স্তুতি করিয়াছেন। এক অগ্নির যেমন বহু স্ফুলিঙ্গ হয়, তদ্রূপ একই আত্মার বিভিন্ন প্রকার বিভূতি হইয়া থাকে।

ভাবে তাহার বিনিয়োগ হইলে স্বাভাবিক নিয়মে সেই কার্য অবশ্যই করিয়া থাকে। তাহার জন্য কোন বাহ্য নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয় না। কার্য করিলে শক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এই অপচয়ের পূরণ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শক্তির পুষ্টির জন্য তাহাতে আহার্য অর্পণ আবশ্যক হয়। যাহা প্রাপ্ত হইলে শক্তি পুষ্ট হইয়া নিজকে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় তাহাই শক্তির আহার। শক্তি নানা হইলেও যেমন তাহার উৎস বা মূলরূপ একই, তেমনি শক্তির আহার স্থূলতঃ বিভিন্ন হইলেও মূলে এক ও অভিন্ন। সুপ্ত শক্তি নিষ্ক্রিয় বলিয়া আহারের অপেক্ষা রাখে না, — কিন্তু উহা দ্বারা কার্যও সিদ্ধ হয় না। কার্য সাধন করিতে হইলে সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া উহাতে অনুরূপ আহার যোগাইয়া উহাকে সমর্থ করিতে হয়। তাহা না হইলে ঐ শক্তি কর্মক্ষম হয় না। ইহার নাম দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ।

শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞকে পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন বলা হইয়াছে। পুরাণে ঐ পাঁচ অঙ্গের নাম আছে — যথা, দেবতা, হবির্দ্রব্য, মন্ত্র, ঋত্বিক্, ও দক্ষিণা ঃ—

(১) দেবতা। এক আত্মার বিভিন্ন বিভূতিই দেবতা। কখনও কখনও দৃষ্টিভেদে দেবতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে — যথা, আজানজ দেবতা, কর্ম দেবতা ও আজান দেবতা। আজানজ ও কর্ম দেবতা কর্মফলের ভোক্তা। ইঁহারা দিব্যলোকে অবস্থান করিয়া কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু আজান দেবতা এরূপ নহেন। এই সকল দেবতা সৃষ্টির আদিকাল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা স্তুতি ও আহুতিতে তুষ্ট হন এবং যজ্ঞফল দান করেন। ইঁহারা দিব্য, সাকার ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন। সাধকের সাধনার যোগ্যতা থাকিলে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ দর্শনও সম্ভবপর হয়। সংস্কার, ব্রহ্মচর্যধারণ, স্বাধ্যায়, শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের অনুষ্ঠান, যোগাভ্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় দ্বারা দেবতার দর্শন লাভ ঘটে। অণিমাদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন যোগী যেমন একই সময়ে নানা শরীর ধারণ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ আজানসিদ্ধ দেবগণও ঐ প্রকার শক্তিসম্পন্ন। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, "একৈকা দেবতা বহুভী রূপৈরাত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু যাগেষু যুগপদঙ্গতাং গচ্ছতীতি, পরৈশ্চ ন দৃশ্যতে অন্তর্দ্ধানাদিক্রিয়াযোগাৎ" (ব্রহ্মসূত্র শারীরক ভাষ্য ১।৩।২৭)।

(২) হবির্দ্রব্য। ইহা আজান দেবতাদের উপজীব্য যজ্ঞের প্রদত্ত আহুতিদ্রব্য। একবারে হবির্দ্রব্যের যতটা অংশ দেবতাদিগকে অর্পণ করা হয় তাহাকে আহুতি বলে। আহুতি শব্দের প্রাচীন অর্থ আহ্বান বা আহূতি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইপ্রকার নির্দেশ আছে)। আহুতি দ্বারা যজমান দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন। আহুতি ফলপ্রাপ্তির পন্থা। একটিমাত্র হবিঃও যদি বিধিপূর্বক অর্পণ করা যায় তাহা হইলে দেবতা উহাকেই বহু মনে করেন ও তুষ্টি লাভ করেন। অগ্নিতে হবিঃ অর্পণ করা বস্তুতঃ দেবতার মুখেই অর্পণ করা। হবিঃ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃতরূপে পরিণত হয়। ইহাই যাজ্ঞিকগণের সিদ্ধান্ত।

(৩) মন্ত্র। শক্তিসম্পন্ন শব্দরাজি, যাহার প্রভাবে হবিঃ দেবতার নিকট ভোগ্যরূপে উপনীত হয়।

(৪) ঋত্বিক্। যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় তাঁহার নাম ঋত্বিক্।

(৫) দক্ষিণা। যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণকে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা দেওয়া হয় সেই দ্রব্যের নাম দক্ষিণা। কর্ম করাইয়া দক্ষিণা প্রদান না করিলে কর্ম পূর্ণভাবে ফল প্রসব করিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, দ্রব্য ত্যাগ করিবার ভার কাহার উপর ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই — ত্যাগরূপ কর্মের ফল যে আকাঙ্ক্ষা করে তাহারই উপর, অথবা ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও কর্তব্যবোধে যে ত্যাগ করে তাহারই উপর। কর্ম সকাম ও নিষ্কাম এই দুই প্রকার বলিয়া যজ্ঞও সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দুই প্রকার। স্বর্গকামী যেমন যজ্ঞ করিয়া তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অন্য কোন ফল কামনা করিয়া — কর্ম করিলেও ঐ ফলের প্রাপ্তি কামনাপূর্বক কর্ম-কর্তারই হইয়া থাকে। এইস্থলে কামনা বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ বুঝিতে হইবে। নিষ্কাম কর্মে এই জাতীয় ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। তবে নিজ কর্ম করিলেও ঐ কর্মের ফল নিজের না হইয়া অন্যের হউক এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে। জগতের কল্যাণ, সর্বজনের হিত ও সুখ, ইহাও কর্মফল — এই ফলের আকাঙ্ক্ষা নিষ্কাম কর্মকর্তারও থাকিতে পারে। ইহা কামনা হইলেও পরার্থ-কামনা বলিয়া কলুষিত নহে। বিষ্ণু-কামনা বা মোক্ষ-কামনা যেমন কামনারূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ কামনা নহে, তদ্রূপ অন্যের

মঙ্গলকামনা দ্বারা কর্মের নিষ্কামত্ব নষ্ট হয় না। সাক্ষাৎ ভাবে পরহিত আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শুধু কর্তব্যবোধে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধির অনুশাসনে অথবা ভগবৎ প্রেরণাতেও কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে। উহা নিষ্কাম কর্মের উচ্চতর আদর্শ। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা না করিলেও কর্ম কৃত হইলেই যথাসময়ে ফল প্রসব করিবেই। ঐ ফল ব্যক্তিগত ভাবে কর্মকর্তার ঈপ্সিত নহে বলিয়া উহা ব্যাপকরূপে সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। এই দুই প্রকার নিষ্কাম কর্মই যজ্ঞের প্রকৃষ্ট স্বরূপ। এই জাতীয় কর্মে বন্ধন ত হয়ই না, বরং যে বন্ধন পূর্ব হইতে আছে তাহাও শিথিল হয়। তাই গীতা বলিয়াছেন, "যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ" (৩-৯), অথবা "যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" (৪-২৩)।

দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞের ও ত্যজ্যমান দ্রব্যের অগ্নিতে প্রক্ষেপরূপ হোমের বিভিন্ন অবয়ব আছে। যে ত্যাগ করে, যাহা ত্যাগ করে, যাহা দ্বারা ত্যাগ করে, যাহার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করে এবং যাহাতে ত্যাগ করে — এই সবগুলিই ত্যাগ (ও হোম) ক্রিয়ার পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব। অমূর্ত ক্রিয়াকে মূর্তরূপ ধারণ করিতে হইলে এই সকল অবয়বের প্রত্যেকটির কার্যকারিতা যথাসম্ভব আবশ্যক হয়। যে ত্যাগ করে ও যে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে সে কর্তা অর্থাৎ যজমান ও তাহার প্রতিনিধি তৎপরিক্রীত অধ্বর্যু।[৫] যাহা ত্যাগ করে তাহা কর্ম। তাহা দেবতার ভোগ্য বস্তু বা হবিঃ প্রভৃতি। যাহা দ্বারা ত্যাগ অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে তাহা করণ। ইহা দুই প্রকার — হবিঃর প্রক্ষেপে ধারকরূপে সাধকতম করণ জুহূ প্রভৃতি, এবং প্রকাশরূপে সাধকতম করণ মন্ত্র প্রভৃতি। সেইজন্য করণ দুই প্রকার। যাহার উদ্দেশ্যে, যাহার প্রীতি বা তৃপ্তির জন্য, ত্যাগক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা সম্প্রদান অর্থাৎ দেবতা। যাহাতে, অর্থাৎ যাহাকে আধার করিয়া, হবিঃ প্রভৃতি অর্পণ করা হয়, তাহা অধিকরণ অর্থাৎ অগ্নি। দেশ কাল প্রভৃতিও এইপ্রকার অধিকরণ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে।

সকাম ও নিষ্কাম ভেদে কর্ম ভিন্ন বলিয়া যজ্ঞের স্বরূপও ভিন্ন। সকাম কর্মও কামনার নানাত্ব বশতঃ নানাপ্রকার। তৈলার্থী ও

৫। হবিঃ ত্যাগ ও অগ্নিতে প্রক্ষেপ, এই দুইটি ক্রিয়ার প্রথমটির কর্তা যজমান ও দ্বিতীয়টির কর্তা অধ্বর্যু।

নবনীতকামী উভয়ে সকাম হইলেও উভয়ের কর্ম এক প্রকার বলা চলে না। তৈলার্থীকে তৈল লাভের জন্য সর্ষপ প্রভৃতি পেষণ করিতে হয়, কিন্তু নবনীতার্থীর পক্ষে উহা মোটেই আবশ্যক হয় না। তাহার জন্য আবশ্যক দুগ্ধ বা দধির মন্থন। পুত্রেষ্টি ও কারীরী এক প্রয়োজন সাধন করে না।

নিত্যকর্মের ব্যক্তিগত ফলানুসন্ধান না থাকিলেও আনুষঙ্গিকভাবে ফলের উদয় হয় বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার বন্ধন আছে। নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা শুধু উর্ধ্বচিত্তের উর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয় তাহা নহে, উহা অধোগামী হয় ; পরিণামে দুঃখের উদয় হয়। ফলানুসন্ধান থাকে বলিয়া কাম্য কর্ম দ্বারাও চিত্ত মলিন হয়। কাম্য কর্মে (দুঃখমিশ্র) অনিত্য সুখের উদ্ভব হইলে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে[৬] ও আত্মজ্ঞানের পথ সাময়িক রুদ্ধ হয়। তাই শাস্ত্র বলেন, "নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া। মোক্ষার্থী ন প্রযতেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ ॥" এইজন্য বৌধায়ন স্বীয় ধর্মসূত্রে বলিয়াছেন যে অগ্ন্যাধেয় প্রভৃতি নিত্যকর্ম ক্ষেমপ্রাপক। বৈধভোগও ভোগ বটে, নিষিদ্ধ ভোগের ন্যায় তাহাতে পতন না ঘটিলেও সাক্ষাৎ ভাবে তাহা হইতে কোন সাহায্য লাভ হয় না। নিষিদ্ধ ভোগে ভোগ-বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। বৈধ ভোগে ভোগ দ্বারা ভোগবাসনা ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসে। এইজন্য শাস্ত্রে বহির্মুখ চিত্তের জন্য উহার বিধান আছে। কিন্তু যাহার চিত্ত বাহিরে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বিষয় ভোগের দোষ দর্শন করতঃ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য সাধারণ বৈধ কর্মেরও আবশ্যকতা থাকে না।

দুই

যজ্ঞের কথা বলিতে গেলে বৈদিক যুগের কর্মময় জীবনধারার একটি সুমধুর চিত্র হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। তাই প্রথমে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দান আবশ্যক মনে হইতেছে। বৈদিক

৬। কাম্যকর্মে যে চিত্তশুদ্ধি হয় না তাহা নহে। চিত্তশুদ্ধি অবশ্যই হয়, তবে তাহা ভোগের উপযোগী, জ্ঞানের উপযোগী নহে। আচার্য সুরেশ্বর স্বীয় বার্তিকে বলিয়াছেন—"কাম্যেঽপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সা।" তাই মধুসূদন বলিয়াছেন—"যদ্যপি কাম্যান্যপি শুদ্ধিমাদধাতি ধর্মত্বাভাব্যাৎ তথাপি সা তৎ ফলভোগোপযোগিন্যেব ন জ্ঞানোপযোগিনী" (গীতা ১৮।৬)।

যুগে আর্যজাতির সামাজিক জীবনে অগ্নিদেবতার স্থান অতি উচ্চ ছিল। তখন তিন বর্ণের মধ্যে ও তিন আশ্রমেই কোন না কোন আকারে অগ্নিপরিচর্যা ও অগ্নি উপাসন প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মচর্য অবস্থাতে ব্রহ্মচারীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে শুদ্ধস্থান হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া পঞ্চভূ-সংস্কার প্রক্রিয়াতে ভূমিসংস্কার পূর্বক ঐ অগ্নিতে সমিৎ আধান করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য-জীবনের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সমাবর্তন কাল পর্যন্ত এই নিয়ম পালন করিতে হইত। বিবাহের পর চতুর্থী কর্মান্তে[৭] শুভদিনে আধান করিয়া স্মার্তাগ্নি গ্রহণ করিতে হইত। সহোদর ভাই না থাকিলে ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। থাকিলে পিতার মৃত্যুর পর ধনবিভাগের সময় অগ্নি গ্রহণ আবশ্যক হইত। বৈবাহিক অগ্নি গ্রহণ না করিলে গৃহস্থ হওয়া যায় না। যে কোন কারণেই হউক কেহ অগ্নি গ্রহণ না করিলে তাহার অন্ন অপবিত্র বলিয়া অন্য লোকে গ্রহণ করিতে চাহিত না। তাহাকে "বৃথাপাক" বলিয়া সকলে নিন্দা করিত। কোন অনিবার্য হেতু-বশতঃ আধানের সময় আধান করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আধান করিতে হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই নিয়ম অবশ্য পালনীয় ছিল। অগ্নির আধান না করিলে আত্মশুদ্ধি হয় না বলিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা বা যাগকর্মে অধিকার জন্মে না। গৃহস্থধর্ম ভার্যার সহিত করণীয়। তাই আধানের সময়েও ভার্যার সাহচর্য আবশ্যক। গৃহস্থ আশ্রমে অগ্নির সেবাই মুখ্য উপাসনা। এই অগ্নির নামান্তর গৃহ্য বা আবসথ্য অগ্নি, অথবা পাকাগ্নি। এই অগ্নিতে স্মার্ত কর্ম সকল করিতে হইত। অন্নপাকাদিও এই অগ্নিতে করার বিধান ছিল। বিশিষ্ট লক্ষণসম্পন্ন বৈশ্যকুলাদি হইতে অথবা অরণিমন্থন করিয়া অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইত।

অরণিমন্থনের প্রণালী সাধারণতঃ জানা নাই বলিয়া এখানে বর্ণনা করা যাইতেছে। শমীগর্ভ অশ্বত্থবৃক্ষের পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ বা উর্ধ্বগামী শাখা পশ্চাৎ দিকে না তাকাইয়া ছেদনপূর্বক ঐ কাষ্ঠদ্বারা অধরারণি ও উত্তরারণি নির্মাণ করা হয়। শমীগর্ভ বৃক্ষ উপলব্ধ না না হইলে সাধারণ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা দ্বারাও উক্ত কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। অরণির দৈর্ঘ্য ২৪ অঙ্গুল, বিস্তার ৬ অঙ্গুল ও উৎসেধ

৭। চতুর্থী কর্মের পরেই পত্নীর ভার্যাত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া চতুর্থী কর্মান্তে আধানের বিধান আছে।

(উচ্চতা) ৪ অঙ্গুল। অরণিকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিলে শাস্ত্রানুসারে উহার ছয়টি বিভাগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগ ৪ অঙ্গুল — মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগ ৪ অঙ্গুল — গ্রীবা, বক্ষ ও হৃদয় ইহার অন্তর্গত। তৃতীয় বিভাগ ৬ অঙ্গুল — উদর, কটি ও বস্তি ইহার অন্তর্গত। চতুর্থ বিভাগ ২ অঙ্গুল — ইহাই গুহ্য প্রদেশ। এই বিভাগটি যাজ্ঞিকগণের নিকট "দেবযোনি" নামে পরিচিত। পঞ্চম বিভাগ ৪ অঙ্গুল — উরুদ্বয় ইহার অন্তর্ভুক্ত। ষষ্ঠ বিভাগে জঙ্ঘাদ্বয় ও পাদদ্বয় সন্নিবিষ্ট। ইহার প্রমাণ ৪ অঙ্গুল মাত্র। চতুর্থ বিভাগের অন্তর্গত দুই অঙ্গুল যোনিস্থান মন্থন করিয়া অগ্নিকে উদ্দীপন করিতে হয়। এই স্থান হইতে উদ্ভূত বহ্নি কল্যাণকর। এই স্থানগত নিয়ম প্রথম মন্থনের জন্য জানিতে হইবে। পরবর্তী মন্থনের সময় স্থানবিশেষের অর্থাৎ দেবযোনি বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। অগ্নিমন্থন কার্যে প্রমন্থ, চাত্র, ওবিলী, নেত্র প্রভৃতি উপকরণ-যন্ত্র আবশ্যক হয়।[৮] এই অগ্নিকে যাবজ্জীবন যত্নের সহিত রক্ষা করা গৃহস্থের কর্তব্য। ইহার কুণ্ডটি বৃত্তাকার হওয়া আবশ্যক। যদি কাহাকেও সস্ত্রীক বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে হয় তবে তাহাকে এই অগ্নি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। সস্ত্রীক না যাইয়া একাকী বনে গমন করিলে যাওয়ার পূর্বে অগ্নি বিসর্জন করিতে হয়। অগ্নিতে এই উপাসন হোম প্রভৃতি আত্মসংস্কারসাধক পাক-যজ্ঞ সকল করার নিয়ম আছে। এই অগ্নি নিজের আয়তন হইতে উঠাইয়া বাহিরে নিয়া যাওয়ার আদেশ নাই। পুত্রাদির উপনয়নাদি সংস্কার বা শান্তি পৌষ্টিকাদি কর্ম — যাহা বহিঃশালাতে করণীয় — লৌকিক অগ্নিতেই করা উচিত।

৮। চাত্র—যে কাষ্ঠে রজ্জু বেষ্টন করিয়া মন্থন করা হয় তাহার নাম চাত্র। ইহার পরিমাণ ১২ অঙ্গুল। ওবিলী=চাত্রের উপরে চাত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড প্রদত্ত হয় তাহার নাম ওবিলী। ইহার পরিমাণ ১২ অঙ্গুল।

নেত্র=মন্থন রজ্জু। ইহা শণ ও গোবাল দ্বারা নির্মিত হয়।

প্রমন্থ=অগ্নি মন্থনের জন্য চাত্রের অধোভাগে উত্তর অরণি কাষ্ঠ হইতে পৃথক্‌কৃত যে ৮ অঙ্গুলি পরিমাণ শঙ্কু লাগান হয় তাহার নাম প্রমন্থ। অধোভাগে প্রমন্থকাষ্ঠ-সম্বদ্ধ চাত্রের উপর ওবিলী স্থাপন করিয়া চাত্রকে অধর অরণিস্থ 'দেবযোনি' স্থানে রাখিয়া নেত্র দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিয়া প্রমন্থন করিতে হয়। মন্থনকালে অরণি শুধু ভূমির উপর না রাখিয়া সংস্কৃত ভূমিতে কৃষ্ণসার মৃগের চর্মের উপর রক্ষা করার নিয়ম আছে।

ঔপাসন হোম, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অষ্টকা, মাসিক শ্রাদ্ধ, শ্রবণা, শূলগব — এই সকল কর্ম পাকযজ্ঞের অন্তর্গত। ঔপাসন হোমটি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে সায়ংকালের ও প্রাতঃকালের দুইটি হোম পৃথক্ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুইটি মিলিয়া একই অভিন্ন কর্ম সিদ্ধ হয়; কারণ উভয়ের সংযোগে একটি ফলেরই উৎপত্তি হয়। এইজন্য এই দুইটির মধ্যে কোন একটি করিয়া অপরটি বর্জন করিলে নির্দিষ্ট ফল লাভ হয় না। সায়ং হইতে প্রাতঃ পর্যন্ত এই কর্মটির বিস্তার। দধিযুক্ত তণ্ডুল অথবা অক্ষত দ্বারা হাতে করিয়া হোম করিবার বিধান আছে। সায়ংকালের প্রধান দেবতা অগ্নি, অঙ্গ দেবতা প্রজাপতি। প্রাতে প্রধান দেবতা সূর্য, অঙ্গ দেবতা অগ্নি। এই কর্মটি যাবজ্জীবন সপত্নীক করিতে হয়। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

পক্ষাদি কর্ম। 'পক্ষাদি' বলিতে যদিও প্রতিপৎ বুঝায়, তথাপি "সন্ধিমভিতো যজেত" অর্থাৎ 'সন্ধির পূর্বে ও পরে যজন করিবে' এই নিয়মানুসারে বিশেষজ্ঞগণ পর্বের (অমাবস্যা-পূর্ণিমার) চতুর্থাংশ ও প্রতিপদের প্রথম তিন অংশ যাগকাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চতুর্থাংশও যাগকাল জানিতে হইবে।

বৈশ্বদেব কর্ম। ইহা দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ নামক পঞ্চ মহাযজ্ঞের নামান্তর। গৃহস্থের প্রক্ষে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রতিদিনের অবশ্য-কর্তব্য কর্মের অন্তর্গত। ইহার প্রভাবে গৃহস্থজীবনের সহভাবী পাঁচ প্রকার অনিবার্য হিংসা জন্য পাপ স্খলিত হয়। চুল্লী, পেষণী প্রভৃতি পাঁচটি গৃহস্থের সূনা বা হিংসা-নিদান স্থান। গার্হস্থ্য জীবনের সহিত সংসৃষ্ট এই অবশ্যম্ভাবী পাপ হইতে মুক্তির জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা। পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বিশ্বের প্রাণিবর্গের সেবা। ঊর্ধ্বে দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোক, মধ্যে মনুষ্যলোক এবং নীচে ইতরপ্রাণী বা তির্যগাদি জীবলোক — এই পাঁচ শ্রেণীতে জগতের যাবতীয় প্রাণী অন্তর্ভুক্ত[৯]। দেবতার উদ্দেশ্যে নিত্যহোম দেবতার তৃপ্তি সাধন করে। ইহাই দেবযজ্ঞ। মনুষ্যেতর জীবকে বলিদান বা আহার্য প্রদান — ইহাই ভূতযজ্ঞ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকাদি এবং পৃথিবী, বায়ু

৯। সমস্ত বিশ্বের প্রাণীগণকে স্মরণ করিয়া যথাশক্তি অন্নাদি দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তিবিধান বা সেবা করার ভাবটি পারস্কর মহাযজ্ঞের প্রাণ।

ও জলের দেবতাবর্গ, ওষধি, বনস্পতির অভিমানী জীব, মনুষ্যদেবতা, আকাশস্থ কাম দেবতা প্রভৃতি এই ভূতযজ্ঞে আপ্যায়িত হইয়া থাকে। পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য নিত্যই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে যে বলি প্রদান তাহাই পিতৃযজ্ঞ পদবাচ্য। অন্য কিছু দিতে না পারিলে "পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া অন্ততঃ জলপাত্র দানের ব্যবস্থা আছে (দ্রষ্টব্য বৌধায়ন)। নিত্য অতিথি সেবা ও ব্রাহ্মণকে অন্ন বা ফলমূলাদি দান ইহা মনুষ্যযজ্ঞ। আপস্তম্ব মতে প্রতিদিন মনুষ্যকে যথাশক্তি দান করাও মনুষ্যযজ্ঞের অন্তর্গত। নিত্য স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ, অন্ততঃ প্রতি বেদের প্রথম মন্ত্র পাঠ, তদভাবে প্রণবের জপ — ইহাই ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ নামে পরিচিত। এই বেদপাঠে কোনদিন কোন কারণে অনধ্যায় হইতে পারে না। প্রাচীন কালে এই অখণ্ড বেদ পাঠকে "ব্রহ্মসত্র" বলিয়া মনে করা হইত।

পার্বণ। ইহা ছয় পুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতি অমাবস্যাতে করণীয় নিত্যকর্ম।

অষ্টকাশ্রাদ্ধ। হেমন্ত ও শিশির এই দুই ঋতুর চারি মাসে প্রতি কৃষ্ণাষ্টমীতে ইহা করণীয়। ইহা অবশ্য কর্তব্য হইলেও কোন কোন শাখাতে বিশেষ কারণ বশতঃ লুপ্ত হইয়াছে।

মাসিক শ্রাদ্ধ। ইহা প্রতিমাসে করণীয়।

শ্রবণা কর্ম। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সর্পদিগকে ঘৃতাক্ত সক্তু বলিদান করিতে হয়। ইহার নাম শ্রবণা কর্ম।

পারস্কর গৃহ্য সূত্রের ভাষ্যকার হরিহর কর্তৃক উদ্ধৃত নিম্নলিখিত দুইটি পদ্যে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাশ্চ যক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া প্রদত্তং
তেষামিদং, তে মুদিতা ভবন্তু॥

অনুবাদ অনাবশ্যক। ইহাতে দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা ও বৃক্ষ পর্যন্ত জীবের নাম করা হইয়াছে।

শূলগব। এই কর্মের দেবতা ঈশান ও দ্রব্য গো। কলিযুগে ইহা নিষিদ্ধ। ইহার পরিবর্তে কোন কোন শাখাতে স্থালীপাকের ব্যবস্থা আছে।

পূর্বে যে সকল কর্মের নাম বলা হইল এইগুলি গৃহ্য কর্ম এবং গৃহ্য অগ্নিতে করণীয়।

শ্রৌত কর্ম গৃহ্য কর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঐ সকল কর্ম গৃহ্য অগ্নিতে করাও চলে না। উহাদের জন্য শ্রৌত অগ্নির আধান আবশ্যক হয়। শ্রৌত অগ্নি তিন প্রকার — আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি। এক দিনেই তিনটি অগ্নির স্থাপনা হয়। প্রতি অগ্নির কুণ্ড ভিন্ন আকারের হয়। আহবনীয়ের কুণ্ড চতুরস্র, গার্হপত্যের বৃত্তাকার ও দক্ষিণাগ্নির অর্দ্ধচন্দ্রাকার। গার্হপত্য অগ্নি সাধারণতঃ হবিঃপাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। পত্নীসংযাজাদি যাগও উহাতে করিতে হয়। দক্ষিণাগ্নিতে সাধারণতঃ পিতৃকর্ম করার ব্যবস্থা আছে। আহবনীয়ই মুখ্য যজ্ঞাগ্নি। মুখ্য শ্রৌত (গার্হপত্য) অগ্নিকে স্মার্ত অগ্নির ন্যায় যাবজ্জীবন সংরক্ষণ করিতে হয়। কোন বিশেষ কারণবশতঃ মধ্যে অগ্নির বিচ্ছেদ ঘটিলে পুনর্বার বিধিপূর্বক আধান করিয়া ঐ অগ্নিকে জাগাইয়া লইতে হয়। পিতা জীবিত থাকিলে ও আহিতাগ্নি হইলেই পুত্রের আধানে অধিকার জন্মে। পিতার পরে পুত্রের অধিকার ত স্বতঃসিদ্ধ। শ্রৌত কর্মে তিন অগ্নিরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু স্মার্ত কর্মে একমাত্র গৃহ্যাগ্নি আবশ্যক হয়। সভ্যাগ্নি এই অগ্নিচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন পঞ্চম অগ্নি। অবশ্য শ্রৌত সূত্রেই ইহার বিধান আছে। ইহাকে সভা মণ্ডপে স্থাপন করিয়া রাখা হয় বলিয়া ইহার নাম সভ্য অগ্নি। প্রত্যেক অগ্নির আয়তন পৃথক্ পৃথক্।

শ্রৌত কর্ম হবিঃসংস্থা ও সোমসংস্থা — এই দুই প্রকার। প্রথমটির মধ্যে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়-পশুবন্ধ ও দর্বীহোম (পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি) অন্তর্গত। দর্শ ও পূর্ণ-মাসকে পৃথক্ যাগরূপে গণনা না করিলে সৌত্রামণীকে সংস্থার অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করিতে হইবে। দ্বিতীয় সংস্থার মধ্যে আছে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম।

আধানসিদ্ধ বৈতালিক অগ্নিসমূহে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নিহোত্র এমন একটি হোমের নাম যাহা অগ্নিকে উদ্দেশ্য

করিয়া সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে করা হইয়া থাকে। ইহাতে গোদুগ্ধ, যবাগূ, তণ্ডুল, দধি, ঘৃত প্রভৃতি নানা দ্রব্যের বিধান আছে। সায়ংকালে অগ্নি মুখ্য দেবতা, কিন্তু প্রাতঃকালে সূর্য মুখ্য দেবতা। এই শ্রৌত কর্মটিই প্রকৃত অগ্নিহোত্র। অনেকে স্মার্ত ঔপাসন হোমকে অগ্নিহোত্র মনে করেন। তাহা ঠিক নহে। অগ্নিহোত্র অতি প্রশস্ত কর্ম ও অবশ্য কর্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। পরম সঙ্কট কালেও ইহা ত্যাগ করা চলে না। দর্শপূর্ণমাসাদি না করিলেও চলে, কিন্তু অগ্নিহোত্র করিতেই হয়। সম্ভবপর হইলে এই কর্মটি যজমানের নিজেরই করা উচিত। অশক্ত হইলে ঋত্বিক্ দ্বারা প্রতিনিধিরূপে করাইবার ব্যবস্থা আছে।

দর্শপূর্ণমাস। ইহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কর্তব্য। আধানের পর অমাবস্যা পড়িলেও তখন না করিয়া পরবর্তী পূর্ণিমাতে ইষ্টি আরম্ভ করিাত হয়। দর্শেষ্টি তার পরেই হয়। ইহাতে সপত্নীক যজমান ও চারিটি ঋত্বিক্ আবশ্যক হয় — যথা অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, হোতা ও অগ্নীধ্র। দর্শ-পূর্ণমাসের ছয়টি যাগ যাবতীয় ইষ্টির প্রকৃতি বা আদর্শ, ইষ্টি সকল বিকৃতি, প্রকৃতিতে প্রয়োজনীয় সকল অঙ্গের উপদেশ থাকে, কিন্তু বিকৃতিতে তাহা থাকে না, ইহাও যাবজ্জীবন করণীয়। অসমর্থ পক্ষে অন্ততঃ ৩০ বৎসর করা উচিত। এই যাগে বহু পদার্থের অনুষ্ঠান হয়।

চাতুর্মাস্য। ইহাতে চারিটি পর্ব আছে — (১) বলি বৈশ্বদেব — ফাল্গুন পূর্ণিমাতে (২) বরুণ প্রঘাস — আষাঢ় পূর্ণিমাতে, (৩) পাকমেধা — কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে এবং (৪) শুনাসীরীয় — ফাগুনের শুক্ল প্রতিপদে অনুষ্ঠেয়। চাতুর্মাস্য যাবজ্জীবন করা চলে নতুবা একবার মাত্র করিয়া তাহার পর পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি করা যায়। যে যাবজ্জীবন করিতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য প্রতি বৎসরই ইহা করণীয়। ঐষ্টিক, পাশু ও সৌমিক ভেদে চাতুর্মাস্য তিন প্রকার। (বিস্তারিত কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

নিরূঢ় পশুবন্ধ। ইহা প্রতি বৎসরে বর্ষা কালে করণীয়।

আগ্রয়ণেষ্টি বা নবান্ন ইষ্টি। নবীন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পর ইহা করিতে হয়। আহিতাগ্নি (অর্থাৎ যে অগ্নির আধান করিয়াছে) এই ইষ্টি দ্বারা যাগ করিয়া নবান্ন গ্রহণ করে। যে আহিতাগ্নি নহে ও ঔপাসনিক সে গৃহ্যসূত্রের ক্রম অনুসারে ইহার অনুষ্ঠান করে।

সৌত্রামণী। ইহা একটি পশু যাগ। স্বতন্ত্র ও অঙ্গভূত, এই দুই প্রকার পশুযাগের বিবরণ পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র যাগে একমাত্র ব্রাহ্মণ অধিকারী। ইহা নিত্য, কার্য এবং নৈমিত্তিক ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে। এই যাগে হোমের জন্য গোদুগ্ধের সহিত সুরারও বিধান আছে। পয়োগ্রহ ও সুরাগ্রহের মধ্যে সুরাগ্রহের দেবতা সূত্রামণি তাই এই যাগের নাম 'সৌত্রামণী' হইয়াছে। কলিতে সুরা নিষিদ্ধ বলিয়া নিন্দিত, কোন কোন আচার্য তাহার পরিবর্তে পয়োগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সৌত্রামণী যাগ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া করিলে নিত্য কর্মের অন্তর্গত ও হবির্যজ্ঞের প্রভারভেদ মাত্র। ইহা ঐশ্বর্য ("ঋদ্ধি") আকাঙ্ক্ষাতে কৃত হইলে কাম্যরূপে পরিগণিত হয়। সোমবমন প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ অনুষ্ঠিত হইলে ইহা নৈমিত্তিক নামে পরিচিত হয়। সৌত্রামণীতে তিন অথবা পাঁচটি পশুর বিধান আছে। আপস্তম্ব মতে ত্রিপশুকা সৌত্রামণী নিত্যা, পঞ্চপশুকা সৌত্রামণীকে 'কোকিল সৌত্রামণী' বলে। কাত্যায়ন মতে পঞ্চপশুকা নিত্যা 'চরণ সৌত্রামণী' নামক একটি সৌত্রামণী যাগ আছে, তাহা রাজসূয়ের অন্তর্গত।

সোমযাগ। এবার সোমযাগের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। ইহার নামান্তর অগ্নিষ্টোম। প্রাচীন কালে সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিয়া উহা দ্বারা হোম করা হইত। এইজন্য ইহার নাম সোমযাগ। বর্তমান সময়ে ঐ লতা অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া উহার পরিবর্তে পূতীকার ব্যবহার করা হয়। এই যাগ একদিনেই সম্পন্ন হইতে পারে। তবে অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান করিতে হইলে পাঁচদিন আবশ্যক হয়। এই যাগে ১৬টি ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। ইহারা অধ্বর্যুগণ (যজুর্বেদীয়), ব্রহ্মগণ (অথর্ববেদীয়), হোতৃগণ (ঋগ্বেদীয়) এবং উদ্গাতৃগণ (সামবেদীয়), এই গণচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রতি গণে চারিটি করিয়া ঋত্বিক্ থাকে। এই চারিটি গণ ক্রমশঃ যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ ও সামবেদের প্রতিনিধিস্বরূপ। সোমযাগে তিনটি বেদের সহিতই সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। মূলে এই যাগে চারিটি সংস্থা আছে — যথা অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র। এই চারিটি হইতে আরও তিনটি সংস্থার উদ্ভব হয় — যথা অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও আপ্তোর্যাম। স্মৃতি মতে এই চারিটি সংস্থাই নিত্য। পাঁচ দিনের কোন্ দিন কোন্ কর্ম করিতে হইবে তাহা শ্রৌতসূত্রে নির্দিষ্ট আছে।

বাজপেয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্র ইহার অধিকারী। সপ্ত সংস্থার অন্তর্গত বাজপেয়ে বৈশ্যেরও অধিকার আছে। এই কর্ম শরৎকালে করিতে হয়। সৌত্রামণীর ন্যায় বাজপেয়েও সুরা হোমের বিধান আছে; কিন্তু উহা কলিতে বর্জনীয়। যাজ্ঞিকগণ সোমসুরা স্থলে তাম্র পাত্রে গোদুগ্ধ সহ সোমরসের ব্যবহার করেন, কারণ গোদুগ্ধ তাম্র পাত্রে রক্ষা করিলে সুরাসদৃশ হয়।

রাজসূয়। ইহাতে রাজপদে অভিষিক্ত একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই অধিকার। ইষ্টি, পশুযাগ ও সোমযাগ তিনই ইহাতে সমপ্রধান ভাবে বিদ্যমান।

অশ্বমেধ। ইহাও একপ্রকার সোমযাগ। পবনীয় পশু অশ্ব বলিয়া ইহার নাম অশ্বমেধ হইয়াছে। অভিষিক্ত সার্বভৌম রাজা ইহার অধিকারী। ফাল্গুন মাসে শুক্লাষ্টমী বা নবমী তিথিতে ইহা আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে হোতাকে পূর্বদিকের উৎপন্ন দ্রব্য, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্‌কার বস্তু, অধ্বর্যুকে পশ্চিমদিক্‌কার বস্তু ও উদ্‌গাতাকে উত্তরদিক্‌কার বস্তু দক্ষিণাস্বরূপ দিতে হয়। কিন্তু ভূমি, পুরুষ ও ব্রাহ্মণসম্পত্তি দক্ষিণাতে বর্জনীয়।

পুরুষমেধ, সর্বমেধ, পিতৃমেধ প্রভৃতি যাগের কথাও ঋষিগ্রন্থে পাওয়া যায়। যে "অতিষ্ঠা" বা সর্বভূমি অতিক্রমকারিণী স্থিতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য পুরুষমেধ যজ্ঞের বিধান। ইহা ৪০ দিনে সম্পন্ন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহার অধিকারী। যজ্ঞ-দক্ষিণা ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বস্ব; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রায় অশ্বমেধতুল্য। তবে অশ্বমেধে পুরুষকে দক্ষিণার অযোগ্য বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, কিন্তু পুরুষমেধে পুরুষও দক্ষিণাদ্রব্যের অন্তর্গত। যিনি পুরুষমেধ করেন তিনি সাধারণতঃ আত্মাতে অগ্নির সমারোপণ করিয়া সূর্যোপ-স্থান পূর্বক অরণ্যে গমন করেন, আর গৃহে ফিরিয়া আসেন না। তবে যদি গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অগ্নির সমারোপণ আত্মাতে না করিয়া অরণিদ্বয়ে করিতে হয়। কারণ আত্মাতে অগ্নি আরোপণ করিলে আর গৃহস্থজীবন চলে না। সর্বমেধ যজ্ঞ সর্বকামের জন্য বিহিত হইয়াছে। পিতৃমেধ মৃত পিতার মৃত্যুবৎসর স্মরণ না থাকিলে করিতে হয়।

দিন হিসাবে যজ্ঞের আরও কিছু ভেদ আছে। যে সব যাগ এক দিনে সম্পূর্ণ হয় তাহাদিগকে একাহ বলে। যেগুলি সম্পন্ন করিতে

দুইদিন হইতে এগার দিন আবশ্যক হয় সেইগুলির নাম অহীন। তেরদিন হইতে সহস্র সংবৎসর পর্যন্ত ব্যাপিয়া যে যাগের অনুষ্ঠান হয় তাহার সাধারণ নাম সত্র। দ্বাদশাহটি অহীন ও সত্র উভয়াত্মক।

তিন

তান্ত্রিক হোমের স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক যাগের যেমন মন্ত্রাদিজন্য সংস্কার দ্বারা সাধারণ অগ্নিকে দিব্য অগ্নিতে পরিণত করা হয় এবং ঐ দিব্য অগ্নিতে আত্মসংস্কার-সাধক ও অন্যান্য যাগাদি কর্ম সম্পাদন করিতে হয়, ঠিক সেই প্রকার তান্ত্রিক হোমের ব্যাপারও জানিতে হইবে। বাহ্য অগ্নি সংস্কারাদির প্রভাবে হোমাগ্নি ও ইষ্টাগ্নির মধ্য দিয়া কি প্রকারে ব্রহ্মাগ্নি পর্যন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হয় তাহার ক্রমটি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অরণিদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উৎপাদন করিয়া অথবা অন্য শাস্ত্রীয় উপায়ে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া উহাকে পাত্রবিশেষে স্থাপন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা বাহ্য অগ্নি মাত্র। তথাপি সাধারণ অগ্নি হইতে উৎকৃষ্ট। এই অগ্নির সঙ্গে আংশিক ভাবে অশুদ্ধ ক্রব্যাদ অগ্নি মিশ্রিত থাকে। উহাকে অপসারণ করিয়া নিরীক্ষণ, প্রোক্ষণ, তাড়ন, অবগুণ্ঠন ও অমৃতীকরণ, এই পঞ্চবিধ উপায়ে বাহ্য অগ্নিকে শোধন করিতে হয়। পরে ভাবনা দ্বারা মূলাধার হইতে সুষুম্না পথে উদ্‌গত চৈতন্যরূপ অগ্নিকে তৃতীয় নেত্র দ্বারা নির্গত করিয়া উহাকে শুদ্ধ বাহ্যাগ্নির সঙ্গে যুক্ত করিয়া ঐ যুক্ত অগ্নিকে শিববীর্য রূপে দেবীগর্ভাত্মক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই ব্যাপারটি বাগীশ্বরী গর্ভে বাগীশ্বর বীজের নিষেকের অনুকল্প বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার পর ইন্ধন দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক উপস্থাপন, উত্থাপন ও প্রজ্বলন করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা করিতে হয়, ইহাই বাগীশ্বরী-গর্ভে অগ্নির ধারণ ও পোষণ। এই পর্যন্ত কর্ম সিদ্ধ হইলে ভাবনা দ্বারা অগ্নিদেবের পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও জাতকর্ম সংস্কার করিয়া নামকরণ করিতে হয়। নামকরণ সংস্কারের পূর্ব পর্যন্ত অগ্নিটিকে 'হোমাগ্নি' বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু নামকরণের দ্বারা 'হোমাগ্নি' ইষ্টাগ্নি-রূপ ধারণ করে। উপাস্যদেবতার নাম অনুসারে অগ্নির নামকরণ হইয়া থাকে — যেমন ললিতা উপাসকের অগ্নি ললিতাগ্নি ইত্যাদি। ইহার পর ভাবনা দ্বারাই বিবাহ পর্যন্ত অগ্নির পরবর্তী সংস্কার

সকল সম্পাদন করিতে হয় পরে পরিষেচন, পরিস্তরণ প্রভৃতি কর্মান্তে হবনের পূর্বে হবন দ্রব্য অনুসারে অগ্নিদেবের ধ্যান আবশ্যক। সমিৎকাষ্ঠ দ্বারা হোম দ্বারা হোম করিতে হইলে অগ্নিকে দণ্ডায়মান-রূপে ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু আজ্য হোমের সময় অগ্নিকে দণ্ডায়-মানরূপে চিন্তা না করিয়া উপবিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হয়। ধ্যানের পর অগ্নিকে মনে মনে শুভালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া স্রুক্ দ্বারা তাঁহার জিহ্বাতে আহুতি অর্পণ করিতে হয়। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা — তাহাদের প্রত্যেকটিতেই আহুতি দিতে হয়, অথবা প্রয়োজন অনুসারে কোন বিশিষ্ট জিহ্বাতে দিতে হয়। এক একটি জিহ্বা এক এক দিকে প্রসারিত। তদনুসারে ছয়টি জিহ্বার বিস্তার ছয় দিকে রহিয়াছে। মধ্যে আছে একটি। ঈশান, পূর্ব ও অগ্নিতে তিনটি এবং বিপরীত দিকে নৈর্ঋত, পশ্চিম ও বায়ুতে তিনটি। এই ছয় জিহ্বার নাম ক্রমশঃ হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা ও অতিরক্তা।[১০] উত্তর-দক্ষিণে জিহ্বা নাই। যেটি মধ্যে আছে সেইটিই উত্তর-দক্ষিণে আয়ত। এই মধ্যস্থ জিহ্বাটির নাম 'বহুরূপা'। ইহাতে আহুতি দিলে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়, এইরূপ নির্দেশ আছে। এই জিহ্বাটিতে ইষ্টস্বরূপা জগজ্জননীকে আবাহন করিয়া পূজান্তে অঙ্গদেবী, নিত্যা, ওঘত্রয় (অর্থাৎ দিব্য, সিদ্ধ ও মানব এই তিন প্রকার গুরুবর্গ), আবরণ দেবতা ও যজ্ঞেশ্বরী সকলকে নিষ্কামভাবে আহুতি দিতে হয়।

১০। সংস্কার রত্নমালাতে উদ্ধৃত বচনেও এই সাতটি নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে, 'হিরণ্যা' স্থলে 'সুবর্ণা' শব্দ আছে, ইহাই বিশেষ। তবে তাহাতে জিহ্বার সন্নিবেশ একটু ভিন্ন প্রকার। গৃহ্য সংগ্রহে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে অগ্নির সাতটি জিহ্বার নাম এই প্রকার-কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধর্মবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও শুচিস্মিতা (গৃঃ সং)। পৌরাণিক মতে বিশ্বা, প্রাণীদিগের সর্বদা মঙ্গলকারিণী। ভবিষ্য পুরাণে যে সকল অগ্নিজিহ্বার নাম আছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রথম নাম-সপ্তকের সহিত ও অপর কতকগুলি দ্বিতীয় সপ্তকের সহিত অভিন্ন। তন্ত্র সংগ্রহে আর একটি নামাবলী পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ—করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, মহালোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগ। প্রথম ছয়টিকে ভোগ করে যথাক্রমে রাক্ষস, অসুর, নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব ও যম। সপ্তমটি 'পদ্মরাগা' অথবা দিব্য জিহ্বা। উহাতেই হোম করিতে হয়। "তস্যাং তু হোময়েৎ নিত্যং সুসমিদ্ধে হুতাশনে." 'পদ্মরাগা'র নাম ভবিষ্যপুরাণোক্ত নামাবলীতেও আছে।

প্রধান দেবতার আহুতি ইহার পরে বিহিত আছে। এই প্রকার আরতি প্রদানের পর মহাব্যাহৃতি হোম ব্যস্ত-সমস্তভাবে সমাপন করিয়া ব্রহ্মার্পণ আহুতিতে পরব্রহ্মে স্থিতি নিতে হয়।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, চিদগ্নি কর্মীর শরীর হইতে উত্থিত হইয়া বাহ্যাগ্নিতে যুক্ত না হইলে বাহ্যাগ্নি যতই শুদ্ধ হউক না কেন হোমাগ্নির কার্য করিতে পারে না। অবশ্য চিদগ্নি সঞ্চারের পূর্বে বাহ্যাগ্নিকে শুদ্ধ করা আবশ্যক। মূর্তি রচনা করিয়া যেমন তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবেই ঐ মূর্তি অবলম্বন করিয়া অর্চকের অর্চনাদি সফল হয়, তদ্রূপ বাহ্যাগ্নিতেও ভিতর হইতে চিদগ্নির সঞ্চার না হইলে ঐ অগ্নিতে যাগক্রিয়া চলিতে পারে না। অবশ্য এই সব প্রক্রিয়া সাধারণ অবস্থায় ভাবনা দ্বারাই করিতে হয়; কিন্তু ভাবনাও ঠিক ভাবে করিতে হইলে উচ্চাঙ্গের যোগকর্মে অধিকার থাকা আবশ্যক।

হোমাগ্নি চেতন বা প্রাণময়। প্রথমে কায়া রচনা করিয়া তারপর উহার সংস্কার করিয়া পরে তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করিতে হয়। ইহার পর চেতন অগ্নি দিব্যভাবে উন্নীত হয়, যাহার ফলে ঐ অগ্নিই পরাশক্তির বাহ্যস্ফুরণ রূপে প্রতীতি-গোচর হয়। পরে উহাকে ব্রহ্মাগ্নিরূপে অনুভব করিয়া ব্রহ্মার্পণ কার্য সম্পন্ন করিতে হয়।

তান্ত্রিক যাগ প্রসঙ্গে ছয় প্রকার কুলযাগের কথা এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই ছয় যাগের প্রথমটি বাহ্য স্থণ্ডিলাদি অবলম্বনে সিদ্ধ হয় এবং ষষ্ঠটি আত্মচৈতন্যরূপ সংবিৎকে আশ্রয় করিয়া করিতে হয়। জড় হইতে চৈতন্যে ক্রমবিকাশের মার্গটি মধ্যবর্তী চারিটি যাগে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ছয়টি যাগের পূর্বটি অপেক্ষা পরবর্তীটি শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে সংবিদে যে যাগটী নিষ্পন্ন হয় — তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারও একটি উত্তর অবস্থা আছে, তখন গুরু-শরীরকে আশ্রয় করিয়া যাগটি নিষ্পন্ন হয়। ইহা এক হিসাবে সপ্তম যাগ বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই সকল যাগের বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

চার

এবার আমরা ক্রমশঃ যজ্ঞের অন্তরঙ্গ ভাবটি ধারণা করিতে চেষ্টা করিব। গীতাতে (৪-২৫-৩০) শ্রীভগবান বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ঐ সকল যজ্ঞের সবগুলিতেই একই আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে লক্ষ্যের আপেক্ষিক স্পষ্টতা অথবা অস্পষ্টতা বশতঃ তারতম্য বোধ হয়। অন্য প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন (গীতা ১০-২৫) যে নানাপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে তিনি 'জপযজ্ঞ' স্বরূপ। শাস্ত্রে অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে যাবতীয় কর্মকাণ্ড, দান ও তপস্যা মিলিত হইলেও জপযজ্ঞের ষোল-কলার এক কলারও সমান হয় না। জপ, বিশেষতঃ মানস জপ, অতিশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্মসূত্রকার বৌধায়ন বলিয়াছেন, "সর্বক্রতুযাজিনাম্ আত্মযাজী বিশিষ্যতে", অর্থাৎ সকল প্রকার যজ্ঞ হইতে আত্মযোগই শ্রেষ্ঠ।[১১] মানস জপ ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আত্মযোগে পরিণত হয়। তাই ইহার এত মহিমা।

যজ্ঞ বলিতে কর্ম বুঝায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কোন কর্মকে বস্তুতঃ যজ্ঞ বলা চলে না। কাম্য কর্ম যজ্ঞরূপে পরিচিত হইলেও উহা যে যজ্ঞের প্রকৃত আদর্শ নহে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যে কর্মের ফলে শুদ্ধি জন্মে — দেহশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়শুদ্ধি, অহঙ্কার শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি, যে কর্মের ফল স্বার্থ নহে পরার্থ, যে কর্মে নূতন আবরণ রচিত হয় না বরং পূর্বস্থিত আবরণ ক্ষীণ হইয়া যায়, যে কর্ম জীবকে ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে ও চরমে মহাজ্ঞান পর্যন্ত উপনীত করে, তাহাই যজ্ঞ। তাই গীতাতে আছে, যজ্ঞার্থ ভিন্ন অন্য কর্মে বন্ধন হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম ভাবে কৃত, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত যোগস্থ কর্ম বা স্বভাবসিদ্ধ কর্মই যজ্ঞ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও কর্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে ফল প্রসব না করিয়া পারে না এবং ঐ ফল নিষ্কাম কর্ম-কর্তাতে আরূঢ় হইতে না পারিয়া সমস্ত বিশ্বের সাধারণ সম্পত্তিরূপে ব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করে। এই প্রীতি, প্রসন্নতা বা প্রসাদই নিষ্কাম কর্মকর্তার যোগ্য পুরস্কার। ইহাই

১১। আধানের পর অগ্নি সকল যজমানে স্থিত হয়। তখন গার্হপত্য অগ্নি থাকে যজমানের প্রাণরূপে, দক্ষিণাটি থাকে অপান রূপে, আহবনীয় থাকে ব্যান রূপে, সভ্য ও আবসথ্য অগ্নি থাকে উদান ও সমান রূপে। এই পাঁচটি অগ্নি আত্মস্থ—আত্মাতে আহিত থাকে। তখন বাহিরে আর অগ্নি থাকে না, তাই তখন "আত্মন্যেব জুহোতি", আত্মাতে হবন হয়। ইহার নাম আত্মযাগ—আত্মনিষ্ঠা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা (বৌধায়ন পৃঃ ২১০-২১১)।

"অমৃত"। পঞ্চ মহাযজ্ঞের উদ্বৃত্ত অন্নকে "যজ্ঞশিষ্ট" ও যজমানের ভোগ্য "অমৃত" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বস্তুতঃ উহা এই প্রসাদ বা ভগবৎ-প্রীতিরই রূপান্তর মাত্র। উহা ভোগ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং অশুচি সংস্পর্শজনিত পাপ, বুদ্ধিপূর্বক পাপ ও অবুদ্ধিপূর্বক পাপ বিনষ্ট হয়।

ত্যাগ ও গ্রহণ এই দুইটি কর্মের অঙ্গ। যাহা অসার বলিয়া হেয় তাহাকে ত্যাগ করা এবং যাহা সার বলিয়া উপাদেয় তাহাকে গ্রহণ করা, এই উভয়াঙ্গ ক্রিয়াই কর্ম বা যজ্ঞের স্বরূপ। প্রকৃতি-রাজ্যে সকল পদার্থই সাঙ্কর্য্য-দোষ-যুক্ত। এখানে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে মল নাই এবং এমন পদার্থও নাই যাহাতে শুধু মলই আছে, আর কিছু নাই। জাগতিক সকল পদার্থেই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভাগ মিশ্রিত আছে। ক্রিয়াকৌশলে মিশ্র পদার্থ হইতে ক্রমশঃ এই অশুদ্ধাংশের বর্জন ও শুদ্ধাংশের বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই ক্রিয়া-কৌশলই যজ্ঞের রহস্য। যাহা দ্বারা এই ত্যাগ-গ্রহণ-রূপ সারাসার-বিবেচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাই চৈতন্য শক্তি। যজ্ঞীয় পরিভাষাতে তাহারই প্রতিনিধি যথাবিধি সংস্কৃত 'অগ্নি'। শক্তি সুপ্ত থাকিলে কর্ম হয় না। তাহাকে জাগাইয়া ও সাধনাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া তাহা দ্বারা কর্ম করিতে হয়। অগ্ন্যাধান প্রভৃতি ক্রিয়া ইহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র। কুণ্ডলিনী না জাগিলে যেমন যোগক্রিয়া সিদ্ধ হয় না, তেমনি হোমাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে যজ্ঞের কার্যও সিদ্ধ হয় না।

মূল শক্তি এক ও অভিন্ন হইলেও ব্যবহারভূমিতে ইহা নানা ও ভিন্ন। মূল ব্যক্তিতে ক্রম না থাকিলেও জাগতিক শক্তিতে যে ক্রম আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। স্তরভেদে ঊর্ধ্বগতি বা বিকাশের ক্রমিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি ইহার উপর নির্ভর করে। আরোহ পথে পদার্পণের পূর্বে প্রথমে শক্তির জাগরণ অনুভূত হয়। তাহার পর ঐ স্তরে জাগ্রৎ শক্তির প্রভাবে মলিনাংশ পরিত্যক্ত হয় ও শুদ্ধাংশ প্রকাশিত হয়। ইহার পর উচ্চতর ভূমির জাগ্রৎ শক্তিতে ঐ শুদ্ধাংশের আহুতি হয়। প্রথম অগ্নি হইতে দ্বিতীয় অগ্নি তীব্রতর। প্রথম অগ্নি পরীক্ষাতে যাহা শুদ্ধাংশ বলিয়া নির্ণীত হয়, দ্বিতীয় অগ্নিতে আহুতির পর দেখা যায় যে ঐ শুদ্ধাংশেও সূক্ষ্ম মল আছে। দ্বিতীয় অগ্নি উহাকে দগ্ধ করে ও ঐ শুদ্ধাংশকে শুদ্ধতর করিয়া প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ঐ শুদ্ধতর অংশও একান্তভাবে অশুদ্ধি বর্জিত নহে। তবে দ্বিতীয়

অগ্নির ক্রিয়াতে ঐ অশুদ্ধি ধরা পড়ে না। ইহার পর তৃতীয় অগ্নির ক্রিয়া চলে। এইভাবে যতক্ষণ অশুদ্ধি থাকে ততক্ষণ অগ্নির দাহিকা শক্তি দহন কার্যে ও মলাপসরণ কার্যে ব্যাপৃত থাকে। সত্ত্ব হইতে মল পূর্ণরূপে অপগত হইলে ইহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামে পরিচিত হয়। অগ্নি তখন আর অগ্নি থাকে না, কারণ মল বা অশুদ্ধি দাহ্য — দাহ্য না থাকিলে দাহিকাশক্তিও কার্য করে না। তখন অগ্নিকে আর অগ্নি বলা চলে না। উহা তখন বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ মাত্র। উহাতে একদিকে বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ ও অপর দিকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বিদ্যমান থাকে।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। মনুষ্য দেহাত্মবোধ লইয়া যে ভূমিতে আছে তাহাই নিম্নতম ভূমি। বিভিন্ন জীবলোকের মধ্যে পৃথিবী যেমন নিম্নতম তদ্রূপ বিভিন্ন জ্ঞানভূমির যে ভূমিতে স্থূল দেহে আত্মবোধ প্রকাশ পায় তাহাই নিম্নতম। সেই-জন্য এই অধোভূমিতেই আদিতে শক্তির জাগরণ[১২] আবশ্যক। জাগ্রত শক্তির প্রথম কার্যই হয় আত্মবোধকে স্থূল দেহ হইতে পৃথক করিয়া উপরিতন স্তরে যোজনা করা। ব্যষ্টি মানব দেহ বা পিণ্ড, সমষ্টি দেহ বা ব্রহ্মাণ্ড এবং মহাসমষ্টি দেহ বা বিশ্ব, সর্বত্রই বিশ্লেষণ করিলে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি প্রধান স্তর বা কোষের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্নময় কোষটি স্থূল। প্রথমে এই কোষ হইতে অভিমান প্রত্যাহৃত হইয়া প্রাণময় কোষকে আশ্রয় করে। তাহার জন্য আবশ্যক সপ্তধাতুময় অন্নময় কোষের সার বীর্যরূপ বিন্দুকে দোহন করিয়া অনুরূপ অনলে আহুতি দেওয়া। উর্ধ্বরেতা ভাব অথবা বিন্দুর উর্ধ্বগতির ইহাই মূল সাধন। পঞ্চাগ্নিময় মহাযজ্ঞের প্রারম্ভে প্রথম অগ্নিতে বা জঠরানলে সৌম্যবস্তু বা আহার্যের আহুতি দানের ফলে অর্থাৎ প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রভাবে ক্রমশঃ সপ্তম ধাতুর বিকাশ হয়। যে অভিমান স্থূল কোষে 'আমি' ভাব প্রকট করে তাহা মূলতঃ এই বিন্দুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বিন্দুর আহুতি দেওয়া সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিন্দু বহির্মুখ হয় ও অনিবার্য

১২। এক হিসাবে শক্তি সর্বদা ও সর্বত্র জাগিয়াই আছে। তথাপি নিজের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত উহাকে সুপ্তের মধ্যে গণ্য করা হয়। শক্তির উপলব্ধি করাই শক্তির জাগরণ। তখনই উহা ব্যবহার ভূমিতে অবতীর্ণ হয়।

মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে[১৩]। অজ্ঞানভাবে বিন্দুর ঊর্ধ্বগতি ঘটিলে "জীবনং বিন্দুধারণাৎ" এই নিয়মানুসারে নিত্য জীবন অবশ্যম্ভাবী[১৪]।

১৩। বিন্দুর বহির্মুখ হওয়ার প্রণালী এই :—মনুষ্য দেহে বিদ্যমান ও ক্রিয়াশীল অসংখ্য নাড়ী বা শিরামধ্যে হৃদয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট মনোবহা নামে একটি নাড়ী আছে। ইহার শাখা প্রশাখা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নাড়ী সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

"অশ্বত্থনাড়ীবৎ ব্যাপ্তা দ্বিসপ্ততিশতাধিকা।
নাড়ী মনোবহেত্যুক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥"

শ্রুতিতে আছে "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।" মনোবহা নাড়ী অন্নরস দ্বারা হৃদয়ান্তর্বর্তী মনকে আপ্যায়িত করে। এই অন্নরসের সূক্ষ্মসত্তা সমস্ত দেহে তেজোরূপে সঞ্চিত হয়, যাহার ফলে দেহে কান্তি, সৌন্দর্য, লাবণ্য, ধৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। কোন কারণে চিত্তে কামনার উদয় হইলে কামনা ও তৎ সহকারী ইন্দ্রিয়বর্গ সম্মিলিত ভাবে ঐ দীপক তেজকে মন্থন করিয়া স্থূলবীর্য্যরূপে পরিণত করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোবহা নাড়ী উহাকে সর্বগাত্র হইতে আকর্ষণ করিয়া ঘনীভূত বিন্দুরূপ দান করে এবং স্বীয় বহির্মুখ বেগে দেহ হইতে নিঃসারণ করিয়া দেয়, দেহে থাকিতে দেয় না। বিন্দুক্ষরণের ইহাই তাৎপর্য। মহর্ষি অত্রি এই জন্য অন্নরস, কামনা ও মনোবহা নাড়ী এই তিনটি কারণের সম্মিলনে অভিব্যক্ত বীর্যকে 'ত্রিবীজ' আখ্যা দিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য—নীলকণ্ঠ চতুর্ধরের 'ভারতপ্রদীপ')। বিন্দুর ক্ষরণটি সেই কালাগ্নি কুণ্ডে। ইহারই ফল জরা, মরণ, বিকার, মালিন্য ইত্যাদি।

১৪। সজ্ঞান ভাবে না হইলেও স্বভাবের নিয়মে ক্ষীণ ভাবে বিন্দুর ঊর্ধ্বগতি না হইয়া পারে না। ঐ গতিকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। উহাই ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সহস্রারের মধ্য বিন্দুতে—সদাখ্য কলাতে—আত্মপ্রকাশ করে। যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে শঙ্খিনী নাড়ী অন্নের সার গ্রহণ করিয়া মস্তকে সুধা সঞ্চয় করে—"অন্নসারং সমাদায় মূর্দ্ধি সঞ্চিনুতে সুধাম্।" ইহাই দৈহিক প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু এই সুধা বা চন্দ্রবিন্দু পূর্ণ অক্ষর বিন্দু হয় না, আংশিক ভাবে ইহার ক্ষরণ হয়। তাই ব্রাহ্মীস্থিতি হয় না ও কালরাজ্য হইতে ত্রাণ ঘটে না। বস্তুতঃ এই বিন্দুই নিরন্তর কালাগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতেছে, যাহার দরুণ জীবদেহ জরা ও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছে না। জ্ঞান ভাবে অর্থাৎ বোধের সহিত বিন্দুর ক্রমিক ঊর্ধ্বগতি সিদ্ধ হইলে স্থিতিলাভ হয়। অবশ্য এই ঊর্ধ্বগতির সিদ্ধি বিবর্জিতও হইতে পারে। তবে সজ্ঞান ভাব আবশ্যক। আবার এমনও হইতে পারে (অবশ্য এখানে তাহা বলা হইতেছে না) যে ঊর্ধ্বগতির প্রশ্নই নাই—কোন প্রকার গতিই থাকে না, সকল প্রকার গতির মধ্যেই গতিহীন স্বপ্রকাশমান স্থিতিভাবটি খুলিয়া যায়। কিন্তু প্রকাশটি স্বপ্রকাশ হওয়া আবশ্যক, নতুবা উহা থাকিয়াও না থাকার সমান।

বিন্দুর আহুতি হয় দ্বিতীয় অগ্নিতে। এই আহুতির প্রভাবে অগ্নির শক্তিতে উহার বিশ্লেষণ হয়। উহার ওজোরূপ সারাংশ প্রাণময় দ্বিতীয় কোষের পুষ্টি সাধন করে। দেহের প্রথম অমৃত বীর্য, উহা অন্নময় কোষের পোষক। দ্বিতীয় অমৃত ওজঃ, উহা প্রাণময় কোষের পোষক। কিন্তু ওজঃ শুদ্ধ না হইলে মনোময় কোষকে পুষ্ট করিতে পারে না। এই শুদ্ধির জন্য তৃতীয় অগ্নিতে ওজঃকে আহুতি দিতে হয়। তখন ওজঃ নির্মল হইয়া মনরূপে ফুটিয়া উঠে। ওজঃর মলিনাংশ নির্গত হইয়া যায় ও শুদ্ধাংশ মনোময় কোষের পুষ্টি সাধন করে। মনের ধর্ম সঙ্কল্প বা বিকল্প বলিয়া মনোময় সত্ত্ব সর্বথা নির্মল নহে। সাধারণ মানুষ মাত্রই এই বিকল্পের অধীন। চতুর্থ অগ্নিতে মনের আহুতি হইলে মন হইতে এই বিকল্পাংশ দূরীভূত হয় ও বিশুদ্ধ সঙ্কল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহারই নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষের পুষ্টি হয়। এইটি যোগভূমি অথবা ঐশ্বরিক জীবের ভূমি।[১৫] বিজ্ঞানে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা দুইই আছে। অনুকূল জ্ঞান সুখ এবং প্রতিকূল জ্ঞান দুঃখ। প্রতিকূলতাই বিজ্ঞানের মল। সেইজন্য বিজ্ঞানকেও অনুকূল অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। পঞ্চম অগ্নিতে শোধিত হইয়া বিজ্ঞান আনন্দরূপে পরিণত হয়। ইহাই পঞ্চম অমৃত, যাহা আনন্দময় কোষের উপজীব্য। ইহাতে মল নাই বলিয়া ইহার শোধন হয় না। ইহা নিত্য অমৃত ও অক্ষয়। ব্যষ্টি ভাবেই হউক অথবা সমষ্টি ভাবেই হউক, এই আনন্দময় কোষই মায়ের কোল অর্থাৎ আনন্দরূপা মায়ের সত্তা। এই পঞ্চম অমৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময় পরমানন্দ। ইহার আর আহুতি নাই।

নাই বটে, তবু বলিতে হয় এখানেও এক প্রকার আহুতি আছে। এক হিসাবে উহাই চরম আহুতি। উহা ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি। উহাকে অন্য আহুতির ন্যায় আহুতিরূপে বর্ণনা করা চলে না। তবুও 'আহুতি' ভিন্ন অন্য কোন যোগ্য নামও দেওয়া সম্ভব নহে। উহাই "ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।" আনন্দময় কোষও 'কোষ' মধ্যে গণ্য — তাই উহাকেও অতিক্রম করিতে হয়। উহা একদিকে আত্মসমর্পণ বা নিজকে রিক্ত

১৫। এইটি জীবেরেই ভূমি, তবে সাধারণ জীবের নহে। বিজ্ঞানভূমির জীব বিজ্ঞানময় ও সত্যসঙ্কল্প তাহার যোগসিদ্ধ বলিয়া জীব হইয়াও ঈশ্বর পদবাচ্য। এই ভূমিতে মনোবহা নাড়ীর কোন ক্রিয়া নাই।

করা অপর দিকে পূর্ণ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা — অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত স্বরূপশক্তিময় আত্মসত্তায় অধিষ্ঠান।

যতদূর পর্যন্ত মৃত্যু আছে বা মলিনতা আছে ততদূর পর্যন্ত আহুতির প্রয়োগ আছে। ততদূর পর্যন্ত অগ্নিও আছে। তাহার পর আত্মস্বরূপে অগ্নির সমারোপণ হয় অমৃতীকরণ ও মলের অপসারণ পূর্ণ হইলে লৌকিক দৃষ্টিতে আহুতির অবকাশ থাকে না কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণত্বের পথে এখানেও আহুতি আবশ্যক হয়। এই উপলব্ধ আনন্দ বা পরমানন্দও সমর্পণ করিতে হয়। ইহা নিত্য সত্তা হইলেও দ্বিতীয় রূপে আস্বাদ্য হয় বলিয়া এক হিসাবে ভোগেরই অন্তর্গত। ইহার অর্পণ না হইলে ভোক্তৃভোগ্য ভাবের অতীত অদ্বয় বিশুদ্ধ চৈতন্যে স্থিতিলাভ ঘটে না। 'চিদবসানো ভোগঃ।' বস্তুতঃ আনন্দই ত প্রিয়তমকে উপহার দিবার একমাত্র যোগ্য বস্তু। প্রথম পাঁচটি দিব্য অগ্নিতে আনন্দের সহিত মিশ্রিত ভাবে নিরানন্দের অর্পণ হইয়াছে। ইহার ফলে আনন্দের উজ্জ্বলতম রূপটি ক্রমশঃ আয়ত্ত হইয়াছে। চরম আহুতিতে সে মহান্ আনন্দকেও অমৃতকেও সমর্পণ করিয়া আনন্দের অতীত স্ব-স্বরূপে স্থিতিলাভ আবশ্যক। এইরূপ হইলে মূল অবিদ্যার গণ্ডীভেদ সম্ভব হয় ও দ্বন্দ্বাতীত পরম সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।" আনন্দই সেই হিরণ্ময় পাত্র, যাহা দ্বারা এই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে।

মৃত্যু তাঁহাকে দিতে হইবে অমৃতও দিতে হইবে, দুঃখ তাঁহাকে দিতে হইবে পরে আনন্দও দিতে হইবে। তাঁহাকে হেয় দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উপাদেয়ও দিতে হইবে তবে ত নির্মল প্রকাশের উদয় হইবে। তবে ত একমাত্র সেই সর্বাতীত, দ্বন্দ্বাতীত সত্তাই যে সর্বরূপে, অনন্ত দ্বন্দ্বময় বিচিত্র বিকাশরূপে, প্রকাশমান রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবে। অমৃত ও মৃত্যু, দুঃখ ও সুখ, তাঁহারই রূপ। লৌকিক বা অলৌকিক কোন অগ্নির সামর্থ্য নাই যে এই চরম আহুতি বা পূর্ণাহুতি গ্রহণ করে ; কারণ ইহা নির্মল অমৃত। একমাত্র ব্রহ্মাগ্নি বা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ অগ্নিই এই পরম অমৃত সোমকে ধারণ করিতে সমর্থ। তাহার ফলে অগ্নি ও সোম একাকার হয় — চৈতন্য ও আনন্দ, অথবা শিব ও শক্তি সামরস্য লাভ করে। ইহারই নাম পরিপূর্ণ সত্য।

যোগিগণ সাধারণতঃ পাঁচটি স্তরে বিশ্বকে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করেন বলিয়া এখানে পাঁচটি স্তর ধরা হইল। এই সংখ্যা নির্দেশ

শুধু বুঝাইবার সুবিধার জন্য। স্তরবিভাগ পাঁচটি ধরা হইয়াছে বলিয়া অগ্নিকেও পাঁচ এবং অগ্নিদ্বারা শোধিত অমৃতকেও পাঁচ রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।[১৬] বাস্তবিক পক্ষে স্তর অনন্ত ও অসংখ্য — অথচ একই স্তরহীন অখণ্ড সত্তা সর্বত্র বিরাজ করিতেছে।

দিব্য অগ্নি-পঞ্চকের ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে অগ্নিসমূহ আত্মাতে পূর্ণরূপে আরোপিত হয়। তখন আত্মভাব অনাত্মসত্তা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া নিজ স্বরূপকেই আশ্রয় করে।

সৃষ্টির রহস্য অতি বিচিত্র। এখানে অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ, শুদ্ধসত্ত্ব ও রজস্তমঃ, ভাল ও মন্দ সঙ্গে সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আত্মবলিরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাহাকে ভাগ করিয়া শুদ্ধাংশের যোগে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয় এবং অশুদ্ধাংশকে তৎকালের জন্য পরিহার করিতে হয়। ক্রমশঃ এমন অবস্থা লাভ হয় যেখানে অমৃত থাকে মৃত্যু থাকে না, আনন্দ থাকে দুঃখ থাকে না, সার থাকে অসার থাকে না, শুদ্ধসত্ত্ব থাকে রজস্তমঃ থাকে না। এইখানে শোধন কার্যের একপ্রকার অবসান বলা চলে। তদনন্তর মহাজ্ঞানের উদয় হইলে অমৃত ও মৃত্যুর ভেদ কাটিয়া যায়, আনন্দ ও দুঃখকে আর পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। তখন দেখা যায় একই স্বপ্রকাশময় চিদানন্দময় মহাপ্রকাশ যেন ভিতরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে (বস্তুত ভিতর বাহির তখন কোথায়?) আপন গৌরবে বিরাজ করিতেছে। ইহাই পূর্ণ সাক্ষাৎকারের দশা।[১৭]

১৬। যাজ্ঞিকগণের পঞ্চাগ্নির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উপনিষদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রসঙ্গে পঞ্চাগ্নির বর্ণনা আছে। তাপসগণ বানপ্রস্থ আশ্রমে পঞ্চতপা করিতেন (ভাগবত ৪-২৩-৫ ; ১১।১৮)—তাঁহারা যে সূর্যাদি অগ্নি পঞ্চকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহা অন্য প্রকার। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যে অগ্নি বিভাগ দেখান হইল তাহা কোষ ভেদের সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্মভেদেও অগ্নির নাম ভেদের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মারুত, চান্দ্রমস, শোভন, হুতাশন, হব্যবাহন, কব্যবাহন, বহ্নি, সাহস, বরদ, মৃড়, জঠরাগ্নি ক্রব্যাদ, বাড়ব, সংবর্ত্তক, পাবক প্রভৃতি নামের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুরেশ্বরাচার্য দেহস্থ কালাগ্নি, বাড়বাগ্নি, বৈদ্যুতাগ্নি, পার্থিবগ্নি, সূর্যাগ্নি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন (দক্ষিণামূর্ত্তি বার্ত্তিক ৯।১০)।

১৭। এইখানে ক্রম আশ্রয় করিয়াই পর পর অবস্থার উদয় ও তদনন্তর সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইল। এই সব অবশ্য নানা প্রকার হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য যে প্রকৃত সাক্ষাৎকার অক্রম—তাহাতে ক্রম নাই, অর্থাৎ

পাঁচ

যজ্ঞের জন্য ("যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ") বা ভগবানের জন্য যে কর্ম্ম অথবা যজ্ঞরূপ যে কর্ম তাহা সম্পন্ন করিতে হইলে সর্বপ্রথম আবশ্যক দেহাভিমানের শুদ্ধি। একদিকে ব্যষ্টি দেহের অভিমান শুদ্ধি ও অপরদিকে সমষ্টি বা মহাসমষ্টি দেহের অভিমান শুদ্ধি অবশ্যক। বস্তুতঃ প্রকৃতি বা স্বভাবের গুণ দ্বারাই এবং মূলে চিৎশক্তির প্রেরণাতেই যাবতীয় কর্ম কৃত হয়। কিন্তু মানব যতদিন অহঙ্কার দ্বারা বিমোহিত থাকে ততদিন নিজেকে কর্তা বলিয়া অভিমান করে। এই মিথ্যা অভিমানের বশে কর্মের বিপাক হইতে উদ্ভূত সুখ, দুঃখ ভোগে জড়িত হইয়া পড়ে। যজ্ঞাত্মক কর্মের মূলে এই প্রকার অশুদ্ধ অহঙ্কারের মোহ থাকে না ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি কামনাও থাকে না। তাই উহা বিশুদ্ধ কর্ম।

এইজন্য উহা প্রারম্ভ করার পূর্বেই দেহস্থিত আধারকুণ্ডে হোমাগ্নির উদ্দীপন আবশ্যক। এই অগ্নি মূলে এক হইলেও ইহাতে আকৃতি ও প্রকৃতিগত অনেক ভেদ আছে। তদনুসারে কার্য ও অধিকারগত ভেদও বিদ্যমান। প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষ দ্বারা অথবা প্রণব ও আত্মার ধ্যানরূপ নির্মন্থন দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিতে হয়। অনাদিকাল হইতে যে অমূল্য রত্ন উপেক্ষিত হইয়া গুপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে তাহাকে ঐ প্রদীপ্ত অগ্নির আলোকে অন্বেষণ করিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। লৌকিক আলোক এমন কি দিব্য আলোকও, ঐ "গুহাহিত" পদার্থকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় না।

যোগিগণ যাহাকে কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন বলেন তাহা এই হোমাগ্নি বোধনের আভ্যন্তরিক পর্যায়। আত্মবিস্মৃত, সংশয়াচ্ছন্ন জীব শ্বাস-

---

ক্রম সেখানে অক্রমের মধ্যে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সাধকের যোগ্যতার তারতম্য অথবা শক্তিপাতের তারতম্যবশতঃ বর্ণনা ক্রমভেদ হইয়া থাকে। আণব, শাক্ত ও শাম্ভব এই তিন উপায়ের মধ্যে শাম্ভব উপায় শ্রেষ্ঠ। অনুপায়ের ত কথাই নাই। অনুপায়ে কোন উপায়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতই পরমেশ্বরের পূর্ণ সমাবেশ হইয়া থাকে। শাম্ভব উপায়েও ক্রমিক সাধনার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যুগপৎ অখণ্ড সত্তার পূর্ণরূপে ভান হইয়া থাকে। প্রাতিভ জ্ঞান ক্রমহীন। উহাতে এক ক্ষণে সমগ্রের পূর্ণ প্রতিভাস অপরোক্ষ রূপে হইয়া থাকে।

প্রশ্বাসের অধীন থাকিয়া ইড়া পিঙ্গলাময় কালরাজ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। কুণ্ডলিনী না জাগিলে কালমার্গ ত্যাগ করিয়া সুষুম্নারূপ মধ্যমার্গে প্রবেশ লাভ ঘটে না এবং মধ্যপথে প্রবিষ্ট না হইলে যোগস্থ হইয়া কোন কর্ম করারও উপায় নাই।[১৮] মধ্যমার্গে কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই বুঝিতে হইবে স্থূল দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও সূক্ষ্মদেহের প্রথম স্তরে প্রবেশ ঘটিয়াছে। তখন শ্বাস কাল-নাড়ীকে পরিহার করিতে আরম্ভ করে ও সুষুম্নাতে[১৯] প্রবিষ্ট হইয়া অধঃ উর্ধ্বে সঞ্চরণ করিতে থাকে। বহির্জগতের স্মৃতি তৎকালে লুপ্তপ্রায় হয়, কিন্তু ভিতরে চৈতন্য উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে। পরবর্তী ভূমিতে সুষুম্নার অন্তঃস্থিত বজ্রা নাড়ীতে [১৯] প্রবেশ হয় ও সূক্ষ্মদেহের প্রথম স্তর হইতে নিষ্ক্রান্তি হইয়া দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান হয়। তখন বজ্রা নাড়ীর শাখা প্রশাখাতে সঞ্চরণ হইতে থাকে। ইহার পর চিত্রিণীতে[১৯] প্রবিষ্ট হইলে সংশয়হীন জ্ঞানের উদ্ভব হয়, হৃদয়-গ্রন্থির ছেদন হয় ও বিকল্পময় অশুদ্ধ জীবভাব কাটিয়া যায়। ইহারই নাম সূক্ষ্মদেহের তৃতীয় স্তরে বিশ্রাম লাভ। তখন জ্ঞানসূর্যের উদয় হয় এবং হৃদয় পদ্ম ঐ সবিতার বিমল কিরণস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। চিত্রিণীর অন্তঃস্থিত ব্রহ্ম নাড়ীতে[১৯] প্রবেশ হইলে নিজকে হৃদয় হইতে

১৮। 'মধ্য' বলিতে বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধচিৎকে বুঝায়, কারণ উহাই সর্ববস্তুর অন্তরতম এবং উহার ভিত্তিরই সংলগ্ন হইয়া সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু মায়িক অবস্থায় শুদ্ধচিৎ নিজ স্বরূপে থাকিয়াও মায়িক খেলার জন্য নিজ স্বরূপ গোপন করে ও স্বভাবতঃ প্রাণ, বুদ্ধি ও দেহভাব ধারণ করিয়া সহস্র নাড়ী জালে ব্যাপ্ত হয় ও নাড়ী মার্গের অনুসরণ করে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে মধ্য নাড়ী প্রধান—ইহা দেহের উর্ধ্ব হইতে অধঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই অপশক্তির আশ্রয়। সকল বৃত্তির উদয় ও বিশ্রান্তির ইহাই একমাত্র আশ্রয়। এই নাড়ীর বিকাশ না হইলে সাধকের আশঙ্কা কাটে না। পরমেশ্বরবৎ সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চকৃত্যের কর্তৃত্বের ভাবনা, বিকল্পক্ষয়, শক্তিসঙ্কোচ, শক্তিবিকাশ প্রভৃতি উপায়ে এই বিকাশ হইতে পারে (দ্রষ্টব্য 'প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয়')। যোগকুণ্ডলিনী উপনিষদে যে 'শক্তি চালনা'-রূপ সরস্বতী চালনা ও প্রাণরোধাত্মক নানা প্রকার কুম্ভকের কথা বলা হইয়াছে তাহারও একমাত্র ফল ইহাই। বিজ্ঞানভৈরবে শাক্ত ক্ষোভ কুলাবেশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিশিষ্ট উপায়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেরই মূল কথা মধ্য নাড়ীতে প্রবেশ।

১৯। ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে আছে যে সুষুম্না মধ্যে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে বজ্রা ও তাহার পর চিত্রিণী নাড়ী অবস্থিত। তাই সুষুম্না ত্রিপদারূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ

দ্বাদশান্ত[২০] (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মহাশূন্য) পর্যন্ত স্পন্দনশীল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ব্রহ্মনালে স্থিতি, শুদ্ধ কারণদেহে বা মহাকারণদেহে অবস্থান এবং জগজ্জননী মায়ের কোলে বিশ্রাম।[২০] বিশুদ্ধ অমৃতই এখানকার ভোগ্য। ইহার ঊর্ধ্বে আর ভোগ নাই ; তখন চৈতন্যময় স্থিতি ও প্রশান্তি। তখন বস্তুতঃ ভোগ ও শান্তি অথবা স্থিতি ও ক্রিয়ার ভেদও কাটিয়া যায়, অর্থাৎ সব থাকিয়াও যেন কিছুই থাকে না।

আগমে আছে, যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ তখনই হৃদয়ঙ্গম হয় যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞেয় পদার্থ হব্যরূপে আহুতি দেওয়ার যোগ্যতা জন্মে। তখন ইন্দ্রিয়বর্গ হয় স্রুক্ (হবির আধার হোমসাধন জুহুকে 'স্রুক্' বলে), নিজে হয় হোতা নিজের আত্মরূপী

বজ্রা ও চিত্রিণী সহ মিলিত হইয়া ত্রিসূত্র রূপে লক্ষিত হয়। গৌতমীয় তন্ত্র মতে সুষুম্না তেজোময়ী। ত্রিবর্ণের দিক্ হইতে সুষুম্নাকে অগ্নিরূপ ও তমোগুণাত্মিকা, বজ্রাকে সূর্যরূপ ও রজোগুণাত্মিকা এবং চিত্রিণীকে চন্দ্ররূপ ও সত্ত্বগুণাত্মিকা ভাবনা করিবার বিধান আছে। ব্রহ্মনাড়ী "শুদ্ধবোধ-প্রবোধা" ও ত্রিগুণাতীতা অথচ সর্বগুণময়ী। ইহা মূলাধারস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ছিদ্র হইতে সহস্রারে স্থিত পরম-শিব পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মরন্ধ্র ইহারই মধ্যে অবস্থিত — সুষুম্নার মূলও ঐখানেই। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিকার পূর্ণানন্দ বলেন যে মেরুর মধ্যে সুষুম্না, তার মধ্যে (কন্দের চার অঙ্গুলি উপরিস্থ লিঙ্গস্থান হইতে প্রসৃত) বজ্রানাড়ী ও বজ্রার মধ্যে প্রণববিলসিত চিত্রিণী নাড়ী বিরাজমান। ব্রহ্ম নাড়ী চিত্রিণীরও মধ্যে। ক্ষুরিকা উপনিষদে সুষুম্নার অন্তর্গত কৈবল্য নাড়ীর প্রসঙ্গ আছে — তাহা সম্ভবতঃ ব্রহ্মনাড়ীর নামান্তর। মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষদের রাজযোগ-ভাষ্যে সুষুম্নাকেই ব্রহ্মনাড়ী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে বহু স্থানে এই প্রকার বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, স্থূল দৃষ্টিতে সুষুম্নাকে ব্রহ্মনাড়ী বলাতে কোন দোষ হয় না।

২০। ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত প্রাণসঞ্চার মার্গের এক প্রান্ত হৃদয় ও অপর প্রান্ত দ্বাদশান্ত বা বিসর্গান্ত পদ (যেখানে অপ্রকাশের অনুভব হয়)। এই মার্গে নিরন্তর বিনা প্রযত্নে বর্ণের উদয় হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু পদ ও বর্ণ উদয় সাধকের প্রযত্ন ভিন্ন হয় না। বর্ণের উদয়ে পর ও সূক্ষ্মভেদে তারতম্য আছে। যাহাকে পরবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল তাহারও পরতর ও পরতম দুইটি অবস্থা আছে। সর্বোত্তম অথবা গভীরতম অবস্থাই পরতম বর্ণের পরম রূপে প্রসিদ্ধ। এইটি নাদের পরমস্বরূপ। ইহাতে যাবতীয় বর্ণ পরস্পর পৃথগভাব ত্যাগ করিয়া অবিভক্ত রূপে অন্য ভাবে নিরন্তর ধ্বনিত হয়। ইহা নিত্যোদিত, ইহার তিরোভাব কখনই হয় না। প্রকৃত অনাহত নাদের ইহাই স্বরূপ।

শিব হন্ অগ্নি ও শক্তিবর্গ হয় অগ্নির জ্বালা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন চিদানন্দ নিজেই হোতা সাজিয়া অপরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্যাত্মক নিজ স্বরূপের অনলে ইন্দ্রিয়সংযোগে বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয় দ্বারা আহুতি প্রদান করে। নিজবোধরূপ অগ্নিতে ভাব সকল সমর্পিত হইয়া স্ব স্ব বিভক্ততা ও ও ভেদ ত্যাগ পুর্বক বোধমাত্র রূপে স্ফুরিত হয়। ইহার নাম অমৃতীভাব। এই প্রকার বোধ উদ্দীপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ এই সব ভোগ করেন অর্থাৎ পরমবোধরূপে পরামর্শন করেন। দেবীগণ তৃপ্ত হইয়া পরবোধের সহিত ঐক্যলাভ করেন। তখন মহাস্বাতন্ত্র্যের উদয় হয় ও পরম প্রকাশের সহিত অদ্বৈত ভাবে স্থিতি হয়। ইহাই পূর্ণতার পূর্বাভাস।

ছয়

যজ্ঞের রহস্যার্থ কিছু কিছু আলোচনা করা হইল। সকাম কর্মীগণ ও জনসাধারণ যজ্ঞের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করুক নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের তাৎপর্য উহা হইতে অনেক গভীর।[২১] পঞ্চকোষ ভেদের দিক্ হইতে অথবা সুষুম্নার অন্তর্বাহিক উর্ধ্বগতির দিক্ হইতে একই অদ্বিতীয় লক্ষ্য অধ্যাত্মমার্গের ভাগ্যবান্

২১। কারণ দেহ ও মহকারণ দেহ ভেদ আছে। কারণ দেহ মায়াময়, অজ্ঞানাত্মক ও আনন্দ প্রধান, কিন্তু কারণ দেহ মহামায়াময় জ্ঞানাত্মক ও হ্লাদপ্রধান। উভয় দেহই অচিদ্রূপ হইলেও প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি নিত্য প্রথমটি ত্রিগুণময় ও প্রাকৃত, দ্বিতীয়টি শুদ্ধসত্বময় ও অপ্রাকৃত। স্থূল ও লিঙ্গশরীর কারণ হইতে উদ্ভূত ও সহমণ্ডলে সঞ্চরণশীল। মহাকারণ কারণের অতীত ও স্বরূপানন্দের আস্বাদন কর্তা। প্রথমটির ক্ষেত্র একপাদ দ্বিপাদ দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র ত্রিপাদ বিভূতি। তন্ত্রমতে মহাকারণ দেহই বৈন্দব দেহ — জাগ্রৎ কুণ্ডলিনী হইতে যাহার উদ্ভব বেদান্তাদি গ্রন্থে প্রয়োজনের অভাব-বশতঃ মহাকারণ দেহের আলোচনা নাই, কিন্তু নাথ যোগিগণ, কবীরাদি সন্তগণ দত্তাত্রেয়াদি অবধূতগণ এবং বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত আগমের অনুযায়ী সাধকগণ — সকলেই কোন না কোন ভাবে স্পষ্টাক্ষরে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই দেহে চিৎ শক্তি সাক্ষাৎ ভাবে অধিষ্ঠিত। ইহাই খৃষ্টীয় সাধক সমূহের Pneumatic Body, যাহা Pneuma বা চিৎশক্তি দ্বারা সর্বদা উজ্জ্বলীকৃত। কারণ-দেহের এক পিঠ মায়াময়, প্রচলিত কারণশরীর, ও অপর পিঠ মহামায়াময় ও বিশুদ্ধ, — ইহই নির্মল মহাকারণ নামে পরিচিত। বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহ।

পথিকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। নিষ্কাম কর্মরূপ যজ্ঞের নিগূঢ়তম আদর্শ আত্মযাগ। আত্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-রূপে স্থিতিই আত্মযাগের চরম সার্থকতা। বলা বাহুল্য, যজ্ঞের আদর্শগত উৎকর্ষ এই পরম লাভের ("যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ") দিক্ হইতেই সুধীগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু কাহারও পরম সৌভাগ্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞের এই মহান্ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। যাঁহারা এই দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বলেন—

"যত্রেন্ধনং দ্বৈতবনং মৃত্যুরেব মহাপশুঃ।
অলৌকিকেন যজ্ঞেন তেন নিত্যং যজামহে॥"

দ্বৈতবন যেখানে ইন্ধন, মৃত্যুই যেখানে মহাপশু, তাদৃশ অলৌকিক যজ্ঞ যে অতি উচ্চ আদর্শ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে যাঁহার এই শেষ জন্ম এবং যাঁহার উপর চিৎশক্তি সুপ্রসন্ন একমাত্র সেই বিরল মহাত্মার হৃদয়েই এই রহস্যময় যজ্ঞের স্বরূপ প্রতিভাত হয় — ইহা জনসাধরেণের অধিগম্য নহে ঃ—

"এষ যাগবিধিঃ কোঽপি কস্যাপি হৃদি বর্ত্ততে।
যস্য প্রসীদেৎ চিচ্চক্রং দ্রাগপশ্চিমজন্মনঃ॥"

কিন্তু যজ্ঞের আর একটা দিক্ আছে যাহা ঐ মহান্ আদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট।[২২] ইহার আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞ বিশ্বরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া শাস্ত্রে বহুস্থানে "বিষ্ণু" রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাতে (৩-১০-১৬) বলিয়াছেন যে

২২। "সর্গং বৈশ্বং হব্যং, ইন্দ্রিয়ানি স্রুচঃ শক্তয়ো জালাঃ স্বাত্মা শিরঃ পাবকঃ, স্বয়মেব হোতা" (পরশুরামস্থল্পসূত্র)। এই বিশ্বহোমের বা সর্বত্যগের কথাই নিম্নোক্ত পদ্যে একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—

"অন্তঃ (প্রভাস্বতি) নিরন্তরমেধমানে
মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূম্নি
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানকম্।"

অর্থাৎ পৃথিবী তত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্যন্ত ৩৬ তত্ত্ব ও তদ্‌রচিত সমগ্র বিশ্বকে আমি সংবিদ্ অগ্নিতে — বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যরূপ অনলে — আহুতি দিতেছি। মহান্ধকারনাশক ও অলৌকিক রশ্মি বিস্তারকারক এই অগ্নি নিরন্তর হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিবতত্ত্বকে গ্রাস করিতে পারে যে মহান্ অগ্নি তাহা যে তত্ত্বাতীত অখণ্ড প্রকাশ তাহাতে অর সন্দেহ কি ?

সৃষ্টির আদি হইতেই প্রজাপতি যজ্ঞের সঙ্গে মানুষকে সংবদ্ধ করিয়া রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের কর্তব্য দেবতার ভাবনা করা অর্থাৎ হবির্দ্রব্য দ্বারা দেবতার সংবর্ধনা করা। এইরূপে সংবর্ধিত দেবতার কর্তব্য মানবের ভাবনা করা অর্থাৎ তাহার আপ্যায়ন করা, সকল প্রকারে তাহাকে অভিলষিত ভোগ দান করা। এই সকল দেবদত্ত সম্পৎ দেবতাদিগের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া ভোগ করিলে ঋণী হইতে হয়। এইপ্রকার পরস্পর ভাবনা দ্বারাই বিশ্বচক্র চলিতে থাকে। জগতের কল্যাণপ্রসূ এই মহানীতি তিনি সৃষ্টির আদি সময়েই প্রবর্তিত করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও নিজের জন্য ভাবনা করিতে বলেন নাই। মনুষ্য দেবতার জন্য ভাবনা করিবে, নিজের জন্য নহে। দেবতাও মনুষ্যের জন্য ভাবনা করিবে, নিজের জন্য নহে। ইহাই পরার্থ কর্ম। জীবের সহিত ভগবানের আন্তরিক সম্বন্ধের দিক্ হইতেও এই নীতিই পরিদৃষ্ট হয়। কারণ যে ভক্ত অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে চিন্তা করে, নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করার যাহার অবসর নাই, ভগবান্ স্বয়ং তাহার যোগক্ষেম বহন করেন, অর্থাৎ তাহার জন্য চিন্তা করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভাবে নিজের কামনা পূর্তির চেষ্টা করে, যে ক্ষুদ্র অহঙ্কারের অধীন হইয়া নিজেই নিজের সকল অভাব দূর করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে ভগবানের দিক্ হইতে চিন্তা করিবার অবসর হয় না — ভগবান্ তাহার সকল ভার গ্রহণ করেন না। মোট কথা, যে যজ্ঞার্থ কর্ম হইতে বিমুখ, যে স্বার্থ চিন্তাপ্রসক্ত, অন্যের চিন্তায় যাহার হৃদয় তৎপর হয় না, যে ভগবৎ প্রবর্তিত মঙ্গলময় যজ্ঞাত্মা "জগৎ চক্রে"র অনুবর্তন করে না, সেই ইন্দ্রিয়ারাম ব্যর্থ-জীবন ব্যক্তির জন্য বিশ্বসংস্থাতে কোন বিশিষ্ট স্থান নাই — সে কালচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতে বাধ্য। তবে কালচক্রও ব্রহ্মচক্রেরই অন্তর্গত, তাই এ নিষ্পেষণের ফলও পরিণামে শুভাবহ — কারণ ইহা হইতে যথাসময়ে তাহার সত্য দৃষ্টির উন্মীলন হয় ও সে সত্যভাবে ভাবিত হইতে সমর্থ হয়।

———

ষট্‌চক্রভেদের রহস্য

এক

সাধারণতঃ বর্তমান সাধক ও যোগিসমাজের ধারণা এই যে ষট্‌চক্র ভেদ না করিতে পারিলে পূর্ণত্ব লাভ হয় না এবং ভেদ করিতে পারিলে পূর্ণত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী। এই ধারণা একেবারে অমূলক নহে। অথচ ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহাও বলা যায় না। ষট্‌চক্র ভেদ কাহাকে বলে এবং তাহার মুখ্য ফল কি তাহা জানিতে পারিলে এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানা যাইতে পারে।

ষট্‌চক্র ভেদের বিবরণ হঠযোগ এবং রাজযোগের সাহিত্যে বিস্তৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিক যোগসাহিত্যেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়েও এবং নাথ সম্প্রদায়েও ইহার বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। প্রস্থানভেদে ষট্‌চক্রের বিবরণে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু মোটের উপর তত্ত্বভেদের রহস্য সর্বত্রই এক প্রকার এবং এই রহস্যের উদ্‌ঘাটনের মহত্ত্ব সকল সম্প্রদায়েই নির্বিবাদে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারিভাষিক বৈশিষ্ট্য এবং দৃষ্টিকোণের বিলক্ষণতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার সমালোচনা করিব না। শুধু চক্রভেদের প্রয়োজন এবং উহার প্রণালী সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্বটি কি তাহাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং বিশদভাবে নিজের দৃষ্টি অনুসারে আলোচনা করিব।

মহাজনের সিদ্ধান্ত এই যে জীব শিব হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু ভিন্ন না হইলেও ভিন্নবৎ হইয়া বন্ধনদশায় সুষুপ্তির ঘোরে কালযাপন করিতেছে। শিব অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি অভিন্নরূপে পরমচৈতন্য নামে অভিহিত হয়। তিনি নিত্য লীলাময় এবং তাঁহার পঞ্চকৃত্য সম্পাদন নিত্যলীলারই অঙ্গীভূত। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই তিনটি কার্য লোক-সমাজে সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহার উর্ধ্বে নিগ্রহ অথবা তিরোধান এবং অনুগ্রহ এই দুইটি অলৌকিক কার্যও ভগবৎ শক্তির সহিত নিত্য জড়িত। কারণ শিবরূপী পরমব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার

পরাশক্তিও তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু লীলাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই সর্বপ্রথম তাঁহার পক্ষে স্বাতন্ত্র্যবলে নিজের পূর্ণত্ব আবৃত করিয়া অপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ আবশ্যক হয়। পূর্ণ পুরুষ নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া অর্থাৎ নিজের যাবতীয় শক্তি স্বেচ্ছায় সীমাবদ্ধ করিয়া অণুরূপে কিংবা জীবরূপে নিজেকে প্রকট করেন। ইহারই নাম তিরোধান অথবা নিগ্রহ। ইহার পর ঐ নিজের অংশভূত চিদণুকে ক্রমশঃ বিভিন্ন আবরণে আবৃত করিয়া মায়িক দেহে প্রকাশিত করেন। ইহাই সৃষ্টির ব্যাপার। যতদিন পর্যন্ত ঐ সৃষ্ট দেহে স্থিতি লাভ হয় ততদিন পর্যন্ত স্থিতির ব্যাপার। তাহার পর কাল পূর্ণ হইলে ঐ দেহের সংহার হইয়া যায়। তখন উক্ত চিদণু নিজের সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার সঙ্গে লইয়া মায়াগর্ভে বিলীন হইয়া থাকে। ব্যষ্টিভাবে, সমষ্টিভাবে এবং মহাসমষ্টিভাবে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ঐ সকল সংস্কার পরিপক্ক হইয়া ফল প্রসবের সময় আসন্ন হইলে উক্ত চিদণুকে পুনর্বার সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করিবার জন্য ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টির আবর্তে পতিত হইতে হয়। এইপ্রকারে সৃষ্টি হইতে সংহার পর্যন্ত আবর্ত নিরন্তর কালের রাজ্যে চলিয়া আসিতেছে। নিজের আত্মস্বরূপ অপরোক্ষভাবে না জানা পর্যন্ত এই কালের আবর্ত বা মায়ার ঘূর্ণি হইতে স্থায়ীভাবে রক্ষা পাইবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। যখন অণুরূপী জীবের মল পরিপক্ক হয় তখন ভগবৎ-অনুগ্রহ ক্রিয়াশীল হইয়া তাঁহাকে যথাসময়ে আত্মজ্ঞান প্রদান করে এবং শিবময় নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারই নাম পরমেশ্বরের অনুগ্রহরূপ পঞ্চমকৃত্য। পরমেশ্বরের নিগ্রহ অথবা তিরোধান হইতে জীবের সংসার আরম্ভ হয়। ইহাই আত্মার পতন। ঠিক সেই প্রকার পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইতে জীবের সংসার চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয় এবং সে জীবভাব ত্যাগ করিয়া নিজের স্বাভাবিক শিবত্ব ধারণ করে। ইহাই আত্মার উদ্ধার, ইহাই জীবের জীবনের পূর্ণ ইতিহাস।

দুই

জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মনুষ্যদেহ লাভ একটি মুখ্য ব্যাপার। স্থাবর উদ্ভিদ পশুপক্ষী প্রভৃতি চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের

পর জীব মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদেহ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাহার পঞ্চকোষের মধ্যে অন্নময় ও প্রাণময় কোষেরই বিকাশ হয়। মনোময় কোষের ক্রিয়া একমাত্র মনুষ্যদেহেই সম্ভবপর। মনুষ্যদেহে এই মনোময় কোষের ক্রিয়া প্রারব্ধ হয় এবং সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া ইহা চলিতে থাকে। কর্তৃত্বাভিমানের প্রভাবে অভিনব ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং তাহার ফলভোগের জন্য তদুপযোগী ভোগদেহ গ্রহণ করিতে হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোগ সম্পন্ন হইলে স্বভাবের নিয়মে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং চিত্ত বহির্মুখভাব ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখ হইতে থাকে। এই অবস্থায় মনের পরিপাক বশতঃ অলক্ষ্যে গুরুশক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকে। পরে উক্ত গুরুশক্তি প্রবল হইয়া, নিরধিকরণ অনুগ্রহ দ্বারাই হউক অথবা আচার্যদেহ রূপ অধিকরণ অবলম্বন পূর্বক অনুগ্রহ দ্বারাই হউক, জীবের উপর সঞ্চারিত হয়। অধিকারের বৈশিষ্ট্য থাকিলে বিবেক অথবা প্রাতিভ জ্ঞান দ্বারা গুরুশক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহাই জীবের জীবনে ভগবৎশক্তির অনুগ্রহরূপ ব্যাপারের রহস্য।

মনুষ্যদেহে গুরুশক্তির ক্রিয়ার প্রভাবে অণুরূপী জীবের শিবময় শক্তি সুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থায় উত্থিত হয় এবং জীবের জীবভাবকে ক্রমশঃ শিবভাবে পরিণত করিতে থাকে। জীবভাবের নিবৃত্তি হইয়া শিবভাবের উদয় হওয়া, ইহাই ষট্‌চক্রভেদের রহস্য। শিবের শক্তি চিদ্‌রূপা হইলেও জীবদেহে উহা মূলাধারকুণ্ডে অচিদ্‌রূপে সুপ্তিমগ্ন থাকে এবং জীবকে নিজের শিবস্বরূপ অনুভব করিতে দেয় না। স্বরূপের আবরণ এবং মিথ্যা পরকীয় রূপের পরিগ্রহ ইহার কার্য। পাঁচটি ভৌতিক তত্ত্ব এবং চিত্ত এই ছয়টি কেন্দ্ররূপে থাকিয়া ছয়টি চক্রের নির্মাণ করে। এই ছয়টি চক্র নিরন্তর আবর্তিত হইয়া শুদ্ধ আত্মাকে জীবরূপে ঘুরাইতে থাকে। এইগুলি যন্ত্রস্বরূপ, যাহাতে আরূঢ় হইয়া জীবমাত্র ইহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ছয়টি চক্রই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয় বস্তু। প্রথম পাঁচটি চক্র পঞ্চভূতের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ষষ্ঠচক্র মনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

আত্মা যখন স্বাতন্ত্র্যবলে জীবভাব ধারণ করে তখন আত্মার স্বরূপনিষ্ঠ পরাবাক্‌রূপা শক্তি জীবকে নিজের কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত

রাখিয়া তাহার উপর সাক্ষাৎভাবে ও পরম্পরা ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। পরাবাক্ জীবকে আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে অসংখ্য প্রকার বিকল্পের সৃষ্টি করে। বিকল্প বলিতে অস্পষ্ট নব নব অর্থের আভাস — যাহা হৃদয়ে অহেতুক ভাবে উদিত হইয়া থাকে তাহাই — বুঝিতে হইবে। পরাবাক্ হইতে পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী বাকে আবরণ শক্তির অবতরণ হইতে থাকে। পশ্যন্তী ভূমিতে সর্বপ্রথম গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার ত্রিপুটি অস্পষ্ট ভাবে উদিত হয় এবং ক্রমশঃ উহা অবতরণ পথে অধিকতর পুষ্ট হইতে থাকে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি শিব অণুভাব পরিগ্রহ করিয়া জীবরূপ ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে শিবের স্বাভাবিক শক্তি জীবভাবের উপযোগী হইয়া সুপ্তস্বরূপে জীবদেহে অবস্থান করে। বস্তুতঃ এই সুপ্তশক্তি স্থাবর হইতে মনুষ্যের পূর্বাবস্থা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সুষুপ্তির ও স্বপ্নাবস্থার মধ্য দিয়া স্বভাবের নিয়মে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। মনুষ্যদেহের সৃষ্টি হইলে ঐ শক্তি পূর্বোক্ত স্বপ্নদশাতেই বর্তমান থাকে বটে, কিন্তু মনুষ্যদেহে এই স্বপ্ন অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থায় উত্থিত হইবার ক্রম লাভ হয়। যতদিন পর্যন্ত এই স্বপ্নাবস্থা থাকে (বলা বাহুল্য ইহা সুপ্তিরই অন্তর্গত) ততদিন পর্যন্ত জীবের সংসার-ভ্রমণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। অভিমানবশতঃ কর্তা সাজিয়া কর্ম করা এবং তাহার পরে অনুরূপ দেহে উহার ফলভোগ করা ইহাই সংসার ভ্রমণ। ঐ শক্তি জাগ্রত হইলে এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তখন ক্রমশঃ মানুষের চিত্ত নিরালম্ব অবস্থা লাভ করে। ইহাই অচিৎশক্তি হইতে চিৎশক্তির পুনরুত্থান জানিতে হইবে। চৈতন্য সুপ্ত হইলেও এবং অচেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও নিজের স্বরূপ ত্যাগ করে না। সুতরাং যখন কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে চৈতন্য পুনর্বার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাস্তবিক পক্ষে জীবের কোনও অভিনব বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে না, তাহার নিজ স্বভাবসিদ্ধ শিবময় রূপেরই পুনঃপ্রাপ্তি হয়।

তিন

পরাবাক্ হইতে বৈখরী বাক্ পর্যন্ত শব্দের অবতরণ হইলে বর্ণাত্মক শব্দের উদয় হয় এবং বর্ণকে মূল করিয়া পদ, বাক্য প্রভৃতি

সহকারে ভাষার সৃষ্টি হয়। এই সকল বর্ণ অথবা মাতৃকাই তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে চিত্তে বিকল্প উদয়ের নিমিত্ত। মূলে বর্ণকে বর্ণহীন অবিচ্ছিন্ন নাদরূপে পরিণত করিতে না পারিলে এবং নাদকে বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিকল্পের অবসান সম্ভবপর নহে। বিন্দু পরবিন্দুরূপে আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বদেশে নিত্য বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ইহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে নিজের স্বরূপে ঐ বিন্দুর বিক্ষিপ্ত অনন্ত অংশগুলিকে সংহত করিয়া পুনর্বার ঐ বিন্দুতে উপসংহার করা আবশ্যক। আমাদের যে লয় ও বিক্ষেপ তাহা এই বিক্ষিপ্ত অংশগুলির আবরণ ও চঞ্চলতা নিবন্ধন তাহাতে সন্দেহ নাই। ষট্‌চক্রভেদী যোগীর প্রথম লক্ষ্যই এই যে উক্ত বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একীভূত করিয়া উর্ধ্বগামী মহাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া। শাস্ত্রে আছে যে চিত্তনদী উভয়তো বাহিনী। ইহা সংসারের দিকে প্রকাশ্য ভাবে নিরন্তর বহির্মুখে অথবা অধোমুখে প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহাই আবার কল্যাণের দিকে গুপ্তভাবে অন্তর্মুখে অথবা উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এই যে উর্ধ্বমুখী বা অন্তর্মুখী ধারা, ইহা মানবদেহের মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় এবং বহির্মুখী বা অধোমুখী ধারা ইড়া ও পিঙ্গলা এবং উহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়।

শাস্ত্রে মূলাধারাদি যে সকল চক্রের অথবা কমলের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি সবই পূর্বোক্ত বর্ণবিশেষ দ্বারা নির্মিত যন্ত্রবিশেষ। এই সকল বর্ণই পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া অথচ পরস্পরের যোগে বিভিন্ন প্রকার বিকল্পের সৃষ্টি করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, তাপ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তিই এই সকল বিকল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত। বৈখরী বর্ণসকলকে বিগলিত করিয়া মধ্যমাতে নাদাভাসে পরিণত করা এবং তদনন্তর পশ্যন্তীতে বিশুদ্ধ নাদময় জ্যোতিতে প্রকাশিত করা, ইহাই যোগসাধনার তাৎপর্য। পশ্যন্তী হইতে পরাতে যাইয়া শব্দব্রহ্ম ভেদ সিদ্ধ হইলে পরমসিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে বর্ণকে বিগলিত করিয়া নাদে পরিণত করিতে হইলে তাপ আবশ্যক হয়। এই তাপের মূল কি? এই তাপ অগ্নির তাপ এবং এই অগ্নি লৌকিক অগ্নি নহে, ইহা চিদগ্নি। মূলাধার কুণ্ডে যে কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে তাহাকে জাগ্রত করিতে

পারিলেই এই চিদগ্নির উপলব্ধি এবং উপযোগ সম্ভবপর হয়। এইজন্য যোগীর প্রথম কার্য, যে কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারাই হউক কুণ্ডলিনীকে উদ্বুদ্ধ করা। তাহার পর ঐ উদ্বুদ্ধ কুণ্ডলিনীর তেজের সঙ্গে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অথবা ভাবনার দ্বারা নিজের প্রাণ ও মনকে সংযুক্ত করা। এই অবস্থায় মন, প্রাণ ও জাগ্রত কুণ্ডলিনী এই তিনটি জিনিষ পৃথক্ না থাকিয়া এক শক্তিরূপে পরিণত হয়। মনকে যদি চন্দ্র ধরা যায় তাহা হইলে প্রাণকে সূর্যরূপে ধরা আবশ্যক এবং কুণ্ডলিনীরূপা বাক্‌শক্তি বস্তুতঃ অগ্নির স্বরূপ। এই ভাবে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি তিনটি শক্তি এক শক্তিতে পরিণতি লাভ করে। ইহার প্রভাবে মূলাধারের চতুর্দলস্থিত চারিটি বর্ণমাতৃকা বিগলিত হইয়া নাদরূপ পরিগ্রহ করে এবং এই চারিটি নাদ সমষ্টিরূপে অভিন্ন নাদের আকারে প্রত্যাবর্তন মূলে মূলাধারে কেন্দ্রস্থ বিন্দুতে উপনীত হয়। মূলাধারের বিন্দু ঊর্ধ্বমুখ সুষুম্না স্রোতে ক্রমশঃ উপর দিকে উত্থিত হইতে থাকে। এই ভাবে মূলাধারচক্র শূন্যাকার হইয়া যায়। ঠিক এই প্রণালীতে স্বাধিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সকল চক্রেই সংস্কার কার্য চলিতে থাকে। চরম অবস্থায় ষট্‌চক্রের পঞ্চাশটি মাতৃকাই নাদে পরিণত হইয়া এবং প্রথমে ছয়টি বিন্দুতে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ এক বিন্দুতে স্থিতি লাভ করে। এই বিন্দুই ভ্রূমধ্যে অবস্থিত তৃতীয় নেত্ররূপ বিন্দু। ইহার স্থান আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে। এই নেত্রের উন্মীলনকে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বলা হয়। ইহা মূলে গুরুশক্তির দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় এবং সাধকের প্রাণ, মন ও জাগ্রত কুণ্ডলিনী ইহার সহযোগী। বিন্দু উন্মীলিত হইলে অর্থাৎ তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেলে জীব আর জীব থাকে না, সে তাহার নিত্য শুদ্ধ শিবরূপ ধারণ করে। কারণ ত্রিনেত্র একমাত্র শিবেরই — জীবের নহে। সহস্রারে গতি বস্তুতঃ শিবেরই গতি পরম শিবের দিকে। তাহার পর সহস্রারও ভেদ হয়। কিন্তু এই সকল প্রসঙ্গ এইখানে আলোচ্য নহে। শব্দ হইতে অর্থাৎ বর্ণমাতৃকাত্মক শব্দ হইতে বিকল্পের উদয় হয় বলিয়া এই মহাপ্রকাশ নির্বিকল্পক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই প্রকাশের উদয় ও আমাদের প্রচলিত ভাষার কাশীমৃত্যু সমানার্থক। অর্থাৎ কাশীতে দেহত্যাগ করিলে শিবত্ব লাভ হয় এবং আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া মহাপ্রকাশে প্রবিষ্ট হইলে দেহাত্মবোধ কাটিয়া যায় এবং শিবভাবে স্থিতি হয়, ইহা একই কথা।

যে প্রণালীতে চক্রভেদের প্রক্রিয়া বলা হইল তদ্ভিন্ন আরও বহু প্রণালী আছে, এবং সেই সব প্রণালীতে যোগপথে অগ্রসর হইলেও ফলাবস্থায় একই প্রভাব উদিত হয়। এই অবস্থায় কর্মের শেষ হয়, অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, দেহাত্মভাব তিরোহিত হয় ও অপ্রাকৃত স্বরূপে স্থিতি হয়। এই অবস্থার পর হইতেই যথার্থ উপাসনার কার্য সম্ভবপর। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন — নাশিবস্য শিবোপাস্তির্ঘটতে কল্পকোটিভিঃ। অর্থাৎ শিবকে উপাসনা করিতে হইলে প্রথমে নিজে শিব হইতে হয়। শিবত্ববিরহিত জীবদশাতে শিবের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে।

ষট্চক্রভেদের পরাবস্থা

আমরা স্থানান্তরে ষট্চক্রভেদের রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইলে ষট্চক্রভেদই প্রথম সোপানরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, কারণ তাহা না হওয়া পর্যন্ত দেহাত্মবোধের নিবৃত্তি হয় না। এই স্থূলদেহ এবং ইহার আনুষঙ্গিক ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মা হইতে পৃথক জড় পদার্থ। মানুষের অহং-বুদ্ধি জন্ম হইতেই এই সকলকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। যতক্ষণ দেহাদিতে আরোপিত এই অহং-বোধ দেহাদি হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপের আশ্রয়ে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, পদার্পণও হয় না। এইজন্য প্রস্থানভেদে যিনি যে প্রকার সাধন মার্গ গ্রহণ করুন না কেন অধ্যাত্মরাজ্যে প্রগতি লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে সর্বপ্রথম নিজের অহং ভাবকে স্থূল অনাত্ম বস্তু হইতে মুক্ত করিতে হইবে। অবশ্য দেহাদি হইতে মুক্ত হইলেই যে বিশুদ্ধ মার্গে প্রবেশ লাভ হয় এমন কোনও কথা নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে বিশুদ্ধ সত্য পথে চলিবার পূর্বে অহং-বোধকে দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধ করা আবশ্যক।

সাধকগণের পরিভাষা অনুসারে তৃতীয় নেত্র অথবা জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলনই দেহ হইতে অর্থাৎ দেহাত্মবোধ হইতে মুক্ত হইবার প্রথম নিদর্শন। ষট্চক্রের প্রতি চক্রেই এক একটি বিন্দু আছে। উহাই ঐ চক্রের কেন্দ্র এবং ঐ চক্রের অধিষ্ঠাতা চক্রেশ্বর ঐ বিন্দুতে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রত্যেক চক্রের বহিরঙ্গ বর্ণময়। উহাকে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীরূপা চিৎশক্তির সাহায্যে বিগলিত করিয়া নাদে পরিণত করিতে পারিলেই চক্রস্থ বিন্দুর প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। তাহার পর ব্রহ্মনাড়ীর স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বমুখী স্রোতে উহার ঊর্ধ্বগতি সংঘটিত হয়। এই প্রকারে ছয়টি চক্রেরই বিন্দু প্রাপ্তি ও বিন্দুর ঊর্ধ্বগতির ফলে ভ্রূমধ্যের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বদেশে প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলন হয়। এই অবস্থায় সাধক পঞ্চাশৎ বর্ণ ও উহা হইতে উদ্ভূত নাদ অতিক্রম পূর্বক বিকল্প-শূন্য একটি বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জ্যোতিটিই বিন্দু,

যাহা ভেদ করিয়া ব্যষ্টি জগৎ হইতে সমষ্টি জগতে প্রবেশ করিতে হয়। বিন্দু জ্ঞানাত্মক জ্যোতিঃস্বরূপ। উহাতে জ্ঞেয় ভাব সকল অভিন্নরূপে নিহিত থাকে। এই জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ইহারই অন্তঃস্থিত শূন্যকে আশ্রয় করিয়া যোগী বৃহত্তর জগতে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ভক্ত ও যোগিগণ বুঝিবার সুবিধার জন্য বিশ্বকে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও মহা সমষ্টি রূপে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্যষ্টি বলিতে একটি বিশিষ্ট নরদেহকে বুঝিতে হইবে। সন্তগণের পরিভাষাতে ইহারই নাম পিণ্ড। সমষ্টি বলিতে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়। অসংখ্য পিণ্ডের সমন্বয়রূপী ব্রহ্মাণ্ডই সমষ্টিপদের অর্থ। ব্রহ্মাণ্ড-সংখ্যা অগণিত এবং অগণ্য। সমষ্টির দৃষ্টিতে এই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিই মহাসমষ্টিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই পর্যন্ত ত ভাবসৃষ্টির পরিসীমা। ইহার পর শূন্য। ভাবময় কোনও সত্তাই সেখানে থাকে না। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই শূন্য বা অভাবও সৃষ্টিরই অন্তর্গত।

ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যাইতে হইলে এক শূন্য ভেদ করিয়া যাইতে হয়। তেমনি সমষ্টি হইতে মহাসমষ্টিতে যাইতে হইলেও শূন্য ভেদ আবশ্যক হয়। এই নীতি অনুসারে মহাসমষ্টিকেও ভেদ করিতে হয়। মহাসমষ্টির অতিক্রম সিদ্ধ হইলে প্রকৃত চরমশূন্যের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে।

ষট্চক্রের ভেদ হইয়া গেলে সমষ্টি রাজ্যে বা সমষ্টি সত্তায় প্রবেশ ঘটে। মাতৃগর্ভস্থ সন্তান যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন ঐ মাতৃগর্ভই তাহার নিকট এক রাজ্য। কিন্তু মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব লাভের পর সে আর মাতৃগর্ভরূপ পূর্ব রাজ্যেই স্থিত হয় না। তখন সে বাহ্য কালের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই স্থলেও ব্যাপারটা কিয়দংশে সেইরূপ। যতক্ষণ আত্মা ব্যষ্টি দেহকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ যোগীর প্রথম লক্ষ্যই হয় ঐ অভিমানটি ভাঙ্গিয়া ব্যাপকতর রাজ্যে প্রবেশ করা। অভিমান কিন্তু ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। কারণ, ব্যষ্টির অভিমান ভাঙ্গিয়া গেলেও তখন সমষ্টির অভিমান তাহাকে পাইয়া বসে। অথবা প্রকারান্তরে বলা চলে, সমষ্টির অভিমানে অভিমানী হওয়া ও ব্যষ্টির অভিমান হইতে মুক্ত হওয়া একই সময়ে সংঘটিত হয়। ইহার সারাংশ এই যে, সাধক অথবা যোগী ষট্চক্রভেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী হইয়া ক্রমশঃ

উর্ধ্বগতি লাভ করিতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ড অথবা সমষ্টি সত্তাতেও ষট্‌চক্রের ন্যায় বিভিন্ন কেন্দ্র স্থান আছে। পর পর ঐ সকল কেন্দ্র স্থানকে অবলম্বন করিয়া যোগীর চৈতন্য উন্মীলিত হইতে থাকে। এক পক্ষে এই গতি জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত প্রগতি ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহার পূর্বে জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ এবং উক্ত রাজ্যে সঞ্চরণ সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে জ্ঞানের পরেও মহাজ্ঞান আছে। সমষ্টির পরেও যেমন মহা-সমষ্টি আছে ইহাও কতকটা সেইরূপ। এইজন্য জ্ঞানরাজ্য হইতে নির্গম এবং মহাজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ উভয়ই আবশ্যক। জ্ঞানরাজ্য হইতে নির্গম পূর্ববৎ ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বদিকের বিন্দু ভেদ করিয়া ঘটিয়া থাকে। উহাই ব্রহ্মাণ্ড-পুরুষের জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন। পিণ্ডস্থ পুরুষের জ্ঞাননেত্রের বিকাশের সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। এই নেত্রের উন্মীলন না হইলে মহাজ্ঞানরাজ্য দৃশ্যপথে পতিত হয় না এবং তাহাতে প্রবেশ করিতে সামর্থ্য জন্মে না। মহাজ্ঞান রাজ্য বলিতে সৃষ্টির অঙ্গীভূত সমগ্র বিশ্ব বুঝিতে হইবে। মহাসমুদ্রে খণ্ড খণ্ড দ্বীপমালা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতি দ্বীপ সমুদ্রের জল দ্বারা চারিদিকে ব্যাপ্ত — এই অন্তরালস্থিত জলের অন্তরায় বশতঃ এক দ্বীপের সহিত আর এক দ্বীপের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত সমুদ্রে অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল দ্বীপের সংখ্যা-নির্দেশ সম্ভবপর নহে। এই মহাসমুদ্র বস্তুতঃ কারণ-সমুদ্রেরই নামান্তর এবং এই সকল দ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। এই সকল দ্বীপের যে সমষ্টি তাহাই মহাসমষ্টি। ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বে আবদ্ধ হইয়া ঐ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা হইলেও এই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিরূপ মহাজ্ঞান-রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার জন্য ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পুরুষের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড হইতে নির্গম এবং অন্তরালবর্তী শূন্যভেদ করিয়া তৎতৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ আবশ্যক। এই মহাসমষ্টি এক হিসাবে "আদি সৃষ্টি" রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। যাহাকে কারণ-সমুদ্ররূপে বর্ণণা করা হইয়াছে তাহাই বিরাট আকাশ, যাহাতে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে।

বলা বাহুল্য, এ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের খেলা পূর্ণভাবে বিদ্যমান। অবশ্য ব্যষ্টির অজ্ঞান হইতে সমষ্টির অজ্ঞান সূক্ষ্ম এবং সমষ্টির

অজ্ঞান হইতে মহাসমষ্টির অজ্ঞান আরও সূক্ষ্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অজ্ঞান অজ্ঞানই। মহাসমষ্টির অজ্ঞানই মূল অজ্ঞান। মহাসমষ্টি দেহে অভিমানী পুরুষই আদি জীব। ইহাই একমাত্র জীব। ইহার পর আর জীবভাব থাকে না। এই এক জীবই প্রতিবিম্ব ভেদে অনন্ত জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মহাসমষ্টির অতিক্রমে যে জ্ঞানের বিকাশ হয় তাহাই পূর্ণ জ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে তাহাই যথার্থ আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে আত্মাতে যে অহং প্রতীতির উদয় হয় তাহাই পূর্ণ অহং। এই অহং-এর প্রতিযোগী অন্য কোনও অহং থাকিতে পারে না। দুর্গা সপ্তশতীতে আছে —

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" — ইহা এই অদ্বিতীয় জ্ঞানেরই সূচক।

কারণ সমুদ্রের ওপারে না গেলে এই অদ্বিতীয় অহং প্রতীতি লাভ করা যায় না। কারণ এই অদ্বৈত অহং-ভাব বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকালে অহং ও ইদংরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নামে দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়। এই দুইটি ধারা থাকা পর্যন্ত অন্তরালে শূন্যের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এই-জন্য জ্ঞানের পূর্ণতার পক্ষে পর পর সকল শূন্যই ভেদ করিতে হয়। আপাততঃ আমরা তিনটি শূন্য গ্রহণ করিয়াছি — শূন্য, মহাশূন্য ও অতি মহাশূন্য। কিন্তু প্রয়োজন হইলে বুঝাইবার সুবিধার জন্য শূন্যের সংখ্যা বাড়ান যাইতে পারে। কিন্তু শূন্য যতই হউক না কেন অতি মহাশূন্যের পর আর শূন্য নাই। কেহ কেহ ইহাকে আত্যন্তিক শূন্য এবং অনন্ত শূন্য বলিয়া থাকেন। দ্বৈত দৃষ্টিতে এই চরম শূন্যের ভেদ হয় না। এবং সেইজন্য চিৎ ও অচিতের সমন্বয় এবং জীব ও ঈশ্বরের একত্ব-প্রতীতি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে জ্ঞানী বা যোগী এই অন্তিম শূন্যকেও ভেদ করিতে সমর্থ হয় সে স্বভাবতঃই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকে, কারণ সেখানে একমাত্র অহং ভিন্ন ইদং-এর কোনও স্থান থাকে না। এই পরম রাজ্যে প্রবেশ করার যে দ্বার তাহার নাম 'ভ্রমর গুহা'। ভ্রমর গুহা চরমশূন্যের পরে এবং পূর্ণ সত্যের পূর্বে অর্থাৎ উভয়ের সন্ধিস্থানে অবস্থিত। ভ্রমর গুহা ভেদ হইয়া গেলে প্রকৃত সত্যরাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে। ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং মহাসমষ্টি সবই কালের রাজ্য এবং কালের নিয়ন্ত্রণের অধীন। কিন্তু সত্যরাজ্য যথার্থ গুরুরাজ্য। কালের রাজ্যে মন ও মায়ার খেলা থাকিবেই এবং সৃষ্টি প্রলয়ের বিভিন্ন প্রকারের লীলাও অবশ্যম্ভাবী।

সেখানে আলো-আঁধার দিবা-রাত্রি সব দ্বন্দ্ব অবস্থান করে। কিন্তু গুরুরাজ্য দ্বন্দ্বাতীত। সেখানে দিবারাত্রি নাই, সৃষ্টি সংহার নাই এবং চিৎ অচিতের বিভাগও নাই। সেখানে কাল নাই। তবে হলাদিনী-শক্তির খেলার জন্য আনন্দের আস্বাদনের জন্য নিত্য গুরুর অধীন তাঁহার কিঙ্কররূপ কাল আছে। কালের রাজ্য কার্য্য-কারণ-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা ন্যায়ের রাজ্য। কিন্তু গুরুরাজ্য স্বাতন্ত্র্যময় স্বাধীনতাময় — উহাই প্রকৃত স্বরাজ। উহা প্রেমের রাজ্য — মহা-করুণার রাজ্য। বস্তুতঃ যাহা প্রেম তাহাই কালের দিকে দৃষ্টিপাত সহকারে মহাকরুণা রূপে পরিণত হয়। এই গুরুরাজ্যেরও অনন্ত বৈশিষ্ট্য আছে। এই প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

তান্ত্রিক সাধনা ও মন্ত্রনয়

বজ্রযোগ

পারমিতানয়ের বিশ্লেষণ সৌত্রান্তিক নয় অনুসারে করা হয়। কিন্তু মন্ত্রনয়ের ব্যাখ্যা একমাত্র যোগাচার ও মাধ্যমিক দৃষ্টিতেই হইতে পারে। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যার্থ অনুমেয়, প্রত্যক্ষ নহে। মাধ্যমিক সাধনা বিজ্ঞানও স্বীকার করে না। দৃষ্টির প্রসার ও উৎকর্ষ-সাধন বিশেষরূপে না হইলে মন্ত্রসাধনায় অধিকার লাভ হয় না।

মন্ত্রযানের লক্ষ্য বজ্রযোগসিদ্ধি। সাধকের আধার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্র সাধনা সম্ভব নহে। পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই মার্গই শ্রেষ্ঠ। এই মহামার্গের চারিটি স্তর আছে। এক একটি স্তরে পূর্ণযোগের এক একটি রূপ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হয়। চারিটি স্তরের সাধনা সম্পূর্ণ হইলে যোগ্য পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেক স্তরের যোগলাভের পূর্বে বিমোক্ষলাভ আবশ্যক।

কল্পনাদি ও আবর্জনাদি হইতে মুক্তিলাভকে বিমোক্ষ বলে। এই-প্রকার মুক্তিলাভের উপায় ধ্যান। অতএব ধ্যান — বিমোক্ষ — যোগ, ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। স্তরের সংখ্যা চারিটি বলিয়া বিমোক্ষও চারি প্রকার — শূন্যতা, অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত ও অনভিসংস্কার। প্রত্যেক যোগের বিমোক্ষের প্রভাবে এক একটি শক্তির বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ এক একটি বজ্রযোগে এক একটি শক্তি পূর্ণ হয়। শক্তির পূর্ণ বিকাশের ফলে বজ্রভাবের উদয় ঘটে। স্থূল দৃষ্টিতে নিজ সত্তাকে চারিভাগে বিভক্ত করা চলে — কায়, বাক্, চিত্ত ও জ্ঞান। প্রথম বজ্রযোগে কায় বজ্রভাবের উদয় হয়। এইপ্রকার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যাহাকে কায়বজ্র বলা হয় তাহা স্থূল জগতের পূর্ণতা। বাকি তিনটিও এই প্রকারই বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রথম বজ্রযোগের নাম বিশুদ্ধ যোগ। ইহার জন্য প্রথমে শূন্যতা নামক বিমোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। শূন্যতা বলিতে স্বভাব শূন্যতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শূন্যতা সিদ্ধ হইলে অতীত ও

অনাগত থাকে না। শূন্যতা দর্শনকে যোগিগণ গম্ভীর ও উদার বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতীত ও অনাগত নাই বলিয়া উহা গম্ভীর এবং না থাকিলেও উহার দর্শন হয় বলিয়া উহা উদার। শূন্যতার গ্রহণ যে জ্ঞানে ঘটিয়া থাকে তাহারই পারিভাষিক নাম শূন্যতা বিমোক্ষ। ইহার ফলে তুতীয় অবস্থার ক্ষয় হয় ও অক্ষয় মহাসুখের উদয় হয়। করুণার লক্ষণ জ্ঞানবজ্র বা সহজকায়। ইহা বস্তুতঃ প্রজ্ঞা ও উপায়ের সাম্যাবস্থা। ইহাই বিশুদ্ধ যোগ।

দ্বিতীয় যোগের নাম ধর্মযোগ। ইহার জন্য আবশ্যক অনিমিত্ত বিমোক্ষ। বুদ্ধ বোধি প্রভৃতি বিকল্পময় চিত্তকে নিমিত্ত বলে। যে জ্ঞানে এই প্রকার বিকল্প থাকে না তাহার নাম অনিমিত্ত বিকল্প। ইহা প্রাপ্ত হইলে সুষুপ্তি দশা ক্ষয় হয়। তখন মৈত্রীরূপ চিত্তের উদয় হয়, যাহা নিত্য অনিত্যাদি দ্বন্দ্ব হইতে সদা বিমুক্ত। এই প্রকার চিত্ত বজ্রধর্মকায় নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দুই কায়ের স্ফুরণ। তখন বুঝা যায়, এই জগৎ কল্যাণ সাধন নির্বিকল্পক চিত্ত হইতে ভিন্ন নহে। এই যোগ প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্য মাত্র।

তৃতীয় যোগের নাম মন্ত্রযোগ। ইহার জন্য অপ্রণিহিত নামক বিমোক্ষ আবশ্যক। নিমিত্তের অভাবে তর্কের অভাব হয়। বিতর্ক চিত্তের অভাবে প্রণিধানের উদয় হয় না। তাই ইহাকে অপ্রণিহিত বলে। অপ্রণিহিত শব্দের তাৎপর্য "আমি সংবুদ্ধ" এই জাতীয় ভাবের উদয়। এই বিমোক্ষলাভের ফলে স্বপ্নক্ষয় হয় ও ভিতরে অনাহত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। ইহাই যথার্থ মন্ত্র অথবা 'সর্বভূতরুত'। ইহার নামান্তর মুদিতা। ইহার দ্বারা সর্বসত্ত্বের মোদন বা আনন্দ সঞ্চার হয়। মনের ত্রাণ হয় বলিয়া এইস্থলে মন্ত্রপদের সার্থকতা বুঝিতে হইবে। ইহার নাম বাক্‌বজ্র বা সম্ভোগকায়। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যেই মন্ত্রযোগ। ইহা সূর্যস্বরূপ।

চতুর্থ যোগের নাম সংস্থানযোগ। ইহার জন্য অনভিসংস্কার নামক বিমোক্ষ আবশ্যক। শ্বেত, রক্তাদি বর্ণ, প্রাণায়াম ও বিজ্ঞান এইগুলির পারিভাষিক নাম অভিসংস্কার। এই বিমোক্ষের প্রভাবে যে বিশুদ্ধি লাভ হয় তাহার ফলে জাগ্রত অবস্থার ক্ষয় হয় ও অনন্ত নির্মাণকায়ের স্ফুরণ ঘটে। তখন উপেক্ষারূপে কায়বজ্রের প্রাপ্তি ঘটে। রৌদ্র শান্তা প্রভৃতি রূপের সহিত ইহার কোন সাঙ্কর্য নাই।

নির্মাণকায় বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যই সংস্থানযোগ। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ইহাকে ‘কমলনয়’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে চারিটি যোগের দ্বারা চারিটি অবস্থা অতিক্রম করা আবশ্যক। বজ্রযোগের ফল পূর্ণ নির্মলতা লাভ করা। তুরীয় প্রভৃতি চারিটি অবস্থাতেই কোন না কোন প্রকার মল থাকিয়াই যায়। যতক্ষণ এই সকল মল শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে না। তুরীয়ের মল হইতে রাগ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বয়, সুষুপ্তির মল তম, স্বপ্নের মল শ্বাসপ্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চক এবং সৎ-অসৎ বিকল্প আর জাগ্রতের মল হইল সংজ্ঞা বা দেহবোধ।

তান্ত্রিক যোগিগণ বলেন যে বৈদিক যোগ দ্বারা মলসকলের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু তান্ত্রিকক্রিয়ার প্রভাবে মল থাকিতে পারে না। এই মতে সকল বস্তুই শূন্য বা স্বভাবহীন। অতীত নাই, অনাগতও নাই। ইহা জানিয়া ধ্যান করিলে মনোভাব শূন্যাত্মক হয়। ইহা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয় এবং দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। এই আধারের উপর যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই শূন্যতা বিমোক্ষ বলে। ইহার প্রভাবে মোহনাশক নির্বিকার আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। বিশ্বকরুণা-যুক্ত জ্ঞান শুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহারই নাম সহজকায় ও বিশুদ্ধ যোগ।

উপরে যে চারিটি বজ্রযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল উহা গুহ্য সমাজ, বিমলপ্রভাদি গ্রন্থের উপদেশও তাৎপর্যমূলক। চৈতন্যকে আবরণ হইতে মুক্ত করাই যোগের উদ্দেশ্য। এক একটি বজ্রযোগের অনুষ্ঠানের প্রভাবে চৈতন্য হইতে এক একটি আবরণ অপসারিত হয়, ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বদর্শনের এক এক অঙ্গ খুলিয়া যায়। ইহার নাম অভিসংবোধি। চারিটি যোগের ধারা চারি প্রকার অভিসংবোধির উদয় হয়। তখন পূর্ণতা লাভের অন্তরায় দূর হইয়া যায়।

সাধারণতঃ এই সংবোধির আলোচনা উৎপত্তি ও উৎপন্ন এই দুই ক্রমের দ্বারা হয়। বৌদ্ধগণ বলেন যে বৈদিক ধারার সাধনাতেও এই দুইটি ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকার ভিন্ন। সম্যক্ প্রকারে বিশ্বদর্শন করিতে হইলে সৃষ্টিক্রম ও সংহারক্রম অথবা আরোহক্রম ও অবরোহক্রম উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। শ্রীচক্র লেখনের প্রণালীতে কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে অথবা পরিধি হইতে

কেন্দ্রের দিকে গতি হইতে পারে। কিন্তু উভয়ে তত্ত্বদৃষ্টিতে ও ও কার্যদৃষ্টিতে ভেদ লক্ষিত হয়। সেই প্রকার উৎপত্তিক্রম ও উৎপন্নক্রমেও ভেদ আছে।

উৎপত্তিক্রমে চারিটি সংবোধিক্রম বুঝিবার উপায় এই ঃ সর্বপ্রথম একক্ষণ অভিসংবোধি। ইহা স্বাভাবিক বা সহজকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। যে ক্ষণে জন্ম-উন্মুখ আলয় বিজ্ঞান, মাতৃগর্ভে মাতা ও পিতার সমরসীভূত বিন্দুদ্বয়ের সঙ্গে একত্ব লাভ করে, উহা একটি মহাক্ষণ। এই ক্ষণে যে সুখসংবৃত্তির উদয় হয় তাহার নাম একক্ষণ সংবোধি। এই সময় গর্ভস্থ কায়া রোহিত মৎস্যের ন্যায় একাকার থাকে। উহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ থাকে না।

ইহার পর পঞ্চাকার সংবোধির উদয় হয়। প্রথম কায়া সহজ-কায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু এই কায়া ধর্মকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। মাতৃগর্ভে যখন রূপাদি বাসনাত্মক পঞ্চম সংবৃত্তির উদয় হয় তখন এই আকার কূর্মবৎ পঞ্চ স্ফোটকবিশিষ্ট লক্ষিত হয়। একটি পঞ্চাকার মহাসংবোধির অবস্থা।

ইহার পর উক্ত পঞ্চ জ্ঞান হইতে প্রত্যেকটি জ্ঞান পঞ্চধাতু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ আয়তনের বাসনা ভেদবশতঃ বিংশতি প্রকার রূপ ধারণ করে। কায়াটিও কুড়ি অঙ্গুলি পরিমিত হয়। ইহাই বিংশত্যাকার সংবোধি। ইহার সম্বন্ধ সম্ভোগকায়ার সঙ্গে। এই পর্যন্ত বিকাশ মাতৃগর্ভে ঘটিয়া থাকে।

ইহার পর গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্তি হয় অর্থাৎ প্রসব হয়। তখন মায়াজালের ন্যায় অনন্তভাবের সংবেদন হয়। জ্ঞানে আর বিংশতি প্রকার ভেদ থাকে না, অনন্ত ভেদের স্ফুরণ হইয়া থাকে। ইহার নাম মায়াজাল অভিসংবোধি, ইহা নির্মাণকায় সহ সংশ্লিষ্ট।

মায়াজালের জ্ঞান উদিত হইলে বুঝিতে হইবে যে উৎপত্তিক্রম সমাপ্ত হইয়াছে। পরমশুদ্ধ সত্তা হইতে মায়ারাজ্যে অবতরণের ইহাই ইতিহাস। মাতৃগর্ভেই রচনা হইয়া থাকে। কামকলা তত্ত্বের ইহাই রহস্য। শুক্লবিন্দু ও রক্তবিন্দু নামক দুইটি কারণবিন্দু কার্য-বিন্দুরূপে পরিণত হয়। পরবর্তী সৃষ্টি বস্তুতঃ এই কার্যবিন্দুরই ক্রমবিকাশ মাত্র। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে আনন্দ মাত্রই থাকে। ইহারই নাম কেবল সুখসংবৃত্তি। উপনিষদেও আছে —

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইহা বস্তুতঃ মহাক্ষণের স্থিতি। সৃষ্টিতে মায়াজালের অনন্ত নাগপাশ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। আনন্দ ভাঙ্গিয়া যায় ও নানাপ্রকার দুঃখের আবির্ভাব হয়। প্রত্যাবর্তনকালে মায়াকে ছিন্ন করিয়া এক মহাক্ষণে ফিরিতে হয়, অর্থাৎ নির্মাণকায় হইতে সহজকায় পর্যন্ত আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যাবর্তনের ধারাতে একক্ষণসংবৃত্তিকে অন্তিম বিকাশরূপে স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ এইক্ষণেই বিশ্বাতীত মহাশক্তি অবতীর্ণ হন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। যোগী গর্ভাধান ক্ষণটিকেই উৎপত্তিক্ষণ মনে করেন। কিন্তু অযোগীর দৃষ্টিতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ ক্ষণ বা নাড়ীচ্ছেদক্ষণই উৎপত্তিক্ষণ। এইক্ষণে মায়া অথবা বৈষ্ণবী মায়ার স্পর্শ ঘটে।

ইহার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। দেহ রচনার মূলে আছে ক্ষর বিন্দু বা আলয় বিজ্ঞান। ইহা অশুদ্ধ বিজ্ঞান। ইহারই জন্ম হয়। দুইটি কার্যবিন্দু একত্র হইয়া দেহ রচনা করে।

উৎপন্নক্রম বস্তুতঃ আরোহক্রম। এক দৃষ্টিতে ইহাকে সংহারক্রমও বলা যাইতে পারে। অন্য দৃষ্টিতে ইহাকে সৃষ্টিক্রমও বলা চলে। যে প্রকার মায়া হইতে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা একটি ধারা, সেই প্রকার ব্রহ্মাবস্থাতেও একটি বিকাশের ব্যাপার রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে পরমাত্মা ও ভগবান পর্যন্ত ভাবের ব্যঞ্জনা ঘটে। বৌদ্ধ চিন্তার রহস্য কতকটা এই দৃষ্টিতে দেখিলেই উন্মীলিত হইতে পারে। মায়ার প্রভাবে প্রতিদিন একুশ হাজার ছয়শো শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে। প্রত্যাবর্তনের অবস্থাতেও সেইপ্রকার ঠিক একক্ষণ অভিসংবোধি ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থাতে প্রাণবায়ু শান্ত হয়। তখন চিত্ত মহাপ্রাণে স্থির হইয়া যায় ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না। তখন দিব্য ইন্দ্রিয়ের উদয় হয়। স্থূল দেহাভিমান থাকে না, দিব্য দেহের আবির্ভাব হয়। এই সময় একই ক্ষণে বিশ্বদর্শন সংঘটিত হয়ঃ "দদর্শ নিখিলং লোকং আদর্শ ইব নির্মলে।" এই জ্ঞানের নাম বজ্রযোগ — ইহা স্বভাবকায়ের অবস্থা।

ক্ষরবিন্দু হইতে দেহ রচনাত্মক সৃষ্টি হয়, অক্ষর বা অচ্যুত বিন্দু হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানাত্মক সৃষ্টি হয়। এই একক্ষণাভিসংবুদ্ধ স্থিতিই বজ্রসত্ত্বের স্থিতি। এই অবস্থায় শ্বাসচক্রের ক্রিয়া থাকে না। এই মহাক্ষণকেই বুদ্ধের জন্মক্ষণ বলা হইয়া থাকে। ইহারই নাম

দ্বিতীয় জন্ম। — "জন্মস্থানং জিনেন্দ্রাণামেকস্মিন্ সময়েঽক্ষরে।" এইটি স্বভাবকায়ের অবস্থা।

ইহার পর চিত্ত বজ্রযোগ হয়। প্রথমে যিনি বজ্রসত্ত্ব ছিলেন, তিনি যখন মহাসত্ত্বরূপে প্রকট হন, তখন পরম অক্ষর সুখের অনুভব হয়। ইহার নাম পঞ্চাকার অভিসংবোধি। আদর্শজ্ঞান, সমতাজ্ঞান, প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান, কৃত্যানুষ্ঠান জ্ঞান ও পূর্ণ বিশুদ্ধ ধর্মধাতুর জ্ঞান, ইহাই মোক্ষ জ্ঞান। রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ ও দ্রব্যাদি পঞ্চ ধাতু উভয়ই প্রজ্ঞা ও উপায়াত্মক। এই পঞ্চমণ্ডল নিরোধস্বভাব — এটা হইল ধর্ম ও কালের অবস্থা। এ সময়ে শ্বাসচক্র পুনরায় ক্রিয়াশীল হয়।

যখন সম্ভোগকায়ের অভিব্যক্তি হয় তখন উহাকে বাক্‌বজ্ররূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা মহাসত্ত্ব, যাহার পরিণাম বোধিসত্ত্ব। এই দ্বাদশাকার সত্ত্বার্থ বোধিসত্ত্বগণের অনুগ্রাহক। এই সর্বসত্ত্বরূপ দ্বারা ধর্মদেশনা করা হয়। এটা বিংশত্যাকার অভিসংস্কারের দশা। ইহাতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও নিরাবরণ লক্ষণ বারোটি সংক্রান্তি আছে।

সকলের শেষে কায়াবজ্রযোগের নিরূপণ হইয়া থাকে। ইহাই নির্মাণকায়। অনন্ত মায়াজাল হইতে কায়ের স্ফুরণ হয়। এখানকার সমাধির নাম মায়াজাল অভিসংবোধি। এই অবস্থায় একই সময়ে অনন্ত ও নানাপ্রকার মায়ার নির্মাণলক্ষণ ষোড়শ আনন্দ-ময় বিন্দুর নিরোধ হয়।

শক্তি উপাসনা — ত্রিকোণ ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব

তান্ত্রিক উপাসনা বস্তুতঃ শক্তিরই উপাসনা। বৌদ্ধগণের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞাই শক্তির স্বরূপ। ইহার প্রতীক ত্রিকোণ, যাহাতে ছয়টি ধাতু বিদ্যমান আছে। এইজন্য ইহার ছয়টি গুণ প্রসিদ্ধ — যথা, সমগ্র ঐশ্বর্য, রূপ, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও অর্থবত্তা। বৈষ্ণবগণ চতুর্ব্যুহের প্রসঙ্গে ভগবান অথবা বাসুদেবের ষাড়্‌গুণ্য বিগ্রহ স্বীকার করেন এবং সঙ্কর্ষণাদি তিন ব্যূহের প্রত্যেকটির গুণদ্বয়াত্মক বিগ্রহ মানেন। বৌদ্ধাগম ও বৌদ্ধেতর শৈব শাক্তাগমেও কতকটা এই প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির প্রতীক ত্রিকোণের তিন কোণে আছে তিন বিন্দু এবং কেন্দ্রে আছে মধ্যবিন্দু। মধ্যবিন্দুতেই তিন বিন্দুর সমাহার হয়। প্রতি কোণের বিন্দুতে দুইটি গুণের সত্তা মানা হয়। তাই

সমষ্টিতে হয় ষড়গুণ। শাক্তগণের চতুষ্পীঠ কল্পনার মূলও ইহাই। বৌদ্ধগণ বলেন যে এই ত্রিকোণ ক্লেশ, মার প্রভৃতি ভঞ্জন করিয়া থাকে। তাই ইহার নাম ভগ। হেবজ্রতন্ত্রে প্রজ্ঞাকে ভগ বলা হইয়াছে। ইহার নাম বজ্রধরধাতু মহামণ্ডল। ইহা মহাসুখের আবাসস্থান। ইহা 'এ' কার বা ধর্মধাতু পদের বাচ্য। ইহা অজর, স্বচ্ছ, আকাশের ন্যায় নির্মল, অনবকাশ, ও প্রকাশময়। ইহারই নামান্তর বজ্রালয় বা বজ্রাসন। ইহা অখণ্ড, অপরিমিত ও অনন্ত প্রকাশময়। ইহাকে আসন করিয়া যিনি আসীন হন তাঁহাকেই বাস্তবিক পক্ষে ভগবান বলা হইয়া থাকে। তাঁহাকেই মহাশক্তির অধিষ্ঠাতা বলিয়া গণন করা হয়।

বৌদ্ধেতর আগমশাস্ত্রেও 'এ' কার শক্তির প্রতীক। ইহা ত্রিকোণ। অনুত্তর পরস্পন্দের দ্যোতক 'অ' এবং উচ্ছলিত আনন্দের দ্যোতক 'আ'। এই 'অ' অথবা 'আ' ইচ্ছারূপ 'ই'-এর সঙ্গে নিয়োজিত হইলে ত্রিকোণের রচনা সম্পন্ন হয়। ইহাই 'এ'কার — ইহা বিসর্গানন্দময় সুন্দররূপে বর্ণিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, মহারাজ অশোকের ব্রাহ্মী লিপিতে 'এ' কার ত্রিকোণাকার।

ত্রিকোণং একাদশকং বহ্নিগেহঞ্চ যোনিকম্।
শৃঙ্গাটং চৈব একারনামভিঃ পরিকীর্তিতম্॥

ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি ত্রিকোণের রূপে পরিণত হয়। বিসর্গরূপে পরাশক্তি আনন্দোদয়ের মাধ্যমে ইচ্ছা ও জ্ঞানের অবস্থা ভেদ করিয়া ক্রিয়াশক্তিরূপ ধারণ করে। ত্রিকোণের উল্লাস ইহারই দ্যোতক। এখানে শক্তি নিত্যোদিতা বলিয়া ইহা পরমানন্দময়। এই যোগিনীজন্মাধার ত্রিকোণ হইতে কুটিলরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি প্রকট হয়।

ত্রিকোণঃ ভগমিত্যুক্তং বিয়ৎস্থম্ গুপ্তমণ্ডলম্।
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াকোণং তন্মধ্যে চিঞ্চিনী ক্রমম্॥

বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত ইহারই অনুরূপ।

'এ' কারাকৃতি যৎ দিব্যং মধ্যং বংকারভূষিতম্।
আলয়ঃ সর্বসৌখ্যানাং বোধরত্নকরণ্ডকম্॥

বাহিরে দিব্য একার, ত্রিকোণের মধ্যে বংকার, ইহার মধ্যবিন্দুতে সর্বসুখের আলয় বুদ্ধরত্ন নিহিত রহিয়াছে। এই প্রজ্ঞাই রত্নত্রয়ের অন্তর্গত ধর্ম। এইজন্য 'এ' কারকে ধর্ম-ধাতু বলা হয়। বুদ্ধরত্ন এই ত্রিকোণের মধ্যে অথবা ষট্‌কোণের মধ্যবিন্দুতে প্রচ্ছন্ন আছে।

ষড়ঙ্গ যোগ

এবার বৌদ্ধ যোগিগণের সমাদৃত ষড়ঙ্গ যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। হঠযোগ অথবা রাজযোগের সাহিত্যে যে অষ্টাঙ্গ অথবা ষড়ঙ্গ যোগের বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে বৌদ্ধ-গণের ষড়ঙ্গ যোগ পৃথক। গুহ্য সমাজ, মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, কালচক্রোত্তর তন্ত্র, মর্মকলিকা তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে নারোপাকৃত সেকোদ্দেশ টীকাতে ইহার আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহা বৌদ্ধ যোগ নামে পরিচিত, কিন্তু মনে হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষে এবং সম্ভবতঃ নাথ সম্প্রদায়েও ইহার প্রচলন ছিল। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য গীতাভাষ্যে (৪.২৮) ষড়ঙ্গ যোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ষড়ঙ্গ যোগের যে ছয়টি অঙ্গ যে নামে অঙ্গীকৃত হইয়াছে এই ছয়টি অঙ্গই প্রায় ওই প্রকার নামেই ভাস্করের গ্রন্থে উপলব্ধ হয়। ছয়টি যোগাঙ্গের নাম ক্রমশঃ এইপ্রকার — প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি ও সমাধি। ভাস্করভাষ্যে "অনুস্মৃতি" স্থানে "তর্ক" বলা হইয়াছে।

যোগীর চরম লক্ষ্য নিরাবরণ প্রকাশের উপলব্ধি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন যে ইহারই নাম সম্যক্ সংবোধি, মহাবোধি অথবা বুদ্ধত্ব। ইহাই উত্তম সিদ্ধি। সমাজোত্তর তন্ত্র মতে ষড়ঙ্গ যোগই ইহার প্রাপ্তির সাধন। ইহার চারটি উপায় আছে। তাহার মধ্যে প্রথম উপায় সেবাবিধান, দ্বিতীয়টি উপসাধন, তৃতীয়টি সাধন ও চতুর্থটি মহাসাধন নামে পরিচিত। মহোষ্ণীষ চক্রের সাধনকে সেবাসাধন বলা হয়। ইহা অশেষ ত্রৈধাতুক বুদ্ধবিম্বের স্বরূপ। অমৃত কুণ্ডলিনী-রূপে ইহাকে ভাবনা করা উপসাধন নামে পরিচিত। দেবতাবৃন্দের ভাবনাকে সাধন বলে। তাহার পর মহাসাধনের স্থান। ইহাই চরম ও পরম। আবরণের লেশমাত্র থাকিতে মহাবোধির উদয় হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ণরূপে সর্বপ্রধান আবরণ হইতে মুক্ত হইতে হইলে প্রভামণ্ডলের আবির্ভাব আবশ্যক এবং উহাতে পূর্ণতার পথিক-রূপী যোগীর প্রবেশলাভও আবশ্যক। কিন্তু অতি উচ্চকোটির যোগীর পক্ষেও প্রভাবমণ্ডলে প্রবেশ অতি দুরূহ ব্যাপার, কারণ যতক্ষণ দীর্ঘ-কালের সাধনার প্রভাব বজ্রসত্ত্ব অবস্থার বিকাশ না হয়, ততদিন ইহা কল্পনার অতীত, কিন্তু বজ্রসত্ত্ব অবস্থা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে পাঁচটি অভিজ্ঞান লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আরূঢ় হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ইহাও দুরাশা মাত্র। আচার্যগণ বলেন মন্ত্রসিদ্ধির উপায় প্রত্যাহার। ইহাই ষড়ঙ্গ যোগের প্রথম যোগাঙ্গ।

প্রত্যাহার তত্ত্বটি বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক — দশটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বৃত্তিলাভ করে। ইহার নাম আহরণ। এই সকল ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইয়া যখন আপন স্বরূপমাত্রের অনুবর্তন করে তখন ইহার নাম হয় প্রত্যাহরণ বা প্রত্যাহার। প্রত্যাহরণ কালে বিষয়গ্রহণ হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ভাবাপন্ন হয় না। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে পারিলে শুদ্ধ আকাশের ধূম, মরীচি, খদ্যোত, দীপকলিকা, চন্দ্র, সূর্য অথবা বিন্দু দর্শন হয়। এইগুলিকে নিমিত্ত বলে। এইপ্রকার দশটি নিমিত্ত আছে। চিত্ত অবধূতি মার্গে প্রবিষ্ট না হইলে ধূমাদি নিমিত্তের প্রতিভাস হয় না। এই সকল নিমিত্তের দর্শন স্থায়ী হইয়া গেলে মন্ত্র সাধকের অধীন হয় এবং বাকসিদ্ধির উদয় হয়। যখন আকাশে ত্রৈধাতুক বিম্বদর্শনকে প্রত্যাহারের অঙ্গ স্থির করিয়া উহাকে আয়ত্ত করা হয়, তখন যোগী সকল মন্ত্রেরই অধিষ্ঠাতা হইতে পারে। বিম্বদর্শন সিদ্ধি হইলে বুঝিতে হইবে প্রত্যাহারের কার্য সিদ্ধি হইয়াছে। তখন দ্বিতীয় যোগাঙ্গ ধ্যানের কার্য আরম্ভ হয়। ধ্যানে পরিপক্বতা লাভ হইলে পাঁচটি অভিজ্ঞা আয়ত্ত হয়। বৌদ্ধগণ বলেন স্থির ও চর যাবতীয় ভাবই পঞ্চ কামরূপ। পঞ্চবুদ্ধের ভাবনা দ্বারা এইগুলিকে বুদ্ধরূপে ভাবনা করা আবশ্যক। বৌদ্ধ মন্ত্রমতে ইহাই ধ্যানের স্বরূপ। ধ্যানের প্রভাবে বাহ্যভাব কাটিয়া যায়, চিত্ত দৃঢ় হয় ও বিম্বের সঙ্গে চিত্তের তাদাত্ম্য হইলে অনিমেষ বা দিব্যচক্ষুর উদয় হয়। দিব্য শ্রোত্র প্রভৃতির উদয়ও ইহারই অনুরূপ। ইহার পর অর্থাৎ অভিজ্ঞান পঞ্চকের আবির্ভাবের পর যোগের তৃতীয় অঙ্গ প্রাণায়ামের আবশ্যক। এই সময় মনুষ্যের বাম ও দক্ষিণ নাড়ীতে প্রবহণশীল দুইটি শ্বাসপ্রবাহকে নিরুদ্ধ ও একীভূত করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিতে হয়। পরে এই পিণ্ডকে মধ্যমার্গে সঞ্চারিত করিবার পর ইহাকে উর্ধ্বদিকে ক্রমশঃ উত্থাপন করিয়া নাসাগ্রে ধারণ করিতে হয়। ধারণা বলিতে ইহাকে কল্পনা বলিতে হইবে। ইহা মহারত্নস্বরূপ। মনুষ্যের স্বরূপ পঞ্চজ্ঞানময় ও পঞ্চভূতস্বভাব। তাই ইহা পঞ্চবর্ণ। এইজন্য নিরুদ্ধশ্বাসকে পঞ্চবর্ণ মহারত্ন বলিয়া উহাকে কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাকে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ললাট ও উষ্ণীষ

কমলের কর্ণিকাতে স্থির করা আবশ্যক হয়। নাসাগ্র ও উষ্ণীষ কমলের বিন্দু সমসূত্র। বজ্রযানী যোগী এই প্রাণায়ামকেই বজ্রজাক বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার তাৎপর্য এই যে দুইটি বিরুদ্ধ শ্বাসধারা সম্মিলিত হইয়া মধ্যনাড়ী পথে উত্থিত হইয়া নাসাগ্রস্থলে স্থিতি লাভ করে। সাধারণ মনুষ্যের প্রাণবায়ু অশুদ্ধ প্রকৃতির বাহন। তাই উহা সংসারের কারণ। যে সকল যোগী পঞ্চক্রম রহস্যবিৎ একমাত্র তাহারাই এই শ্বাসের রহস্য বুঝিতে পারে।

প্রাণায়াম সিদ্ধির ফলে বোধিসত্ত্বভাবের উদয় হয়, তখন বোধিসত্ত্বগণ তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে যোগের চতুর্থ অঙ্গ ধারণা অভ্যাসে অধিকার জন্মে। যোগদৃষ্টিতে নিজের ইষ্টমন্ত্রই প্রাণ। ইহাকে হৃদয়ে কর্ণিকার মধ্যে ধ্যান করিতে হয়, তাহার পর প্রাণকে ঊর্ধ্বে উত্থাপন করিয়া ললাটে বিন্দুর স্থানে নিরুদ্ধ করিতে হয়। প্রাণই মন্ত্র, কারণ ইহা মনকে ত্রাণ করে। এই প্রাণ বা ইষ্টমন্ত্রের শান্তভাব ধারণ পূর্বক বিন্দুস্থানে নিরোধ ধারণা নামে পরিচিত। ধারণার ফল বজ্রসত্ত্বে সমাবেশ। এই পর্যন্ত যতটা যোগাভ্যাস সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রভাবে মহারত্নস্বরূপ প্রাণবায়ু স্থিরতা লাভ করিয়াছে। এই স্থিরবায়ু নাভিচক্র হইতে চাণ্ডালী নাম্নী কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপন করে, তখন এই শক্তি বজ্রমার্গ হইতে মধ্য-ধারা অবলম্বন করিয়া উষ্ণীষ কমল কর্ণিকাতে উপনীত হয় ও কার্যাদি স্বভাব চারিটি বিন্দুকে গুরুনির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। ধারণাতে সিদ্ধিলাভ হইলে চাণ্ডালী শক্তি উজ্জ্বলতা লাভ করে এবং বোধিসত্ত্ব বজ্রসত্ত্ব অবস্থাতে উপনীত হয়, তখন গ্রাহক চিত্ত বা বজ্রসত্ত্ব শূন্যতাবিম্বরূপে গ্রাহ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যায়। বিন্দুতে ধারণার ফলে প্রাণ গতিশূন্য হয় বলিয়া একাগ্র হয়, তখন পঞ্চম যোগাঙ্গের আবির্ভাবের অবসর ঘটে। ধারণা পর্যন্ত অভ্যাসের ফল সংবৃত্তি সত্ত্বের ভাবনার নিশ্চলতা। এই সত্ত্বের দ্বারাই ত্রিধাতুর প্রতিভাসন হয়। যোগাঙ্গের পঞ্চম অঙ্গ — অনুস্মৃতি। ইহার উদ্দেশ্য সংবৃত্তি সত্তাকার একদেশ বৃত্তি আকার সমগ্র আকাশব্যাপীরূপে দর্শন। তখন ত্রিকালস্থ সমগ্র ভুবনের দর্শন লাভ ঘটে। ইহাই বস্তুতঃ অনুস্মৃতি স্বরূপ। অনুস্মৃতির ফলে বিমল প্রভামণ্ডলের আবির্ভাব হয় ও তাহাতে যোগীর প্রবেশ ঘটে। এই অবস্থায় চিত্ত সম্যক প্রকারে বিকল্পশূণ্য হয় এবং যোগীর লোমকূপ হইতে পঞ্চরশ্মির নির্গম হয়। ইহাকে মহারশ্মি

বলে। তখন গ্রাহ্য ও গ্রাহক চিত্ত এক হইয়া অক্ষর সুখের আবির্ভাব হয়। তখন নিখিল আবরণের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। ইহাই যোগের ষষ্ঠ অঙ্গ বা সমাধি। বুদ্ধত্ব ইহারই নামান্তর। অকস্মাৎ এক মহাক্ষণের মহাজ্ঞানের নিষ্পত্তি হইয়া সমাধি আবির্ভূত হয়। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সমাপত্তির দ্বারা প্রথমে সকল ভাবের সমাহার হয়। তখন পিণ্ডযোগে ভাবনাবিশেষের ফলে অকস্মাৎ মহাজ্ঞানের উদয় হয় ও নিষ্পন্নাদিক্রমে ব্যোমকেশের উদ্গম হইলে পূর্ববর্ণিত অক্ষর সুখের আবির্ভাব, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের সাম্য এবং চলাচল যাবতীয় প্রতিভাসের উপসংহার হয়। তখন পিণ্ডযোগ বশতঃ পরম অনাস্রব মহাসুখাত্মক প্রভাস্বর হইতে বিম্বের মধ্যে ভাবনা করিতে হয়। লৌহাদি সকল রস ভক্ষণ করিয়া যেমন একমাত্র সিদ্ধরস বিদ্যমান থাকে, এই পরম অনাস্রব মহাসুখময় প্রভাস্বরও তদ্রূপ সবকিছু গ্রাস করিয়া স্বয়ং অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতে থাকে। এই প্রভাস্বরের মধ্যে সংবৃত্তি সত্ত্বেরও বিম্বভাবনা করিতে হয়। ইহা সাক্ষাৎকারাত্মক। ইহার ফলে পরম মহাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তখন সংবৃত্তি সত্ত্ব ও পরমার্থ সত্ত্বের দ্বিধা ভাব কাটিয়া যায় এবং অদ্বয়রূপে উহাদের প্রকাশ হয়। যুগনদ্ধ বিজ্ঞানের ইহাই রহস্য। ইহাই বুদ্ধ বা আত্মার পরমস্বরূপ। সমাধিবশিতা বশতঃ নিরাবরণ ভাবের উদয় হয়। ইহাই অচলস্থিতি।

বাগ্‌যোগ

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে বৌদ্ধযোগ বাগ্‌যোগেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে জাগাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় শব্দ। বীজ, বর্ণ, মাতৃকা প্রভৃতি ইহারই রূপান্তর। কুণ্ডলিনী শক্তি প্রতি আধারে সুপ্ত রহিয়াছে। ইহাকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে ঐ জাগ্রত শক্তি সাধকের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া বৈচিত্র্য লাভ করে। এইজন্যে সাধকের ভিন্নতা-বশতঃ মন্ত্রও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে প্রকারে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলস্বরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার শব্দ-বীজ মূর্ত হইয়া দেব-দেবীর আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। মীমাংসা মতে দেবতা মন্ত্রাত্মিকা কিন্তু বেদান্ত মতে দেবতা বিগ্রহরূপা। বস্তুতঃ এই দুই মতই সত্য। বাচক ও বাচ্য অথবা নাম ও রূপ অভিন্ন বলিয়া

মন্ত্র ও দিব্য বিগ্রহ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিন্ন। নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে দেবতার সাকারতা ও নিরাকারতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংকেত করা হইয়াছে।

সর্বত্রই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধকের মন্ত্রবিচার তাহার প্রকৃতিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। রোগের নির্ণয় করিতে না পারিলে ঔষধ নির্ণয় করা যায় না। পঞ্চস্কন্ধের মূল বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন মূলে পাঁচপ্রকার ভেদই লক্ষিত হয়। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে ইহার পারিভাষিক মন্ত্র কুল। হেবজ্রতন্ত্রে কুলের বিবরণ আছে। দেবতা একই হইলে তাহাতে আবাহন করিতে হয়। অব্যক্ত অগ্নি হইতে যেমন প্রদীপ জ্বালান যায় না তেমনই অপ্রকট দেবতাকেও আবাহন করা যায় না। যে করণ বা সাধন দ্বারা দেবতাকে আবাহন করিতে হয় তাহাকে মুদ্রা বলে। এক একপ্রকার আকর্ষণের জন্য এক একপ্রকার মুদ্রার আবশ্যকতা আছে। দেবতা প্রকট হইয়া এবং পরে আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ গুণানুসারে নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। ইহার নাম মণ্ডল। মণ্ডলের কেন্দ্রে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা থাকেন। চারিদিকে বৃত্তাকারে অসংখ্য দেবী-দেবতা বাস করেন।

বৌদ্ধ ধর্মে জ্ঞান, যোগ ও চর্যাদিতে আগমের প্রভাব কখন কতটা ও কিরূপে পতিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। মনে হয় বীজরূপে ইহা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং কোন কোন বিশিষ্ট অধিকারী প্রাচীনকাল হইতেই এ বিষয়ে অনুশীলন করিতেন। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে তন্ত্রসাধনা অত্যন্ত গুপ্ত সাধনা এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধারারূপে চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ ও ইহার বাহিরে মিশর, এশিয়া মাইনর, মধ্যএশিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডে অতি প্রাচীন সময়ে ইহা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ও উপনিষদাদিতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বজ্রযান সম্বন্ধে বৌদ্ধসমাজে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ প্রথমে করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিদ্বান তারানাথ বিশ্বাস করিতেন যে প্রথম প্রকাশনের পর দীর্ঘকাল পুরুষপরম্পরা ক্রমে তন্ত্রসাধনা প্রচলিত ছিল। ইহার সিদ্ধমণ্ডলী ও বজ্রাচার্যগণ ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। চুরাশী সিদ্ধের নাম, তাঁহাদের মত ও তাঁহাদের অন্যান্য পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। নামের তালিকাতেও মতভেদ আছে। রসসিদ্ধ, মাহেশ্বরসিদ্ধ, নাথসিদ্ধ

প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সিদ্ধগণের পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধগণের সংখ্যা শুধু যে চুরাশী ছিল তাহা নহে, তদপেক্ষা অধিক ছিল। কোন কোন সিদ্ধের পদাবলী প্রাচীন ভাষাতে গ্রথিত দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বজ্রযান ও কালচক্রযান মানিতেন, কেহ কেহ সহজযান মানিতেন। প্রায় সকলেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

শব্দের মহিমা

সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সর্বত্রই সৃষ্টির মূলে শব্দের মহিমা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈদিক, তান্ত্রিক এবং অন্যান্য সাধনার চরম সিদ্ধান্ত ইহাই এবং অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যাইবে খৃষ্টীয়, মোহাম্মদীয় প্রভৃতি অন্যান্য দেশের সাধনতত্ত্বেরও ইহাই সার কথা। এই সম্বন্ধে প্রত্যেক সাধনার সিদ্ধান্ত লইয়া বিশ্লেষণ করিবার আবশ্যকতা নাই — মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১টি কথা বলিতেছি। সৃষ্টির অতীত স্পন্দহীন যে মহাসত্তা স্বপ্রকাশভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা একদিক হইতে দেখিলে যদিও স্পন্দের অতীত, তথাপি অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাকেও স্পন্দময় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। এই মূল স্পন্দনই আত্মার স্বাতন্ত্র্যরূপ পরাশক্তি। স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি সর্বদাই আত্মার সহিত অভিন্নরূপ একরসভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যই এই যে উহা আত্মার সহিত নিত্য অভিন্নরূপে থাকিয়াও ভিন্নবৎ প্রতীত হইতে পারে, এক থাকিয়াও অনেকবৎ প্রকট হইতে পারে এবং নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অনন্ত ক্রিয়াবিলাসরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই যে মূল স্বাতন্ত্র্য, ইহাকে অদ্বৈত তান্ত্রিকগণ বিমর্শশক্তিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। যে পরমসত্তার সহিত উহা অভিন্ন তাহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকাশ নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশ ও বিমর্শ দুইই এক, অথচ এক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে অনির্বচনীয় বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। কারণ, প্রকাশ বিমর্শহীন অবস্থায় স্বরূপতঃ থাকিলেও স্বপ্রকাশ বলিয়া পরিগণিত হন না। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ে কোন পার্থক্য থাকে না। বিমর্শের প্রভাববশতঃই প্রকাশ স্বয়ংপ্রকাশরূপে স্বানুভূতিগোচর হয়। এই বিমর্শই আত্মার মহিমা — ইহাই মহাশক্তির স্বরূপ। এই বিমর্শের নামান্তর অহংভাব। বিমর্শহীন প্রকাশে অহংভাবের স্ফুরণ থাকে না। এই জন্যই উহাকে অপ্রকাশ বা জড় বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। অহন্তাবর্জিত প্রকাশ জড়, অহন্তাবিশিষ্ট প্রকাশ চৈতন্য। জড় ও চৈতন্যের ইহাই নিদর্শন। মনে রাখিতে হইবে জড় এবং চৈতন্যে

বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কারণ প্রকাশাংশ উভয়ে একই। কেবল বিমর্শের স্ফুরণ-অস্ফুরণবশতঃই জড়-চৈতন্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়। এই যে অহন্তার কথা বলা হইল ইহার কোন প্রতিযোগী নাই। ইহা অপরিচ্ছিন্ন অহংভাব। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ইদংভাবের সত্তা এখনও প্রকটিত হয় নাই। এইজন্য ইহাকে পূর্ণাহন্তা বলে। পূর্ণাহন্তাই পরমেশ্বরের স্বরূপ। অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিকগণ ইহাকেই পরাবাক্ বা শব্দের আদিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সৃষ্টির পূর্বে নিত্য-সত্যরূপে শব্দই বিদ্যমান রহিয়'ছে, এই শব্দই প্রজ্ঞা। খণ্ড প্রজ্ঞা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিবার জন্য ইহাকে পূর্ণপ্রজ্ঞা বা মহাপ্রজ্ঞা বলিলেও ক্ষতি হয় না। বৌদ্ধগণ ইহাকেই প্রজ্ঞা-পারমিতা বলিতেন। ইনি সমগ্র জগতের প্রসূতি, শুধু জগৎ কেন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, সিদ্ধবর্গ এমন কি ঈশ্বর ভাবেরও প্রসূতি। কারণ, এই পূর্ণাহন্তাই মূল ঐশ্বর্য। ইহা পরমেশ্বরের অথবা আত্মার স্বভাব। বস্তু স্বভাববিরহিত থাকে না, সুতরাং আত্মা স্বরূপস্থিতিকালে কখনই পূর্ণাহন্তা বিরহিত হইয়া থাকেন না। St. John এর Gospel-এ যে বিবরণ আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্থাৎ The Word was with God and the Word was God। "Word" শব্দে এখানে মূল শব্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্ম ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নহে।

সৃষ্টিকালে এই শব্দ হইতেই অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 'অনাদিনিধনং ব্রহ্ম' শব্দের পরমতত্ত্ব। ইহা হইতে অর্থ আবির্ভূত হয়। তারপর এই জগৎরূপে দেশ ও কালগত অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রতিভাস-পূর্বক প্রকট হইয়া থাকে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন 'অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং বিবর্ততে অর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।" ইহা সর্বথা সমীচীন।

অদ্বৈত তন্ত্রমতে পরাবাক্ বা স্বাতন্ত্র্যবশতঃ আত্মা সর্বপ্রথম পশ্যন্তী ভূমিতে অবতীর্ণ হন। এই ভূমিতে বাচ্য ও বাচকের পরস্পর অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। পরাবস্থায় বাচ্যবাচক ভাব মোটেই থাকে না। সুতরাং সেখানে সম্বন্ধের কল্পনা নিরর্থক। উহা অদ্বৈত ভূমিরও অতীত। কিন্তু পশ্যন্তী অবস্থায় বাচ্য ও বাচক এই দুইটি ভাব থাকে। কিন্তু উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। এই বাচ্য-বাচকই অর্থ ও শব্দের স্বরূপ। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য, অথচ উভয়ই অভিন্ন।

মধ্যমা ভূমিতে বাচক ও বাচ্যের অভেদ থাকিলেও একটা ভেদের আভাস স্ফুরিত হয়। এই অবস্থায় শব্দ হইতে অর্থ পৃথক বস্তুরূপে পরিগণিত হয় না অথচ সর্বথা অভিন্নতাও থাকে না। ইহা ভেদাভেদের অবস্থা। এই অবস্থাতেই শব্দ অর্থরূপে প্রতীয়মান হয় এবং কি ভাবে উহা ঘটিয়া থাকে তাহা যোগের প্রত্যক্ষগোচর। শব্দের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বাচ্য অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। লৌকিক শব্দের অর্থবোধের জন্য যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম বর্তমান আছে ইহার কোনটিই সেখানে প্রযোজ্য হয় না। শব্দের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ তাহার অব্যবহিত পরেই অর্থের উদয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ সংহারকালেও অর্থের উপশম শব্দের মধ্যেই হইয়া থাকে। এই মধ্যমাভূমি অত্যন্ত রহস্যময়। এই ভূমিতে অবস্থিত হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় শব্দ এবং অর্থ এই দুইটি অবিনাভাব সম্বন্ধ। শব্দ আয়ত্ত হইলে তাহা হইতে যেমন অর্থকে ফুটাইয়া তোলা যায় তদ্রূপ অর্থ আয়ত্ত হইলে তাহা হইতে তাহার অর্থ আবিষ্কার করা যায়। উভয়ে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকার দরুণ একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শব্দ ও অর্থই বস্তুতঃ নাম ও রূপ। বৈখরীভূমিতে শব্দ হইতে অর্থের পৃথক্‌করণ সুসম্পন্ন হয়। তখন বিস্মৃতির উদয় হয় ও তাহার ফলে শব্দ হইতে অর্থকে এবং অর্থ হইতে শব্দকে স্বাভাবিক নিয়মে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় শব্দ ও অর্থের মধ্যে ভেদ সম্বন্ধ থাকে। জগতের অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ এই বৈখরীভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইজন্য তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া শব্দের সহিত অর্থকে যোজনা করিতে হয়। এই ভূমিতে সংকেত অথবা convention অঙ্গীকার করিয়া শব্দ হইতে অর্থবোধের উপাদান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেখানে শব্দ-অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ লুপ্ত না হইয়াছে সেখানে এই convention আবশ্যক হয় না। পরাভূমি হইতে বৈখরীভূমিতে অবতরণই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইতিহাস। এইভাবে মূল পরমশব্দ জাগতিক অর্থরূপে ক্রমশঃ এক এক ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ফিরিবার সময় বিপরীত ক্রমে জাগতিক অর্থ হইতে ক্রমশঃ মূল শব্দে উপনীত হইতে থাকে। মূল শব্দের আবিষ্কার হইলেই জীবের জীবত্ব চিরদিনের জন্য অপগত হইয়া যায়। জীব পরমশিব রূপে নিজের নিত্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া

ধন্য হয়। তখন এই মূল মহাশব্দ তাহার স্বভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বৈতবাদিগণ বলেন চিৎশক্তি অথবা পরমেশ্বরের নিত্যসমবেতা পরমাশক্তি বিন্দু নামক শুদ্ধ অচিৎ পদার্থকে স্পর্শ করিলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টির সূচনা করে। তাই পারমেশ্বরী শক্তি ক্রিয়াশক্তি রূপেই বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার যেটি নিষ্ক্রিয়াবস্থা তাহাতে বিন্দুর ক্ষোভ্য-ক্ষোভক ভাব থাকে না। বিন্দুর নামান্তর মহামায়া অথবা কুণ্ডলিনী। যখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হয় তখন ঐ ক্ষোভের ফলে নাদের ধারা প্রবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে কলা, তত্ত্ব ও ভুবন এই তিনটি এবং বর্ণ, মন্ত্র ও পদ এই তিনটি — মোট ছয়টি অধ্বার আবির্ভাব বুঝিতে পারিলে বিন্দু হইতে কিভাবে শব্দের ধারা এবং অর্থের ধারা প্রকটিত হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিন্দুতে যে সকল জীব বা পশু বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা মায়া অতিক্রমপূর্বক বিলীনভাবে সুষুপ্তবৎ বর্তমান রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহাদের মলরূপী আবরণ পরিপক্ব হইয়াছে তাহারা সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া জাগিয়া উঠে। ইহাই তাহাদের চৈতন্যের বিকাশ। এই বিকাশ বৈন্দবদেহ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। বৈন্দবদেহ বিন্দু অথবা কুণ্ডলিনী হইতে উদ্ভূত। বিজ্ঞানাকল নামক অণুসকল ভগবৎদত্ত দীক্ষার ফলে এই শুদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজের যোগ্যতানুরূপ অধিকার ও ভোগ লাভ করিয়া থাকে। বৈন্দব রাজ্যের সৃষ্টি, ওখানকার দেহ সৃষ্টি এবং তাহাদের অধিকারাদি সম্পত্তি সবই ভগবৎদত্ত কৃপার ফল। এই অবস্থাটি মায়াতত্ত্বের উপরে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার সহিত মায়া অথবা কর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান ৮ জন অষ্ট মন্ত্রেশ্বররূপে ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহার নিম্নবর্তী পরিপক্বমল ৭ কোটি বিজ্ঞানাকল মন্ত্ররূপে শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভগবানের মায়িক জীব উদ্ধাররূপ মহা-কার্যের ইহারাই প্রধান সহায়ক। ইহার মধ্যে মন্ত্রেশ্বরগণ গুরুরূপে এই অনুগ্রহ কার্যের কর্তা হন এবং মন্ত্রগণ বিদ্যারূপে এই অনুগ্রহ কার্যে গুরুবর্গের অধীন করণ হয়। ইহাই অপরামুক্তির অবস্থা। প্রলয়াকল নামক যে সকল জীব প্রলয়কালে মায়াতত্ত্বে সুষুপ্ত থাকে তাহাদের মধ্যেও যাহারা মলের পরিপাকবশতঃ অধিকতর যোগ্য তাহারাও

পূর্ববৎ ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রেশ্বর রূপে আবির্ভূত হন। ইহাদের মায়াভেদ হয় নাই বলিয়া ইহাদের মায়িক দেহও বর্তমান থাকে। অথচ দীক্ষার ফলে বৈন্দব দেহও আয়ত্ত হয়। ইহারা উভয় দেহ বিশিষ্ট। ইহারা মায়াগর্ভস্থ জগতের অধিকারিমণ্ডল। এই উভয় প্রকার মন্ত্রেশ্বরের অধীনে থাকিয়া মন্ত্রবর্গ জীব-উদ্ধার কার্যে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারও পরবৈরাগ্যের উদয় হইলে সে তৎক্ষণাৎ পূর্ণত্ব লাভ করে এবং অধিকার হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়। তখন নিম্নভূমিস্থ অধিকারী ঐ রিক্তপদে উন্নীত হয় এবং মায়াগর্ভ হইতে অন্তিম পদের জন্য অধিকারী নির্বাচিত হয়। বলাবাহুল্য এই সকল অধিকারী প্রলয় পর্যন্ত অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা শুদ্ধাধিকারী তাহাদের স্থিতিকাল মহাপ্রলয় পর্যন্ত।

যে ৮টি ঈশ্বরের কথা বলা হইল তাহাদের জন্য যিনি প্রধান তাঁহার নাম অনন্ত। তিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা। তাঁহার সংকল্প হইতে মায়া ক্ষুব্ধ হইয়া মায়িক জগৎ প্রসব করে। শিব যেমন শুদ্ধ জগতের প্রতিষ্ঠাতা অনন্তও তেমনি মায়িক জগতের অধিষ্ঠাতা। শুদ্ধ জগৎ যেমন বিন্দুরূপ মহামায়া হইতে উদ্ভূত হয়, মায়িক জগৎ তেমনি মায়াতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয়। শুদ্ধ জগৎ সৃষ্টির মূলে শিবের নির্বিকল্প চৈতন্যশক্তি কাজ করিয়া থাকে। অশুদ্ধ জগতের সৃষ্টির মূলে অনন্তাখ্য ঈশ্বরের সবিকল্পক জ্ঞানরূপ কল্পনা-শক্তি কার্য করিয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি যাহা ক্রিয়াশক্তিরূপে বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে তাহা বিন্দুর অতীত পরনাদ। ইহা বিন্দুক্ষোভজনিত নাদ নহে। ঈশ্বরের সবিকল্পক জ্ঞান বা সংকল্প বিন্দুসমুত্থিত নাদ শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ চৈতন্য। অতএব শুদ্ধ জগতের সৃষ্টির মূলে পরনাদরূপ শব্দ, শুদ্ধ জগতের সৃষ্টির মধ্যে অপরনাদরূপ বিন্দুজন্য শব্দ, এবং অশুদ্ধ মায়িক জগতের সৃষ্টির মূলে অপর নাদের দ্বারা অনুবিদ্ধ চৈতন্যরূপী ঐশ্বরিক শব্দ। সৃষ্টির নিম্নস্তরেও এই-প্রকার শব্দ হইতেই সৃষ্টির ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ হইতে সৃষ্টিপ্রণালী বুঝিবার পক্ষে যে সকল বাধা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া চিত্তকে যথাসম্ভব সংস্কাররহিত করিতে পারিলে রহস্যের উদ্‌ঘাটন সহজসাধ্য হয়। অক্ষর-ব্রহ্মকে শব্দাত্মক বলিয়া পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি শব্দব্রহ্ম, ইনি স্বরূপতঃ কলাতীত

হইলেও ইহাতে স্বরূপানুবিদ্ধ অনন্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল শক্তি মূল শব্দ হইতে পৃথক অথবা ভিন্ন নহে। ইহা স্বরূপের সহিত অভিন্ন বলিয়া ইহাদিগকে স্বরূপশক্তি বলা হয়। এই সকল শক্তিই কলা নামে অধ্যাত্ম শাস্ত্রে পরিচিত। এই সকল কলাই নিত্য কিন্তু নিত্য হইলেও ইহারাই সৃষ্টির আদি প্রবর্তক। এই সকল নিত্য কলা হইতেই বিকারাত্মক জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল নিত্য কলা, সমষ্টিরূপে মহাপদবীবাচ্য। এই প্রকৃতি কালশক্তিকে আশ্রয় করিয়া যোনিরূপে পরিণত হয়। যোনিবর্গ হইতে অনন্ত ভাবপুঞ্জ আবির্ভূত হয়। এই যোনিবর্গই আত্মার কলাদেহ। কলাদেহ হইতে যে সৃষ্টির উদ্ভব হয় তাহা ক্রমবদ্ধ এবং বিকারাত্মক। এই সৃষ্টিচক্র ষড়র নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম, সত্তালাভ, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং নাশ, সৃষ্টিচক্রের এই ছয়টি অর।

নিত্যকলা মহাবিন্দুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইগুলি নিরন্তর মার্গভেদে বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্তে ঘুরিতেছে। সাধক জপের সময় ইহাই অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম কালচক্রের আবর্তন। এই আবর্তন হইতে বেগের তীব্রতা অনুসারে অহোরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর চক্র পর্যন্ত চক্র রচিত হইয়াছে। ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি মহাপ্রলয় পর্যন্ত কালচক্রের আবর্তনের মূলে এই নিত্যামণ্ডলের সঞ্চরণ রহিয়াছে। পঞ্চদশ নিত্যা আবর্তন-রূপে নিরন্তর পরিক্রমা করিতেছে। যিনি ষোড়শী তিনি বিন্দুরূপে মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মূল চক্রটিকে ত্রিকোণাত্মক ধরিয়া লইলে বুঝিতে হইবে এই পঞ্চদশ নিত্যাই ত্রিকোণমণ্ডলের তিনটি ভুজ। তিনটি ভুজই পরস্পর সমান; কারণ প্রত্যেকটি ভুজ ৫টি করিয়া নিত্যা বা কলাদ্বারা গঠিত। এই মণ্ডলের মধ্যবিন্দুরূপে যিনি রহিয়াছেন তিনি নিত্য প্রকাশমান চিদানন্দস্বরূপ — তিনি ষোড়শী কলা। পঞ্চদশ কলার আবর্তন আছে বলিয়া তাহা হইতে ক্ষরণ হয়। কিন্তু ষোড়শকলা হইতে অমৃত দ্বারা পঞ্চদশকলা আপূরিত না হইলে পঞ্চদশ কলা হইতে ধারারূপে অমৃতক্ষরণ সম্ভব-পর হয় না। এই অধঃপ্রবাহ হইতেই সৃষ্টির সূচনা হয়। ষোড়শী কলা হইতে ঊর্ধ্বপ্রবাহ একটি রশ্মি সপ্তদশীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। উহা কালের অতীত। উহাকেই আশ্রয় করিয়াই নিত্য জগতের আবির্ভাব হয়।

শব্দময়ী কলা কালকে আশ্রয় করিয়া ক্রম অবলম্বন পূর্বক অর্ধ-রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ষোড়শী কলা শব্দরূপে নিজের সৃষ্টি নিজে দেখিয়া থাকেন। সংহারকালে অর্থকে লীন করিতে পারিলে ঐ শব্দ ক্রমশঃ পঞ্চদশীতে পর্যবসিত হয়। তারপর কালচক্র ভেদ করিতে পারিলেই বিন্দুতে প্রতিষ্ঠা হয়। কালচক্র হইতে বিন্দুতে লইয়া যাওয়া ইহাই গুরুশক্তির কার্য। যে সৃষ্টি কালের অধীন তাহাতে ক্রম আছে কিন্তু নিত্য সৃষ্টি কালের অধীন নহে, তাহাতে ক্রম নাই। উভয় সৃষ্টিই শব্দ হইকে উত্থিত। মন্ত্রাদি জপ হইতে দেবতাদের যে আবির্ভাব তাহা বাস্তবিক পক্ষ্যে অনিত্য সৃষ্টিও নহে, নিত্য সৃষ্টিও নহে। বস্তুতঃ উহা কালের মধ্যে নিত্য সৃষ্টির অভিব্যক্তি। যাহা নিত্য জগতের সিদ্ধসত্তা জপাদি দ্বারা তাহার আবরণ সরিয়া গেলে কালরাজ্যে তাহার আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ নিত্য সৃষ্টিও সৃষ্টি বটে, যদিও তাহা অনন্ত। এই সৃষ্টির মূলেও শব্দের ক্রিয়া রহিয়াছে।

চিদাকাশ হইতে চৈতন্যরূপ শব্দের উত্থান হয়। যখন ঐ শব্দ প্রতিধ্বনিরূপে মায়িক আকাশে ফুটিয়া উঠে তখন উহাতে মায়ার আবরণরূপে একটি পর্দা পড়িয়া যায়। চৈতন্যশব্দ জড়শব্দে পরিণত হয়, কিন্তু জড়শব্দ হইলেও যতক্ষণ বায়ুর ক্রিয়ার উন্মেষ না হয় ততক্ষণ উহাতে অবিচ্ছিন্নতা থাকিয়া যায়। এই পর্যন্তই নাদের গতি। ইহার পর বায়ুতত্ত্বকে আশ্রয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরাকাশে বাহ্য-সত্তার আভাস একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠে। আন্তরভাব তখনও দূর হয় নাই অথচ বাহ্যভাব ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। চরম অবস্থায় যখন আন্তরভাব লুপ্ত হয় এবং একমাত্র বাহ্যভাবই বিদ্যমান থাকে তখন ভেদজ্ঞানের উদয় হয় এবং আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে। শব্দ এবং অর্থ উভয়ের স্বরূপে আবরণ পড়ার দরুণ শব্দ ও অর্থ তখন পরস্পর পৃথক হইয়া যায়। তখন শব্দ হইতে আর অর্থকে পাওয়া যায় না এবং অর্থ হইতেও শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় বর্ণাত্মক বৈখরীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা কন্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত অবস্থান করে। ৪৯ বায়ুর স্বাভাবিক কম্পনের তারতম্যানুসারে নাদরূপী শব্দ ৪৯ ভাগে বিভক্ত হয়। সমষ্টি লইয়া ৫০ এবং সমষ্টি সহ ৫১। ইহাই বর্ণমালার সংখ্যা। উহার মধ্যে অনেক রহস্য আছে, তাহা অবান্তর বলিয়া

এখানে উল্লেখ করা গেল না। বর্ণমালার সৃষ্টি এবং অনন্ত জ্যোতিঃ হইতে রশ্মিউদ্‌গম সমকালীন ব্যাপার। এই সকল বর্ণ বিষদন্ত-বিহীন সর্পের ন্যায় অথবা জলহীন শরৎকালের মেঘের ন্যায় নামে-মাত্র শব্দরূপে পরিচিত। এই সকল বর্ণের সম্যক্ প্রবোধনপূর্বক তাহাদের পরস্পর সংঘটন সম্পন্ন করিতে পারিলে ইচ্ছানুসারে পদার্থ সৃষ্টি করা যায়। বস্তুতঃ মন্ত্রোদ্ধার এই মহাতত্ত্বের বিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে।

নাদের স্বরূপ

নাদ করিতে করিতে ধ্বনি অথবা নাদের বিকাশ হইয়া থাকে। নাদ মূলে এক হইলেও ইহাতে অনন্ত প্রকার সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে। যেমন একই প্রকার আলোকে অনন্ত-প্রকারের রূপ প্রকাশিত হয় তেমনি একই মহানাদে অনন্তপ্রকারের খণ্ড শব্দ নিহিত থাকে। মহানাদকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে। শুধু আমাদের জগৎ নহে, লোক-লোকান্তর সমন্বিত অনন্ত জগৎ ঐ এক মহানাদেই প্রকাশমান হয়। ইহারই এক একটা অংশ এক একটি খণ্ডনাদ বলিতে পারা যায়। দেহকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য চক্র আবর্তিত হইতেছে। বস্তুতঃ ঐ চক্রসকলের আবর্তনেই দেহটি চৈতন্যময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ কত চক্র যে এই দেহে রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। কোন চক্রই স্থির নহে — সবগুলি আপন আপন বেগে আবর্তন করিতেছে। এই সকল ছোট বড় চক্রের ঘুর্ণীর ফলস্বরূপ আমাদের চিত্তে নানারূপ বৃত্তির উদয় হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তি অথবা মানসিক ভাবপুঞ্জ চক্র-সকলের আবর্তনের ফলজনিত অনুভব ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহাই আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা। এই সকল আবর্তন হইতে অনবরত তরঙ্গাত্মক শব্দ উত্থিত হইতেছে। যেমন একটি মেশিনে ছোট বড় নানাপ্রকার চাকা অনবরত ঘুরিতে থাকিলে শব্দের উদয় হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই সকল শব্দ ধ্বন্যাত্মক। প্রতি যন্ত্রের শব্দই ভিন্ন কিন্তু যন্ত্র বহুসংখ্যক বলিয়া সবগুলি ধ্বনি একসঙ্গে শ্রুতিগোচর হয়। এই সকল ধ্বনিই বহির্মুখ মন অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ এইগুলিকে ধ্বনিরূপে অনুভব না করিয়া মানসিক বৃত্তিরূপে অনুভব করে। বস্তুতঃ এই সবগুলি ধ্বনি। যাহাদের লক্ষ্য অন্তর্মুখ হইয়াছে তাহারা চিত্তের জল্পনা-কল্পনা সবগুলিকেই শব্দ-রূপেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই অশুদ্ধ শব্দের খেলা। এই ধ্বনিতেই জগৎ ডুবিয়া রহিয়াছে — অথচ বুঝিতে পারিতেছে না। যোগীর একমাত্র লক্ষ্য এই ধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হওয়া।

গুরুদত্ত নাম বা মন্ত্র যথাবিধি অভ্যাস করিতে পারিলে উহা হইতেও ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধ্বনি বিশুদ্ধ। ইহা অশুদ্ধ ধ্বনিকে শুদ্ধ করিয়া আপন স্বরূপে পরিণত করে। অশুদ্ধ ধ্বনিতে ধ্বনি অংশ অপেক্ষা বর্ণাংশের প্রাধান্য থাকে বলিয়া উহাতে বিকল্পের উদয় হয়। এই বর্ণভাগ ক্রমশঃ গলিয়া গিয়া সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিতে পরিণত হইলে এবং সেই ধ্বনি পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ ধ্বনিতে বিলীন হইলে একমাত্র শুদ্ধ ধ্বনিই বিরাজ করে। ইহাই চৈতন্যশক্তির খেলা। নাম বা মন্ত্রজপ হইতে এই বিশুদ্ধ ধ্বনিরই বিকাশ হয়।

ধ্বনি মূলবস্তু নহে ; উহা জ্যোতির ক্রিয়াজনিত অনুভূতি মাত্র। অর্থাৎ জ্যোতি আপনাতে আপনি বিশ্রান্ত না হইয়া বাহিরের দিকে উন্মেষ প্রাপ্ত হইলে জ্যোতির চারিদিকে অখণ্ড ধ্বনিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধ্বনিমণ্ডল বহিরুন্মেষ বা বাহ্যভাবের আধিক্যবশতঃ অশুদ্ধ ধ্বনিতে পরিণত হইয়া বায়ুসহযোগে বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হয়। অন্তর্মুখ গতিতে জপ ও ধ্যানের ফলে এই বর্ণমালা গলিয়া গিয়া অশুদ্ধভাব পরিহারপূর্বক শুদ্ধ ধ্বনিরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত যখন অন্তর্মুখ হয় তখন ধ্বনি হইতে জ্যোতির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। চরমাবস্থায় জ্যোতিই থাকিয়া যায় ; ধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হয় না। তখন যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় জ্যোতির বাহিরে ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং ধ্বনির বাহিরে বর্ণাত্মক শব্দ। এই বর্ণসমষ্টি লইয়া বদ্ধজীবের ভাব ও ভাষা রচিত হইয়াছে।

চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অবিদ্যার স্বরূপ। তাহা চক্ষু বুজিলেও যেমন থাকে, না বুজিলেও তেমনি থাকে। তবে লক্ষ্য বহির্মুখ থাকিলে বাহিরের আলো প্রকাশিত হয় বলিয়া ঐ ব্যাপক অন্ধকারটি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু উহা দূর হয় না। উহা দূর করিবার একমাত্র উপায় শুদ্ধ শব্দের প্রভাবে জ্যোতির বিকাশ। জ্যোতির বিকাশ ও স্থিতি হইলে পূর্বোক্ত অন্ধকারটি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। জ্যোতিতে স্থিতি-লাভ করিতে পারিলে এবং অভিভূত না হইয়া গেলে জ্যোতির মধ্যে রূপের আবির্ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্যোতির সহিত রূপের সম্বন্ধ দুইভাবে উপলব্ধ হয়। প্রথম বুঝিতে পারা যায় জ্যোতিই যেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘনীভূত হইয়া জ্যোতির্ময় দৃশ্যরূপে

পরিণত হইয়াছে। যেমন সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে জমিয়া বরফের পাহাড়রূপে পরিণত হয় ঠিক সেইরূপ। কিন্তু ইহার পর আর একটা অবস্থা আসে তখন বুঝা যায় জ্যোতিটি ঘনীভূত হইয়া রূপ হয় নাই কিন্তু রূপ হইতেই চারিদিকে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। ইহা অতি উচ্চ অবস্থা। জ্যোতির মধ্যে ইচ্ছার খেলা অনুসারে এই রূপের বিকাশ সম্ভবপর হয়। যে সাধকের ইচ্ছাশক্তি জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া অস্তমিত হইয়া যায় সে ঐ মহাজ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া যায়, উঠিতে পারে না এবং তাহার নিজের সত্তা পৃথক ভাবে অনুভূত হয় না বলিয়া তাহার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তবে সদ্‌গুরু বা ভগবান্ তাহাকে ঐ মহাজ্যোতির কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের চরণে লইয়া আসিতে পারেন। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলিলাম তাহারও পরাবস্থা আছে। তখন রূপ শুধু রূপই থাকে। তাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয় না। তাহা দেখিবার জন্য আলোকের আবশ্যকতা হয় না। ঐ রূপ স্বয়ং প্রকাশ। ঐখানে শব্দ প্রবেশ করিতে পারে না, জ্যোতিও প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাই নিজ ধামের ক্ষীণ আভাস। সংক্ষেপে বলিলাম।

নাম হইতে শব্দ জাগে ইহা সত্য, কাম হইতে জাগে ইহাও সত্য। কারণ শব্দ চৈতন্য। তীব্র আঘাত পাইলেই উহা ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ উহা সর্বদা জাগিয়াই আছে। যাহার চিত্তে ধ্বনি নিত্য জাগ্রত রূপে বর্তমান নাই তাহার পক্ষে কামের প্রভাবে ঐ ধ্বনির সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নহে। শুধু কাম কেন, তীব্র ক্রোধ বা ঐ জাতীয় অন্য কোনও বৃত্তির প্রভাবেও ধ্বনি জাগিয়া উঠিতে পারে। যাহা হইতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহা হইতেই ঐ জাগ্রত নাদ সাধকের অন্তরে নিজেকে প্রকাশিত করে। বস্তুতঃ এই বিচিত্র কারণে অর্থাৎ কামাদির প্রভাবে ধ্বনির উন্মেষ অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সংঘর্ষের নিদর্শন মাত্র। যাহার অন্তঃপ্রকৃতি বহিরুন্মুখ সে ঐ প্রকার ধ্বনি ঐ অবস্থায় উপলব্ধি করে না। পক্ষান্তরে যাহার বহিঃপ্রকৃতি অন্তরুন্মুখ সেও ঐ প্রকার ধ্বনি উপলব্ধি করে না।

বহিঃপ্রকৃতি অন্তরুন্মুখ হইলে এবং তদনুরূপ থাকিলে যে ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা স্বাভাবিক ক্রমে মূল স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। ধ্বনিতে ধ্বনিতে যে ভেদ আছে ইহা সত্য। বস্তুতঃ প্রত্যেক স্তরের ধ্বনিই পৃথক। এইখানে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

প্রাণায়ামের সাহায্যে এবং মন্ত্রের সাহায্যে এই উভয় প্রকার উপায়েই নাদ উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু নাদ যে ভাবেই উত্থিত হউক তাহার মূল প্রক্রিয়া একই। বিন্দুরূপিণী মহামায়া সাক্ষাদ্ ভাবে শুদ্ধ জগতের এবং পরম্পরাতে অশুদ্ধ জগতের উপাদান কারণ। যখন পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা চিৎশক্তি এই বিন্দুকে আঘাত করেন, তখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। বিন্দু ক্ষুব্ধ না হইলে নাদের আবির্ভাব হইতে পারে না এবং মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্যমূলক আঘাত ব্যতিরেকে বিন্দুর ক্ষোভ সম্পাদিত হয় না। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া একদিকে যেমন শাব্দী সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হয়, অপর দিকে তেমনি আর্থী সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর এবং যাবতীয় শুদ্ধ জগতের অধিবাসিবর্গের দেহ ও করণ, এই ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতেই সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রচিত হইয়া থাকে। শব্দের সঙ্গে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়েরই মূলে বিন্দু ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায়, ছত্রিশটি তত্ত্ব এবং তত্ত্বময় বিশ্ব মূলতঃ বিন্দু ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই বিন্দুরই নামান্তর কুণ্ডলিনী শক্তি। ব্যষ্টিরূপে মানবদেহে জীবকুণ্ডলিনীরূপে এবং সমষ্টিরূপে বা মহাসমষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বদেহে জগৎ-কুণ্ডলিনীরূপে এই শক্তিই বিরাজ করিতেছে। সুতরাং কুণ্ডলিনী হইতেই নাদের আবির্ভাব। মাতৃগর্ভে যখন জীবদেহ রচিত হয় এবং বিশ্বমাতৃকার গর্ভে যখন আদিসৃষ্টির উদ্ভব হয় — উভয়ত্রই কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহা সৃষ্টির দিক্‌কার কথা। কিন্তু সাধক যখন নাদকে অভিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তখন উহা সংহার অথবা প্রত্যাবর্তন পথেই করিতে হয়। এইজন্যই প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও আমরা ব্যবহারিক ভাষাতে বলি যে নাদকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে তথাপি ইহা সত্য যে বাস্তবিক পক্ষে মহাপ্রলয় না হওয়া পর্যন্ত নাদ চির অভিব্যক্তই রহিয়াছে —নাদকে অভিব্যক্ত করিতে হয় না। নাদ যদি অব্যক্ত থাকিত তাহা হইলে সৃষ্টি থাকিতে পারিত না, কারণ সৃষ্টি নাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ত্রই এই কথা। অতএব নাদকে অভিব্যক্ত করার অর্থ এই অভিব্যক্ত নাদকে উপলব্ধি-গোচর করা। প্রাণায়ামের দ্বারা কুম্ভক প্রভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ হইলেও সুষুম্নারূপে সূক্ষ্ম বায়ুর গতি অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। তখন মন ইড়া-পিঙ্গলা মার্গ পরিহার করিয়া যে অনুপাতে

সুষুম্না-পথে প্রবিষ্ট হয়, সেই অনুপাতে সুষুম্নাস্থ নাদধ্বনি শুনিতে পায়। সুষুম্না শূন্য পথ, শূন্যই আকাশ, নাদ উহারই ধর্ম। সুতরাং যতক্ষণ আকাশ বা ব্যোমপথে প্রবিষ্ট না হওয়া যায়, ততক্ষণ নাদ-শ্রবণ কি প্রকারে হইতে পারে? কুম্ভকের দ্বারা এই ব্যোমপথেই প্রবেশ লাভ হয়। সেইজন্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যোগ থাকা নিবন্ধন নাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র বস্তুতঃ নাদময়। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়াই মন্ত্রের স্বরূপ রচিত হয়। মন্ত্রের দেহ বৈন্দব দেহ সন্দেহ নাই। তবে আমাদের অচৈতন্য বশতঃ এই নাদরূপী মন্ত্রে নানাপ্রকার আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে। জপাদির দ্বারা এবং অন্যপ্রকার সাধনার প্রভাবে এই আগন্তুক আবরণ অপসারিত হইলেই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভূত হয়। আকাশে সূর্য উদিত থাকিলেও মেঘের আচ্ছাদনবশতঃ যেমন তাহা উপলব্ধি-গোচর হয় না, ঠিক সেইপ্রকার মন্ত্র নাদময় হইলেও আবরণ-বশতঃ এই নাদময়তা অনুভূত হয় না। যাহাকে মন্ত্র-চৈতন্য বলে তাহাই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভব। বস্তুতঃ মন্ত্র নিত্যচেতন, তথাপি যতক্ষণ আবরণ অপসারিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে চেতন বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না।

সুতরাং মন্ত্র জাগিলে সুষুম্নাপথে নাদধ্বনিরূপে উহার সন্ধান পাওয়া যায়। কুম্ভকের ফলে মন সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইলেও ঐ প্রকার নাদধ্বনি পাওয়া যায়। যে কোন প্রকারেই হউক সালম্ব ভাব হইতে কিঞ্চিৎ নিরালম্ব ভাব আসিতে আরম্ভ করিলেই নাদের আবির্ভাব হইতে থাকে। নাদের বিকাশ ভিন্ন আকাশমার্গে সঞ্চার বা খেচরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। শূন্য, মহাশূন্য, অতিশূন্য প্রভৃতি শূন্যের ঔপাধিক ভেদ রহিয়াছে। সেই প্রকার নাদের অভিব্যক্তিতেও ক্রম আছে, কারণ নাদ হইতে মহানাদ পাওয়া না গেলে নিত্যগুরুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে যে-কোন উপায়েই হউক সুষুম্নাপথে লক্ষ্য পড়িলেই নাদ শ্রুতিগোচর হয়। সামান্য দৃষ্টিতে উপলব্ধির প্রকারভেদবশতঃ নাদের ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রাণায়ামের ফলে নাদের অনুভব এবং মন্ত্রজপের ফলে নাদের অনুভব — এই উভয় অনুভবে এক দৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য নাই। ইহা সামান্য অনুভব কিন্তু বিশেষ অনুভবও আছে। কারণ, মৃত্তিকা

দ্বারা রচিত যাবতীয় মৃণ্ময় বস্তু সজাতীয় হইলেও যেমন একটি মৃণ্ময় বস্তুর সহিত অপর একটি মৃণ্ময় বস্তুর সজাতীয় ভেদ আছে, তেমনি বিন্দুক্ষোভজন্য সকল নাদই সজাতীয় হইলেও একটি নাদের সহিত অন্য নাদের পার্থক্য আছে। সামান্যাংশে অভেদ এবং বিশেষাংশে ভেদ ইহাই উভয়ে ইতরবিশেষ।

মন্ত্র-বিজ্ঞানের এক দিক্

মন্ত্রের স্বরূপ কি, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ইহার স্থান কোথায়, মন্ত্র-সাধনের তাৎপর্য কি — এই সকল প্রশ্ন সাধারণতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নও যে উদিত না হয় — এমন নহে। এ বিষয়ের প্রকৃত সমাধান জানিতে হইলে মন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে নিজের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া বা বিন্দুর উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিক্ষেপই চৈতন্য-শক্তির সঞ্চার। দৃষ্টিপাতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মহামায়া সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। বিশুদ্ধ জড়শক্তির নাম মহামায়া। যে সকল অণুরূপী জীব পূর্বকল্পের সাধনা, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, বিবেকজ্ঞান প্রভৃতির ফলে অশুদ্ধ জড়শক্তিরূপা মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বরের নিজ স্বরূপে উপনীত হইতে পারে নাই, তাহারা মহামায়ার গর্ভে বিদ্যমান থাকে। এই সকল জীবের অবস্থা সুষুপ্তিবৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়া হইতে মুক্ত হওয়ার ফলে এই সকল জীবের যেমন অশুদ্ধ মায়িক দেহ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ থাকে না, তেমনি কোন উচ্চতর বিশুদ্ধ দেহও থাকে না। ইহারা মায়ার ঊর্ধ্বে, মহামায়ার গর্ভে লীন থাকে। মায়াগর্ভে অবস্থান যে প্রকার, মহামায়ার গর্ভে অবস্থানও অনেকটা সেই প্রকার — উভয়ের মধ্যে শুধু আবরণগত পার্থক্য আছে। অপ্রাকৃত দিব্য-অবস্থা বা ভাগবত অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। চৈতন্যের বিকাশ ব্যতীত তাহার আবির্ভাব ঘটে না। উহা পশুত্বের অতীত অবস্থা। মায়ার নিদ্রা এবং মহামায়ার নিদ্রা, উভয় স্থলেই পশুভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। পশুত্ব থাকা পর্যন্ত প্রকৃত জাগরণ কোথায়?

মহামায়ার বিশ্রান্তিকালে তদ্‌গর্ভনিহিত জীবসকল সুষুপ্ত থাকে। উহাদের জীবত্ব পশুত্বমূলক। চৈতন্যের উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা তিরোহিত হয় না। ঐ সকল বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত অশুদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবত্তা লাভের দুইটি অন্তরায় আছে। একটি আত্মার স্বরূপগত

অণুত্ব বা পশুত্ব। ইহা অভিন্ন-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক চৈতন্যের স্বরূপের আচ্ছাদন, আর একটি মহামায়ার সম্বন্ধ। এই দুইটি আবরণ নিবৃত্ত হইলে শুদ্ধ ভগবত্তার অভিব্যক্তির পথ খুলিয়া যায়।

যখন সৃষ্টির আদিতে মহামায়াতে চৈতন্যশক্তির আধান হয়, তখন ঐ শক্তির ক্রিয়াবশতঃ মহামায়া ক্ষুব্ধ হইয়া কার্যোন্মুখ হয় এবং তাহাতে সুপ্তবৎ নিহিত অণুরূপী জীব-সকলও জাগিয়া উঠে। নিদ্রা-কালে ঐ সকল জীব বিদেহ অবস্থায় মহামায়াতে লীন থাকে, কিন্তু মহামায়া ক্ষুব্ধ হওয়া মাত্রই উহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন অণু কখনও জাগিতে পারে না। তাই মহামায়ার ক্ষোভের ফলে ক্ষুব্ধ মহামায়া হইতে ঐ সকল অণুর প্রয়োজনানুরূপ দেহ প্রভৃতি উৎপন্ন ও বিকশিত হয়। সুতরাং যখন তাহারা জাগিয়া উঠে, তখন আর তাহারা কেহই বিদেহ থাকে না — তাহারা মহা-মায়াজাত দেহ লইয়াই প্রকাশিত হয়।

মহামায়াতে চৈতন্যশক্তির আবেশ এবং ঐ সকল অণুতে চৈতন্য-শক্তির সঞ্চার একই কথা, কারণ অণুসকল সুপ্ত অবস্থায় মহামায়ার সহিত অভিন্ন হইয়াই বিদ্যমান থাকে।

মহামায়ার গর্ভে অসংখ্য অণু বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাপ্রলয়ের অবস্থায় ইহারা সকলেই সমভাবে লীন থাকিলেও চৈতন্যশক্তির সম্পাতে সকলে সমভাবে প্রবুদ্ধ হয় না এবং হইতেও পারে না। কোন কোন অণুরই জাগরণ হইয়া থাকে — সকলের নহে। যদিও সকল অণুই মলবিশিষ্ট এবং চৈতন্য বা ভগবদনুগ্রহের আবশ্যকতা যদিও সকলেরই সমভাবে আছে তথাপি মলের গরিপক্বতা সকলের সমান নহে। যাহার মল যত বেশী পরিপক্ব তাহার মল তত বেশী পরিমাণে চৈতন্যশক্তির দিকে উন্মুখ হয়। মল অনাদি কাল হইতে আত্মাকে অণুরূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। অণুত্বই পশুত্ব — ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম নহে। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম শিবত্ব বা পূর্ণচৈতন্য। ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অভিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ। মল অনাদি হইলেও আগন্তুক। ইহা দ্বারা ঐ স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকে। তখন শিবরূপী আত্মা জীব বা পশুরূপে পরিণত হয়। এই মল কালশক্তি দ্বারা নিরন্তর পরিপক্ব হইতেছে। সৃষ্টিকালে পরি-পাকের অন্য উপায়ও যে না আছে তাহা নহে, তবে প্রলয়কালে ঐ উপায় কার্য করে না। পরিপক্বতার এমন একটি মাত্রা আছে যাহা

প্রাপ্ত হইলে ঐ সকল অণু আপনা হইতেই চৈতন্যশক্তির অভিমুখে উন্মুখ হয়। আকাশস্থ সূর্যের কিরণ সমুদ্রের উপরে এবং কতকটা তলদেশ পর্যন্ত পতিত হয়, কিন্তু যে সকল জীব ঐ কিরণের সীমারেখা পর্যন্ত উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারা আপাততঃ ঐ কিরণের ক্রিয়া হইতে বঞ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা ঐ কিরণের স্পর্শ প্রাপ্ত হয়, তাহারা উহার প্রভাবে জাগিয়া উঠে এবং আপন মলপাকের মাত্রানুরূপ বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া শুদ্ধ জগতে সঞ্চরণ করিতে থাকে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অপক্বমল জীবসকলের সুষুপ্তি ভঙ্গ হয় না। সাধারণতঃ কল্পান্তরে তাহাও হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বলা বাহুল্য, এই স্থলে আমরা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তির খেলার দিক্‌টার উল্লেখ করিলাম না। স্বাতন্ত্র্যশক্তির দিক্ হইতে বিচার করিলে মলের পরিপক্বতার উপরে চৈতন্যশক্তির সঞ্চার নির্ভর করে, একথা সর্বত্র সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই স্থলে সাধারণ নীতির দিক্ই অনুসরণ করা হইয়াছে। যে সকল জীবের আলোকস্পর্শ হয় বলিয়া বলা হইল, তাহারা সকলেই পুরাতন জীব। তাহারা সংসারে পতিত হইয়াছিল এবং প্রত্যাবর্তন মুখে মায়া পর্যন্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহামায়ার মধ্যে 'কেবলী'-রূপে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মায়ারাজ্য ভেদ হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে বাসনা-মুক্তি হয় নাই, কারণ মায়াতীত বাসনা এখনও রহিয়াছে। মায়িক বাসনা ক্ষীণ করিবার জন্য মায়িক দেহ গ্রহণ করিয়া মায়িক জগতে কর্ম করিতে হয়। দেহ গ্রহণ না করিলে বাসনা-ক্ষয় হয় না। মায়াতীত বাসনার ক্ষয় করিতে হইলে তদনুরূপ দেহ গ্রহণ করিয়া তাদৃশ কর্ম সম্পাদন আবশ্যক। মায়িক বাসনা মলিন, কিন্তু মায়াতীত বাসনা বিশুদ্ধ। কর্তৃত্ব-অভিমানবশতঃ মায়িক জগতে কর্ম হয় এবং ভোক্তৃত্ব-অভিমানবশতঃ মায়িক জগতে ভোগ হয়। কর্মানুষ্ঠান ও কর্মফল ভোগকেই মিলিত ভাবে সংসার বলে। কিন্তু মায়াতীত বাসনার স্থলে কর্মের মূলেও ঠিক অহঙ্কার নাই এবং ভোগের মূলেও উহা নাই। এইজন্য উহাকে প্রকৃত সংসার বলা চলে না। সংসার বলিলে উহাকে শুদ্ধ সংসার বলা যাইতে পারে। এই মায়াতীত কর্মই 'অধিকার' এবং মায়াতীত ভোগই প্রকৃত ভোগ বা 'সম্ভোগ'। এই অধিকার ও ভোগের অতীত অবস্থা 'লয়'।

এখন প্রশ্ন এই ঃ মায়াতীত বাসনা বিদেহ অণুতে কি প্রকারে চরিতার্থ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, মায়াতীত বাসনা মায়াতীত দেহ দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। মায়িক বাসনার তৃপ্তি মায়িক উপাদান হইতে হয়, কিন্তু মায়াতীত বাসনার তৃপ্তি মায়িক উপাদান হইতে কি প্রকারে হইবে? এইজন্য যে মায়াতীত উপাদান আবশ্যক হয়, তাঁহার নাম মহামায়া। যখন চৈতন্যশক্তি মহামায়াকে স্পর্শ করে তখন পূর্ববর্ণিত পক্বমল জীবসকল জাগিয়া উঠে এবং ক্ষুব্ধ মহামায়া হইতে রচিত দেহ অধিষ্ঠান করিয়া আপন আপন কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। মহামায়ার নামান্তর কুণ্ডলিনী শক্তি। পূর্বোক্ত পক্বমল সকল জীবের দেহাদি কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে রচিত। ঐ সকল জীব তখন আর জীবপদবাচ্য থাকে না। তাহারা জীব হইয়াও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন।

পরমেশ্বরের করুণাদৃষ্টিরূপ চৈতন্যশক্তির সঞ্চারের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহা বস্তুতঃ চিৎশক্তিরই ক্রিয়াশক্তিরূপে উন্মেষ। চিৎশক্তির সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুইটি অবস্থা আছে। বস্তুতঃ অবস্থা দুইটি না হইলেও কার্যগত ভেদের জন্য কৃত্রিমভাবে দুইটি বলা হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে ক্রিয়ার অভাববশতঃ শক্তির সঞ্চার হয় না, সুতরাং এই শক্তিসঞ্চার বস্তুতঃ চিৎশক্তিময়ী ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার। ইহারই নামান্তর দীক্ষা। পরমেশ্বর স্বয়ং ক্রিয়াশক্তির প্রবর্তকরূপে চৈতন্য-দাতা গুরু। পূর্বোক্ত পরিপক্ব-মল জীব সৃষ্টির আদিতে ঐ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মহামায়া হইতে উদ্ভূত বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিলে পরমেশ্বরের আদি শিষ্যরূপে শুদ্ধ জগৎ বা মহামায়িক জগতে স্থিতি লাভ করে। আমরা যে মায়িক জগতের সহিত পরিচিত তাহার সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের চরম ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত হয়। ইহারা জীব হইয়াও ঈশ্বরকল্প, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর হইতে ন্যূন। কারণ ইহাদের শুদ্ধ বাসনা আছে, পরমেশ্বরের বাসনা নাই। সমষ্টি-ভাবে সমগ্র জগতের কল্যাণ কামনা — ইহাই শুদ্ধবাসনার স্বরূপ। আপাততঃ মনে হইতে পারে, বিশুদ্ধ বাসনার অতীত হইতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐটি বিশুদ্ধ কৈবল্য অবস্থা, ভগবদবস্থা নহে।

সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বরের চৈতন্যময়ী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে সকল জীব বিশুদ্ধ দেহ লাভ করে তাহারা সকলেই সমভাবাপন্ন নহে।

তাহাদের মধ্যেও অবান্তর ভেদ আছে। এক হিসাবে সকলকেই এক স্তরের বলা অবশ্যই চলে ; কারণ সকলের মধ্যেই চিৎশক্তির উন্মেষ রহিয়াছে। সকলেই শুদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছেন এবং ন্যূনাধিক ভাবে হইলেও সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তি জাগ্রৎ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়াশক্তির বিকাশে তারতম্য আছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধ জগতের চেতনবর্গের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, তাহার মূল ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য। এই তারতম্য কেন হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, অণু সকলের মল সমানরূপে পরিপক্ব থাকে না বলিয়াই. ভগবৎশক্তি অর্থাৎ পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি সকলে সমানরূপে ধারণ করিতে পারে না। মল যে পরিমাণে পক্ব না হইলে, চিৎশক্তির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তাহা শুদ্ধ রাজ্যের সকলেরই আয়ত্ত বা অধিগত হইয়াছে, ইহা সত্য ; কিন্তু এই পরিপক্বতার তারতম্য আছে। তদনুসারে যেখানে পরিপক্বতা অধিক সেখানে ক্রিয়াশক্তির আবেশ অধিক মাত্রায় হয়। মল পরিপক্ব না হইলে ক্রিয়াশক্তি ধারণ করা যায় না। এইজন্য অপক্ব-মল অবস্থায়, ক্রিয়াশক্তির সঞ্চার মোটেই হয় না। তাই মলপাক না হইলে শ্রীগুরু কখনই জীবকে অনুগ্রহ করেন না।

পক্বমল অণুসকলের মধ্যে যাহাদের মল সর্বাপেক্ষা অধিক পরিপক্ব, ক্রিয়াশক্তির আবেশ হইলে তাহাদের মধ্যে কর্তৃভাবের উদয় হয়। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ কর্তৃত্ব। ইহাতে অহংকারের সম্বন্ধ থাকে না। ইহাদের নীচে বহু সংখ্যক পক্বমল অণু পূর্বোক্ত প্রণালীতে ভগবৎশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা চৈতন্য লাভ করে। ইহাদের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি অপেক্ষাকৃত ন্যূন বলিয়া ইহাদের মধ্যে কর্তৃভাবের উন্মেষ না হইয়া করণভাবের উন্মেষ হয়। যে কয়েকজনের মধ্যে কর্তৃভাবের উন্মেষ হয় তাহারা এক হিসাবে সজাতীয় হইলেও তন্মধ্যেও পরস্পর ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে। তদ্রূপ কারণশক্তিময় সমষ্টিতেও পরস্পরের মধ্যে উক্তপ্রকার ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে, যাহারা কর্তৃভাবাপন্ন তাহারা ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যাহারা করণভাবাপন্ন তাহাদের অবলম্বন শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্ব। এই বিদ্যা মায়াতীত জ্ঞানস্বরূপ। যে কয়েকজন ঈশ্বরতত্ত্বে অবস্থান করে তাহারা ঈশ্বর অথবা গুরু ; যাহারা বিদ্যাতত্ত্ব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা মন্ত্র অথবা দেবতা।

এই সকল মন্ত্র ঈশ্বর অথবা গুরুর অধীন। ইহারা গুরুর দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া মায়িক জীবের উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহারা স্বতঃপ্রেরিত হইয়া পূর্বোক্ত জীবোদ্ধারে ব্যাপৃত হইতে পারে না, কারণ ইহারা করণ, কর্তা নহে।

গুরু এবং দেবতা উভয়ই শুদ্ধদেহসম্পন্ন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ-লাভে উভয়ের মধ্যে নিজ স্বরূপজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে — নিজের শিবত্ববোধরূপ জ্ঞানের উদয় উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে হইয়াছে। তবে গুরু কর্তৃভাব লইয়া এবং দেবতা করণভাব লইয়া কার্য করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অন্য দিক্ হইতেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। যদিও পরমেশ্বরের অনুগ্রহশক্তি উভয়ের মধ্যেই পতিত হইয়াছে, তথাপি ব্যক্তিগত বিকাশের দিক্ দিয়া তারতম্য অস্বীকার করা যায় না। যে সকল আত্মা তত্ত্বভেদক্রমে উর্ধ্বগতির ফলে মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা মলপাকের দরুণ ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইলে দেবতা পদে আরূঢ় হয়। ইহাদের নাম মন্ত্র। আত্মিক বিকাশ এতটা না হইলে প্রকৃত দেবত্বলাভ হয় না। মায়ার অন্তর্গত দেবতার কথা আমরা বলিতেছি না। মায়াতীত দেবতার একমাত্র শুদ্ধ দেহই থাকে ; অশুদ্ধ দেহ থাকে না। কিন্তু গুরুর অবস্থা অন্য প্রকার। মল যদি অত্যন্ত পরিপক্ব হয় তাহা হইলে চৈতন্যশক্তির অবতরণ তাহাতে অবশ্যম্ভাবী এবং মলপাকের তীব্রতা-বশতঃ কর্তৃভাবের আবেশ স্বাভাবিক। এই সকল অণু দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আচার্য-অধিকার লাভ করিয়া থাকে। তত্ত্বভেদক্রমে আত্মিক বিকাশ ইহাদের যতটাই হউক, তাহাই যথেষ্ট। যে যে তত্ত্বে অবস্থিত, গুরুপদে অধিরূঢ় হইলেও তাহার মায়িক দেহ সেই তত্ত্বেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদনুগ্রহের ফলে যে বিশুদ্ধ দেহ বা বৈন্দব দেহ প্রাপ্তি হয় তাহা গুরুপদবাচ্য সকল আত্মারই একপ্রকার। মায়াতত্ত্ব ভেদ না করা পর্যন্ত গুরু-মাত্রেরই দুইটি দেহ থাকে। তন্মধ্যে একটি গুরুদত্ত শুদ্ধ দেহ, যাহা মহামায়া বা কুণ্ডলিনীর উপাদানে গঠিত এবং অপরটি নিজ নিজ মায়িক দেহ। এই দ্বিতীয় দেহ জীবের ক্রমবিকাশের মাত্রা অনুসারে কোন-না-কোন মায়িক তত্ত্বে আশ্রিত থাকে ; অর্থাৎ কাহারও মায়িক স্থূল দেহ পার্থিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস, ইত্যাদি। দেহের বিকাশ বলিতে দেহের উপাদানকে নিম্নবর্তী তত্ত্ব হইতে উর্ধ্বতত্ত্বে পরিণত করা বুঝায়। কার্য্যের গতি

কারণের দিকে এবং কারণের গতি তাহার স্ব-কারণের দিকে। এই-প্রকার পার্থিব দেহ জলীয়ে এবং জলীয় দেহ তৈজসে পরিণত হইতে পারে। ইহাই দেহের উপাদানগত উৎকর্ষ। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ এই তত্ত্বভেদরূপী উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে না। এই উৎকর্ষ প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের ফল। চৈতন্যশক্তির অবতরণ একমাত্র মলের পরিপক্বতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য কেহ পৃথ্বীতত্ত্ব ভেদ না করিয়াও ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার কেহ মায়াতত্ত্ব অতিক্রম করিয়াও উহা প্রাপ্ত হয় না। তত্ত্বভেদের উপর শক্তির অবতরণ নির্ভর করে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, অণু মায়াতত্ত্ব ভেদ করিলেও যতদিন মলপাক করণভাবের অভিব্যক্তির উপযোগী না হয়, ততদিন উহার উপর ভগবানের অনুগ্রহশক্তি সঞ্চারিত হয় না। ঐ সকল অণুকে কল্পান্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। কারণ, দেবদেহের রচনা সৃষ্টি-সময়ে হয় না, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে হইয়া থাকে। যদি মায়াভেদ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তো কোন প্রশ্নই নাই। কারণ, মায়াভেদ না করা পর্যন্ত কোন আত্মাতে মলপাকবশতঃ ভগবানের শক্তিলাভ হইলেও দেবত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না। মায়াভেদের পর যে সকল আত্মা মলপাকের ফলে ভগবদনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা লাভ করে, তাহাদের উপর কল্পান্তরে শক্তির অবতরণ হইয়া থাকে। বর্তমান কল্পে ঐ সকল আত্মা মহামায়াতে লীন থাকে।

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, কোন বিশিষ্ট কল্পের আত্মা অনুরূপ মলপাক সত্ত্বেও সেই কল্পে দেবত্বলাভ করিতে পারে না। এমন কি, মায়াভেদ হইয়া গেলেও তাহা সম্ভবপর হয় না। তাহাকে মহামায়াতে কল্পান্তরের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিশ্রাম করিতে হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গুরু সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। গুরুতে শক্তির অবতরণই প্রধান ; অর্থাৎ যতটা মলপাক হইলে কর্তৃভাবের আবেশ দীক্ষাকালে সম্ভবপর হয়, তাহা হইবেই। মায়াভেদ না করিলেও ক্ষতি নাই। এমন কি কোন নিম্নবর্তী তত্ত্বে অবস্থান করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, গুরুভাবের অভিব্যক্তিতে জীবের স্বকৃত ঊর্ধ্বগতির মাত্রানির্দেশ আবশ্যক হয় না। ঠিক ঠিক মল পরিপক্ব থাকিলে স্বীয় বিকাশের ফলে যে যেখানে আছে, সেখান হইতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া শুদ্ধদেহ এবং আচার্যের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। তবে যদি

তাহার মায়াতত্ত্ব ভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

সর্বত্রই ইহা সত্য যে, দেবতা গুরুর অধীন। দেবতা স্বভাবতঃ মহামায়ার রাজ্যের অধিবাসী। কিন্তু গুরু মহামায়ার রাজ্যের অধিবাসী হইয়াও যুগপৎ মায়া রাজ্যের অধিবাসী হইতে পারেন। অবশ্য এই স্থলে সৃষ্টিকালীন গুরুর কথা বলা হইতেছে, যাঁহাদের মায়াদেহ এবং শুদ্ধদেহ দুইই আছে। সৃষ্টির অতীত গুরুদের কথা এখানে বলা হইতেছে না — তাঁহারা মায়াদেহ-বর্জিত এবং বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহ সম্পন্ন।

পূর্বোক্ত বিবরণে তত্ত্বভেদপূর্বক উর্ধ্বগতির কথা বলা হইয়াছে। ইহা একটু পরিষ্কার করিয়া আলোচনা না করিলে কাহারও বোধগম্য হইবে না। এইজন্য সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলিতেছি। সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির মূল উপাদানস্বরূপ একটি বস্তু থাকে। আপাততঃ ইহাকে জড় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ইহার এক দিক্ (ভিতরের) শুদ্ধ এবং অপর দিক্ (বাহিরের) অশুদ্ধ। যতদিন সৃষ্টির উদয় না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই ভিতর-বাহির বিভাগটি বুঝিতে পারা যায় না। এমন কি, এই অচিৎস্বরূপ মূল উপাদানটি যে আছে, তাহাও জানিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বরের দৃষ্টি শুদ্ধাংশের উপর পতিত হয়, তখন উহা জ্যোতিরূপে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠে, শুদ্ধের বাহিরে অশুদ্ধ অংশটি ছায়া বা অন্ধকাররূপ ঐ জ্যোতিঃ-স্বরূপকে ঘিরিয়া থাকে। এই শুদ্ধাংশ বা জ্যোতিটি মহামায়া, বাহিরের ছায়াটি মায়া। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই উভয়ের মধ্যে একই অচিৎ-সত্তা রহিয়াছে। ইহা ক্ষুব্ধ হইয়া স্তরে স্তরে তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব অচিতের মূল বিভাগ নহে। অচিতের মূল বিভাগ পাঁচটি কলা। ইহার মধ্যে শুদ্ধাংশে দুইটি এবং অশুদ্ধাংশে তিনটি কলা অবস্থিত। প্রত্যেকটি কলা অবান্তর ভাবে তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। তদনুসারে জ্যোতির্ময় রাজ্যে পাঁচটি তত্ত্ব এবং মায়া বা ছায়া রাজ্যে একত্রিশটি তত্ত্ব অভিব্যক্ত আছে। পাঁচটি কলাই পর পর অধিকতর বহির্মুখ। তদ্রূপ উহা হইতে অভিব্যক্ত তত্ত্বগুলিও উহারই ন্যায় পরপর অধিকতর বহির্মুখ। যেখানে বহির্মুখতার পরাকাষ্ঠা তাহার নাম পৃথিবী। তদ্রূপ যেখানে অন্তর্মুখতার চরম সীমা, তাহার নাম

শিব বা মহামায়া। বস্তুতঃ ইনিই কুণ্ডলিনীস্বরূপ। এই শিব শিব-নামে পরিচিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বিশুদ্ধ জড়-বস্তু। ইহারই নাম আদিতত্ত্ব বা বিন্দু। তত্ত্বাতীত শিব বা পরমেশ্বর ইহা হইতে পৃথক্।

এই তত্ত্বগুলি স্তরে স্তরে সাজানো আছে। বিশ্বের সর্বত্রই এই ক্রমবিন্যাস দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি তত্ত্ব হইতে কতকগুলি ভুবনের আবির্ভাব হয়। ভুবনগুলি তত্ত্বের ন্যায় গুণ, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতির বিকাশের তারতম্য অনুসারে অধঃ-উর্ধ্ব ভাবে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে। উর্ধ্ব প্রদেশ হইতে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রদেশ পর্যন্ত এই সকল ভুবনের সমষ্টি জীবের নিকট বিশ্ব নামে পরিচিত। জীব আপন আপন অধিকার ও যোগ্যতা অনুসারে প্রতি স্তরেই বিদ্যমান আছে। জীব সৃষ্টিকালে অর্থাৎ বিশ্বমধ্যে অবস্থান কালে দেহযুক্ত হইয়াই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু প্রলয় অবস্থায় জীবের দেহ থাকে না। তখন জীব মায়াতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে লীন হইয়া সুষুপ্তবৎ অবস্থান করে, অথবা যদি কোন কৌশলে মায়াভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহামায়ার মধ্যে সুষুপ্তবৎ লীন থাকে। মায়ার মধ্যে যে ত্রিশটি তত্ত্ব আছে, তাহার প্রত্যেকটিকে এবং মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব আছে ও থাকিতে পারে। এই সকল তত্ত্বের মধ্যে জন্য-জনক ভাব অথবা অধঃ-উর্ধ্ব বিভাগ আছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। তদনুসারে তত্ত্ববর্তী জীবসমূহেরও শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শ্রেণীবিভাগ তত্ত্বের আপেক্ষিক উৎকর্ষমূলক। উহা হইতে জীবের স্বকীয় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রলয় জড়ের ক্রিয়াসাপেক্ষ — উহা জীবের সাধনার অধীন নহে। যখন উপাদানের মধ্যে বহির্মুখ প্রেরণা আসে, তখন সৃষ্টির দিকে প্রবৃত্তি হয়। পক্ষান্তরে যখন উপাদানের মধ্যে সঙ্কোচ ভাব আসে তখন ঐ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ বাড়িতে থাকে এবং চরম অবস্থায় মূল উপাদানরূপে কেন্দ্রে স্থিতি হয়।

অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে যে সকল জীব এই, মূল উপাদান অতিক্রম করিয়া শুদ্ধবিদ্যার নীচে অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে মলপাকের তারতম্যে কেহ কেহ নবীন সৃষ্টিতে দেবভাবে আবির্ভূত হয়। ইহাদের দেহ বৈন্দব। অবতরণ মুখেও এক প্রকার দেবভাবের আবির্ভাব হয়। তাহারা স্বভাবতই মায়াতীত। তাই তাহারা

শুদ্ধ হইলেও ক্রমবিকাশের নিয়মের অধীন নহে। তাহারা এক প্রকার অব্যক্তভাবাপন্ন। বলা বাহুল্য, উভয়ই মায়ার অতীত ভূমির কথা।

ঠিক এইপ্রকার অশুদ্ধ অথবা মায়িক দেবতাও আছে। ইহার রহস্য বুঝিতে পারিলে শাস্ত্রবর্ণিত আজান দেবতা, কর্মদেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দেবতার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

জপ রহস্য

পরম পদে প্রবিষ্ট হইয়া স্বভাবের ধারা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে জপ অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। জপের নানাপ্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই দুইটি প্রধান। যাহাকে শাস্ত্রে বৈখরী জপ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই বাহ্য জপ, ইহা প্রারম্ভিক ক্রিয়া। আন্তর জপ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম। বাহ্য পূজা হইতে যেমন আন্তর পূজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বাহ্য জপ হইতে আন্তর জপ শ্রেষ্ঠ। বিধিপূর্বক নানাপ্রকার বর্ণের উচ্চারণই বাহ্য জপের লক্ষণ — ইহাকে আচার্যগণ বিকল্পাত্মক সংজল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি পরম পথের ও পরম পদের অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে ক্রমশঃ বাহ্য জপে বিমুখ হইয়া আন্তর জপে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রথম প্রারম্ভ অবশ্য বৈখরী হইতেই হইয়া থাকে। কর্তৃত্বাভিমান লইয়াই সঙ্কল্পপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কণ্ঠ জপই বৈখরী জপের স্থূল লক্ষণ। বাচিক, উপাংশু ও মানসিক — এই তিনপ্রকার জপই বৈখরীর অবান্তর ভেদ। এই তিনটি ভেদেই "জপ করা" ভাবটি থাকে। মানস কর্মেও যেমন কর্ম, সেই প্রকার মানস জপও বস্তুতঃ বৈখরী জপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মানস জপ করার মূলেও কর্তারূপে অহং ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ 'আমি জপ করিতেছি' এই ভাবটি স্ফুট অথবা অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহার পর ধীরে ধীরে অবস্থান্তরের উদয় হয়। তখন কণ্ঠরোধ হইয়া যায় — প্রযত্ন দ্বারা জপ করা আর চলে না। কর্মকারিণী নাড়ী সকল কিয়দংশে স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন জপ আপনা আপনি ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ইহার নাম 'জপ হওয়া'। ইহা স্বভাবের জপ। ইহার তিনটি ভেদ আছে। প্রথমে হৃদয়ে জপ হয়, তাহার পর দ্বিতীয়াবস্থায় নাভিতে হয় এবং অন্তে মূলাধারে হইয়া থাকে। হৃদয় জপকেই মধ্যমামার্গে প্রবেশ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই অবস্থায় নাদ আপনা আপনি চলিতে থাকে। মধ্যমাতে প্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত শুধু বাহ্য জপে নাদ শ্রুতি হয় না। বাহ্য জপে মন্ত্রাক্ষরের পৃথক পৃথক উচ্চারণ থাকে বলিয়া উহা বিকল্পময়, তাই

উহা প্রকৃত মন্ত্র নহে। মধ্যমা ভূমিতে যখন নাদের সহিত মন্ত্র স্বভাবতঃ ধ্বনিত হইয়া উঠে তখনই উহা আন্তর জপ বলিয়া জানিতে হইবে। আপন আপন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের সঞ্চার নিরুদ্ধ করিয়া আভ্যন্তর নাদে উচ্চারণ করিতে হয়।

সংনিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রোচ্চরেন্নাদমান্তরম্।
এষ এব জপঃ প্রোক্তো ন তু বাহ্যজপো জপঃ ॥

পরম ভাবের দিকে যে পুনঃ পুনঃ ভাবনা তাহাই আন্তর জপ — নাদের প্রকটাবস্থা।

হৃদয়-কমল মধ্যে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে উপনিষদে হৃদয়াকাশ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ সেই অনাহত প্রদেশে সর্বদাই ভগবতীর আনন্দময় স্বরূপ নাদরূপে পরিণত হইয়া চারিদিকে সংসর্পিত হইতে থাকে। আমাদের মন সাধারণতঃ বহির্মুখ থাকে বলিয়া এই নাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন গুরুকৃপায় মন অন্তর্মুখ হয়, তখন পরিস্ফুট ভাবে ইহার পরিচয় উপলব্ধি করা যায়। তাহার প্রভাবে নেত্রে অশ্রুর উদগম হয়, সমস্ত শরীরে পুলক বা রোমাঞ্চের সঞ্চার হয় এবং অন্যান্য সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হয়।

বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ এবং উপাংশু জপ হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ, ইহা শাস্ত্রে সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বাচিক জপে বাহ্য বায়ুর সম্বন্ধ অধিক কিন্তু উপাংশু জপে এই সম্বন্ধ অনেকটা ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু তবুও কিছু কিছু থাকে। প্রকৃত মানস জপে বাহ্য জপের সম্বন্ধ একপ্রকার থাকে না বলিলেই চলে। বাহ্য বায়ুর প্রভাববশতঃই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যে অনুপাতে ঐ প্রভাব কমিয়া আসে সেই অনুপাতে বিক্ষিপ্ততাও হ্রাস পাইতে থাকে। বাচিক জপ অপেক্ষা মানসিক জপে যে একাগ্রতা অধিক আবশ্যক হয় এবং সেইজন্যই যে জপের উৎকর্ষ অধিক তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাচিক জপে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু ঠিকভাবে যথাবিধি জপ হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হইয়া যায়। শ্বাসের গতি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা না করিলেও বাচিক জপ উপাংশু জপে পরিণত হইয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি একান্তভাবে ক্ষীণ হইলে বিনা চেষ্টাতেই উপাংশু জপ মানসিক জপে পরিণত হয়। ঐ সময় বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া স্তম্ভিতপ্রায়

হয় অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলার ক্রিয়া অনেকটা শান্ত হয়। জপ প্রসঙ্গে যে শক্তি এতক্ষণ ইড়া-পিঙ্গলার পথে সঞ্চরণ করিতেছিল, তাহা তখন সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং এতক্ষণ যে শব্দ বাহিরে উচ্চারিত হইতেছিল, সুষুম্নাতে শক্তির অন্তঃপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মধ্যমায় বায়ুর প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে তাহা ভিতরে ভিতরে উচ্চারিত হইতে থাকে। কিন্তু এই বাহ্য উচ্চারণ এবং আভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ঠিক একপ্রকার নহে। বাহ্য উচ্চারণ বাহ্য বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই বায়ু ইড়া-পিঙ্গলার পথে প্রবাহিত। কিন্তু অ্যাভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ভিতরের বায়ু দ্বারা সিদ্ধ হয়, এই বায়ু সুষুম্না পথে প্রবাহিত হয়। বাহ্য বায়ু স্থূল, ভিতরের বায়ু সূক্ষ্ম। সুষুম্নাতে বায়ুর উর্ধ্বগতি না হইলে প্রকৃত মানসিক জপ হয় না। বাহ্য বায়ুকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালনা করিয়া ধ্বনিরূপে পরিণত করিতে হয়। কিন্তু সুষুম্নাস্থিত বায়ু নিয়ত উর্ধ্বগমনশীল বলিয়া সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সুষুম্না নিরন্তর শব্দময়। ইহার সহিত কুণ্ডলিনীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহ্য জপের অনুষ্ঠানের ফলে যখন সুষুম্নাতে কিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ হয় তখন পূর্বোক্ত বাহ্য জপের সংস্কার সুষুম্নাকে রঞ্জিত করে। ইহার ফলে অনবচ্ছিন্ন নাদ সাধকের বাহ্যজপের অনুরূপ ধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া শ্রুতিগোচর হয়। এই অবস্থায় মন্ত্রজপ ভিতর হইতে আপনা আপনি হইতে থাকে, চেষ্টা করিতে হয় না। ইহা বস্তুতঃ অজপারই একটি অবস্থা। প্রচলিত মানসিক জপ হইতে এই মানসিক জপ অনেকাংশে পৃথক — কারণ প্রচলিত জপে সাধকের চেষ্টা থাকে কিন্তু এই প্রকার মানসিক জপে চেষ্টা থাকে না।

বৈখরী হইতে মধ্যমা, মধ্যমা হইতে পশ্যন্তী, এবং পশ্যন্তী হইতে পরা — ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। বাচিক ও উপাংশু জপ উভয়ই বৈখরীতে হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক জপ মধ্যমা ভিন্ন হয় না। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ এক সত্তায় পরিণত হয়। ইহাই চৈতন্যের স্ফুরণ। আত্মসাক্ষাৎকার, মন্ত্রসিদ্ধি, ইষ্টদর্শন, অপরোক্ষ দর্শন প্রভৃতি পশ্যন্তী অবস্থারই ব্যাপার। পরাবস্থা অব্যক্ত। মধ্যমা অবস্থাতেই শব্দ হইতে জ্যোতির আবির্ভাব আরম্ভ হয়, হৃদয়ের সঞ্চিত অন্ধকার মধ্যমা নাদের সময়ই বিগলিত হইতে থাকে। বৈখরী ও

পশ্যন্তীর অন্তরাল অবস্থায় বাহ্য দৃশ্য জগৎ তিরোহিত হইয়া স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত ভাবময় একটি অনন্ত জগৎ ফুটিয়া উঠে। এই জগৎ উপসংহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যাপক আলোকরাশি এবং তদালোকিত অনন্ত দৃশ্যরাশি বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে পরিণত হয়। ইহাই আত্মজ্যোতি। ইহা পশ্যন্তী বাকের অবস্থা। এই জ্যোতিতে ডুবিতে পারিলে এবং ডুবিয়া আত্মহারা না হইলে জ্যোতির মধ্যে আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহারও পরাবস্থা আছে। এখানে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

বর্ণাত্মক শব্দ হইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দে প্রবেশ করিতে না পারিলে যোগপথ পাওয়া যায় না। ধ্বন্যাত্মক শব্দই নাদ। বর্ণরূপী শব্দ যতক্ষণ বিগলিত হইয়া বৈচিত্র্য পরিহার করিতে না পারে, ততক্ষণ নাদরূপী শব্দের উপলব্ধি হয় না। নাদ ভিন্ন বিন্দুর উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? রেখা যেমন গতিহীন হইলে বিন্দুরূপ ধারণ করে নাদও তেমনি প্রবাহহীন হইলে বিন্দুরূপে পরিণত হয়। এই বিন্দুই পূর্ববর্ণিত জ্যোতি। আত্মস্বরূপের ইহাই অভিব্যঞ্জক।

শাস্ত্র এবং মহাজনগণের অনুভব হইতে জপের অনেক রহস্য অবগত হওয়া যায় কিন্তু এই সকল রহস্যের বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, কারণ সাধকের চিত্ত যতক্ষণ কৃত্রিম উপায় হইতে অকৃত্রিম স্বভাবসিদ্ধ উপায়ের অবলম্বন করিতে না পারে ততক্ষণ কার্যক্ষেত্রে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন সদ্‌গুরু কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিষ্যের অধিকার অনুসারে কোন না কোন প্রকারে তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন তখন ঐ দীক্ষা ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিশুদ্ধকায় অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয় তাহাই বাস্তবিক পক্ষে শিষ্যের স্বদেহ। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে তাহাতে যেমন ফলের আবিষ্কার হয়, তদ্রূপ গুরুদত্ত বীজ শিষ্যের হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে যথাবিধি পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইলে শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, জ্ঞানরূপ দেহ উৎপন্ন করিবেই করিবে। বীজ যেমন অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং বাহির হইতে কেবলমাত্র পরিকর্মের আবশ্যকতা হয় তদ্রূপ বীজ গুরুশক্তি বা চৈতন্যশক্তির প্রভাবে শিষ্যক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া আপনা আপনি বিকশিত

হইতে থাকে। শিষ্যকৃত সাধনা পরিকর্মরূপে প্রতিবন্ধক অপসারণ করিয়া তাহার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে মাত্র। শিষ্যের যাবতীয় ক্রিয়া গুরুদত্ত অথবা গুরুকর্তৃক অভিব্যাঞ্জিত চৈতন্যশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, জপাদি যাবতীয় সাধন-ক্রিয়া একমাত্র উদ্‌বুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইহাই স্বাভাবিক সাধন। কর্তৃত্বাভিমানশীল জীব এই সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ দেহাভিমানের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি বা গুরুশক্তি আপন স্বভাবে উহা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় যে জপাদি হয়, তাহা প্রচলিত জপাদি হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। বস্তুতঃ ইহা অজপারই খেলা। কারণ ইহার মূলে স্থূলদেহী জীবের কোন চেষ্টা থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রভাবে যে ভাবে ইহা চলিতে থাকে এবং পর পর যে সব অবস্থার উদ্ভব হয় সাক্ষীরূপে জীব তাহা অনুভব করিতে পারে।

কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি জাগাইয়া না দিলে সাধনের ঐ স্বাভাবিক মার্গ আয়ত্ত হইতে পারে না। গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যকে চৈতন্যের আভাস মাত্র তাহাকে সাধন প্রণালী উপদেশ দিয়া থাকেন। শিষ্যকে পুরুষকার অথবা চেষ্টা করিয়া সাধন করিতে হয় এবং ঐ আভাস-রূপী চৈতন্যের সাহায্যে কুণ্ডলিনী জাগাইতে হয়। দীর্ঘকাল সাধনার ফলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া সাধককে বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থায় জপাদি সকল প্রকার সাধন চেষ্টা-পূর্বক করিতে হয় না। শুধু প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অর্থাৎ পুরুষকার-নিরপেক্ষ স্বভাবের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয়। সাধন করিতে করিতে চৈতন্যের বিকাশ সিদ্ধ হইলে সাধনের আর প্রয়োজন হয় না, এবং যাহা আভাসরূপী চৈতন্য ছিল, তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এই জাতীয় সাধক বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈখরী ভূমি হইতে পশ্যন্তীভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

যে সকল সাধক গুরু হইতে শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ বা চৈতন্যের আভাসমাত্র প্রাপ্ত না হন, তাঁহারা চৈতনা-শক্তির সম্বন্ধবিরহিত থাকেন বলিয়া প্রকৃত যোগী বা সাধক কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহেন। তবে ইহা সত্য যে তীব্র সংবেগ, উৎকট ইচ্ছা, বৈরাগ্য এবং ভগবদ্‌ ভক্তি থাকিলে, তাঁহারাও চৈতন্য

শক্তি বা তাহার আভাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। কারণ বিশ্বগুরু সমগ্র জগতের উদ্ধার-কামনায় নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন। তাদৃশ ব্যাকুলতা থাকিলে আধারের অন্যপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরম্পরাতে গুরুকৃপা অবশম্ভাবী। তবে যতক্ষণ চৈতন্যের সংস্পর্শ না ঘটে ততক্ষণ ইহাদের যথার্থ সুফল লাভের ততটা আশা থাকে না।

অজপা রহস্য

এক

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আধ্যাত্মিক সাধনের মধ্যে জপের মহিমা সাধক সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক কর্মের মধ্যে জপের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। যজ্ঞ নানাপ্রকার আছে এবং প্রতি যজ্ঞেরই এক একটি বিশেষ ফলের নির্দেশও আছে। কিন্তু জপ-যজ্ঞের মাহাত্ম্য অন্যান্য যজ্ঞ অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ইহা স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। জপের তত্ত্ব এবং ফলাফল বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নহে, কিন্তু জপ সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য সেই অজপা সম্বন্ধে প্রাচীন মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজের অনুভব ও বুদ্ধি অনুসারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব। জপের প্রকৃত বিজ্ঞান না জানিলেও জপ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সামান্য জ্ঞান অনেক সাধকেরই আছে। কিন্তু অজপা সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেকেই বিশেষ কিছু জানেন না। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ, ভাবুক ও ভাবহীন সকল অধিকারীর পক্ষেই অজপা-সাধনের উপযোগিতা রহিয়াছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই সাধনা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

একদিক হইতে দেখিতে গেলে ইহা যে অত্যন্ত সরল সাধনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ কোন সাধনাই ইহা হইতে সরল হইতে পারে না। মানুষের দেহ-ধারণের পর হইতেই, অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে প্রয়াণকাল পর্যন্ত, সমগ্র জীবনের মধ্যে যে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিয়া থাকে তাহাকে মূল ভিত্তি করিয়া অজপা সাধন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার জন্য কোন বিশেষ উপকরণ, কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়া, কোন বিশেষ অনুশাসন আবশ্যক হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সকল সময়েই প্রবাহিত হইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট অজপা ক্রিয়াও তেমনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্বকালেই সমরূপে চলিতে থাকে। এই ক্রিয়া আরব্ধ হইলে ইহা চেষ্টা অথবা মনোযোগের অপেক্ষা না

রাখিয়া আপনা হইতেই নিরন্তর চলিতে থাকে। সুতরাং এক হিসাবে ইহা যে অত্যন্ত সরল সাধন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সরল হইলেও এই সাধনটি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং ইহার বিজ্ঞান একটি গভীর রহস্য। ইহার ফল অন্য কৃত্রিম সাধনার অনুরূপ নহে। নিষ্ক্রিয় পরমসত্তার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া যে ক্রিয়া বিশ্বমধ্যে নিরন্তর চলিতেছে, অজপা মনুষ্য-দেহে তাহারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। ইহা স্বভাবের সাধনা। প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টি ভূমিতে এবং সমষ্টি ভূমিতে সমরূপে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। অজপা-বিজ্ঞান ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উদয় অবশ্যম্ভাবী। এই সাধনা যেমন স্বাভাবিক, ইহার ফলও তেমনি স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বভাবে স্থিতিলাভ।

ভগবান বুদ্ধদেব অতি প্রাচীনকালে 'আনাপানসতি' নামে যে সাধনা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহা অজপা-সাধনেরই একটি অঙ্গমাত্র বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণ বহু-স্থানে ইহার আলোচনা করিয়াছেন এবং বিস্তারপূর্বক ইহার বিশ্লেষণও করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ ও অন্যান্য নাথযোগিগণ অজপা-সাধনের মহিমা জানিতেন — তাঁহারা এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার মহিমা উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্যে বহুস্থানে অজপা সাধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে মহাযোগী নানক সাহেব রাজা শিবনাথকে তাঁহার অধিকার অনুরূপ পর পর কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপদেশ-পরম্পরার মধ্যে প্রথমে রাম নাম, তাহার পর প্রণব এবং সর্বশেষে হংসরূপ অজপা মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অজপা-গায়ত্রী, হংস-বিদ্যা, আত্মমন্ত্র,* প্রাণযজ্ঞ প্রভৃতি বিবিধ নামে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্যে এই সাধন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতী ও তাঁহার ভগিনী মাধবীকে, অর্থাৎ

---

* গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি' এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রাণযজ্ঞের স্বরূপ। শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকাতে ইহাকে অজপা-সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বিষয়ে তত্ত্বের ব্যতিহার (বিনিময়) ও তত্ত্বে বিষয়ের ব্যতিহার (বিনিময়), ইহাই প্রাণ-যজ্ঞের স্বরূপ।

তাঁহার সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে, এই সাধনার গুহ্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সন্ত কবীর, মহাত্মা তুলসীদাস প্রভৃতি মহাজনগণের সিদ্ধির মূলে এই সাধনার অনুষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে, সাধক সম্প্রদায়ে ইহা সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমান যুগেও যোগী গম্ভীরনাথ, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহাত্মা রামঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকগণ এই সাধনের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। শ্বাসে-প্রশ্বাসে সাধন করিতে পারিলে যে সহজ উপায়ে অতি দুর্লভ মহাতত্ত্বের উন্মীলন হয় তাহা ইঁহারা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভক্ত ও শিষ্যগণ অজপা-সাধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কথা প্রচার করিয়াছেন। সিদ্ধ-জীবনীকার স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বারদীর ব্রহ্মচারী মহাযোগী লোকনাথ হইতে এই সাধনেরই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য।

এই সাধন অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সদাশিব, ব্রহ্মা, নারদ, বশিষ্ঠ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতিও এই সাধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য সকল প্রকার সাধনের ন্যায় এই সাধনেরও আদিগুরু শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এই সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই।

দুই

শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং তাহার নাড়ীচ্ছেদ হয় তখন হইতেই তাহার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া লক্ষিত হইতে থাকে। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে গর্ভধারিণী জননী হইতে পৃথক্ ভাবে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না। গর্ভস্থ শিশু মায়ের আহৃত খাদ্যেই পুষ্টিলাভ করে, এবং মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসেই তাহার দেহের বিকাশ হয়। কিন্তু প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবী মায়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তখন হইতেই সে বস্তুতঃ কালরাজ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে। শিশুর যেটি প্রথম শ্বাস গ্রহণ তাহার নাম জন্ম এবং ঐ শ্বাসের শেষ ত্যাগই মৃত্যু নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মধ্যবর্তী অবস্থা তাহার জীবন। এইজন্য মনুষ্যের সমগ্র জীবনটিই শ্বাস-প্রশ্বাসময়। মনুষ্য আত্মবিস্মৃত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অধীন থাকে এবং নিরন্তর কালের প্রেরণায় ইড়া ও পিঙ্গলা নামক বাম ও দক্ষিণ মার্গে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মূলে অবিদ্যার আবরণরূপ পর্দা না থাকিলে বিক্ষেপ-

রূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বাস-প্রশ্বাস কালেরই খেলা, এবং আমরা যাহাকে জীবন বলি তাহা কাল বা মৃত্যুরই আপন প্রকাশের মহিমা মাত্র।

যোগিগণ বলেন, যোগপথে নয়টি মুখ্য অন্তরায় রহিয়াছে। — এইগুলি চিত্তের বিক্ষেপ স্বরূপ। চিত্তের বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি বিদ্যমান থাকে। নয়টি মুখ্য অন্তরায়ের নাম — ব্যাধি, স্ত্যান বা চিত্তের অকর্মণ্যতা, সংশয়, প্রমাদ বা সমাধি-সাধনের অনুষ্ঠানের অভাব, দেহ ও চিত্তের অলসভাব, অবিরতি বা বিষয় তৃষ্ণা, ভ্রান্তিজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, সমাধির ভূমিলাভ না হওয়া এবং ভূমিলাভ হইলেও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারা। দুঃখ, ইচ্ছার অপূর্ণতাবশতঃ চিত্তের ক্ষোভ, দেহের কম্পন ও শ্বাস-প্রশ্বাস, এইগুলি পূর্ববর্ণিত মুখ্য অন্তরায়ের আনুষঙ্গিক সহকারী।

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে শ্বাস-প্রশ্বাস মূল রোগ নহে, রোগের উপসর্গ মাত্র। মূল রোগের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসও আয়ত্ত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল চিত্তের বিক্ষেপ এবং বিক্ষেপের মূল প্রত্যক্ চৈতন্যের অনুপলব্ধি অর্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের অভাব। যে উপায়ের দ্বারা প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাহারই প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কালের খেলাও শান্ত হইয়া যায়। প্রণব-জপ এবং প্রণব-বাচ্য ঈশ্বরের ভাবনাকে যোগিগণ আত্মজ্ঞান লাভের মুখ্য হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রণব-জপের রহস্য অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায় যে অজপা জপই শ্রেষ্ঠ জপ এবং অন্য সকল জপই চরম অবস্থায় অজপাতে পর্যবসিত হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ।

তিন

এক অহোরাত্রে মানুষের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা ২১৬০০ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অবস্থাভেদে ইহার কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেও ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্বাসটি বাহির হইয়া যায় 'হং' ধ্বনি করিতে করিতে — ইহার নাম প্রশ্বাস, এবং এটা আবার ভিতরে আসে 'সঃ' ধ্বনি করিতে করিতে — ইহার নাম নিঃশ্বাস।*

* "হংকারেন বহির্যাতি সঃকারেন বিশেৎ পুনঃ" — ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু রামপ্রসাদের গানে আছে—

যোগিগণ বলেন, জীব নিরন্তর শ্বাস-প্রশ্বাসচ্ছলে এই হংসমন্ত্র বা অজপা-গায়ত্রী জপ করিতেছে। জীবমাত্রই ইহা করিতেছে, সুতরাং মনুষ্যও করিতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইতর জীব হইতে মানুষের পার্থক্য এই যে মনুষ্য তাহার পুরুষকার দ্বারা এমন সামর্থ্য অর্জন করিতে পারে যাহার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই স্বাভাবিক গতিতে বিপর্যয় সম্ভব হয়। অর্থাৎ মানুষ সাধনবলে হংসঃ গতিকে সোহং গতিতে পরিবর্তিত করিতে পারে। তখন আত্মজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায় এবং ইড়া-পিঙ্গলাতে প্রবাহশীল বায়ুর বক্রগতি সুষুম্নাতে সরল গতিরূপে পরিণত হয়। সুষুম্না ব্রহ্ম মার্গ। বায়ু ইড়া-পিঙ্গলার মার্গ হইতে আকৃষ্ট হইয়া যে পরিমাণে সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হয় সেই পরিমাণে বিকল্পের উপশম ঘটে। নির্বিকল্প আত্মজ্ঞানের অবরুদ্ধ দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। সুষুম্নাতে প্রবেশ না করিলে বায়ু ও মনের ঊর্ধ্বগতি সম্ভবপর হয় না এবং ঊর্ধ্বগতি ব্যতিরেকে বিকার ত্যাগ করিয়া চিত্ত সাম্যভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। যোগিগণ যাহাকে কুম্ভক বলেন তাহা এই ঊর্ধ্বগতির ফলে ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কুম্ভকের মধ্যে যে গতি থাকে না তাহা নহে। কিন্তু বক্রগতি পরিত্যক্ত হইয়া অন্তর্মুখী সরল গতির সূচনা হয়। এই সরল গতি হইতে অন্তে গতিহীন অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাকে আমরা জাগতিক ভাষায় প্রাণ-অপানের ব্যাপার বলি তাহাই যোগীর হংস মন্ত্রের উচ্চারণ বুঝিতে হইবে।

এই প্রকার বিষম গতির কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে প্রকৃতির ভিতরেই এই বৈষম্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। প্রাণ অপানকে এবং অপান প্রাণকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে — কিন্তু উভয়ের স্বাভাবিক গতি পরস্পর বিরুদ্ধ। প্রাণ যে দিকে সঞ্চারিত হয় অপান তাহার বিপরীত দিকে সঞ্চারিত হয়। যদি

'হং'বর্ণ পূরকে হয় 'সঃ'বর্ণ রেচকে বয়,
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়া।

ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ কথা, কিন্তু অশাস্ত্রীয় নহে। কারণ যোগবীজে (১৩১) আছে যে 'সঃ' ধ্বনির সহিত নির্গম ও 'হং' ধ্বনির সহিত প্রবেশ হয়। জীব সর্বদা হংসঃ মন্ত্র জপ করিতেছে। ইহার পর আছে—

'গুরুবাক্যাৎ সুষুম্নায়াং বিপরীতো ভবেৎ জপঃ।
সোহং সোহং ইতি প্রাপ্তো মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে॥' (১৩২)

তাহারা অন্য-নিরপেক্ষ হইত তাহা হইলে বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু তাহা নহে। অপানকে না হইলে প্রাণের চলে না, তাই প্রাণ অপানকে চায়, তাহাকে আকর্ষণ করে, যদিও অপান বিরুদ্ধবাহী। তদ্রূপ প্রাণকে না হইলে অপানেরও চলে না, তাই অপান প্রাণকে টানে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত সাম্য অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়াই উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ গতির উদয় হইয়াছে। তাই অজ্ঞাতসারে প্রাণ ও অপান বিরুদ্ধ সঞ্চারী হইয়াও অবিরুদ্ধ সাম্যভাবেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। যতক্ষণ তাহা না ঘটিবে ততক্ষণ শান্তির সম্ভাবনা নাই। বদ্ধ জীব এই দো-টানার মধ্যে পড়িয়া একবার উঠিতেছে ও একবার নামিতেছে। বাম ও দক্ষিণ পথে সঞ্চরণ করিতেছে, ইহার বিশ্রাম নাই। যোগীর লক্ষ্য এই দুইটি বিরুদ্ধ গতির সমন্বয় সাধন করা। সকল প্রকার অধ্যাত্ম সাধনার ইহাই উদ্দেশ্য।

এই বৈষম্যময়ী গতির দুইটি দিক্ আছে — একটি দেহগত ও অপরটি কালগত। নাসাপুট হইতে শ্বাস বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং বাহির হইতে উহা ভিতরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই বহির্গতির একটি সীমা আছে। সাধারণ অবস্থায় নাসাপুট হইতে বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুল পর্যন্ত এই বাহ্যগতি লক্ষিত হয়। আগন্তুক *কারণ বিশেষে কখনও একই ব্যক্তির শ্বাস-গতিতে গতির কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তদ্রূপ প্রকৃতির বৈচিত্র্য বশতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির শ্বাসের গতিতেও কিছু কিছু ভেদ থাকে। গতির বিস্তার যত অধিক, বহির্মুখতা ও কালের প্রভাবও তত অধিক জানিতে হইবে। সংযত জীবন অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ এই বহির্গতির হ্রাস হইতে থাকে। এইটি দেহগত বিষম গতির বিবরণ।

কালগত বৈষম্য অন্য প্রকার। একটি নির্দিষ্ট কালের শ্বাস-সংখ্যা দ্বারা এই বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্বাস বলিতে বর্তমান প্রসঙ্গে পূরক ও রেচক উভয়ই বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এক মিনিটে সংসারী সুস্থ মনুষ্যের পনেরটি শ্বাসোচ্ছ্বাস হয়, এইরূপ ধরা

* কথিত আছে, ভোজন ও বাক্যালাপে বহির্গতির বৃদ্ধি হয় ছয় হইতে বার আঙ্গুল, গমনে বৃদ্ধি হয় বার হইতে চব্বিশ আঙ্গুল। দ্রুত বেগে ধাবনে ত্রিশ হইতে বিয়াল্লিশ আঙ্গুল পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়, সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হয় স্ত্রীসঙ্গে — তিপান্ন হইতে পঁয়ষট্টি আঙ্গুল।

হইয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আগন্তুক কারণ বশতঃ ও প্রকৃতি ভেদে ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তাহা নগণ্য। সংযম ও অভ্যাসের প্রভাবে এই সংখ্যাও ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইটি হইল শ্বাস গতির কালের দিক্। বলা বাহুল্য, শ্বাসের বাহ্যোন্মুখতা ও সংখ্যার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ বাহ্যগতি বার আঙ্গুল হইলে সংখ্যা পনের হইয়া থাকে, এইরূপ মানা হয়। যোগাভ্যাস অথবা বিশিষ্ট শক্তির প্রভাবে বাহ্যগতি কম হইলে সংখ্যাও তদনুপাতে কম হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্বাসের দেশ সম্বন্ধ ও কাল সম্বন্ধ সমভাবে একই সঙ্গে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বাহ্যগতি এক আঙ্গুল কমিলে সংখ্যা কমে সোওয়া, দুই আঙ্গুল কমিলে সংখ্যা কমে আড়াই। অন্তে যখন বাহ্যগতির বার আঙ্গুলই শূন্যে পরিণত হয় তখন সংখ্যাও পনের হইতে শূন্যে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ শ্বাসের দেশগত ও কালগত সম্বন্ধ একই সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়। এই অবস্থায় শ্বাসের স্থূল সঞ্চার রুদ্ধ হয় এবং রেচক পূরক রূপ ব্যাপার শান্ত হয়। ইহারই নাম কুম্ভক, যাহা হইতে পূর্ণ সমাধানের মার্গ উন্মুক্ত হয়। এই সমাধানই স্থিতি। তখনই পূর্ব-বর্ণিত বিক্ষেপের উপশম হয়, তৎপূর্বে নহে।

প্রাণের বাহ্যগতি বা সংখ্যা ন্যূন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়। প্রথমে কামনা ত্যাগ হয়। প্রাণের চঞ্চলতা হইতেই বাসনার উদ্ভব হয়। প্রাণ শান্ত হইতে আরম্ভ করিলে চিত্তে ক্রমশঃ নিষ্কাম ভাব স্থান লাভ করে। নিষ্কাম ভাবের অভিব্যক্তির পর আনন্দের অভিব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন — 'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'। শান্তির উদয় ভিন্ন প্রকৃত সুখের আবির্ভাব হয় না। ইহার পর বাক্‌সিদ্ধি, দূরদৃষ্টি, আকাশ গমন, ছায়ানাশ, এমন কি নির্বাণ পর্যন্ত আয়ত্ত হয়। ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

প্রাণের বাহ্যগতির উপশম সাধনার উদ্দেশ্য। যে প্রকার চিন্তা ও আচরণ দ্বারা এই বাহ্য গতির বৃদ্ধি হয় তাহা সাধন ক্ষেত্রে বর্জনীয়। অন্ততঃ এইসব বিষয়ে সংযমের অভ্যাস আবশ্যক।

চার

অজপা সাধনের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মহাজনগণ গুরু-পরম্পরা অনুসৃত পদ্ধতির বশবর্তী হইয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন প্রকার

বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। সাধকের যোগ্যতা ও অধিকারগত বৈশিষ্ট্য হইতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় ইহাদের প্রত্যেকের সার্থকতা আছে।

অজপা কুণ্ডলিনী হইতে উদ্ভূত প্রাণধারিণী প্রাণবিদ্যারূপে যোগি-সমাজে পরিচিত। শ্যেনপক্ষী যেমন ঊর্ধ্ব আকাশে উড্ডীন হইলেও গুণবদ্ধ থাকিলে নিম্নে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয় তদ্রূপ প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার বশীভূত জীব ঊর্ধ্বদিকে ও অধোদিকে গতিলাভ করিয়া থাকে। কোন কোন আচার্য বলেন, 'তৎ' পদবাচ্য পরমাত্মা হংসবিদ্যার প্রথম অবয়ব 'হ'কার দ্বারা বর্ণিত হন এবং 'ত্বং' পদবাচ্য প্রত্যেক্ চৈতন্য অথবা খেচরী বীজ দ্বিতীয় অবয়ব 'সঃ' কার দ্বারা দ্যোতিত হয়। প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে যে অব্যাকৃত আকাশ আছে তাহাতে লিঙ্গ-শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার প্রতিলোমভাবে হংসের গতি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে — 'সঃকারো ধ্যায়তে জন্তুর্হংকারো জায়তে ধ্রুবম্'। 'সঃ' অথবা জীব নিজের জীবত্ব পরিহার করিয়া সোহং শব্দের লক্ষ্য প্রত্যক্ আত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। যে সাধক নিজের আত্মাকে ধ্যান করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে 'হ'-কারাত্মক পরমাত্মভাবের প্রাপ্তি সুলভ হয়।

দ্বিতীয় মতে, হংস বলিতে প্রত্যক্ আত্মা অথবা ব্যষ্টি-তুরীয় বুঝিতে হইবে এবং পরমহংস শব্দে পরমাত্মা অথবা সমষ্টি-তুরীয়কে বুঝাইয়া থাকে। ব্যষ্টি-তুরীয় ও সমষ্টি-তুরীয় পরস্পর যুক্ত হইলে হংসযোগ নিষ্পন্ন হয়। ইহাই অজপার তত্ত্ব।

তৃতীয় মতে, সাধকের প্রজ্ঞা ও সাধনশক্তির তারতম্য অনুসারে অজপা তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। মন্দপ্রজ্ঞ, মধ্যপ্রজ্ঞ এবং উত্তমপ্রজ্ঞ সাধকের দৃষ্টি যে ভিন্ন তাহা অধোলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। যাহার জ্ঞানশক্তি উজ্জ্বল নহে, যে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার নাম মন্দপ্রজ্ঞ। এই প্রকার সাধক 'হ'কার দ্বারা পুরুষ এবং 'স'কার দ্বারা প্রকৃতি, এই দুইটি ধারণা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার দৃষ্টিতে হংসযোগ বলিতে পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ বুঝায়। কিন্তু যাহার প্রজ্ঞা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, অর্থাৎ যে মধ্যপ্রজ্ঞ, তাহার দৃষ্টি অনুসারে 'হ'কার অপানের সঞ্চার এবং 'স'কার প্রাণের সঞ্চার

বুঝাইয়া থাকে। মুখ্য প্রাণ যখন পরাঙমুখভাবে আবর্তিত হয় তখন তাহাকে প্রাণ না বলিয়া অপান বলা হয়। সুতরাং হংস বিদ্যার রহস্য মধ্যম সাধকের দৃষ্টি অনুসারে প্রাণ ও অপানের সংযোগ ভিন্ন অপর কিছু নহে। কিন্তু যে সাধক উত্তম প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাহার দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। সে প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ অথবা প্রাণ ও অপানের সম্বন্ধ পরিহার করিয়া আত্ম-স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। এই সাধক অজপা মন্ত্রের পূর্বভাগ 'অহং'কে জীবাত্মার বাচক এবং উত্তর-ভাগ 'সঃ'কে শক্তিবাচক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে।

অধিকার ভিন্ন বলিয়া অজপা জপের বিধানও ভিন্ন। নিম্নাধিকারী তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি দৈহিক উচ্চারণ-যন্ত্রের ব্যাপারের দ্বারা অজপা-জপ সম্পাদন করে। এই সকল সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত বা শোধিত নহে। তাই ইহারা দেহগত ক্রিয়াকে আশ্রয় না করিয়া জপ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা মধ্যম অধিকারী তাহাদের চিত্ত-সংস্কার অধিক। এইজন্য তাহাদের পক্ষে অজপা জপ করিবার জন্য তালু প্রভৃতির কোন প্রকার ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তাহাদের অধিকার উচ্চ বলিয়া তাহাদের বিধানও ভিন্ন। তাহাদের পক্ষে দৈহিক উচ্চারণের প্রয়োজন না থাকিলেও অন্য প্রকার অনুসন্ধানের আবশ্যকতা রহিয়াছে। তাহাদিগকে ভাবনা করিতে হয় যে অজপা মন্ত্রের 'সঃ' অংশ প্রাণরূপে এবং 'হং' অংশ অপান বৃত্তিরূপে নিজ দেহে সর্বদা অনুস্যূত রহিয়াছে। 'হং' শব্দের সহিত অপান বৃত্তির সাম্যমূলক সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই 'হং'কার অপান বৃত্তির সূচনা করে। তদ্রূপ 'সঃ'কার প্রাণকে বুঝাইয়া থাকে। 'সঃ' এবং 'হং', মন্ত্রের এই দুইটি ভাগ, প্রাণ ও অপান বৃত্তিরূপে নিজের দেহে সর্বদাই ক্রিয়া করিতেছে — এইপ্রকার নিরন্তর চিন্তাই অজপা-জপ। প্রাণাপানরূপে বিদ্যমান এই মন্ত্র যে সাধক গুরুমুখ হইতে অধিগত হয় সে 'অজপন্নপি' অর্থাৎ তালু আদির ব্যাপার না করিলেও তাহাতে প্রাণাপানরূপ মন্ত্র অনুস্যূত থাকে। সেইজন্য সর্বদাই তাহার জপ হইয়া থাকে। তাই এই হংসমন্ত্রকে অজপা বিদ্যা বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা এই অনুসন্ধানরূপ জপ অধিক প্রবল এবং অধিক ফলপ্রদ। তথাপি এই জপের সঙ্গে আস্তিক্যভাব, গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকিলে বলের আধিক্য হয়। এই হইল মধ্যম অধিকারীর কথা। কিন্তু উত্তম অধিকারীর জন্য অজপার

বিধান অন্য প্রকার। বলা বাহুল্য, উচ্চ অধিকারীর চিত্ত শ্রবণ, মনন প্রভৃতির অভ্যাসবশতঃ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। এই জাতীয় সাধক ধারণা করে যে অজপা-মন্ত্রের পূর্বভাগ 'অহং' জীবকে বুঝায়, যে জাগ্রৎ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষী। নিজেকে সুখী অথবা দুঃখী অনুভব করা যায়, তাই বুঝা যায় যে, 'অহং' পদার্থ জীবের বাচক। কিন্তু মন্ত্রের উত্তরভাগে যে 'সঃ' পদ আছে তাহা ইহাদিগের মতে শক্তির বাচক। এই শক্তি বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র বিশ্বের কারণ পরমেশ্বরের নামান্তর। সুতরাং সংসারিরূপে প্রতীয়মান 'অহং'ই প্রকৃত প্রস্তাবে 'সঃ' অথবা পরমাত্মা। ইহাই অজপা-জপের তাৎপর্য।

বর্ণবিজ্ঞান ও আত্মার অবস্থা-বৈচিত্র্য

স্বরূপ দৃষ্টিতে আত্মা সর্ব ভাবের অতীত বলিয়া ইহা সর্ব ভাবের মধ্যে সর্বাত্মক হইয়াও সর্বদা সর্বত্র নিজ-স্বভাবে স্বয়ংরূপে অবস্থিত। তাই ইহা নির্বিকার, দ্বন্দ্বাতীত, নির্দোষ ও সমরস। কিন্তু ব্যবহার-ভূমিতে ও প্রতিভাস ক্ষেত্রে ইহার অবস্থাগত ভেদ লক্ষিত হয়। এই সকল অবস্থা বা দশার অবান্তর বিভাগ অসংখ্য, কিন্তু ইহাদের মুখ্য বিভাগ জাগ্রৎ-আদি ভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়াই সর্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। এই পাঁচটি অবস্থার মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা সকলেরই সুপরিচিত। অন্য দুইটিকে জ্ঞানের উদয় ও পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত কেহই স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে কোন অবস্থাই বিশুদ্ধ আত্মার নহে, কিন্তু দেহাদি-সংসৃষ্ট আত্মার ইহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই পরিদৃষ্ট অবস্থা সকল কি প্রকারে উদিত হয়? সাধারণ দৃষ্টিতে অতি স্থূল ভাবে এই ভেদের উপপাদন প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-গত বৈশিষ্ট্য হইতেই এই সকল দশার উদয় হইয়া থাকে। আত্মা বলিতে এখানে দেহ-বিশিষ্ট জীবাত্মার কথাই বুঝিতে হইবে, বিদেহী কেবলাত্মার কথা নহে। আত্মা ও মনের সংসর্গ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংসর্গ, এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংসর্গ যে অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয়। কিন্তু যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু অবশিষ্ট দুইটি সম্বন্ধ পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার প্রচলিত নাম স্বপ্নাবস্থা। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, তাছাড়া মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধও থাকে না, একমাত্র আত্মা ও মনের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সুষুপ্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অজ্ঞান-আচ্ছন্ন জীব নিরন্তর এই তিনটি অবস্থার আবর্তন অনুভব করিয়া থাকে। এই আবর্তন হইতে অব্যাহতি লাভ, করিতে হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক। যতদিন তাহা না হয়, অর্থাৎ যতদিন আত্মার সম্যক্ জ্ঞান উদিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই আবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্যষ্টিভাবে ইহা যেমন সত্য,

সমষ্টি ভাবেও তেমনি সত্য। মৃত্যুর পর লোকান্তর গমন বা জন্মান্তর পরিগ্রহ, এমন কি প্রলয়াদির ব্যাপার, সবই এই নিয়মের অধীন।

সুষুপ্তি দশাতেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকে। ইহা অনাদি সংযোগ এবং মুল অজ্ঞান হইতে প্রসূত। সুষুপ্তি কালে মনঃ পুরীতৎ নাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ বেষ্টনের অভ্যন্তরে হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করে। ঐটি আকাশ স্থান। ওখানে কোন নাড়ী নাই এবং বায়ুরও কোন স্পন্দন অনুভূত হয় না। সুপ্তিকালে মন হৃদয়মধ্যে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে বলিয়া ঐ সময় কোন প্রকার লৌকিক জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ মন মনোবহা নাড়ীতে সঞ্চরণ না করিলে লৌকিক জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। নাড়ী মাত্রই বায়ু-ঘটিত সংস্থান — সমগ্র মানবদেহ নাড়ীজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু দেহের মধ্যে একমাত্র ঐ হৃদয়স্থ দহরাকাশই নাড়ী-শূন্য, বায়ু-শূন্য এবং মনের ক্রিয়াশূন্য স্থান। দেহের সর্বত্রই মনের সঞ্চরণ এবং বায়ুর ক্রিয়া সম্ভবপর, কিন্তু হৃদয়ে বায়ু, মন প্রভৃতি কিছুই ক্রিয়া করে না। মন যখন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তখন ওখানে স্তব্ধ হইয়া বিদ্যমান থাকে — উহা মনের লয়াবস্থা। মনের ক্রিয়া না থাকাতে ঐ সময়ে বিলক্ষণ আত্ম-মনঃ-সংযোগ ঘটিতে পারে না বলিয়া জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার লৌকিক বিশেষ গুণের উদ্ভব হয় না।

কিন্তু যখন গুরুকৃপাতে এবং নিজের প্রাক্তন শুভাদৃষ্টের পরিপাক বশতঃ অলৌকিক জ্ঞানের উদয় হয় তখন ঐ অনাদি আত্ম-মন-সংযোগের হেতুভূত অজ্ঞানটি কাটিয়া যায়। তখন ঐ আত্ম-মনঃ-সংযোগও থাকে না। তখন হৃদয়াকাশ নবোদিত জ্ঞান-সবিতার স্নিগ্ধ কিরণমালায় আলোকিত হয়। এই অবস্থাটিকে স্থূলভাবে আত্মার তুরীয় দশার পূর্ব সূচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই অবস্থার উদয় হইলে ও ইহা স্থায়ী হইলে ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই সমভাবে অনুস্যূত থাকে। ইহা পূর্ণাবস্থা হইলেও ইহার উন্মেষ প্রথমেই সাধারণতঃ পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তাই জ্ঞানের উদয়ের পরেও জাগ্রৎ প্রভৃতি অজ্ঞান-দশা কিছু সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। তবে উহা ক্রমশঃই অধিকতর হীনশক্তি হইয়া পড়ে। দেহ থাকা পর্যন্ত অথবা প্রারব্ধের ফল ভোগের দ্বারা কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সাধারণতঃ এইভাবেই চলিতে থাকে। প্রারব্ধ কাটিয়া গেলে দেহাভিমান আভাস রূপেও থাকে না। জাগ্রৎ-আদি অবস্থা-ভেদেও

থাকে না। তখন একই অবিচ্ছিন্ন স্থিতি বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ে তুরীয় অবস্থা তুরীয়াতীত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বস্তুতঃ ঐটি নিত্যাবস্থা হইলেও তুরীয় অবস্থার উদয় ও পরিপাক না হইলে উহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। জাগ্রৎ-আদি তিনটি পৃথক দশা যতদিন থাকে ততদিন পর্যন্ত চতুর্থ বা তুরীয় নামের সার্থকতা — যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ জ্ঞানের অর্থ আছে। কিন্তু যখন জাগ্রৎ-আদি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা থাকে না, অজ্ঞানও থাকে না, তখন ঐ তুরীয়ই তুরীয়াতীত বা স্বরূপস্থিতি নামে পরিচিত হয়।

জাগ্রৎ অবস্থাতে ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখ থাকে ও রূপ রসাদিময় বিষয়-পঞ্চকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া উহাদিগকে গ্রহণ করে। এই ভাবে আমাদের বাহ্য জগতের জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতে এই বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ক্লান্তিবশতঃ ইন্দ্রিয়ের বহিরুন্মুখ ভাব তখন উপশম প্রাপ্ত হয় — ইন্দ্রিয় তখন অন্তর্মুখ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইলেও মন তখনও বহির্মুখ থাকে, অর্থাৎ ঐ সময়ে ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখ না থাকিলেও মনের ইন্দ্রিয়ামুখী প্রবণতা নিবৃত্ত হয় না। ইহারই ফলে স্বপ্নানুভবের উদয় হয়। ইহা সংস্কারজন্য জ্ঞান। তা'ছাড়া, ঐ সময়ে মন দেহের মধ্যেই মনোবহা নাড়ী অবলম্বন করিয়া অন্তঃস্থিত বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণ করে ও নানাপ্রকার দর্শন স্পর্শনাদির অনুভব করে। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড অভিন্ন বলিয়া এই সঞ্চার এক দিকে যেমন ব্যষ্টির মধ্যে হয়, অপর দিকে তেমনি সমষ্টির মধ্যেও হইতে পারে। সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞানও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার পর যখন ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন মনের ইন্দ্রিয়মুখী গতি নিবৃত্ত হয় ও মন উপরত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চায়। ঐ সময়ে স্বভাবতঃ উহা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার লাভ করে। মন বহির্মুখ না হইয়া অন্তর্মুখ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, কারণ হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশ পরিমিত রূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সর্বব্যাপক। মন যখন যেখানেই থাকুক না কেন উহা নিত্যই তাহার সন্নিহিত থাকে। তথাপি মন সব সময়ে উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। মন বাহ্য-উন্মুখ ভাব হইতে বিরত হইয়া অন্তর্মুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আকাশে অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়। একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর মনের আর সঞ্চরণ করিবার সামর্থ্য থাকে না, কারণ ঐ আকাশে চলিবার

কোন পথ নাই। তাই মন নিশ্চল হইয়া ঐখানে অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য এই - মন ক্লান্ত হইয়া নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট হইলেও মনের দিকে আত্মার উন্মুখ-ভাব নষ্ট হয় না। সেইজন্যই উভয়ের মধ্যে সংযোগ বিদ্যমান থাকে। যত দিন অনাদি অবিদ্যা প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত না হয় ততদিন আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার এই মনের অভিমুখতা নিবৃত্ত হইতে পারে না। এইজন্যই মন কিয়ৎকালের জন্য সুষুপ্তিতে স্থির হইলেও এই স্থিতি দীর্ঘকাল থাকে না। পূর্ব-সংস্কারের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে মন বহির্মুখ হয় এবং পূর্ববৎ নাড়ীমার্গে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব সংস্কারের উদ্বোধনের প্রকৃত হেতু কাল। সুতরাং বুঝিতে হইবে সুষুপ্তি অবস্থাতেও মন কালাতীত হইতে পারে নাই। সেই জন্যই মন স্থির হইলেও সুষুপ্তিতে জ্ঞানের উদয় হয় না। জাগতিক জ্ঞান মনের ক্রিয়া সাপেক্ষ। হৃদয়াকাশে সেইজন্য লৌকিক জ্ঞানের উদয় সম্ভবপর নহে। যে সময় মন স্থির হয় ও সঙ্গে সঙ্গে লোকোত্তর জ্ঞানের প্রকাশ জাগিয়া উঠে সেই সময়েই তুরীয় অবস্থার উন্মেষ জানিতে হইবে। সুষুপ্তিতে যে স্থিরতা তাহা তামসিক। ঐ অবস্থায় সত্ত্ব থাকিলেও উহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নহে, সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয় ও বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত মূল অজ্ঞানকে কাটান যায় না এবং লোকোত্তর জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয় না। গুরুকৃপাতে যদি আত্মার মনোমুখী দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয় অথবা ততোধিক গুরুকৃপাতে যদি ঐ দৃষ্টি পরমাত্মমুখী দৃষ্টিতে পরিণত হয় তাহা হইলে পূর্ববর্ণিত অনাদি অজ্ঞান কাটিয়া যায় ও আত্ম-মনঃ-সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় মন নিষ্ক্রিয় এবং চেতন-ভাবাপন্ন হয়। ইহারই নাম মনের জাগরণ, মনের উদ্ধার বা মনের ত্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষ। আমরা যে তুরীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি তাহা ইহারই নামান্তর। ইহার পর এই চেতন ও শুদ্ধ মনও আর থাকে না। তাহাই তুরীয়াতীত। তখন একমাত্র আত্মাই আপন স্বরূপে বিরাজ করেন এবং নিজের সহিত নিজে ক্রীড়া করেন।

দুই

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা প্রচলিত সাধারণ দৃষ্টির কথা। কিন্তু বিজ্ঞানদৃষ্টিতে আরও অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে যাহা কিছু উপলব্ধি করেন তাহার কিয়দংশ সাধারণ জিজ্ঞাসুর ঔৎসুক্য নিবৃত্তি ও জ্ঞান সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যাঁহারা দেহ-বিজ্ঞানে নিষ্ণাত তাঁহারা বলেন যে আমাদের এই মানব-দেহ সর্বময় — ইহাতে সব কিছু আছে। শুধু তাহাই নহে, সব কিছুর অতীত যাহা তাহাও ইহাতে আছে। পিণ্ড যে শুধু ব্রহ্মাণ্ড হইতে অভিন্ন তাহা নহে — ব্রহ্মাণ্ডাতীত বা বিশ্বাতীত সত্যও পিণ্ডের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই দেহ-চক্রকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে সাঙ্কেতিক যন্ত্ররূপে নিরীক্ষণ করিলে ইহাকে একই দৃষ্টিতে ষট্‌কোণ রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি দশা জীবভাবে সংসৃষ্ট, তাই এই তিনটিকে জীব-দশা বলা চলে। তুতীয় অবস্থার নাম শিব-দশা। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া তিনটি জীবদশা ও একটি শিব-দশা অর্থাৎ মোট চারিটি দশা প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে চতুরস্ররূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু তুরীয় অবস্থার অবান্তর ভেদও কল্পনা করা যাইতে পারে। কারণ এই অবস্থাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির উপাধিগত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর। এই ঔপাধিক সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ হইতে তুরীয়কেও তিন প্রকার মনে করা চলে। এই ভাবে দেখিতে গেলে জীব-দশা তিনটি বলিয়া জীব ত্রিকোণ-পদ-বাচ্য এবং শিব-দশাও তিনটি বলিয়া শিবও ত্রিকোণ-পদ-বাচ্য। দেহচক্রে এই উভয় দশার পরস্পর মিলন রহিয়াছে। সেইজন্য দেহচক্রকে সাঙ্কেতিক ভাবে ষট্‌কোণ বলিয়া বর্ণনা করা চলে।

অতএব তুরীয়কে এক দশা মনে করিলে দেহ চতুরস্র নামে অভিহিত হয়। আর যখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি জীবাবস্থার সহিত জাগ্রৎ-আদি উপাধিসম্পন্ন শিবাবস্থারূপে তুরীয়কে তিন প্রকার ধরিয়া যোগ করা যায় তখন এই দেহকে ষট্‌কোণ বলা হইয়া থাকে। দেহচক্রের একটি নাভি বা মধ্য-বিন্দু আছে। তাহাই সমগ্র চক্রটিকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। যাহাকে আমরা তুরীয়াতীত অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করি উহাই তাহার স্বরূপ, উহাই দেহচক্রের কেন্দ্র।

তিন

জাগ্রৎ একটি সক্রিয় অবস্থা — ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থের অনুসন্ধানই ইহার স্বরূপ। সুপ্তি অবস্থা নিবৃত্ত হইলে এই প্রকার যে বাহ্য অর্থের অনুসন্ধান উদিত হয়, ইহাই জাগ্রৎ। ইহাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু সুপ্তি অবস্থাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে না — উহা জড়ত্ব-প্রধান নিষ্ক্রিয়াবস্থা। এই উভয় অবস্থার অন্তরালে আর একটি অবস্থা আছে। তাহার নাম স্বপ্ন। সুপ্তি নিবৃত্ত হওয়ার পূর্বে নানা প্রকার মানসিক ভেদময় বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয় — উহাই স্বপ্ন নামে পরিচিত। জীবের সংসার দশা বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটি দশার সহিতই আমরা পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। যাহাকে সুপ্তি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাই সংসারের বীজ দশা, যাহাকে স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সংসারের উন্মেষ দশা এবং যে দশাকে আমরা জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি তাহা সংসারের গাঢ় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা। আত্মার সংস্কারের ক্রমিক আধিক্য অনুসারে পরপর এই তিনটি অবস্থার নির্দেশ করা হইল। কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই তিনটি অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই তিনটি অবস্থার মধ্যে পরস্পর ভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতে ইহাদের যে কোন দুইটি অবস্থা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইতে পারে না, পর পর হয়। অর্থাৎ যখন স্বপ্ন থাকে তখন জাগ্রৎ বা সুষুপ্তি থাকে না। কিন্তু তুরীয় অবস্থা এই প্রকার নহে। কারণ উহা উক্ত তিন অবস্থার প্রত্যেকটির সহিত ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান থাকে। তুরীয় জাগ্রতে থাকে, স্বপ্নে থাকে এবং সুষুপ্তিতেও থাকে। তুরীয়ের প্রকাশের জন্য অন্য কোন অবস্থা নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক নহে। চিৎ-এর অনুসন্ধানই তুরীয়ের বৈশিষ্ট্য। উক্ত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটি চিৎ হইতে উদ্ভূত — তাই চিৎ উহাদের কারণ ও উহারা চিতের কার্য। কার্যে যেমন কারণ ব্যাপকরূপে বর্তমান থাকে তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তুরীয় ব্যাপকরূপে বিদ্যমান থাকে। তুরীয় অবস্থা শুদ্ধ ও নির্মল হইলেও উহাতে জাগ্রৎ প্রভৃতি ভিন্ন অবস্থার কলঙ্ক স্পর্শ হয়। ইহা স্পর্শ মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা সত্য। কিন্তু তুরীয়াতীত অবস্থাতে এই স্পর্শও থাকে না।

পরম শিবের প্রাণস্বরূপা পরাশক্তি মাতৃকা মহাযন্ত্রের বাচ্য। এই মহাশক্তি পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট — ইহার স্বরূপ জাগ্রৎ প্রভৃতি পঞ্চ অবস্থার দ্বারা গঠিত। মূর্তির অবয়বের দিক হইতে বিচার করিলে

জাগ্রৎ অবস্থাকে ইহার শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে, কারণ দক্ষিণ পার্শ্ব ক্রিয়া প্রধান এবং জাগ্রৎ অবস্থাও ক্রিয়া প্রধান। সুষুপ্তিকে বাম পার্শ্ব মনে করা যাইতে পারে, কারণ ইহা অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। স্বপ্ন অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তী — ইহা দেবীর জঘন বা গুহ্য প্রদেশ বলিয়া কল্পিত হয়। বিকল্প সমূহ এই অংশ হইতেই উদ্ভূত হয়। সুপ্তি নিবৃত্ত হওয়ার পর যে বিষয়-জ্ঞান হয় তাহা জাগ্রৎ এবং সুপ্তি নিবৃত্ত না হইলেও যদি অর্থজ্ঞান হয় হয় তবে উহা স্বপ্ন বলিয়া জানিতে হইবে। তুরীয় অবস্থা দেবীর মুখরূপে কল্পিত হয়। জাগ্রৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ দশাতে যে জড় ভাব প্রকট হয় তাহাকে গ্রাস করিবার সামর্থ্য একমাত্র তুরীয়েই আছে। মুখ যেমন চর্বণ ও ভক্ষণ কার্য করিয়া থাকে তেমনি চিদনুসন্ধান-প্রধান তুরীয় অবস্থাও জড়ত্বকে গ্রাস করিয়া থাকে। তুরীয়াতীত অবস্থা দেবীর হৃদয়রূপে পরিকল্পিত। ইহাই সকল অবস্থার প্রাণ-ভূত। বাস্তবিক পক্ষে তুরীয়াতীত অবস্থা সাক্ষাৎ মহাশক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে অবস্থার বিচার প্রসঙ্গে তুরীয়াতীত অবস্থারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তুরীয় ও তুরীয়াতীত উভয় দশাতেই চিদ্‌ভাবের প্রকাশ থাকে, তথাপি তুরীয় অবস্থাতে সংসার-কলঙ্কের ক্ষীণ আভাস থাকিয়া যায়, কিন্তু তুরীয়াতীতে তাহাও থাকে না। পরম শিবের অবস্থা ষষ্ঠ দশারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য — ইহা অখণ্ড ও ব্যাপক। কিন্তু তাহা হইলেও পরম শিব হইতে পরাশক্তির উৎকর্ষই কীর্তিত হইবার যোগ্য, কারণ পরম শিবের সত্তা চিৎ-সারভূতা বিমর্শরূপা পরাশক্তির অধীন। এইজন্য শিব-শক্তিতে বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও শক্তিরই প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হয়।

চার

এই যে বিভিন্ন দশার বর্ণনা করা হইল ইহাদের সহিত 'অ' কারাদি বর্ণ সমূহের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কালিদাস রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শক্তি ও শিবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য উপমাচ্ছলে বাক্ বা শব্দ এবং অর্থের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টি প্রসঙ্গে শব্দই যে অর্থরূপে বিবর্তিত হয় ইহা ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন-শাস্ত্রে সর্বত্র এই শব্দ

ও অর্থের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা কীর্তিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় যোগিগণও ইহা জানিতেন এবং এই বিষয়ে অনেক গুহ্য তত্ত্ব তাঁহাদের সাধন সাহিত্যে উপলব্ধ হয়। শব্দ - অধ্বার বা ধারার মূল বর্ণ। বর্ণ হইতে মন্ত্র, পদ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। অর্থ-অধ্বার মূল কলা, যাহা হইতে তত্ত্ব, ভুবন প্রভৃতি কার্যবর্গের ক্রমিক স্ফুরণ হয়। উভয় ধারার পরস্পর সম্বন্ধ প্রতি স্তরেই বিদ্যমান।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বর্ণকে আত্মিক দশার জ্ঞাপক বা ব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতে পারি। সুতরাং তদনুসারে দশা ও বর্ণের মধ্যে ব্যঙ্গব্যঞ্জক সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলা চলে। বর্ণ দ্বারাই দশাগুলির অভিব্যক্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য। যে নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া উভয়ে এই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে তাহা উভয়ের সাদৃশ্য। ক্রমশঃ আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

'অ' হইতে বিসর্গ পর্যন্ত স্বরবর্ণ সুষুপ্তি অবস্থার দ্যোতক। 'ক' কার হইতে 'ম' কার পর্যন্ত পাঁচশটি স্পর্শ বর্ণ জাগ্রৎ অবস্থার দ্যোতক। য, র, ল ও ব এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ স্বপ্নাবস্থার পরিচায়ক। শ, ষ, ও স — এই তিনটি উষ্মবর্ণ তুরীয় বাচক এবং কূটাক্ষর 'ক্ষ' তুরীয়াতীত রূপে কল্পিত হয়। আপাততঃ ইহার বিচার তুরীয়ের সহিতই করিতে হইবে। যাহাকে তুরীয় বলা হইল তাহা জাগ্রৎ অবস্থাতে আবির্ভূত সুষুপ্তির নামান্তর। ইহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা যোগনিদ্রা।

বর্ণ সকল উচ্চারণ করিতে হইলে যে প্রযত্ন আবশ্যক হয় তাহার বৈশিষ্ট্য অবস্থাসকলের বৈশিষ্ট্যের ঠিক অনুরূপ। উচ্চারণগত সঙ্কোচ ও বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইল। স্পর্শবর্ণের উচ্চারণে স্পৃষ্ট প্রযত্ন আবশ্যক হয় — ইহা জাগ্রৎ অবস্থার দ্যোতক। এই প্রযত্নে সঙ্কোচভাব প্রধান থাকে। কিন্তু বিবৃত প্রযত্নে সঙ্কোচভাব কাটিয়া যায় উহাতে প্রসারের প্রাধান্য থাকে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিবৃত প্রযত্নের দ্বারাই হইয়া থাকে। স্বরবর্ণ সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞাপক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্বরবর্ণ নাদকল্প। এইজন্য তাহাকে নাদ-রূপেই গ্রহণ করা হয়।

স্পর্শ বর্ণ সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক। স্পৃষ্টতা প্রযত্ন বলিতে কন্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের নিম্ন ও উর্ধ্বভাগের সংঘটন বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম সঙ্কোচ গ্রহণ, বিবৃততা প্রযত্নের উদ্দেশ্য এই

যে ইহা দ্বারা পূর্বোক্ত সংঘটিত কণ্ঠাদি ভাগদ্বয়ের পুনরায় বিঘটন করা হয়। ইহার নামান্তর সঙ্কোচ ত্যাগ। জাগ্রৎ অবস্থায় ঘট-পটাদি অর্থের গ্রহণ হয়। এই অবস্থায় আত্মাতে সঙ্কোচ ভাবের উদয় হয়। সুষুপ্তি অবস্থা বিশ্রামের অবস্থা — তখন আত্মাতে পূর্ণভাব প্রকাশিত হয়।

যদিও বর্ণই দশার অভিব্যঞ্জক তথাপি সঙ্কোচ গ্রহণ ও সঙ্কোচ ত্যাগ মূলক অবস্থাসাদৃশ্য বর্ণের প্রযত্নসাপেক্ষ। এইজন্য প্রযত্নকে উপচার বশতঃ অবস্থা-ব্যঞ্জক বলিয়া ধরা হয়। স্বপ্ন অবস্থার জ্ঞাপক অন্তঃস্থ বর্ণগত ঈষৎ স্পৃষ্টতা প্রযত্ন। এই উচ্চারণ প্রযত্নে স্পৃষ্টতাই প্রধান — তবে গৌণভাবে বিবৃততা ইহাতে আছে। এইজন্য ইহাকে মিশ্র প্রযত্ন বা ঈষৎ স্পৃষ্ট প্রযত্ন বলা হয়। তুর্যদশার জ্ঞাপক উষ্ম-বর্ণগত ঈষৎ বিবৃততা প্রযত্ন। এই বিবৃততা প্রযত্ন স্পৃষ্টতার সহিত মিশ্রিত বলিয়া ইহা সমগ্র নহে — ইহা সঙ্কীর্ণ বা ঈষৎ।

অতএব সুষুপ্তির পূর্ণতা সমগ্র বা পূর্ণ। কারণ ইহা নির্বিকল্প পদ — ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়বর্গের বিশ্রামস্বরূপ। বিকল্পের অভাবই পূর্ণত্বের বোধক। জাগ্রতের অপূর্ণতা ঠিক এই প্রকার সম্যক্ বা পূর্ণ। কারণ ইহা সংসারপদ ও গাঢ় বিকল্পের উদয় স্থান। ইহা ঘট-পটাদির অনুসন্ধানাত্মক — ইহাতে বিশ্রান্তির স্পর্শ পর্যন্ত নাই। এই বিকল্পদ্বয়ই জাগ্রৎ অবস্থাকে মহাসঙ্কোচময় রূপে পরিণত করিয়াছে। তুরীয় অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মিশ্রণ বলিয়া জানিতে হইবে। যদিও তুরীয় অবস্থাতে চিদ্-বিশ্রান্তি ব্যাপকভাবে আছে এবং চিদ্-বিশ্রান্তিই সুষুপ্তি, তথাপি ঐ ব্যাপ্তির অনুসন্ধান হয় চৈত্য বর্গে বা জড় বস্তুতে। কাজেই বিকল্প-স্পৃষ্টতাও জাগ্রতের অনুবর্তী থাকে। স্বপ্নও মিশ্ররূপ — ইহা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সমবায় রূপ। তুরীয়ে পূর্ণতা অসমগ্র। কিন্তু স্বপ্নে সঙ্কোচ অসমগ্র।

পাঁচ

জ্ঞান ও ক্রিয়ার দিক্ দিয়া জাগ্রৎ সুষুপ্তি প্রভৃতি দশার আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে জাগ্রতের দুইটি রূপ আছে — একটি জ্ঞানরূপ অর্থাৎ স্বপ্ন এবং অপরটি ক্রিয়ারূপ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ জাগ্রৎ। তদ্রূপ সুষুপ্তিরও দুইটি রূপ আছে — একটি জ্ঞানরূপ অর্থাৎ তুরীয় এবং অপরটি ক্রিয়ারূপ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সুষুপ্তি। ইহা হইতে বুঝা যায়

যে স্বপ্ন জাগ্রতের প্রকার বিশেষ এবং তুরীয় সুষুপ্তির প্রকার বিশেষ। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নেও ঘট-পদাদির গ্রহণ হয় বলিয়া স্বপ্নও এক প্রকার জাগ্রৎই। তবে স্বপ্নে সুষুপ্তি অনুবৃত্ত থাকে, কিন্তু জাগ্রতে তাহা থাকে না। তদ্রূপ সুষুপ্তিই তুরীয়। কারণ উভয় পদেই বিশ্রান্তি লাভ হয়। তবে তুরীয়ে জাগ্রৎ অনুবৃত্ত থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহা থাকে না।

এই যে চারিটি দশাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হইল ইহার দ্বারা দশাসকলের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করা সহজ হইবে। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সহিত স্বপ্ন ও তুরীয় অবস্থার সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত। বোধ (awakening) ভিতরে বা অন্তঃকক্ষাতে উদিত হইলে উহা জ্ঞানরূপে উদিত হয়, উহারই নাম স্বপ্ন। কিন্তু উহা বাহিরে অর্থাৎ বহিঃকক্ষাতে উদিত হইলে ক্রিয়ারূপে উদিত হয়, উহার নাম জাগ্রৎ। তদ্রূপ সুপ্তি অন্তঃকক্ষাতে জ্ঞানরূপে উদিত হইলে উহার নাম হয় সুষুপ্তি। অতএব অন্তরিন্দ্রিয়ের অনুসন্ধানের নাম জ্ঞান এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অনুসন্ধানের নাম ক্রিয়া, ইহাই তাৎপর্য।

সংসার ও বিশ্রামের অনুসন্ধান প্রথমে অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটে, পরে উহা বাহ্যেন্দ্রিয়ের ধারাতে অবতীর্ণ হয়। মনে রাখিতে হইবে সমস্ত ভাবই শিবশক্ত্যাত্মক বলিয়া জ্ঞান - ক্রিয়ারূপ। অতএব জ্ঞান-জাগ্রৎ (স্বপ্ন), ক্রিয়া জাগ্রৎ (জাগ্রৎ), জ্ঞান-সুষুপ্তি (তুরীয়), ক্রিয়া-সুষুপ্তি (সুপ্তি), আবার জ্ঞান-জাগ্রৎ (স্বপ্ন), ক্রিয়া-জাগ্রৎ (জাগ্রৎ), ইত্যাদি ক্রমে চারিটি দশাতে অবতরণশীল কালচক্রের পরিভ্রমণ হইতেছে। এই কালচক্রের নাভি বা কেন্দ্রটি তুরীয়াতীত। জাগ্রৎ প্রভৃতি চারিটি দশার স্বভাব ভেদাভেদ রূপ সংসার ও তাহার বিশ্রান্তি— (১) জাগ্রৎ এর স্বভাব ভেদ-সৃষ্টির বা ভেদ-প্রবৃত্তিরূপে সংসারের বাহ্যেন্দ্রিয় ধারাতে অবভাসন; (২) স্বপ্নের স্বভাব অন্তরিন্দ্রিয় ধারাতে ভেদ-সৃষ্টির স্ফুরণ; (৩) তুরীয় কি? পূর্ব-বর্ণিত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুইটি দশাই অভেদ - সৃষ্টিতে তুরীয়-নাম ধারণ করে। বিশ্রান্তির উন্মুখতাবশতঃ ভেদনিবৃত্তিরূপে মার্গ-পরিগ্রহই অভেদ দশা। (৪) সুষুপ্তি উভয় ভূমির জন্ম ও লয় স্থান — ইহা ভেদময় জীব-সংসারের উদয় ও লয়-ভূমি এবং ইহা অভেদময় শিব-সংসারেরও উদয় এবং লয় ভূমি। জীবের সংসরণের তিনটি পদ ভেদাত্মক, তার ক্রম এই- সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ। জীবের বিশ্রামেরও ঐ তিনটিই পদ, তবে উহারা অভেদাত্মক। উহার নাম তুরীয়। ঐ তিনটি পদের ক্রম

এই — জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। বিশ্রামের পথটিও পাশের অন্তর্গত তবে ওখানে মায়ার স্পর্শ নাই। শিবের সংসরণের তিন পদ — ভেদহীন সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎবৎ তিনটি অবস্থা অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। শিবের বিশ্রামের তিন পদ — জাগ্রৎ হইতে সুষুপ্তি পর্যন্ত — নিবৃত্তি মার্গ। ইহাই তুরীয়। শিবে প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ দুইটি অভিন্ন ও একরূপ, কারণ উভয়ই অভেদাত্মক। এইজন্য উভয়েই 'তুরীয়' শব্দের ব্যবহার হয়। তথাপি 'তুরীয়' পদ ব্যবহারের মুখ্যতা নিবৃত্তি মার্গে, প্রবৃত্তি মার্গে নহে। অদ্বৈত সংসারের সমাধান দ্বৈত সংসারের মতই বুঝিতে হইবে।

ছয়

পূর্বে দশা স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল দশার অধিষ্ঠাতা শিব ও জীবের স্বরূপ কি এখন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ মন্ত্রশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বিন্দু ও বিসর্গ এই দুইটি পরিভাষা অনুসারে তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যাইতেছে। শিব প্রকাশতত্ত্ব। যাহাকে প্রকাশতত্ত্ব আপন হইতে যেন বাহিরে বিসর্জন করে তাহাকে বিসর্গ বা বিমর্শ বলে। ইহার নামান্তর স্বভাব ও প্রকৃতি। বস্তুতঃ বাহিরে বিসর্জন করে না — কারণ সর্বব্যাপী প্রকাশের বাহিরে কিছু থাকিতেই পারে না। প্রকাশের ভিত্তিলগ্ন হইয়াই প্রতি বস্তু নিজ সত্তা লাভ করে। প্রকাশের বাহিরে সত্তা থাকে না। যাহা প্রকাশমান নহে তাহাকে সৎ বলা চলে না। বিসর্জনটি একটি চমৎকার মাত্র। প্রকাশের স্বভাবই বিমর্শ, যাহা না থাকিলে প্রকাশ বিষয় দ্বারা উপরক্ত হইলেও স্ফটিকাদির ন্যায় উহাতে জড়ত্ব প্রসঙ্গ হয়। দীক্ষার পর সংবিৎ — শাস্ত্র সিদ্ধান্তে অধিকার জন্মে। দীক্ষিত পুরুষই পরম রহস্য রূপ মন্ত্রার্থের উপদেশাধিকারী। তাই কোন কোন আচার্য মন্ত্রার্থ বিষয়ক প্রস্তাবে সংবিন্মতের সার প্রকাশিত করিয়াছেন। এই যে বিমর্শ ইহা প্রকাশের স্বকীয় স্বভাবভূত ও আত্ম-বিশ্রান্ত, ইহার নামান্তর পরা প্রকৃতি, স্বাতন্ত্র্য, মায়া ও অবিদ্যা। ইহাই জগদ্-বীজ। কোন সময়ে প্রপঞ্চানুসন্ধানের ইচ্ছা হইলে প্রকাশ এই বিমর্শকে স্বাত্ম-ভিত্তিতেই বহির্বৎ বিসর্জন করেন। তাহাই বিসর্গ। এই বিসর্গরূপ বিমর্শ বেদ্যাকার ধারণ করিয়া বেদককে গ্রাস করে ও নিজে প্রমাতা সাজে। বেদক চিৎরূপ হইলেও প্রমুষিত-বৈভব

হইয়া, অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রমাণরূপ ধারণ করে ও জীব বা পশু নামে পরিচিত হয়। আবার যখন ঐ শিবরূপী প্রকাশ প্রপঞ্চসংহারের ইচ্ছা করেন তখন বিমর্শরূপিণী প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে গ্রাস করেন। তখন তাঁহার নাম হয় বিন্দু। বিন্দু অপরিচ্ছিন্ন স্বভাব। অতএব বেদ্য, বিমর্শ ও বিসর্গ এক। তদ্‌রূপ বেদক, প্রকাশ ও বিন্দু অভিন্ন। বিমর্শের স্বভাব সংসরণ। প্রকাশের স্বভাব বিশ্রাম। এই বিচিত্র সংসার বিসর্গ দ্বারাই সমুন্নীত হয়। বস্তুতঃ পশু, শিব ও পরম শিব সকলেই সংসারী, তাই সংসারকে বিচিত্র বলা হইয়াছে।

এখন কাহার সংসার কি প্রকার তাহা বলা যাইতেছে। পশুর সংসার দ্বৈতাত্মক, কারণ এই সংসারে বিসর্গ বা বিমর্শ অবিদ্যারূপে ভেদ উন্মীলন করে। কিন্তু শিবের সংসার অদ্বৈতরূপ, কারণ এখানে বিমর্শ বিদ্যারূপে অভেদভাব পরিগ্রহ করে। আর পরম শিবের সংসার মিশ্র বা দ্বৈতাদ্বৈত রূপ, কারণ ইহাতে বিমর্শ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়রূপে যুগপৎ ভেদাভেদাত্মক রহস্য প্রদর্শন করে। এই ত্রিবিধ সংসারের বিশ্রাম কোথায়? ইহার উত্তরে সিদ্ধগণ বলেন যে শুদ্ধ মহাবিন্দুপদই সংসার-কলঙ্ক দ্বারা অস্পৃষ্ট অন্তর্মুখ বিশ্রাম-স্বভাব। ইহাই অনুত্তর পরমধাম। এই মহাবিন্দুতেও দুইটি স্থিতি আছে ঃ— প্রথমটি ত্রিবিধ সংসারের উপাদানভূত পূর্ণ বিমর্শস্বভাব বলিয়া মহা-বিশ্রান্তিপদ হইলেও কক্ষাত্রয়ে প্রকটিত প্রপঞ্চের কলরব ও অনুসন্ধান-গন্ধ ওখানে একেবারে উপশম প্রাপ্ত হয় না। ঐটি চতুর্থপদ। দ্বিতীয়টির নাম পরম ব্যোম। ইহা পঞ্চম্নায়-পরিশোধিত নিষ্কল মহাবিন্দুতত্ত্ব। এইটি পঞ্চমপদ। সুতরাং উক্ত পাঁচটি দশা এই প্রকার — (১) ভেদ-সংসার — ইহা পশুর; (২) অভেদ-সংসার — ইহা শিবের; (৩) মিশ্র-সংসার — ইহা পরম শিবের; (৪) সর্ব সংসারের একমাত্র বিশ্রান্তি দশা — ইহা তুরীয়। এইটি স-কল মহাবিন্দু ও (৫) নিষ্কল মহাবিন্দু — ইহা তুরীয়াতীত।

বিন্দু অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া শিব-স্বরূপ হইলেও যখন উহাতে বিকল্প-স্পর্শ হয় তখন উহার পরিচ্ছিন্নত্ব সম্ভবপর হয়। প্রশ্ন হয়, ঐ অবস্থায় তাহাকে 'বিন্দু' বলা উচিত কিনা। ইহার উত্তর এই যে ঐ অবস্থাতে বিকল্প স্পর্শ থাকার দরুণ সমগ্র বিন্দুলক্ষণ উহাতে প্রযোজ্য হয় না। তবে গৌণভাবে 'বিন্দু'-শব্দের ব্যবহার বিকল্প ক্ষেত্রেও হইয়া

থাকে। কারণ বিত্তি অথবা জ্ঞান অভেদরূপ। তবে ইহা গুণ-গর্ভিত অভেদরূপ, তাই ইহা গুণ। এইপ্রকার বিন্দু গৌণ। গৌণ 'বিন্দু' শব্দ ব্যবহারের ইহাই নিমিত্ত। এই জ্ঞানই শিবের স্বরূপ বা তনু। এইভাবে মিশ্র সংসারের অধিষ্ঠাতাও বিন্দু। ব্যবহার বাহুল্যের অভিপ্রায়ে শিবকেই বিন্দু বলা হয়। কিন্তু পরিচ্ছেদ সত্ত্বেও চিৎ-রূপ বলিয়া পশুকেও বিন্দু বলা চলে।

'বেদ্য' শব্দে বুঝায় ভেদপদ বা ভেদস্থান। ইহা জীবের ব্যাপক, তাই ইহা জীব-স্বরূপ, যাহা যাহার ব্যাপক বা সংবরক তাহা তাহার স্বরূপ হয়। বেদ্য ভেদের সংবরক বা ব্যাপক বলিয়া ভেদের স্বরূপ। এইজন্য জীব বেদ্যরূপ বলিয়া বেদ্যবৎ 'বিসর্গ' - পদবাচ্য। মন্ত্র-বিদ্‌গণ এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পশুপদে এবং শিবপদে বেদ্য ও বেদক পরস্পরকে আক্রমণ করে। কেন এরূপ করে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। রহস্যাগমের সিদ্ধান্ত এই যে এই জগৎ শিব-শক্তির অথবা প্রকাশ ও বিমর্শের পরিণাম। যদিও প্রাচীন মতে জগৎকে বিমর্শেরই বিলাস বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রকাশ ব্যতিরেকে বিমর্শের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না। তাই বিমর্শ জগদাকারে বিলসিত হইলেও জগতে প্রকাশাংশকে অর্ধ ভাগ দ্বারা অবভাসন করে। বাকী অর্ধভাগ দ্বারা নিজাংশ অবভাসন করে। প্রকাশাংশ বেদক, বিমার্শাংশ বেদ্য। কাজেই বেদ্য বা চৈত্য বিমর্শের পরিণাম বলিয়া বিমর্শই। এই বিমর্শ চিৎ বা প্রকাশের ধর্ম। কেননা প্রকাশ হইতেই ইহার জন্ম হয় এবং প্রকাশেই ইহার লয় হয়। সকল বস্তুই স্ফুরণ ব্যতীত সত্তাহীন হয় — স্ফুরণ প্রকাশের অধীন। তাই সকল বস্তুরই মূল কারণ প্রকাশ। আর এক কথা। শব্দরূপ বিমর্শের উদয় ও লয় স্থান গগন। ইহা প্রকাশেরই নামান্তর। অন্যপক্ষে প্রকাশ বিমর্শের ধর্ম। প্রকাশের রূপ বিসৃষ্ট না হইলে অর্থাৎ 'ইহা এইরূপ' এই প্রকার বিমর্শ দ্বারা প্রকাশের স্বরূপ-নির্দেশ না হইলে, ঐ প্রকাশ থাকিয়াও না থাকার সমান। যে বস্তু 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে বিসৃষ্ট না হয় তাহার সত্তা স্বীকার করিলে শশশৃঙ্গ প্রভৃতিরও সত্তা মানিতে হয়। অতএব সকল বস্তুই কোটি-অধিরোহণ বিষয়ে বিমর্শের অধীন। সুতরাং প্রকাশের সত্ত্বেও বিমর্শের কারণতা আছে বলিয়া প্রকাশকে বিমর্শ-ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

শিব ও শক্তির পরস্পর ধর্ম-ধর্মিভাব প্রদর্শিত হইল। ইহার উপযোগিতা আছে। পূর্ব প্রকারে চিৎ ও চৈত্যের ধর্ম-ধর্মিভাব সমান বলিয়া পরস্পর পরস্পরের পদ স্বভাবতঃই আক্রমণ করিয়া থাকে। ধর্মীধর্মপদের ব্যাপক হয়। যখন চিৎ চৈত্য দ্বারা আবৃত বা ব্যাপ্ত হয় তখন তাহা 'পশু'পদ-বাচ্য হয়। তখন তাহার স্বকীয় শক্তি আচ্ছন্ন হয় — তাহার দীনভাব জন্মে। পক্ষান্তরে চিৎ যখন চৈত্যকে আবরণ করে তখন উহা 'শিব'পদ বাচ্য হয়।

পশু ও শিবের পদদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা গেল। এখন চিৎ ও চৈত্যের সমব্যাপ্তি পদ কি প্রকার তাহা বলা যাইতেছে। যখন চিৎ ও চৈত্য সমব্যাপ্তিক হয় তখন উহাদের স্বভাব স্তিমিত বা নিশ্চল হয় — ঐ নিশ্চল মধ্যমপদ বা মিশ্রপদ বিশ্রান্তিস্বভাব অবগাহন করিয়া 'পরম শিব' নামে প্রসিদ্ধ হয়। শিব ও জীবগত ব্যাপারদ্বয়ের এককালীনতা স্থলে পরস্পর অভিঘাত বশতঃ পরস্পরের ব্যাপার-বেগ উপক্ষীণ হইলে যে নির্ব্যাপার দশা উপস্থিত হয় তাহাই সমব্যাপ্তি পদ। এই স্তিমিত দশা উভয়ের মূল বলিয়া ইহা উভয় পক্ষ-ব্যাপিনী হয় ও ইহা দুই পক্ষেই বিশেষ স্বাম্য (স্বামিত্ব) লাভ করে। এইভাবে মিশ্র পদে প্রমাতা শিব ও জীবের ব্যাপারের যৌগপদ্যানুসন্ধান হয়। এইভাবে ধর্মী তিন প্রকার — চিৎ, চৈত্য ও মিশ্র, এবং তাহাদের বিমর্শও তদনুরূপ তিন প্রকার — অর্থাৎ জীবের দ্বৈত বিমর্শ, শিবের অদ্বৈত বিমর্শ এবং পরম শিবের উভয়াত্মক বিমর্শ।

সাত

জ্ঞান ও ক্রিয়ার স্বরূপ কি ইহাই এখন আলোচ্য। জ্ঞান অভেদাত্মক বলিয়া চিৎ। কারণ, ঘটপটাদি জানিবার সময় 'জ্ঞাত হয়' এইরূপে বিভিন্ন ঘট-পটাদিতে একরূপতা প্রতীতি জন্মে। তাই চিৎ অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। ক্রিয়া ভেদরূপ — ইহা চৈত্য। ঘট পট প্রভৃতি চৈত্য পরস্পর-ব্যাবৃত্ত স্বরূপ হওয়ার দরুণ ভিন্নরূপে অনুভূত হয়। অতএব চিৎ বা চৈত্য, জ্ঞান বা ক্রিয়া, পরস্পর-ব্যাবৃত্ত স্বরূপ হওয়ার দরুণ ভিন্নরূপে অনুভূত হয়। অতএব চিৎ বা চৈত্য, জ্ঞান বা ক্রিয়া, স্বরূপতঃ পরস্পর ভিন্ন নহে। তবে যে ভেদের অবভাস হয় তাহার কারণ বিপর্যয়-জ্ঞান অর্থাৎ মায়া। তত্ত্বদৃষ্টিতে উভয়ই অভিন্ন।

জ্ঞান বা প্রকাশই বিমর্শ আকারে কঠিনত্ব গুণ ধারণ করিলে ক্রিয়াপদ বাচ্য হয়। আকাশের কাঠিন্যই শব্দ। তদ্রূপ চিদাকাশের কাঠিন্যই বিমর্শ। যেমন জল ও করকার ভেদ বাস্তব নহে, তদ্রূপ প্রকাশ ও বিমর্শের ভেদও বাস্তব নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকাশ ও বিমর্শের মধ্যে ভেদ বাস্তবিক না থাকিলেও ইহা মানিতেই হইবে যে চৈত্যরূপ বলিয়া ঘটপটাদি নানারূপা ক্রিয়াকে জ্ঞানরূপ প্রকাশ হইতে স্থূলতঃ ভিন্ন না বলিয়া পারা যায় না। আর এক কথা। বিমর্শ বর্ণরূপ। ঘটপটাদি নির্দিষ্ট আকারাত্মক — এই দৃষ্টিতে বিমর্শ হইতে ঘটপটাদির ভেদ নিশ্চয় করা হয়। এইরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিবেক-দশাতে ঘটপটাদি কোন বস্তুরই ঘটপটাদি শব্দরূপ বিমর্শ ব্যতিরেকে কোন পৃথক্ স্বরূপ পাওয়া যায় না। যাঁহাদের মায়ান্ধকার গুরু-কটাক্ষ দ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং ক্রিয়া যে জ্ঞান হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন তাহা সত্য। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে বিমর্শরূপা ক্রিয়া কাঠিন্য ত্যাগ করিয়া বিশ্রান্তি-স্বরূপ বিরল-ভাব আশ্রয় করিলে জ্ঞান-পদ বাচ্য হয়, অর্থাৎ প্রকাশের সহিত একরকম হয়। অতএব জ্ঞানের বাহ্যরূপ ক্রিয়া, ক্রিয়ার বাস্তবরূপ জ্ঞান, দুইটি একার্থক। এই জ্ঞানই প্রকাশ বা শিব এবং ক্রিয়া বিমর্শ বা শক্তি। উভয়ের প্রাধান্য সমান সমানই, সুতরাং উভয়ই যুগপৎ সত্য। সিদ্ধগণ বলেন যে এই যামল সিদ্ধান্ত মন্ত্রবিজ্ঞানের হৃদয় স্বরূপ।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, জ্ঞান ক্রিয়ার কারণ এবং ক্রিয়া জ্ঞানের কারণ — ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তর এই, ক্রিয়া বা বিমর্শ ভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশ - স্বরূপই সিদ্ধ হয় না। ঠিক সেই প্রকার জ্ঞান ভিন্ন ক্রিয়ার উপলব্ধিও সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সিদ্ধগণ বলেন, জ্ঞান ও ক্রিয়া যামল অথবা যুগপৎ সিদ্ধ। ইহাই মন্ত্রের হৃদঙ্গ। জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে পৌর্বাপর্য নাই, যৌগপদ্যই আছে। বেদ্য-বেদকরূপে, প্রকৃতি-পুরুষরূপে, দেহ-আত্মারূপে ও শব্দ-অর্থরূপে অথবা অন্য কোন প্রকার পর্যায়ের আকারে জ্ঞান ও ক্রিয়া দুইটিই যুগপৎ সিদ্ধ।

আট

শিবের দক্ষিণার্দ্ধ ক্রিয়া, তাই কর্মকাণ্ড দক্ষিণমার্গ। তাঁহার বামার্দ্ধ জ্ঞান, সেইজন্য জ্ঞানকাণ্ড বাম-মার্গ। সিদ্ধগণের মতে শৈবমত

দক্ষিণাচার এবং শাক্তমত বামাচার, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ইহার তাৎপর্য এই, ক্রিয়া বিমর্শরূপ বলিয়া শক্তি-স্বরূপ। জ্ঞান প্রকাশরূপ বলিয়া শিব-স্বরূপ। ইহা রহস্য বলিয়া জানিতে হইবে। জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ শিব-শক্তিতে পরস্পর অনুরাগ বশতঃ পরস্পরের স্বভাব পরস্পরে উপরক্ত হয়। শিবের স্বভাব জ্ঞান জড়াকার ক্রিয়া দ্বারা উপরক্ত বা রঞ্জিত হয়। তখন উহা জড়ের শুক্লতা দ্বারা (চন্দ্রের শুক্লতা দ্বারা) শুক্ল হয়। শক্তির স্বভাবভূত ক্রিয়া অজড় জ্ঞান দ্বারা উপরক্ত হইয়া অজড় রবির রক্ততা দ্বারা অরুণ হয়। উভয় মিশ্ররূপ উভয়বর্ণ-সংসর্গ বশতঃ হেমবৎ হয় (golden)। শিব, শক্তি ও মিশ্র এই তিনটির স্বরূপ, পর্যায় ও গুরু পাদুকান্তর্গত চরণত্রয়বৎ বর্ণবাসনাও বুঝিতে হইবে। সেইজন্য শিব জ্ঞানরূপ হইলেও শক্তির স্বভাব ক্রিয়ার স্বরূপ অনুসন্ধান কার্যে সদা ব্যাপৃত বলিয়া জ্ঞানমার্গে, বা বামাচারে ব্যবস্থাপিত হইয়াছেন। ইহাই কৌলিক রহস্য। এই তত্ত্বটি অত্যন্ত দুর্বোধ। জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সত্য পুরুষের বাম ও দক্ষিণ অর্ধরূপে বিন্যাস করিয়া সিদ্ধগণ বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার ব্যাপ্তি সমান সমান হইলে তাহার নাম হয় ইচ্ছা। ইহাই মধ্য। ইচ্ছাতত্ত্ব পরমাত্মস্বভাবের জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুই পক্ষের মূলরূপ — উভয়ের বীজস্বরূপ। যদিও এক হিসাবে ইহা বলা চলে যে জ্ঞান-ক্রিয়াও ইচ্ছার মূল এবং ক্রিয়া-জ্ঞানও ইচ্ছার মূল, তথাপি ইহা সত্য যে ইচ্ছা মাধ্যমিক বলিয়া সুষুম্না স্বরূপ। সেইজন্য সিদ্ধগণ ইচ্ছাকেই এক সঙ্গে জ্ঞান-ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইচ্ছা অচল ও স্তিমিত স্বভাব। ইহাই বিশেষ ভাবে বীজত্বের সমর্পিকা। কারণ বীজ নিশ্চল ভাবে স্থিত থাকে এবং মূল ও অঙ্কুর ক্রমশঃ ভিতরে ও বাহিরে প্রসৃত হয়। জ্ঞান অন্তর্মুখী গতির দ্বারা নিবৃত্তি রূপে প্রসরণ করে, তাই জ্ঞানকে মূল বলা হয়। বীজের অধোভাগে প্রসরণশীল অবয়বটি থাকে। ক্রিয়া বহির্মুখী গতির দ্বারা প্রবৃত্তি রূপে প্রসরণ করে। এইজন্য ক্রিয়াকে বীজের অঙ্কুর বলা হয়। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটিকে প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। জ্ঞান, ক্রিয়া ও এই উভয়ের সমষ্টির স্বরূপ ও সামরস্যরূপী ইচ্ছা — এই তিনটি তত্ত্ব পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়।

———

শ্রীভগবানের স্বরূপ ও কৃত্য (দ্বৈতশৈবমত)

দার্শনিকদিগের মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধে এবং তাঁহার কৃত্য সম্বন্ধে সকল দেশেই নানা প্রকার আলোচনা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত শৈবাগম অনুসারে এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বলা বাহুল্য শৈবগণ ভগবৎ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া উহার পরিবর্তে শিব শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমরাও সেই রীতি অনুসারে এই প্রসঙ্গে শিব শব্দেরই প্রয়োগ করিব।

ইঁহারা বলেন, মূলে তিনটি তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তিনটি তত্ত্বই পরমতত্ত্ব। ইহাদিগকে তাঁহারা রত্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাদের নাম ঃ— শিব, শক্তি ও বিন্দু অথবা মহামায়া। বৌদ্ধগণ যেমন ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘকে রত্নত্রয় বলেন তদ্রূপ এই সম্প্রদায়ের শৈবগণও উক্ত তিনটি পরমতত্ত্বকে রত্নত্রয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় শিব, শক্তি ও বিন্দুর পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। শিব চিৎস্বরূপ, শক্তিও চিদ্রূপা, কিন্তু বিন্দু অচিদ্‌রূপ। শক্তি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী এবং শিবস্বরূপে নিত্যসমবেত। কিন্তু ইহা কখনও সক্রিয় কখনও নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। শক্তি ক্রিয়াশীল হইলে উহার প্রভাবে অচিদ্রূপ বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন বিন্দুও তখন ক্ষোভহীন শান্ত থাকে। শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিলে শিব কেবল স্বপ্রকাশ-স্বরূপেই স্থিত থাকেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাইবার উপায় থাকে না। ইহা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা। শিবের স্বাতন্ত্র্যবশতঃই শক্তিতে ক্রিয়ার উন্মেষ হয় ; এবং ক্রিয়ার উন্মেষ হইলেই বিন্দুতে চঞ্চলতা আসে এবং পরিণাম সংঘটিত হয়। বিন্দুর নামান্তর মহামায়া। চিদাকাশ এবং কুণ্ডলিনী শব্দ দ্বারা এই বিন্দুকেই লক্ষ্য করা হয়। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জগতের সৃষ্টির সূচনা করে। ইহা কি জন্য হয় তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সূর্য হইতে যেমন রশ্মি অথবা কিরণ নির্গত হয় তদ্রূপ ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতে কিরণ-মালা নির্গত হইয়া থাকে। এই মূল কিরণকে অথবা শক্তির ধারাকে

কলারূপে আগমশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রদীপের আলো চারিদিকে বিসর্পিত হইলেও যে আলো প্রদীপের অধিকতর নিকটবর্তী তাহা তত উজ্জ্বল এবং যাহা প্রদীপের অপেক্ষাকৃত ব্যবধানে স্থিত তাহার উজ্জ্বলতা তত কম। প্রদীপের বিকিরণ শক্তি আপাততঃ সীমাবদ্ধ ধরিয়া নিলে প্রদীপের বিকিরণের একটা অন্তিম সীমা স্বীকার করিয়া নিতে হয়, যাহার ফলে প্রদীপের আলো ক্রিয়াশীল থাকে না। ঠিক সেই প্রকার বিন্দুকে প্রদীপ স্থানীয় ধরিয়া লইয়া কলাবর্গের বেষ্টনী চারিদিকে কল্পিত হইয়া থাকে। বিন্দু হইতে গণনানুসারে যেটি পঞ্চম কলা সেইটি অন্তিম কলা। এইটির নাম নিবৃত্তি, কারণ ইহার পর কলার বহিঃপ্রসরণ নিবৃত্ত হইয়া যায়। নিবৃত্তি কলা হইতে অধিকতর বিন্দু-সন্নিহিত কলার নাম প্রতিষ্ঠা কলা। প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা নিকটতর কলার নাম বিদ্যাকলা। বিদ্যার অন্তরঙ্গ কলা শান্তিকলা নামে প্রসিদ্ধ। সর্বাধিক নিকটবর্তী কলা, যাহা বিন্দুর সহিত অভিন্ন ভাবে বর্তমান তাহার নাম শান্তাতীত কলা। এই পাঁচটি কলার সমষ্টি বিন্দু। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া জ্যোতি ও শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু এই জ্যোতি ও শব্দ ক্রমশঃ বহির্মুখ হইতে হইতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। প্রদীপের আলোর বহির্ভাগে যেমন ছায়া পরিদৃষ্ট হয় তেমনই অভিব্যক্ত বিন্দুর বহির্ভাগে ছায়ারূপা মায়া পরিদৃষ্ট হয়। বিন্দু যখন অব্যক্ত থাকে তখন এই আলো ও ছায়া উভয়ই অব্যক্ত থাকে। ইহা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা। কিন্তু সৃষ্টিকালে আলোর রাজ্য ও মায়ার রাজ্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অবান্তর বিভাগও যে না আছে তাহা নহে। এখানে তাহা আলোচনা করিব না। আলোর রাজ্যটি মহামায়ার রাজ্য; ছায়ার রাজ্যটি মায়ার রাজ্য। কিন্তু ছায়া ছায়া হইলেও তাহাতে আলোর আভাস আছে। তদ্রূপ মায়ারাজ্যেরও অন্তঃস্থলে মহামায়ার অংশ বিদ্যমান থাকে জানিতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে — মহামায়া বিক্ষুব্ধ হইয়া যে কলা-পঞ্চকে পরিণতি লাভ করে তন্মধ্যে তিনটি কলা অর্থাৎ নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাকলা মায়ারাজ্যের অন্তর্গত এবং অপর দুইটি কলা যথা শান্তা ও শান্তাতীতা মহামায়া রাজ্যের অন্তর্গত। মহামায়া রাজ্য প্রথমে সৃষ্টি হয়; তাহার পর মায়ারাজ্যের সৃষ্টি হয়; মায়ারাজ্যের প্রশাসন করিবার জন্য মহামায়া রাজ্যের গঠন পূর্বেই আবশ্যক হয়।

শ্রীভগবান আগম শাস্ত্রানুসারে সর্বদা পঞ্চকৃত্যনিরত। তদনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ বা তিরোধান ও অনুগ্রহ সর্বদাই তিনি করিতেছেন। ইহা তাঁহার নিত্যকৃত্য অথচ তাঁহার স্বরূপের এমন একটা দিক আছে সেখানে তিনি কিছুই করিতেছেন এইরূপ বলা চলে না। দ্বৈত মতে জীব বা পশু অনাদি কাল হইতে মলের দ্বারা আচ্ছন্ন। যদিও জীব স্বরূপতঃ শিবত্বসম্পন্ন তথাপি এই মলের আবরণ বশতঃ সে নিজের শিবত্ব বিস্মৃত হইয়া জীব সাজিয়া এবং কর্তৃত্ব ভাব গ্রহণ করিয়া শুভাশুভ কর্ম করার ফলে ভোগের জন্য মায়িক জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দেহে সংসারী সাজিয়া নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। এই ব্যাপারের মূলে তার আত্মবিস্মৃতিই কারণ; বস্তুতঃ এই বিস্মৃতির মূলে মলের আবরণ বা রোধশক্তি। ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ঘটিয়া থাকে এবং তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অনুগ্রহের ফলে এই আবরণ যখন কাটিয়া যায় তখন জীব শিবত্ব লাভ করে। ইহাই তাহার পরামুক্তি। যতদিন ইহা না ঘটে ততদিন সে যে কোন অবস্থাতেই থাকুক তাহা চরম নহে। এই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের মূলে শ্রীভগবান স্বয়ং এবং উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের আবর্তন চলিতেছে। মায়িক উপাদানে দেহ গ্রহণ করা — ইহাই সৃষ্টি, ঐ দেহের সংরক্ষণ — ইহাই স্থিতি এবং মৃত্যুতে বা প্রলয়ে উহার নিবৃত্তি—ইহাই সংহার। দেহবীজ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত দেহ গ্রহণ বন্ধ হইতে পারে না। তাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের আবর্ত নিরন্তর ঘুরিতেছে। দেহবীজ নষ্ট হইলে অর্থাৎ অবিবেক ও অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে মায়িক দেহ গ্রহণের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু জীবের পরম স্বরূপ যে শিবভাব তাহা তখনও উপলব্ধ হয় না, তাহার জন্য শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক হয়।

শ্রীভগবানের স্বরূপ অর্থাৎ শিবস্বরূপ, বুঝিবার সুবিধার জন্য, তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে— (১) নিষ্কল, (২) সকল-নিষ্কল, ও (৩) সকল। শ্রীভগবান বা শিব নিরন্তরই এই ত্রিবিধভাবে অখণ্ড-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। বিভাগ-কল্পনা জীবের বুঝিবার সুবিধার জন্য। এই ত্রিবিধ বিভাগের সহিত চিৎশক্তির তিনটি অবস্থার এবং সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুরও তিনটি অবস্থার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবানের যেটি নিষ্কল স্বরূপ তাহা পরম অব্যক্ত। সেখানে শক্তি নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। বলা

বাহুল্য, তখন বিন্দুও ক্ষোভহীন বলিয়া শান্ত। ইহা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা-কালীন ভগবৎস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন যেটি দ্বিতীয়াবস্থা — তাহা চিৎশক্তির উন্মেষ দশা — তখন শক্তি পূর্বাবস্থার ন্যায় একেবারে মুকুলিত নহে এবং পরাবস্থার ন্যায় পূর্ণ বিকশিতও নহে। ইহারই নাম শক্তির উন্মেষ। তদ্রূপ বিন্দুও তখন অক্ষুব্ধ নহে এবং পূর্ণভাবে ক্ষুব্ধও নহে। এইটি বিন্দুর ক্ষোভোন্মুখ অবস্থা। এইটি পরম আনন্দের অবস্থা, যাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলে তাহা এই অবস্থাতেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এখনও সৃষ্টি হয় নাই; মাতার গর্ভে সন্তানের অবস্থানের ন্যায় এই অবস্থায় বিশ্বমাতার গর্ভে সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত থাকে। ইহার পরবর্তী অবস্থাই প্রসবদশা। চিৎশক্তি তখন প্রবৃত্তি-সম্পন্ন এবং পূর্ণবেগে ক্রিয়াশীল। বিন্দুও তখন ক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টির উপাদানরূপে পরিণত হয়। এইটি পরমেশ্বরের বা শ্রীভগবানের সকলাবস্থা। ইহার পূর্ববর্তী ভোগাবস্থাটি ছিল সকল-নিষ্কল, আর পূর্বাবস্থা যেটি সেটি নিষ্কল। অখণ্ড ভগবৎস্বরূপে এই তিনটি দশাই রহিয়াছে। একটি লয়ের অবস্থা — ইহা সৃষ্টির প্রাগবস্থা। একটি ভোগাবস্থা — ইহা সৃষ্টির গর্ভাবস্থা — ইহাকে পালনাবস্থাও বলে। একটি সৃষ্টির বিকাসাবস্থা — ইহাকে অধিকারাবস্থাও বলে। ভগবান স্বরূপতঃ ইহার প্রত্যেকটি। তাঁহাতে কোন বিরোধ নাই। জীবের বুদ্ধি ক্রম ধরিয়া এগুলি বুঝিতে চেষ্টা করে।

জীব তাহার সংসারাবস্থা কাটিয়া যাইবার পর দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া থাকে। যে সকল জীব চিদাত্মক নিজ স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি ও মায়া হইতে পৃথগ্‌ভাবে কৈবল্য-দশাতে অবস্থান করে তাহারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু নিজের অন্তর্নিহিত শিবত্বের অনুভব প্রাপ্ত হয় না, কারণ এ সকল জীবে আণবমল কাটে না। যতদিন মলের পরিপাক না হয় ততদিন উহার কাটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে সকল জীব পক্বমলাবস্থা প্রাপ্ত হয় অথচ বিবেকজ্ঞানবশতঃ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয় তাহারা অভিনব সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রভাবে তাহাদের আণবমল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অব্যবহিত উত্তরক্ষণে শিবসাম্য লাভ করিতে পারে না তাহারা তাহাদের শুদ্ধ বাসনানিবন্ধন দুইটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটি লাভ করিয়া

থাকে। কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যের বাসনাবিশিষ্ট বলিয়া ঈশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত হয় — ইহারা পরমেশ্বরের স্থানাপন্ন পঞ্চকৃত্যকারী মহাপুরুষ। ইহারা পূর্ণশিবত্ব লাভ না করিলেও অধিকারী শিবরূপে গণ্য হইয়া থাকে। মায়িক জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার ইহাদেরই হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ অধিকারী বা কর্তা সাজিয়া গুরু ও ঈশ্বরের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আবার অন্য কেহ গুরু ও ঈশ্বরের নির্দেশবর্তী থাকিয়া জীবের অনুগ্রহ ব্যাপারে করণস্থান প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রেশ্বর ও মন্ত্র নামে তান্ত্রিকশাস্ত্রে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে মন্ত্রাত্মক দেবতা ও মন্ত্রপ্রযোক্তা গুরুরূপী ঈশ্বর, ইহারাও এক প্রকার জীবই, যদিও ইহারা পরমেশ্বর দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ কৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়। এই অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকেই আমরা স-কল শিব বলিয়া পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। এই সকল ঈশ্বরকল্প জীবের সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু যে সকল জীব অধিকার-বাসনা-সমাচ্ছন্ন নহে তাহারা বলপূর্বক শ্রীভগবান কর্তৃক জগৎ ব্যাপারে প্রেরিত হয় না। তাহারা শুদ্ধ পরমানন্দের ভোগবাসনা বিশিষ্ট বলিয়া শ্রীভগবান তাহাদিগের সেইরূপ আনন্দ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহারা মায়িক জগতের দিকে বিমুখ হইয়া আত্মবিশ্রান্তি গ্রহণ পূর্বক অখণ্ড পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে। এই আনন্দরস অনন্ত, অপার এবং অসংখ্য প্রকার বিশিষ্ট। যাহার বাসনা যে প্রকার সে স্বভাবতঃ সেই প্রকার আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই আস্বাদনও এক হিসাবে ক্ষোভমূলক, কারণ চিৎশক্তির ক্রিয়োন্মেষ অবস্থাতে অক্ষুব্ধ বিন্দু যখন ক্ষোভের দিকে উন্মুখ হয় তখনই এই প্রকার আস্বাদন সম্ভবপর হয়। ইহাও একজাতীয় ভোগবাসনা, ইহা মায়ার অতীত এমন কি অধিকার ভূমিরও অতীত, তথাপি ইহা বাসনা। এই বাসনা থাকে বলিয়াই আনন্দের, এমন কি স্বরূপানন্দেরও আস্বাদন ঘটে। ইহাই আত্মারামাবস্থা। উপনিষদে যে আত্মমিথুন অবস্থার কথা বলা হইয়াছে ইহা তাহাই। কিন্তু যখন এই ভোগবাসনা চরিতার্থ হইয়া যায় তখন আর এই স্বরূপানন্দও ভাল লাগে না। আনন্দ তখনও থাকে বটে, কিন্তু বাসনা থাকে না বলিয়া তাহার আস্বাদন হয় না। এই আনন্দের অবস্থায় এই সকল মুক্ত শিবকল্প জীব শ্রীভগবানের

সকল-নিষ্কল স্বরূপের দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু বাসনা যখন পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন চিৎশক্তিও নিষ্ক্রিয় হয় এবং মহামায়া বা বিন্দুতেও ক্ষোভ উঠে না। ইহাই আনন্দাতীত শান্তির অবস্থা — ইহা লয়াবস্থা, পরশিবের স্থিতির অবস্থা, যাহার নামান্তর নিষ্কল দশা। সে জীব তখন প্রকৃতই শিব — কর্তারূপে অধিকারী শিব নহে এবং ভোক্তারূপে সদাশিব নহে, কিন্তু পূর্ণশান্ত ও স্বরূপস্থিত। বিন্দু নিত্য বলিয়া বিন্দুর অতীত অর্থাৎ লয়াবস্থার অতীত কোন অবস্থা আত্মারূপী শিবের প্রাপ্য নহে।

কিন্তু অদ্বৈত দৃষ্টিতে আত্মা এই অবস্থাত্রয়ের উর্ধ্বে সাক্ষাৎ পরমশিব দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। এইভাবে দেখা যাইতেছে, পরমেশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ — তাঁহার শক্তি সচ্চিদানন্দরূপা এবং তিনি নিত্য নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও সর্বদা পঞ্চকৃত্যকারী এবং পঞ্চকৃত্য করা সত্ত্বেও তিনি নিত্য নিঃস্পন্দ স্বরূপস্থিত। জীব যখন নিজের শিবরূপ প্রাপ্ত হয় তখন সেও তাহাই। জীবকে জীবরূপে নিজ হইতে বাহির করা — ইহা যেমন তাঁহার স্বভাব, তেমনি জীবকে নিজস্বরূপে মিলাইয়া লওয়া — ইহাও তাঁহারই স্বভাব। এই স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিত্যলীলা নিরন্তর কালের বাহিরে প্রবর্তিত হইতেছে। আবার কালের ভিতরেও কর্মসূত্রের মধ্য দিয়া ইহারই ছায়াভিনয় চলিতেছে। বলা বাহুল্য, এই সকল লীলাভিনয় সত্ত্বেও তিনি যেমন লীলাতীত তেমনি লীলাতীত।

———

দেহসিদ্ধি

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ," "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা পঞ্চভূতময় ষাট্‌কৌষিক দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 'কিমাশ্চর্যং' — আশ্চর্য কি ? তখন যুধিষ্ঠিরের উত্তরে এইরূপ তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছিল যে প্রত্যহ ভূতসমূহ যমালয়ে গমন করিতেছে ইহা জানিয়াও প্রত্যেক প্রাণী মনে করে সে সংসারে স্থায়ী হইবে এবং তাহার মৃত্যু হইবে না। ইহাই এক পরম আশ্চর্য ব্যাপার। এই বিষয়ে যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে সমস্ত জীবই স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে প্রার্থনা করে, আমি যেন স্থায়ীভাবে সংসারে থাকিয়া যাই, আমার যেন অভাব না হয়।

দেহ বলিতে আমরা শুক্র-শোণিতের দ্বারা রচিত যোনিজ শরীরকে বুঝিয়া থাকি। প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত জীব এই দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দেহ চেষ্টা, ইন্দ্রিয় এবং ভোগের আশ্রয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ন্যায়বৈশেষিক মতে দেহশুদ্ধির ইহাই তাৎপর্য। সাংখ্য মতে 'সপ্তদশৈকং লিঙ্গং' সূত্রের দ্বারা লিঙ্গশরীর স্বীকৃত হইয়াছে; এবং পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ হইতে ভিন্ন মূল অবিদ্যারূপে কারণদেহ স্বীকৃত হইয়াছে। এই পর্যন্ত গুণমণ্ডলের ব্যাপ্তি। কার্য ও কারণ-ভেদে ভৌতিক দেহ দুইপ্রকার। আবার কার্যদেহও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। প্রচলিত দর্শন, পুরাণ ও উপ-পুরাণে তিনপ্রকার দেহেরই উল্লেখ ও বিচার লক্ষিত হয়।

ভৌতিক দেহ বিকারিস্বভাব। এই বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন্ত্র, ঔষধি, তপঃ প্রভাবে, উপাসনা যোগ ও জ্ঞানপ্রভাবে অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ার ফলে ভৌতিক শরীরও এত অধিক নির্মল হইতে পারে যে উহা নশ্বর হইয়াও অবিনাশী হইতে পারে এবং মৃত্যু জয় করিতে পারে। ইহা কল্পনামাত্র নহে, শাস্ত্র ও অনুভবসিদ্ধ। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ 'কালদহন তন্ত্র' এবং 'মৃত্যুঞ্জয় তন্ত্রে' কায়সিদ্ধির বিবরণ দেখিতে পারেন। চিদম্বর নিবাসী রামলিঙ্গ

শাস্ত্রী প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে কায়সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং সমাগত জনসমক্ষে দিবালোকে তিরোহিত হইয়াছিলেন। ইহা একটি প্রামাণিক তথ্য। এই বিষয়ে আরও সত্য ঘটনা উপস্থিত করা যাইতে পারে।

ভূতসমূহ স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়, অর্থবত্ব এই পঞ্চ স্বভাবযুক্ত। ভূতসমূহের এই পঞ্চবিধ স্বরূপের সংযমের দ্বারা জয়লাভ হইলে যোগীর অণিমাদি সিদ্ধি ও কায়সম্পৎ-এর অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ভূতজয় হইলে যোগীর যেমন একদিকে রূপলাবণ্যের বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে তেমন শরীরটি বজ্রবৎ দৃঢ় হয়। ইহাই মুখ্য কায়সম্পৎ। সিদ্ধদেহ ভৌতিক ধর্মের দ্বারা অভিভূত হয় না। ইহাই সিদ্ধদেহের প্রধান লক্ষণ।

দেহ সিদ্ধ হইলে উহা জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিকার হইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়। কখন কখন দেখা যায় যে দেহ একই সঙ্গে অজর ও অমর উভয়ই। আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে অজরত্ব ও অমরত্ব এক সঙ্গে বিদ্যমান নাই। যখন অজরত্ব ও অমরত্ব এই দুটি ধর্ম একই দেহে থাকে তখন ঐ সিদ্ধ দেহকে দিব্যতনু বলা হইয়া থাকে, আবার কোন কোন দেহ জরা-রহিত হইয়াও দীর্ঘকাল পরে কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও তাহাতে দিব্যশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। আবার কখন কখন এইরূপও দেখা যায় যে দেহ মরণরহিত হইলেও তাহাতে জরা আসে কিন্তু এই জরা সোমকলার দ্বারা ইচ্ছানুসারে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। তারপর যখন ঐ শরীর জীর্ণ হইয়া যায় তখন ঐ দেহ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া ঔপপাদিক দেহের ন্যায় বালক, পৌগণ্ড এবং কিশোর অবস্থাপন্ন পুরুষের ন্যায় নবীন দেহ গ্রহণ করা চলে। অথবা যৌবনের উন্মেষমাত্র হইয়াছে এইরূপ তরুণ শরীরও লাভ করা সম্ভবপর। জীবের দেহসম্বন্ধ জন্ম, আয়ু ও ভোগের ন্যায় প্রারব্ধ কর্মের ফলে হইয়া থাকে। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং দেহপাত ঘটে। ইহারই নাম মৃত্যু। যোগপ্রক্রিয়ায় কায়সম্পৎ লাভ হইলে শুধু যে ভূতধর্মের দ্বারা অনভিভব হয় তাহা নহে, দেহপাতও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

সৌগত মতে বোধিসত্বের দশভূমিরূপ হেতু অবস্থায় চারিপ্রকার সম্পৎ আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে বজ্রসার স্থিরকায় সম্পদ্রূপ রূপকায়

সম্পৎ উল্লেখযোগ্য। শ্রুতিতেও এইরূপে যোগাগ্নিময় শরীরে ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর অভাবের কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ (শ্বেতাশ্বতর ২-১২)

দেহসিদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহ বজ্রাঙ্গ এবং আয়ুর অসামান্য বৃদ্ধি হইলেও এবং ভুতসমূহের দ্বারা উহা অনভিভূত হইলেও যুগান্তে মহাযুগান্তে কল্পান্তে বা মহাকল্পান্তে ঐ দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেহসিদ্ধিও আপেক্ষিক এইরূপ বলা উচিত। কারণ, দেহের উপাদানসমূহের সম্যক্ শুদ্ধি না হওয়ায় প্রদীপ্ত কালাগ্নির প্রভাবে উহা দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এইসব সিদ্ধি পুরুষ চিরজীবী এবং কল্পান্তস্থায়ী রূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম' এই উক্তির দ্বারা সোম-পানের প্রভাবে অমরত্বলাভ যেরূপ প্রলয়কাল স্থায়ী — দেহও তদ্‌রূপ। এইপ্রকার দেহসম্পদ্ কালাবচ্ছিন্ন সুতরাং উহা বাস্তব নহে। কিন্তু এইরূপ স্থিতি কোন বিশেষ প্রকার দেহ সম্বন্ধে সত্য হইলেও আমরা যে প্রকার দেহশুদ্ধির বিষয় আলোচনা করিতেছি তাহা এইরূপ নহে। দেহ যখন শুদ্ধ সত্ত্বময় অথবা চিন্ময়রূপে স্থিতিলাভ করে তখন নিরপেক্ষ পারমার্থিক সিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই যে ষোড়শকল পুরুষের যে ষোড়শী নামক কলা বিদ্যমান উহাই অমৃত-কলা এবং পূর্ণ সোম কলা। উহা দ্বারা দেহের আপূরণ হইলে কালানল ঐ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহার ফলে দেহের শোষণও ঘটে না। ঐ অবস্থায় দেহ ও আত্মা অভিন্ন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধাবস্থা ও মৃত্যুঞ্জয়তা লাভ। সম্যকরূপে যে দেহে সাধন ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে — আয়ুক্ষয় হইলে উহার পতন যোগীর ইচ্ছায় অথবা কাল প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সম্যক্ প্রকারে দেহসিদ্ধি সম্পন্ন হইলে ঐ সিদ্ধদেহ চিন্ময়রূপ ধারণ করে, তখন সিদ্ধযোগীর দেহ তাহার শক্তিরূপ বলিয়া সিদ্ধস্বরূপেরই অন্তর্গত হয়। সুতরাং তখন পতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুধু স্বাতন্ত্র্যবশতঃ তিরোভাব মাত্র ঘটিয়া থাকে। পূর্ণ সামরস্য দশায় দেহ ও আত্মা শিব-শক্তিরূপ ধারণ করিয়া সর্বতোভাবে সমরস হয়। উহা অদ্বয় স্বরূপ ও নিত্য স্বপ্রকাশ থাকে। সেইজন্য তখন তিরোভাব হয় না।

সিদ্ধ সম্প্রদায়ে কিম্বদন্তী আছে — যাহা দ্বারা সম্যক্ ও অসম্যক্-রূপে কায়াসিদ্ধির ভেদ স্পষ্ট প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, একবার গোরক্ষনাথ অল্লাম প্রভুদেব নামক কোন একজন মহাসিদ্ধের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট নিজের ভূতজয় এবং বজ্রাঙ্গতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রভুদেবের মতে কেবলমাত্র বজ্রাঙ্গতা লাভ সম্যক সিদ্ধি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। দেহের স্থিরতা হইলেও যতক্ষণ মায়ানিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ পরামুক্তির সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মতে ক্ষর ভূতসমূহের এবং অক্ষর কূটস্থের অধীশ্বর মহাদেবের প্রতি ভক্তিই পরামুক্তির উপায়। এই ভক্তির উদয় না হইলে দেহসিদ্ধি হইলেও উহা পরমাসিদ্ধিরূপে পরিগণিত হয় না।

জরা ও মৃত্যু হইতে দেহকে মুক্ত করাই দেহ-সিদ্ধির তাৎপর্য। ইহা নানা উপায়ে হইতে পারে। উপায়ভেদে দেহসিদ্ধির স্বরূপেও কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে। দেহ সাধনা অতি কঠিন ও দুঃসাধ্য সাধনা। অতি অল্প ব্যক্তিই ইহাতে সফলতা লাভ করে। কিন্তু অল্প হইলেও নানা দেশে প্রাচীনকাল হইতেই ইহার প্রচার আছে। গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতীয় গ্রন্থেও ইঁহাদের উল্লেখ আছে। হঠযোগীরা বিন্দু ও বায়ু জয় করিয়া দেহ সিদ্ধ করেন। রসায়নবিদ্গণ পারদকে ১৮ সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া তাহার দৈহিক প্রয়োগ দ্বারা দেহসিদ্ধি লাভ করেন। সহজপন্থিগণ ভাবসাধনা দ্বারা, মন্ত্রসাধকগণ মন্ত্রবীর্য দ্বারা, বাউলগণ চন্দ্রসাধনা দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ করিতে যত্ন করেন। গোপীচাঁদ, ময়নামতী প্রভৃতির কাহিনী দেহসিদ্ধির প্রসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে।

সিদ্ধগণের মত এই যে দেহ সিদ্ধ বা শুদ্ধ হইলে ঐ দেহ কালের গ্রাসে পতিত হইতে পারে না। তখন ঐ দেহ আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকাল-সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনা চলিতে পারে। দেহ-সাধনার উদ্দেশ্য জীবন্মুক্তি লাভ। সিদ্ধগণের জীবন্মুক্তি বেদান্তের জীবন্মুক্তি হইতে ভিন্ন। বেদান্তমতে জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধের অধীনে থাকে। জ্ঞানের ফলে সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয় না। উহা ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয়। তখন দেহপাত হইলে বিদেহ কৈবল্য

লাভ হয়। কিন্তু সিদ্ধগণ এই জাতীয় কৈবল্যমুক্তির পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন — দেহ থাকিতেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া চাই। দেহ ও মন অস্তমিত হইলে মুক্তির আস্বাদ কিভাবে উপলব্ধ হইবে? দেহ মৃত্যু বা কালের অধীন থাকিলে মুক্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত জীবন্মুক্ত পুরুষ তাহাকেই বলা চলে যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। জীবন্মুক্ত সিদ্ধের দুইটি অবস্থা — (১) প্রথমতঃ মায়িক দেহ শুদ্ধ হইয়া মহামায়ার দেহলাভ। ইহাই সিদ্ধদেহ। (২) তারপর ঐ দেহ ক্রমশঃ জ্যোতির্ময় হইয়া প্রণবতনুরূপে পরিণত হয়। তখন উহা সিদ্ধগণেরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সন্তগণ বলেন প্রথম অবস্থাটি অমর দেহ, দ্বিতীয় অবিনাশী দেহ। উভয়ই মৃত্যুজয়ী। প্রণবদেহ বস্তুতঃ কুণ্ডলিনী স্বরূপ। সিদ্ধদেহই যোগদেহ। সহজিয়া সাধকগণের প্রবর্তক দশার অবসানে যে ভাবদেহের বিকাশ হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধদেহেরই প্রকারভেদমাত্র। তবে ধারাগত পার্থক্য আছে।

সিদ্ধদেহের প্রধান limitation এই যে ইহা রক্তশূন্য। রক্ত-শোষণ ব্যতিরেকে দেহসিদ্ধি এখনও কাহারও আয়ত্ত হয় নাই। রক্ত থাকিলেই কালের আঘাত অবশ্যম্ভাবী, উর্ধ্ব জগতের সত্তা রক্তহীন বলিয়া মৃত্যুর অধীন নহে। রক্তশূন্য হইলে মৃত্যুর ভয় থাকে না। তখন ঐ সত্তা বিরাট চৈতন্যের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ জ্যোতি-রূপে ঐ সত্তা থাকে — উহা অতীন্দ্রিয় ও ক্ষোভের অতীত। উহা শূন্যে নিরালম্বভাবে অবস্থান করে। কিন্তু এবার মহাযোগের ফলে যাহা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে রক্তশূন্য হইবে না, অথচ চরমে মৃত্যুঞ্জয় হইবে। ইহার প্রক্রিয়া ভিন্ন, উদ্দেশ্যও ভিন্ন। দেহে রক্ত না থাকিলে সেই দেহে স্মৃতির ক্রিয়া হয় না — তাহার দ্বারা জীবজগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভবপর নহে।

যখন নরদেহে পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব হইবে তখন ঐ সকল সিদ্ধ-কায়া দ্বারা বহু কার্য সম্পন্ন হইবে। উহার প্রধান কার্য হইবে বীজ-হীন ক্ষেত্রে বীজ অর্পণ করা। অবশ্য উহা জগদ্‌গুরুর প্রেরণাতেই হইবে। নরদেহে এখন পর্যন্ত পূর্ণব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয় নাই — কারণ তাহা হইলে জগতের পরিবর্তন হইয়া যাইত। প্রকৃতি পর্যন্ত বিকাশ নরদেহে অবশ্য হইয়াছে — অবশ্য বিরল ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রকৃতিভেদ হয় নাই। প্রকৃতিভেদ হইলেই কালবিনাশ সিদ্ধ হইত —

কালের বিক্রম থাকিত না, সকলেই পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিজেকে অনুভব করিত। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। যাঁহাদের ব্রহ্মলাভ হইয়াছে তাঁহারা দেহাবস্থায় উহা লাভ করেন নাই, দেহান্তে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মহাযোগীদের সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি — সিদ্ধসাধকদের সম্বন্ধে নহে। সাধকের লক্ষ্য চিদাকাশ। যোগ-মন্ত্রের সাহায্য না পাইলে চিদাকাশ ভেদ করা যায় না। ব্রহ্মবীজ ব্যতীত ব্রহ্মাবস্থার বিকাশ হইতে পারে না। যে সব ক্ষেত্রে এই বীজপাত হয় নাই তাহারা মরণান্তেও ব্রহ্মলাভ করিতে পারে না। স্বীয় ভাব ও কর্ম অনুযায়ী তাহাদের গতি হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্ম-লাভ তাহাদের হওয়ার আশা নাই। কিন্তু এই মহাযোগের সময় তাহারাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হইবে। তাই তাহাদিগকে ব্রহ্মলাভের যোগ্য করিবার জন্য ব্রহ্মবীজ দান করিতে হইবে। এই সকল বীজহীনক্ষেত্রে বীজবপন ও কর্ষণ প্রভৃতির কার্য সিদ্ধদেহ মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদন করিবে।

কায়া সিদ্ধ হইয়া গেলে বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার ভেদ লক্ষিত হয় না। এই জন্য এই সকল আত্মা স্তর লাভ করিতে পারে না। এই সকল আত্মা মর অবস্থা হইতে অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু যোগী যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া মর দেহে কর্ম সমাপ্ত করিবার পূর্বে অথচ মহাভাব বা তাদৃশ অবস্থা লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিলে উর্ধ্বলোকে অমরদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত অমরদেহ হইতে এই অমর-দেহ বিভিন্ন। এই অমরদেহ উর্দ্ধলোকে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকট হইয়া থাকে। ইহাদের স্তরলাভ হয়। মরসিদ্ধ অমরদেহ স্তরহীন।

———

সিদ্ধ পুরুষ

এক

আমাদের দেশে সকলেই বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধ পুরুষ কাহাকে বলে শুনিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধ পুরুষ কাহাকে বলে তা না জানিলেও তাহাদের সাধারণ ধারণা এই যে, মানুষ নিজের জীবনে এমন একটি অলৌকিক অবস্থা লাভ করিতে পারে যখন সে আর সাধারণ মানুষ থাকে না — তাহার অলৌকিক শক্তি লাভ হয় এবং সে মনুষ্য-জীবনের একটি মহান্ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জীবনের পথে অনেকটা পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। যে কোন সাধনায় সফল হইলেই সাধককে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ বলিতে সাধারণতঃ লোকে ঐ সকল পুরুষকে লক্ষ্য করে, না। প্রাচীনকালে চুরাশী জন সিদ্ধ পুরুষের কথা সাহিত্যে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যা অনন্ত।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সিদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। সিদ্ধাবস্থা লাভের উপায় সকল ধর্মেই আছে। সুতরাং হিন্দু ধর্মের ন্যায় খৃষ্টীয়, সুফী, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়েও সিদ্ধ পুরুষ আছেন। কি প্রকারে মনুষ্য প্রকৃত সিদ্ধ পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

দুই

সমগ্র সৃষ্টি অথবা বিশ্বের মূলে এমন একটি মহাশক্তিধর সত্তা আছেন যাঁহাকে অদ্বৈত ও অখণ্ড না বলিয়া পারা যায় না। এই সত্তাটি চৈতন্য-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ — ইহাতে অনন্ত প্রকার অনন্ত শক্তি অভিন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইনি এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনন্ত, এবং অক্ষত ও নির্বিকার — ইনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ। দেশ কাল ও নিমিত্ত ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কার্য-কারণ-ভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা ইনি নিয়ন্ত্রিত হন না। মনুষ্য জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার সহিত পরিচিত, কিন্তু পূর্ণ সত্য অর্থাৎ

ভগবৎ-স্বরূপ এই ত্রিবিধ অবস্থায় পাত্রে পারদবৎ থাকিয়াও উর্দ্ধে নিত্যই অতিচেতন অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। এই অতিচেতন অবস্থা চৈতন্যেরই অবস্থা। ইহাকে তুরীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে — ইহা অপ্রতিহত এবং নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎকারাত্মক প্রকাশের অবস্থা কিন্তু ইহার পরে এমন একটি গভীর অবস্থা আছে যেখানে বোধেরও উন্মেষ নাই এবং যেখানে বোধ-সহকারে প্রবেশ করাও যায় না। বস্তুতঃ ইহা কোন অবস্থাই নহে, একটি স্থিতি মাত্র। অতিচেতন অবস্থারও অতীত বলিয়া ইহাকে এক হিসাবে অচেতন অবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা অচেতন অবস্থা নহে, বরং চৈতন্যের ঘনীভূত অবস্থা। ইহা প্রকাশের ঘনীভূত অপ্রকাশ। ইহা আপাতদৃষ্টিতে জড় বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ইহা জড় ও চেতন এই দ্বন্দ্বভাবের অতীত। ইহাই ভগবানের স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তি থাকিলেও এই স্থিতি হইতে ঐ সকল শক্তির প্রয়োগ সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন স্তরেই হয় না। যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি সত্যের অপার ও অতল প্রকাশ, তিনি নিজে তৎস্বরূপ হইয়াও তাহা যেন জানেন না, এই স্থিতি কিয়দংশে আমাদের পরিচিত গভীর সুষুপ্তির অনুরূপ।

তিন

কিন্তু এই স্থিতি হইতে জগতের সৃষ্টি হয় না। যাঁহাকে আমরা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তা বলিয়া বর্ণনা করি তিনি এই পূর্ণ সত্য হইতে অভিন্ন হইলেও চেতন পুরুষ। তিনি নিরন্তর সৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন এবং সে বোধও তাঁহার আছে। কিন্তু তিনিই যে অখণ্ড অনন্ত পরম তত্ত্ব তাহা সৃষ্টি-কর্তা রূপে তিনি যেন জানেন না এবং তাহা জানিবার প্রয়োজনও যেন হয় না।

মনুষ্য সিদ্ধাবস্থাতে যে পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার সঙ্গেও তাঁহার যেন কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার একমাত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত। এই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, দেশ ও কালের অতীত নহেন এবং কার্যকারণ ভাবের সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বোধ-কেন্দ্র হইতেই অনন্ত বিশ্বের নির্গম হইয়া থাকে। যতদিন তিনি ক্রিয়াশীল থাকেন সেই সময়-পরিমাণকে এক হিসাবে কল্প বা মহাকল্প নাম দেওয়া যাইতে পারে। সমস্ত বিশ্বই তাঁহার কর্মের ক্ষেত্র।

দেহাদিতে আত্মাভিমান বিগলিত হইলে আত্মাতেই আত্মাভিমান জাগে বটে, কিন্তু তাহা শুধু একটি মাত্র ক্ষণের জন্য। কারণ পুনর্বার ব্যুত্থানের সময় পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসে। ইহার পর দেহাদিতে আত্মাভিমান সমগ্রভাবে বিলীন হয়। তাহার পর অভিমানের সংস্কারও নষ্ট হয়। অন্তিম অবস্থাতে আত্মাতেই আত্মাভিমান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্বেই আত্মাতে অনাত্মাভিমান কাটিয়া যায়। এইটি মহাব্যাপ্তির অবস্থা। কেহ কেহ কম্প, ভ্রম প্রভৃতি দশটি লক্ষণ বা অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই দশটি লক্ষণও পূর্বোক্ত পাঁচটি শ্রেণীরই অন্তর্গত। দশম লক্ষণ অব্যক্ত, কারণ ঐ অবস্থাতে শিবতত্ত্বে প্রবেশ হয় ও ভবসমুদ্র হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

পাঁচটি লক্ষণের উদয় হইলে পূর্ণতা লাভ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু পৃথক্ ভাবে এক একটি লক্ষণের উদয় হইলে তত্তৎচক্রের ঐশ্বর্য লাভ হয়, কিন্তু পূর্ণত্ব লাভ হয় না। ঐ সব চক্র তখন আয়ত্ত হয়। যেমন দেহ সর্বব্যাপক-বোধ সহ অভেদাপন্ন থাকিলেও নির্দিষ্ট কার্য করিতে পারে — চক্ষু রূপই গ্রহণ করে, রসাদি নহে, — সেই প্রকার ত্রিকোণাদি নির্দিষ্ট চক্রে প্রবেশ করিলে আনন্দাদি এক একটি বিশিষ্ট অনুভব লাভ করা যায়। কিন্তু পাঁচটি লক্ষণের উদয় না হওয়া পর্যন্ত সর্বানুভব সম্ভবপর হয় না। আনন্দের অভিব্যক্তির স্থান দেহমধ্যে ত্রিকোণ চক্র, যাহার নামান্তর অধোবক্ত্র বা যোগিনী বক্ত্র। উদ্ভব নামক লক্ষণের বিকাশ-ক্ষেত্র কন্দ-স্থান। নাভির সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কম্পের উদয়স্থান হৃৎ-চক্র। নিদ্রার স্থান তালু ও ঘূর্ণি বা মহাব্যাপ্তির স্থান উর্ধ্ব-কুণ্ডলিনী বা দ্বাদশান্ত।*

---

* উর্ধ্বকুণ্ডলিনীর দেহস্থিত মধ্যনাড়ী উর্ধ্বপ্রান্ত, অধঃকুণ্ডলিনী উহার নিম্নতম সীমা। উর্ধ্বকুণ্ডলিনীতে শক্তির সঙ্কোচ পূর্ণ হয়। তদ্রূপ বিকাশের পূর্ণতা হয় অধঃকুণ্ডলিনীতে। নাসাপুটের ক্রমিক উর্ধ্ব স্পন্দন দ্বারা সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তাহার বলে ভ্রূভেদ পূর্বক উত্থিত হইয়া উর্ধ্বকুণ্ডলিনী পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্রূপ শক্তিকে প্রগুণিত করিয়া অধঃকুণ্ডলিনী স্থানে স্পর্শ লাভ করিতে হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরিস্থিত শক্তি উর্দ্ধকুণ্ডলিনী, যাহা প্রসুপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় অনুন্মিষিত সমগ্র বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহারই ভিত্তিতে বিশ্বের উল্লাস হয়। যাবতীয় তত্ত্ব ও ভূবনের ইহাই একমাত্র আধার। ইহার উর্ধ্বে ব্যাপিনী কলার স্থান নির্দিষ্ট আছে।

এই মহাব্যাপ্তির স্থানই পরমতত্ত্ব বা মন্ত্রভূমি। ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিলেই ব্রহ্মপুরে প্রবেশ হয়। ত্রিশিরোভৈরব নামক আগমের মতে মধ্যনাড়ী মার্গ অবলম্বন করিয়া উদান শক্তির প্রবাহ আশ্রয় পূর্বক ঊর্ধ্ব দিকে আরোহণ করিতে করিতে বিসর্গান্ত বা দ্বাদশান্ত পদ পর্যন্ত যাইতে হয়। তাহার পর গতির নিবৃত্তিরূপ চরমাবস্থাতে সকল প্রকার আবরণশূন্য ও বিকল্পজাল হইতে মুক্ত মন্ত্র-ভূমিতে প্রবেশ লাভ ঘটে। কল্পনাহীন নিরাবরণ চৈতন্যস্বরূপই পরম-স্বরূপ। প্রথমে নিম্ন প্রবাহরূপী অপানকে রোধ করিয়া ঊর্ধ্বাক্ষেপ-রূপী প্রাণকে বর্জন করিতে হয়। পরে উভয়ের সংঘর্ষের দ্বারা মধ্যধামে গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে আবর্তন করিতে পারিলে মার্গস্থিত বিভিন্ন চক্র লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য জন্মে। এই প্রকারে চক্রভেদ পূর্বক চলিতে চলিতে দ্বাদশান্ত-ভূমিতে মহাপ্রকাশের অনুভব হয়। এই মহাপ্রকাশই নিত্যোদিত আত্মজ্ঞান রূপে অবভাসমান হয়। এখানে অবভাসন ক্রিয়ার বিচ্ছেদ থাকে না বলিয়া ইহাই পরম প্রমাতার বা শিবরূপী নিজ আত্মার বৃত্তিলাভ। অশেষ বিশ্বের উপশম-বশতঃ নিস্তরঙ্গ আত্মবৃত্তি শিবরূপা জানিতে হইবে। তখন একমাত্র নিজ আত্মাতে বিশ্রান্তি থাকে বলিয়া এই বৃত্তি সান্তা ও একা বা কেবলা। এইটি আত্মার বিশ্বাতীত স্বরূপ। এই বৃত্তিই আবার অনন্তরূপে বাহিরে উল্লসিত হইয়া থাকে। এইটি আত্মার বিশ্বময় রূপ। ইহা শিবাত্মক বলিয়া বাহ্যরূপে স্ফুরিত হইলেও সর্বদাই পরম সাক্ষীরূপ নিজ স্বরূপে স্থিতিশীল! তাই বলা হয়, আত্মা খণ্ড ভাবে অনন্ত রূপে প্রকাশমান হইলেও সর্বদা এক ও অখণ্ড।

———

পরমতত্ত্বের অনুভূতি

অধিকার ভেদে পরমতত্ত্বের অনুভূতি বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি অনুভূতির অধিকার ভেদে এক একটি স্থিতিও আছে। উহাও অধিকার ভেদে পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানপথে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ যোগমার্গে ঐ অনুভূতি পরমাত্মার আকার ধারণ করে। বিশুদ্ধ ভক্তিভাবে পরমতত্ত্ব ভক্তি-ভাবে স্ফুরিত হয়। ব্রহ্মানুভূতির ফলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মরূপে স্থিতিলাভ হয়। তদ্রূপ পরমাত্মদর্শন ও ভগবৎদর্শনের ফলে চরম অবস্থায় তত্তৎ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। যাঁহারা ক্রম অবলম্বন করিয়া চলেন তাঁহারা একটি অনুভূতির পর পরবর্তী অনুভূতিমার্গ আশ্রয় করেন। চরম অনুভূতির পর তাঁহাদের স্থিতিলাভ হয়। কোন বিশেষ অনু-ভূতির পর স্থিতিলাভ হইলে অন্য অনুভূতি পাওয়া সহজ হয় না। তবে ভগবৎকৃপাতে সবই সম্ভবপর হয়। এইজন্য কোনও স্থিতিতে কেহ আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও সেখান হইতে তাহাকে উঠাইয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে।

ব্রহ্মানুভূতি অভেদাত্মক। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীব ও জীবের ভেদ, জীব ও জগতের ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ, জাগতিক পদার্থের পরস্পর ভেদ — এই পাঁচপ্রকার ভেদের অনুভূতি ব্রহ্মাবস্থায় থাকে না। উহা বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ব্রহ্মানুভূতিতে কোন দৃশ্য বস্তুর ভাগ হয় না। স্বপ্রকাশ শুদ্ধচৈতন্য আপনাতে আপনি প্রকাশমান থাকে। একই চৈতন্য দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দৃষ্টিভেদে পৃথক্ কৃত হয় না। যেখানে দৃশ্যের দর্শন থাকে সেখানে ঐ দৃশ্য বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু যেখানে পৃথক দৃশ্যের সত্তাই নাই সেখানে দর্শন ভিতরে হয় অথবা বাহিরে, এই প্রশ্নের কোনও অর্থই হয় না। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিঃশক্তি ও অব্যক্ত। ইহা চিরস্থির অপরিণামী ও কূটস্থ নিত্য। ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই স্বরূপে সৎ, চিৎ, ও আনন্দ এই তিন অংশের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

পরমাত্মার অনুভূতি এই প্রকার নহে। একই দেহকে আশ্রয় করিয়া ব্যাষ্টিভাবেই হউক বা সমষ্টিভাবেই হউক জীবাত্মা ও

পরমাত্মা উভয়ই অবস্থান করে। জীবাত্মার দুইটি অবস্থা। একটি বদ্ধাবস্থা, একটি মুক্তাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীবকে পুরুষ বলে। বদ্ধাবস্থা জীব দেহ প্রভৃতিতে অভিমানযুক্ত হইয়া সাজিয়া বসে। দেহাশ্রিত সমস্ত কার্য আপনাতে আরোপ করিয়া লয় ও নিজে কর্তা সাজিয়া বসে। ইহার দণ্ডস্বরূপ তাহাকে সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সাংসারিক জীবের ধর্ম। জীব মুক্ত হইলে বুঝিতে পারে সে কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। সে দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতির ক্রিয়া দর্শন করাই তাহার স্বভাব। তাই স্বভাবে স্থিতি হইলে আত্মা সাক্ষীরূপে নিজ প্রকৃতির খেলা দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করে। মুক্তপুরুষ যে প্রকার সাক্ষী, পরমপুরুষ পরমাত্মাও ঠিক সেই প্রকার সাক্ষী। ইহাই উভয়ের সাধর্ম্য। কিন্তু ক্রিয়াশক্তিরও আশ্রয়, শুধু জ্ঞানশক্তির নহে। মুক্তপুরুষ শুধু জ্ঞানশক্তির আশ্রয়। মুক্তপুরুষ পরমপুরুষের উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ পরমপুরুষের ধর্ম প্রাপ্ত হয় এবং নিজেও কূটস্থ অবস্থা লাভ করে। বদ্ধ জীব দেহকে আশ্রয় করিয়া কর্ম করে এবং ফল ভোগ করে। কিন্তু মুক্তপুরুষ দেহস্থিত হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করে, পরমাত্মাও তদ্রূপ দেহস্থিত শূন্যপ্রদেশে প্রকাশমান হইয়া থাকে। যেখানে দেহসম্বন্ধ মোটেই নাই সেখানে জীবাত্মা পুরুষরূপে নিজের সত্তা কিম্বা পরমাত্মারূপে পরমপুরুষের সত্তা অনুভব করিতে পারে না। এইজন্যই ব্রহ্মানুভূতিতে এই উভয়ের সত্তা প্রকাশিত হয় না। কারণ যথার্থ ব্রহ্মানুভূতি দেহবোধের অতীত অবস্থায় হইয়া থাকে। পরমাত্মদর্শন জ্যোতিরূপে হইয়া থাকে। পুরুষরূপে জীবাত্মার স্বরূপ দর্শনও ঠিক সেইপ্রকারই হয়। পরমাত্মা ব্যাপক জ্যোতি, মুক্তপুরুষ তাহারই অন্তর্গত খণ্ডজ্যোতি। উপাসনার প্রভাবে এই উভয় জ্যোতিতে যোগ হয় — ইহাই জীবাত্মার সাযুজ্য। ইহা যোগের অবস্থা, জ্ঞানের অবস্থা নহে।

ব্রহ্মানুভূতিতে যেমন ভিতর বাহির ভেদ নাই, পরমাত্মার অনুভূতি সেই প্রকার নহে। এই অনুভূতি ভিতরেই থাকে। কিন্তু ভগবৎ অনুভূতি ইহা হইতে বিলক্ষণ। ভগবৎস্ফূর্তি ভিতরে হয় না, বাহিরে হয়। পরমাত্মদর্শনে শুধু জ্যোতি দৃশ্যরূপে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদর্শনে দৃশ্য কিছুই থাকে না। কিন্তু ভগবৎদর্শনে দৃশ্যের পূর্ণ প্রকাশ থাকে। তাহা জ্যোতি নহে, 'রূপ'। ভগবান সাকার, ব্রহ্ম

নিরাকার, পরমাত্মা জ্যোতি মাত্র। তাহা ঠিক সাকারও নহে অথচ ব্রহ্মবৎ নিরাকারও নহে। কারণ জ্যোতিও ত একটা আকার। ভগবৎ স্ফূর্তিতে ভাবময় দেহ অথবা ভাবদেহাবিষ্ট স্থূলদেহের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই কার্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবানের রূপ আছে, শব্দ আছে, তদ্রূপ রসগন্ধাদি সকল ধর্মই অপ্রাকৃত চৈতন্যময়, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সকল বৈচিত্র্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপে দেহ, ইন্দ্রিয় ও আত্মার কোন পার্থক্য নাই, অথচ অনুভূতিতে সবই পাওয়া যায়। ভগবৎস্বরূপ চিন্ময় বলিয়াই স্থূলদৃষ্টিতে তাহারা স্থূলবৎ, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা সূক্ষ্মবৎ, কারণ দৃষ্টিতে তাহা কারণবৎ, মহাকারণ দৃষ্টিতে মহাকারণবৎ এবং কৈবল্য বা শূন্যদৃষ্টিতে তদ্‌বৎ প্রতীত হইয়া থাকে। অথচ তাহা যাহা আছে তাহাই থাকে। ইহা নিত্যসিদ্ধ দেহ বা আত্মার সিদ্ধ স্বরূপ। এই অবস্থার প্রাপ্তি না হইলে পরমপদে প্রবেশ হইতে পারে না।

রূপ বা আকারের স্ফূর্তি ভক্তি হইতে হইয়া থাকে। শুদ্ধ জ্যোতির স্ফূর্তি চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগ হইতে হইয়া থাকে। অরূপ অর্থাৎ নিরাকার নির্গুণ সাম্যময় চৈতন্যের অভেদরূপে স্ফূর্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে হইয়া থাকে। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি তিনটি যখন পৃথক পৃথক ও অমিশ্র ভাবে থাকে তখন পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পূর্বনির্দিষ্ট প্রণালীতে হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু যেখানে মার্গগত সাঙ্কর্য বিদ্যমান থাকে সেখানে অনুভূতিতে বিশুদ্ধতা থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যোগ যদি ভক্তি মিশ্র হয় তাহা হইলে যোগীর দর্শন হয় জ্যোতির্ময় আকারের, ভক্তি বা ভাব অনুসারে আকার যেরূপই হউক না কেন সে আকার জ্যোতিরই আকার, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা এইরূপ দর্শন পান তাঁহাদিগকে ভক্ত যোগী বলে, এই দর্শন ধ্যানাবস্থায় — হৃদয়ে হইয়া থাকে। ইহা ভক্তিপথের দর্শন নহে — ভক্তিযুক্ত পথের দর্শন। কিন্তু ভক্তযোগীর ন্যায় যোগীভক্তও আছে অর্থাৎ যে ভক্ত বিশুদ্ধ ভক্ত নহে, যাহার ভক্তিতে যোগ মিশ্রিত থাকে সে জ্যোতি দর্শন পায় না, সে বাহিরে নিজের ইষ্টরূপ দর্শন পায় কিন্তু জ্যোতির দ্বারা বেষ্টিত। বিশুদ্ধ ভক্ত হইলে এই জ্যোতির বেষ্টন দেখা যাইত না। ইহা ভক্তির সঙ্গে যোগাংশের মিশ্রণের ফল।

জ্ঞান যোগ ও ভক্তির ক্রম সম্বন্ধেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যাহারা সাধক ও শুদ্ধ জ্ঞানমার্গের উপাসক তাহারা চরমাবস্থায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। তাহাদের পক্ষে সাকার দর্শন বা জ্যোতি দর্শন পথের অনুভূতি মাত্র। চরমে ইহা থাকে না। ইহার মধ্যে একটি ক্রম লক্ষিত হয়। কেহ সাকার দর্শন করিয়া পরে দেখিতে পায় ঐ আকার জ্যোতিতে লীন হইয়া গেল, এবং জ্যোতিও নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তিরোহিত হইল। আবার কাহারও কাহারও প্রথমে জ্যোতি দর্শন হইয়া তাহার পর জ্যোতির মধ্যে রূপ বা আকার দর্শন হয়। চরমে শুদ্ধ জ্ঞানের পূর্ণতায় আকার থাকে না। একমাত্র নিরাকার সত্তাই চৈতন্যরূপে অবশিষ্ট থাকে।

যাহারা যোগী ও পরমাত্মার উপাসক তাহারা চরম অবস্থায় পরমাত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তৎস্বরূপে স্থিতি লাভ করে। পরমাত্মাই যোগেশ্বর। এই যোগৈশ্বর্য লাভই যোগ পথের পরম লক্ষ্য। ইহাদের পক্ষে সাকার ও নিরাকার উভয় অনুভূতি পথের অনুভূতি মাত্র। সাকার অনুভূতি মায়িক, নিরাকার অনুভূতির সময় তাহা থাকে না। চরম অবস্থায় নিরাকার অনুভূতিও থাকে না, থাকে মাত্র পরমাত্মার অনুভূতি ও তজ্জন্য স্বরূপস্থিতি। সাকার ক্ষর, নিরাকার অক্ষর ও পরমাত্মাই পুরুষোত্তম।

যাহারা ভক্তিমার্গের সাধক ও ভগবানের প্রাপ্তিই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা ভগবৎরূপে পরম ভক্তের অনুভূতি লাভ করিবার পূর্বে রাস্তায় চলিবার সময় নির্বিশেষরূপে ও জ্যোতিরূপে তাঁহার অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই দুইটি অনুভূতি আপেক্ষিক। ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্তির পরে ইহাদের কোনও সার্থকতা থাকে না। এই দুইটি অনুভূতি তাহারই অঙ্গীভূতরূপে প্রকাশ পায়। শুদ্ধ জ্ঞান ভেদ না করিয়া গেলেও জ্যোতি ও আকার পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা জ্ঞানের আলোকে স্থির থাকিতে পারে না। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়। ইহার কারণ এই জ্যোতি চৈতন্যের সহিত সত্ত্ব গুণের সংস্রব বশতঃ, এবং রূপ উহারই ঘনীভূত ভাবের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের উদয় হইলে সত্ত্বগুণও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় বলিয়া চরম অনুভূতিতে জ্যোতি ও আকার কিছুই থাকিতে পারে না।

শুদ্ধ জ্ঞান ভেদ করিয়া যাইবার পর যে জ্যোতি ও আকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা স্বরূপশক্তির কার্য। তাহা ত্রিগুণের খেলা নহে। এইজন্য জ্ঞানের আলোকে তাহা দূরীভূত হয় না। শুধু তাহাই নহে, জ্ঞান স্বয়ং ঐ অবস্থায় ম্লান হইয়া যায়। কারণ, জ্ঞান শুধু স্বরূপের প্রকাশ, এবং জ্যোতি ও আকার স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত স্বরূপধর্মের প্রকাশ। উভয়ের উপর বিশুদ্ধ জ্ঞানের কোনই প্রভাব লক্ষিত হয় না।

———

ভক্তি-সাধনার একটি দিক্

অধ্যাত্ম সাধনার বিভিন্ন দিক্ আছে একথা সকলেই জানেন। কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি উপায়ের কথা অনেকেই অল্পবিস্তর শুনিয়াছেন। এই সকল সাধনার মধ্যে ক্রম আছে, ইহাও সত্য। আবার যুগপৎ একই মহাসাধনার অঙ্গরূপে ইহাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থান আছে, ইহাও সত্য। ক্রমিক সাধনার মধ্যেও সাধকের দৃষ্টিভেদে বিভিন্ন প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। তদ্রূপ মহাসাধনার প্রকারভেদও বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রবন্ধে মহাসাধনরূপেই ভক্তি সাধনের একটি দিক্ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। ভক্তি সাধনার ফলে শ্রীভগবানের নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অনন্তকাল তাঁহার কিঙ্কররূপে নিজের অধিকার অনুসারে তাঁহার সেবা করা ও লীলারস সম্ভোগ করা সম্ভবপর হয়। এই পথে প্রবিষ্ট হইতে হইলে সর্বপ্রথম পথ প্রদর্শক সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। কারণ সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্তি না ঘটিলে নিজের স্বরূপের আবরণ তিরোহিত হয় না এবং মুক্ত স্বরূপের প্রকাশও হয় না। অবিদ্যাই আবরণ এবং শুদ্ধবিদ্যাদ্বারা এই আবরণ নিবৃত্ত হইয়া জ্ঞানময়ী তনুর অভিব্যক্তি হয়। শুদ্ধবিদ্যা সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষ ব্যতীত পাওয়া যায় না।

সদ্‌গুরুর প্রাপ্তি অত্যন্ত কঠিন। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি-সংস্কার পরিপক্ব না হইলে এবং অনাদি সঞ্চিত মল ক্ষীণ হইবার অবসর না আসিলে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার এবং আশ্রয়লাভ সম্ভবপর হয় না। এইজন্য গুরুলিপ্সু সাধক ধর্মজীবন লাভের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে নিজের রুচি অনুসারে কোন একটি নামকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং ভাবনা দ্বারা নাম ও নামীর অভেদ ধারণা করিয়া নিরন্তর আকুল প্রাণে শুদ্ধ ও সংযত প্রাণে এই নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকেন। চিত্তে জাগতিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হইলে এবং আভাসরূপে বৈরাগ্যের বীজ নিহিত হইলে এই নামসাধনা ক্রমশঃ অকৃত্রিম জ্ঞানসাধনার পূর্ব-অঙ্গরূপে পরিণতি লাভ করে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে নামসাধনার ফলে বিশ্বগুরু কোন একটি

মূর্তি আশ্রয় করিয়া দীন সাধকের ব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং সাধককে আনন্দের রাজ্যে উন্নয়ন করিবার জন্য সর্বপ্রথম অনুগ্রহময়ী জ্ঞানশক্তির সঞ্চার করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি সাধকের কারণ-দেহ অজ্ঞানকল্পিত। সুতরাং গুরুদত্ত দীক্ষার প্রভাব সর্বপ্রথম এই অজ্ঞানময় কারণ-দেহের উপরই পতিত হয়। গুরুদত্ত বীজমন্ত্র বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধ জ্ঞান-দেহের বীজ। উহা অঙ্কুরিত হইয়া যথাসময়ে সাধকের অকৃত্রিম সাধনার উপায়স্বরূপ নিত্যদেহের অভিব্যঞ্জক হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেমন ক্রমশঃ বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প ও ফলে পরিণত হয় এবং ফল হইতে পরিপাক বশতঃ ক্রমে রসের উদ্‌গম হয় তদ্রূপ এই গুরুদত্ত জ্ঞান-বীজও সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে অর্পিত হইয়া ক্রমশঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহরূপ ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য সকল তিরোহিত হইতে থাকে। গুরুদত্ত মন্ত্রের সাধনা এইজন্য এক হিসাবে জ্ঞানেরই সাধনা। কিন্তু ইহা শুদ্ধজ্ঞান নহে, ক্রমশঃ ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। জ্ঞানসাধনা পূর্ণ হইলে অজ্ঞানের উপাদান বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং নিজের স্বরূপ উজ্জ্বল স্ব-ভাবে পর্যবসিত হয়। অশুদ্ধ অচিদংশ বিনষ্ট হইলে দৈহিক প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী অবস্থা হইতে শুদ্ধ সত্ত্বময়ী অবস্থাতে প্রকট হইবার যোগ্যতা লাভ করে।

যাঁহারা শুধু মলিন অচিৎ ধর্ম হইতে অব্যাহতি লাভ করাই পরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন না তাঁহারা সরল পথে অখণ্ড চৈতন্যের দিকে অগ্রসর না হইয়া ভাবের পথে পূর্ণত্বের অভিমুখে ধাবমান হন। চিত্তের উপাদান সত্ত্বগুণ প্রধান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিত্ত-শুদ্ধির পর এই চিত্তে রজোগুণ ও তমোগুণের অংশ নিষ্ক্রিয় ও স্তম্ভিত হইয়া যায় ইহাও সত্য, কিন্তু এই শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন যোগ্যতা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। দর্পণ স্বচ্ছ, ইহার সম্মুখে যে কোন বস্তু উপস্থিত হয় উহা দর্পণে যথাবৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ইহাই স্বচ্ছতার লক্ষণ। কিন্তু দর্পণ স্বচ্ছ হইলেও বিম্ব যদি অপসারিত হয় তাহা হইলে উহাতে প্রতিবিম্বের আভাস ফোটে না। পক্ষান্তরে ঐ স্বচ্ছ দর্পণেই এমন কোন বস্তুর সংমিশ্রণ থাকিতে পারে যাহার ফলে বিম্ব অপসারিত হইলেও দর্পণে পতিত প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইয়া থাকে। চিত্ত দর্পণবৎ স্বচ্ছ পদার্থ, উহাতে বস্তুর আকার প্রকাশিত হইলেও স্থায়ী হয় না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে উহা স্থায়ী হইয়াও থাকে, ইহার

কারণ, চিত্তক্ষেত্রে ভাবের সত্তা নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। ভাব-রহিত চিত্ত শুষ্ক জ্ঞানপথের উপযোগী। কিন্তু ভাবযুক্ত চিত্ত ভাব-সাধনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়।

গুরুদত্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সাধক যখন সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন এক হিসাবে তাহার সাধন-কার্য আপেক্ষিক রূপে সমাপ্ত হইয়াছে বলা যায়। অবশ্য সাধনার প্রকৃত সমাপ্তি পূর্ণতত্ত্বের অভিব্যক্তিতে, তাহা তখনও বাকী থাকে। কিন্তু চিত্ত স্বচ্ছ ও বিমল হইলেও ভাবযুক্ত থাকিলে পূর্ববর্ণিত বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহ ভাবদেহ রূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারে না। এইটিই নিরাকারের মধ্য দিয়া সাকার সাধনার ক্ষেত্রে পদার্পণ। ভাবদেহ অশুদ্ধ মায়িক দেহ নহে — ইহা স্বভাবের দেহ। এক হিসাবে ইহাকে স্বরূপদেহ বলা যাইতে পারে। ভাবগত বৈশিষ্ট্য বশতঃ এই ভেদ লক্ষিত হয়। এই ভাব আগন্তুক ও বিনশ্বর ভাব নহে, ইহা নিজ ভাব বা স্বভাব। ভাবসাধনা ভাবদেহেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্বে যে সাধনার কথা বলা হইয়াছে তাহা কৃত্রিম সাধনা, কিন্তু ভাবের সাধনা স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। এই সাধনা শিখাইবার জন্য পৃথক্ গুরুর আবশ্যকতা হয় না। তবে যাহাদের ভাবদেহের অভিব্যক্তি হয় নাই অথচ ভাবসাধনার রুচি রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে ভাবনা-যোগে ভাবদেহ রচনা করিয়া ওই দেহ অবলম্বন পূর্বক রাগানুগা মার্গে ভাবসাধনা করার ব্যবস্থা আছে। ইহাও ভক্তি সাধনার একটি বিশিষ্ট দিক্ এবং বৈধী ভক্তি বা মর্যাদা ভক্তি হইতে ইহার উৎকর্ষ নিঃসন্দেহ। তথাপি ইহাতে কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা আছে, কারণ সত্য সত্যই ভাবদেহের অভিব্যক্তি এবং প্রাকৃত দেহে অবস্থিত হইয়া কল্পনা দ্বারা ভাবদেহের আবির্ভাব — এই দুইটি ঠিক এক নহে। উভয় সাধনাই ভাবসাধনা হইলেও এক সাধনায় শাস্ত্রনির্দেশ ও গুরুপরম্পরা রহিয়াছে, কিন্তু অপরটিতে কিছুরই আবশ্যকতা হয় না।

আচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে এ লীলানুগামিনী ভক্তিসাধনাতে চারিটি মুখ্য দশা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চারিটি দশাকে জ্ঞান, বরণ, প্রাপ্তি ও অনুভব নামে বর্ণনা করা যাইতে পারে। সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম দশার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহার নাম আচার্য-প্রপত্তি। এই অবস্থায় গুরুর শরণাগত থাকিয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও জগতের তত্ত্ব

নিরূপণ করিতে হয়, ইহা একপ্রকার জ্ঞানেরই সাধনা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। আচার্যের অনুগত ভাবে তাঁহারই কৃপাতে এই জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের দিক্ হইতেই এই দশাটিকে 'জ্ঞান' দশা বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহার পর দ্বিতীয় বা 'বরণ' দশাতে ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে পরস্পরের যে নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার অভিব্যক্তি হয়। ইহা ভাবদেহের উদয় না হওয়া পর্যন্ত সঠিক ভাবে হইতে পারে না। আচার্যগণ ইহাকে সম্বন্ধদীক্ষা বলিয়া উল্লেখ করেন। জীব যতক্ষণ নিজের ভাবদেহে অধিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ ভগবানের সহিত তাহার নিত্য-সম্বন্ধ বুঝিতে পারে না। জানদশার অবসান হইলে যখন ভাবের উদয় হয় তখন গুরুকৃপাতে এবং নিজের অনাদিসিদ্ধ রুচি অনুসারে ভগবানের সহিত ভাবদেহী সাধকের নিত্যসম্বন্ধ খুলিয়া যায়। এই সম্বন্ধ জ্ঞানগোচর না হইলে জীব সেবকরূপে আরাধ্য পরমেশ্বরের সেবা করিতে সমর্থ হয় না। জীব অনন্ত এবং ভগবান্ এক হইলেও এবং মূলে প্রতি জীবের সহিত অভিন্ন হইলেও ভাবদৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবের সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীব স্বভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ না করা পর্যন্ত তাহার হৃদয়ে এই সম্বন্ধের বৃত্তি জাগে না, এবং ইহা না জাগিলে অকৃত্রিম ভাবসাধনা সম্ভবপর হয় না। ভগবৎ ধামে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্যলীলায় যোগদান করা সেব্য-সেবক ভাবের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ভক্ত জীবের সেবা তাহার স্বীয় প্রকৃতির অনু-গামিনী। প্রত্যেকের সেবা পৃথক্ পৃথক্। যাহার যে সেবা তাহার পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। নিত্যধামে শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করিয়া যে নিত্য আনন্দময় উৎসব চলিতেছে তাহাতে প্রত্যেক জীবেরই একটি বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট স্থান আছে। শুধু তাহাই নহে, তাহার একটি বিশিষ্ট সেবাও আছে, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও আছে এবং তাহারই অনুরূপ একটি রসের আস্বাদনও আছে। সম্বন্ধদীক্ষা সুসম্পন্ন না হইলে কোন জীবই ভগবৎ সম্বন্ধে তাহার নিজ স্থান স্পষ্ট দেখিতে পায় না। এই যে বরণের কথা বলা হইল ইহা বস্তুতঃ স্বাভাবিক বলিয়া উভয় পক্ষে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক জীবের বরণ এবং জীব কর্তৃক ঈশ্বরের বরণ। এইরূপ না হইলে ইষ্ট সাধনায় ব্যাঘাত হইয়া যায়।

ভাবদেহে ভাবসাধনায় পক্ব হইলে ভাবের পূর্ণ পরিণতিতে প্রেমের উদয় হয়। ভাবের ন্যায় প্রেমেরও পূর্ণতা আবশ্যক। প্রেমের চরম

উৎকর্ষ সম্পাদনই সাধনার উদ্দেশ্য। শ্রীভগবানের নিত্যকিঙ্কর জীব সাক্ষাৎ সেবার যোগ্যতা লাভ করিলে নিত্যলীলায় প্রবেশ লাভ করে। নিত্যলীলা চক্রে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভাবের অনুকূল সেবার স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। যাহার যে স্থান তাহার পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট, কারণ ঐখান হইতেই সে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট কোন জীব স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্মে আকৃষ্ট হয় না অর্থাৎ নিজের বিশিষ্ট সেবা ত্যাগ করিয়া অন্যের সেবা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয় না। এই তৃতীয় দশাকে 'প্রাপ্তি' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সেবার পরে যে রসাস্বাদ ঘটে তাহাই 'অনুভব' দশা নামক চতুর্থ দশা। ইহা লীলারসের আস্বাদন। রসিক ভক্তগণের মতানুসারে ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও লীলারসের মাধুর্য অনন্তগুণে অধিক। অথচ স্বরূপতঃ উভয়ই এক। এই পরম রসের আস্বাদনই ভক্তি-সাধনার চরম লক্ষ্য।

———

বৈষ্ণব সাধনা ও সাহিত্য

ভারতবর্ষে চারিটি বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারিটি পৃথগ্‌ধারায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করিয়া আসিতেছে। চারিটিই পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণশীল। প্রথমটি, শ্রীসম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। ইহার আদি প্রবর্তক শ্রী বা লক্ষ্মী ও দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈত। শ্রীরামানুজাচার্য ইহার প্রধান প্রচারক। দ্বিতীয় সম্প্রদায়, সনকাদি প্রবর্তিত বলিয়া হংসসম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইহার সিদ্ধান্ত দ্বৈতাদ্বৈত ও প্রধান প্রচারক শ্রীনিম্বার্কাচার্য। তৃতীয়টি, ব্রহ্ম-প্রবর্তিত দ্বৈতমতাবলম্বী ব্রহ্মসম্প্রদায়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য এই মতের প্রধান আচার্য ছিলেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ের নামান্তর রুদ্রসম্প্রদায়। ইহার আদিগুরু রুদ্রদেব, সিদ্ধান্ত শুদ্ধাদ্বৈত এবং প্রধান প্রচারক বিষ্ণুস্বামী ও পরবর্তীকালে বল্লভাচার্য। বলা বাহুল্য, চৈতন্যদেবের নামানুসারে কোন স্বতন্ত্র বৈষ্ণবসম্প্রদায় নাই। সাধারণতঃ মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই চৈতন্যদেবের গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের গণনা হইয়া থাকে। গুরুপরম্পরা আলোচনা করিলেও তাহাই জানা যায়। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গুরু কেশব ভারতী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী এবং সন্ন্যাস-গুরু কেশব ভারতী উভয়ে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মাধ্বাচার্যের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীচৈতন্যের অভিমত দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঐক্য নাই। এমন কি উভয়ে উপাসনা-প্রণালী ও আদর্শগত ভেদও বহুপ্রকার পরিলক্ষিত হয়।

গৌড়ীয় মতের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে অনেক স্থলেই দৃষ্টি পতিত হয়। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র, শাক্ততন্ত্র এবং মহাযানাদি বৌদ্ধ সাধন-প্রণালী হইতে বহু তত্ত্ব গৌড়ীয়গণ স্বকীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্তই আগমের অন্তর্গত। সুতরাং গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের মূলে যে আগমের প্রাধান্য রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগমের সহিত বেদের সম্বন্ধ কি, সে বিষয়ে নানা প্রকার মত আছে। এখানে সে সকল আলোচনার প্রয়োজন নাই। এক সময়ে আগমের প্রামাণ্য এবং বৈদিকতা লইয়া দেশে ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গৌড়ীয় আচার্যগণ

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় আপন মত বৈদিক বা শ্রৌত সিদ্ধান্ত বলিয়াই অনেক স্থলে প্রচার করিয়াছেন এবং উপনিষৎ ও পুরাণাদি সহায়ে স্বকীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, স্মার্তগণ বৈষ্ণবমতকে পাশুপতাদি শৈবমতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়া সাধারণতঃ উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে পাঞ্চরাত্র-মতভুক্ত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পাঞ্চরাত্র বলিতে ভাগবতসম্প্রদায়ও বুঝিতে হইবে। অবশ্য, মূলে পাঞ্চরাত্র এবং ভাগবতসম্প্রদায়ে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে দুই সম্প্রদায় মিলিত হইয়া গিয়াছে।[১] ভাগবতসম্প্রদায় বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২] শ্রীমদ্‌জীব গোস্বামী উক্ত গ্রন্থের টীকাতে এবং স্বরচিত 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামক নিবন্ধে ভাগবত মতের আলোচনা করিয়াছেন। তিনিও পাঞ্চরাত্র মতের সহিত ভাগবতের সমন্বয় দেখাইয়া গিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্র কিংবা ভাগবত ধর্ম ভক্তিপ্রধান। বৈদিক সাহিত্যে ভক্তির চর্চা অতি বিরল। যদিও বৈদিক উপাসনাকে অনেকে ভক্তির

১। মহাভারতের শান্তিপর্বে, মোক্ষধর্মপর্বে, নারায়ণীয়খণ্ডে (অধ্যায় ৩৫০) পাঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ আছে। ইহার বক্তা নারায়ণ, শ্রোতা নারদ। পাশুপত, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতির ন্যায় ইহা অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। হর্ষচরিতে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত সম্প্রদায়ের পৃথক্ উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্র ২ ২, ৪২-৪৩ সূত্রদ্বয় শংকর মতে ভাগবত মতের বিরুদ্ধ। সংশোধিত আকারে এই অধিকরণ রামানুজমতে পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের সমর্থক। রামানুজের বিশ্বাস ছিল যে, বাদরায়ণ পাঞ্চরাত্র-বিরোধী ছিলেন না এবং পাঞ্চরাত্রমত অবৈদিক নহে। যামুনাচার্যও তাঁহার পূর্বে-"আগমপ্রামাণ্য" রচনা করিয়া পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের বৈদিকত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাভারতের নারায়ণীর মতে পাঞ্চরাত্র সাত্বতগণের ধর্ম, তাই ইহা কখনও কখনও সাত্বতধর্ম নামেও বর্ণিত হইয়া থাকে।

২। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাল নিরূপণ করা সুকঠিন। তবে ইহা যে নবীন গ্রন্থ নহে কিংবা বোপদেবের রচিত নহে সে সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কাশী সংস্কৃত কলেজের সরস্বতীভবনে বোপদেবের জন্মেরও বহুপূর্বের হস্তলিখিত একখানা শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুঁথী আছে। লিপিবিচারে এই গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর নিকটবর্তী বলিয়াই মনে হয়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিলভাঁ লেভিও এই পুঁথী দেখিয়া উক্ত কালানুমানের সমর্থন করিয়াছিলেন।

স্থানাভিষিক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন, — এবং কিয়দংশে ইহা সত্য বলিয়াই বোধ হয় — তথাপি 'ভক্তি' বলিলে যাহা বুঝায় ঠিক সে জিনিসটি বৈদিক কর্ম কিংবা জ্ঞান বা উপাসনা কাণ্ডে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দিক হইতে ভক্তির লক্ষণ বিভিন্নভাবে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু চরমাবস্থায় ভক্তিকে চিত্তের ভাবময় প্রকাশ বলিয়াই মানিতে হয়। ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রে যেমন ভাবের আলোচনা উপেক্ষিত হইয়াছে,[৩] সেইরূপ বৈদিক সাধনপদ্ধতিতেও ভক্তির কোন স্থান নাই। শাণ্ডিল্য ও নারদ ভক্তিসূত্রের রচয়িতা। উভয়ের সহিতই পাঞ্চরাত্র মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, শাণ্ডিল্য ঋষি চারিবেদে পরম শ্রেয়স্ না পাইয়া পাঞ্চরাত্রের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তৃপ্তি-লাভ করেন। শাণ্ডিল্যসংহিতা নামক একখানি পাঞ্চরাত্র সংহিতার উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতের নারায়ণীয়োপাখ্যান ও নারদ-পাঞ্চরাত্রাদি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, নারদও পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বী ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ হইতেও নারদের মন্ত্রবিদ্যা-বিরোধ অনুমিত হয়। কর্ম-বাদিগণ যেমন কর্ম হইতে, জ্ঞানবাদিগণ সেই প্রকার জ্ঞান হইতে, নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয় বলিয়া থাকেন। ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্র জ্ঞানপ্রাধান্যখ্যাপক। যদিও জ্ঞান এবং তৎপ্রাপ্য অপবর্গের লক্ষণ প্রতিদর্শনেই বিভিন্নভাবে নিরুক্ত হইয়াছে, তথাপি আত্মজ্ঞান না হইলে যে মুক্তি হয় না তাহা সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকে। ভক্তিশাস্ত্র প্রধানতঃ ভক্তির মাহাত্ম্যখ্যাপক। শাণ্ডিল্য ও নারদকৃত গ্রন্থেও স্বভাবতঃ ভক্তিরই মুখ্যত্ব কীর্তিত হইয়াছে। কোন স্থলে ভক্তিকে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণরূপে, কোথাও বা ভক্তিকে ভক্তিরই অর্থাৎ পরাভক্তির সাধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, মুক্তিকে উভয়ের অন্তরালবর্তী অবান্তর ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভক্তি-

৩। জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মবিশেষগুণ কিংবা চিত্তধর্ম গণনা করিবার সময় ভাবের (emotion) উল্লেখ করা হয় নাই। ইচ্ছাকে ঠিক ভাব বলা যায় না। সুখদুঃখও ভাবপদবাচ্য নহে। অলঙ্কার শাস্ত্রে ভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার আছে। কিন্তু এই শাস্ত্র আগমমূলক। সুতরাং বৈদিক সাধনায় ভাবের স্থান কোথায় তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ বাসনাত্মক বলিয়া বৈরাগ্যমূলক জ্ঞানকাণ্ডে ইহার স্থান নাই। কাণ্ডদ্বয় জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রধান। সঙ্কর্ষণকাণ্ড নামক উপাসনাকাণ্ডেই বা ইহার স্থান কোথায় ?

শাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ ও নানাপ্রকার মত-সমন্বিত। আমরা যথাসময়ে সে সকলের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণবধর্মের পূর্ব-ইতিহাস বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। তবে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের মর্ম গ্রহণ করিবার জন্য যতটুকু আবশ্যক ততটুকু সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইবে। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ "সংহিতা" অথবা 'তন্ত্র' আখ্যাসমন্বিত আগমসাহিত্য। সাধারণতঃ গ্রন্থাদিতে অষ্টোত্তর শতসংখ্যক পাঞ্চরাত্রসংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ডাক্তার শ্রেডার দেখাইয়াছেন যে, এই সংখ্যানির্দেশ ঠিক নহে। তিনি কপিঞ্জল, পাদ্ম, বিষ্ণু ও হয়শীর্ষ সংহিতা এবং অগ্নিপুরাণ হইতে যে নামাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে ২১০টি নাম পাওয়া যায়। তিনি এতদ্ব্যতীত আরও বহু সংহিতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহা সত্ত্বেও নামাবলী সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, এই সকল নাম ব্যতিরেকে আরও বহু নাম প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন সাহিত্যে উপলব্ধ হয়, এবং অনেক সময়ে এক নামের বহুসংখ্যক সংহিতাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা ডাক্তার শ্রেডারও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রকার বিস্তীর্ণ সাহিত্যে যে সর্বত্র একই ভাব অক্ষুণ্ণভাবে পরিদৃষ্ট হইবে তাহা আশা করা যায় না। কাশ্মীরাগমের মধ্যে যে প্রকার অদ্বৈতবাদ কিংবা দ্বৈতবাদ উভয়েরই সন্নিবেশ আছে, পাঞ্চরাত্র আগমেও অনেকটা তাহাই আছে। তবে ঐ অদ্বৈতবাদ শ্রীশঙ্করাচার্যপ্রচারিত নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্। স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে অদ্বৈত বা অদ্বয় বলিতে শিব-শক্তির সামরস্য বুঝায়। শিবশক্তির বৈষম্যই ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাত্মক দ্বৈত, এবং উভয়ের সাম্যভাব অদ্বৈত। পাঞ্চরাত্র মতও প্রায় সেইরূপ। যখন পরা শক্তি বা লক্ষ্মী পরমেশ্বরে বিলীন থাকেন তখন প্রলয়াবস্থা — ইহা শক্তির নিষ্ক্রিয় দশা। ইহাকেই অদ্বয়াবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। শঙ্করমতে শক্তির বাস্তব সত্তা নাই — পারমার্থিক দৃষ্টিতে শক্তি তুচ্ছ, বিচারদৃষ্টিতে অনির্বচনীয় বা মিথ্যা এবং ব্যবহারদৃষ্টিতে সত্য। পারমার্থিক সত্তা একমাত্র ব্রহ্মেরই আছে। সুতরাং শঙ্কর-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদে শক্তির স্থান নাই। শক্তির পারমার্থিকতা অস্বীকার করিবার ফলে জীব ও জগৎ উভয়েই মিথ্যা-রূপে উপেক্ষিত হইয়াছে ; কর্ম, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতির বাস্তবিকতা নিরস্ত হইয়াছে, সম্বন্ধ ও সম্বন্ধাত্মক জ্ঞান মায়িক বলিয়া অনাদৃত

যাহাকে আমরা জীব বলিয়া বর্ণনা করি তাহাকেও পূর্ণ সত্য হইতে পৃথক বলা চলে না। ঈশ্বরও পূর্ণ হইতে ভিন্ন নহেন এবং জীবও ভিন্ন নহে, কিন্তু ঈশ্বর চেতন এবং জীব আংশিক ভাবে চেতন ও আংশিক ভাবে অচেতন। জীব তাহার ক্ষুদ্র অহংটিকে জানে, কিন্তু সে নিজেই যে বাস্তবিক পক্ষে আত্মা — যাহা অনন্ত এবং অখণ্ড — তাহা সে জানে না। দেশ ও কাল এবং কার্য-কারণ-ভাবের নিয়ম জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জীবও পূর্ববর্ণিত কল্প বা মহাকল্প পর্যন্ত অবস্থান করে, তাহার পর সে নিজকে পূর্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পূর্ণরূপে স্থিতিলাভ করে। আত্ম-স্বরূপের সহিত মন প্রাণ প্রভৃতি উপাধির যোগ হইলে জীবরূপে আত্মার আবির্ভাব হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিতে হইলে উপাধিমূলক এই জীবভাবটি ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু মৃত্যুর ফলে এই অবস্থার প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। কারণ জাগতিক বাসনা থাকা পর্যন্ত মৃত্যুর পরেও জীব-ভাব কাটে না এবং পূর্ণভাবে বাসনা কাটিয়া গেলে দেহ থাকিতেও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। এই সকল বাসনা বা সংস্কারকে জ্ঞানপূর্বক রোধ করিতে হইবে। মনুষ্যের চিত্ত এই সকল সংস্কারের দ্বারা সর্বদাই অনুবিদ্ধ থাকে বলিয়া চৈতন্য নিজেকে নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানপূর্বক এই সকল সংস্কারকে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে প্রকৃত সত্য-দর্শন প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর। জীব-ভাব-বর্জিত আত্মা বস্তুতঃ শুদ্ধ আত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং জীবনের ধারা থাকিতে থাকিতেই জীব-ভাবের অতীত হওয়া আবশ্যক। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই এই যে বোধাতীত পরমতত্ত্বকে বোধে ধারণ করিয়া সংসারের এবং দেহের যাবতীয় বাসনা বর্জন করিতে হইবে। প্রতি মনুষ্যই নিদ্রাকালে বাসনা বর্জন করিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ইহা জ্ঞানপূর্বক করে না, কিন্তু অচেতন ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে করিয়া থাকে। তাই তাহাকে পুনর্বার উঠিতে হয়। এইজন্য নিদ্রা অথবা সাধারণ মৃত্যু সকল মনুষ্যের প্রকৃত কাজে আসে না, গভীর নিদ্রাতেও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। কারণ যদিও নিদ্রাতে মনুষ্যের দেহ-স্মৃতি থাকে না তথাপি জাগিয়া উঠিলে সেই স্মৃতি পুনর্বার ফুটিয়া উঠে। এই গভীর নিদ্রা মৃত্যুর ফলে ঘটিয়া থাকে। তখন জাগিয়া উঠিয়া জীব দেখিতে পায় যে সে নূতন দেহে নূতন

আবেষ্টনের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব-স্মৃতির রক্ষা হয় না বলিয়া নূতন বলিয়া বুঝিতে পারে না। এই জন্য যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে মরিয়া মরা নিষ্ফল, কিন্তু জীয়ন্তে মরা আবশ্যক। জীয়ন্তে মরা কাহাকে বলে? বোধাতীত অবস্থায় বোধ সম্যক প্রকারে রক্ষা করা, ইহাই জীয়ন্তে মরা। এই অবস্থায় একদিকে লিঙ্গহীন নির্মল আত্ম-স্বরূপের পূর্ণ বোধ জাগিয়া থাকে ও অন্যদিকে দেহ মন ও বিশ্বের চেতনা থাকে না।

চার

জীব মায়া-জাল ভেদ করিয়া সৃষ্টিকে ভেদ করিতে পারিলে নিজকেই শিবরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই তাহার জীবনের সার্থকতা। সে তখন তাহার নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে। ইহাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তাহার নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেদ অর্থাৎ জীব জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদ আর থাকে না। সে আর পূর্বের ন্যায় তখন দেশ কাল ও নিয়তির অধীন থাকে না। সে তখন নিজকেই সর্বশক্তিমান্ পূর্ণসত্য বলিয়া চিনিতে পারে। তাহার এই স্থিতি আর কখনও ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কোনও প্রকার জাগতিক পরিবর্তন তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। সে বুঝিতে পারে যে, সে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় সত্তাতেও ছিল। ছিল কেন? —আছে। কিন্তু ইহা সে পূর্বে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে ইহা তাহার বোধগম্য হইয়াছে। সর্বশক্তিমান্ পরম তত্ত্বের সহিত জ্ঞান ও চৈতন্যের যোগ হওয়াতে এই অবস্থার উদয় হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধাবস্থা। ইহা নিত্য জাগ্রৎ অবস্থা। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ও জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য ও দৃষ্টি এবং প্রেমিক, প্রেমপাত্র ও প্রেম এখানে অভিন্ন। এক্‌মাত্র সিদ্ধ পুরুষই এই অদ্বয় স্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ। অতীত, অনাগত ও বর্তমান তিন কালেই তিনি এক। বস্তুতঃ সকলেই তাহাই, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় তাহা বুঝিতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে এক পরমাত্মাই পরমতত্ত্ব ঈশ্বর জীব ও সিদ্ধ পুরুষরূপে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকার খেলা করিতেছেন। পরমাত্মা অবস্থায় পরমতত্ত্ব এক অখণ্ড ও অনন্ত স্বরূপে জ্ঞানের অগোচর

ভাবে অনন্ত শক্তি, অনন্ত সত্তা ও অনন্ত চৈতন্য ধারণ করিয়া আছেন। ঈশ্বররূপে এই সকল শক্তিই তাঁহার আছে, কিন্তু তিনি শুধু বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ব্যাপার অনুভব করিতেছেন। জীবরূপেও তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু নিজেকে বাসনা দ্বারা বদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধরূপে অনুভব করিতেছেন। তাঁহার সিদ্ধ অবস্থাটি সেবাত্মক অবস্থা। একমাত্র এই অবস্থায় তিনি চেতনভাবে তাঁহার অনন্ত শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

পাঁচ

এই যে সিদ্ধাবস্থার কথা বলা হইল ইহাই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পরের অবস্থা। ভগবৎ সাক্ষাৎকার বলিতে শুধু ভগবদ্-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান বুঝায় না — ইহা প্রকৃতই ভগবানের সহিত যুক্ত অবস্থা। এই অবস্থার প্রাপ্তি না ঘটিলে কোন সাধককেই যোগী বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। এই অবস্থায় জীব নিজের পৃথক্ সত্তাবোধ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব প্রকার দ্বৈত ভাবকে অতিক্রম করে। পরমাত্মার সহিত তাহার যে তাদাত্ম্য রহিয়াছে তাহার স্থায়ী জ্ঞান তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব যদিও তখন উপলব্ধি করে যে, এই অবস্থা তাহার অনাদিকাল হইতেই ছিল তথাপি সাক্ষাৎকারের পূর্বে ইহা তাহার বোধগম্য এবং আস্বাদনের বিষয় রূপে ছিল না, ইহা বলিতেই হইবে। যে অসীম এবং অব্যাহত আনন্দ সিদ্ধ পুরুষগণ অনুভব করেন তাহা কোন অভূতপূর্ব বস্তু নহে। তাহা পরমাত্মস্বরূপে অনাদিকাল হইতেই ছিল কিন্তু সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত উহার প্রকাশ হয় নাই। সাধক সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে ইহা মনে করা চলে না যে, সে কোন একটি পৃথক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল — সে পূর্বেও যাহা ছিল তখনও তাহাই থাকে। তাহার স্বরূপের কোনই পরিবর্তন হয় না। তবে যাহা পূর্বে সে জানিত না, সাক্ষাৎকারের পরে সে তাহা জানিতে পারে, ইহাই মাত্র ভেদ। অনাদিকাল হইতে এই যে ক্রম-বিকাশের খেলা চলিতেছে, ইহা একটি খেলা মাত্র। ইহা মায়ার বিলাস, ইহার কোনই বাস্তবিক সত্তা নাই। ইহা আত্মহারা জীবের নিজেকে ফিরিয়া পাইবার কৌশল মাত্র।

জগতের মায়াজালে জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া এই খেলাটি সময় সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। মায়াজালে জড়িত

হইবার মূল কারণ জীবের অহঙ্কার। জীব প্রথমাবস্থায় অহঙ্কার শূন্যই থাকে, কিন্তু তাহার চৈতন্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের বিকাশ হয়। এই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই মোহ অথবা অবিদ্যা গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। জীবের নিজ স্বরূপে অনন্ত জ্ঞান নিহিত থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তির পথে ইহাই একমাত্র বাধক। গভীর নিদ্রার সময় জীব পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য উপভোগ করে, কিন্তু এই উপভোগের সচেতন অনুভব হয় না। সুষুপ্তিকালে জগতের ভ্রম অল্প সময়ের জন্য তিরোহিত হয়, কারণ তখন চেতনা স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ভগবান্ বা আত্মস্বরূপের সচেতন অনুভূতি ফুটে না, কারণ অহংকার সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হইলে শুধু বাহ্য জগতের জ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয় না। কখনও কখনও এমন হয় যে সুষুপ্তির গাঢ়তা ভাঙ্গিয়া যায় অথচ জাগ্রৎ অবস্থার উদয় হয় না। এই প্রকার সন্ধিক্ষণে চৈতন্য নিরালম্ব ভাবে অল্পক্ষণের জন্য আত্মপ্রকাশ করে। এইটি বোধের অবস্থা — জড়ত্ব নহে। কিন্তু কিসের বোধ ? বিশ্বের নহে। এই ব্যাপক অভাবের বোধটি তখন জাগিয়া উঠে।

ইহাকেই মহাশূন্যাবস্থা বলে। ইহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পূর্ব সূচনা। চৈতন্য জগতের ইন্দ্রজাল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অহংকারে নিহিত অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশিত করিলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রকাশ-কাল বলা যাইতে পারে। একমাত্র সিদ্ধ পুরুষেই এই প্রকার অনন্ত জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর। সিদ্ধ পুরুষে পরমাত্মা নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানেন, কিন্তু এই জ্ঞান সাধকাত্মাতে অথবা অসাধক অবস্থায় বদ্ধ আত্মাতে যে পরমাত্মা আছেন তাহাতে থাকে না। এইজন্যই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগত ব্যাপার। একই পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্য-মান থাকিলেও এক আধারে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ জ্ঞান খুলিয়া যায়, কিন্তু অন্য আধারে যায় না। যদি তাহা যাইত তাহা হইলে এক জনের ভগবত্তা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের বিচিত্র লীলার অবসান হইয়া যাইত। অবশ্য যে কোন আত্মা সাধনবলে যথা সময়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ তাহাতে কোন বাধা নাই। অহঙ্কারের গ্রন্থি এবং জগতের ইন্দ্রজাল হইতে যে আত্মা মুক্তিলাভ করে তাহারই পক্ষে পরমাত্মভাবের স্ফুর্তি সম্ভবপর, সকলের পক্ষে নহে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ফলে আত্মা কিছু প্রাপ্ত হয় কি ? এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্বে প্রাপ্তি শব্দের অর্থ কি তাহা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। অপ্রাপ্ত বস্তুও মোহ বশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইলে মোহ-নিবৃত্তি দ্বারা নিত্য-প্রাপ্ত অবস্থার পুনরভিব্যক্তিকেও প্রাপ্তি বলে।

আত্ম-প্রাপ্তি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত। ইহা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে, তথাপি ইহার মহত্ত্ব অপরিসীম। অসিদ্ধ পুরুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে করে ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার আনন্দ ও জ্ঞানের অন্ত নাই। ভাগবত জ্ঞানের প্রাপ্তি নানা উপায়ে হইতে পারে। প্রেমই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। বিচারমূলক জ্ঞান অন্য প্রকার। প্রেমের দ্বারাই বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ও পূর্ণ আত্মবিলোপ সংঘটিত হয়। ইহার পর ভগবানের সঙ্গে মিলন হয়। দিব্য প্রেমের প্রেমিক নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ভুলিয়া যায় এবং ক্রমশঃ মানবীয় সীমার গণ্ডী অতিক্রম করে। ক্রমবিকাশের ফলে নিজের পরম সত্তা অভিব্যক্ত হয়। যখন মায়া ও দ্বৈত প্রপঞ্চ হইতে আত্মা মুক্ত হয়, তখন সে একীভাব প্রাপ্ত হয়। তাই ঐ সময় মূল অদ্বয় সত্তার আকর্ষণ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। এই পথে প্রেমের প্রেরণাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পথের তিনটি অংশ বা বিভাগ আছে। প্রথম অংশে পর পর অনেকগুলি স্তর আছে। এইগুলিকে ভূমি বলা যাইতে পারে। দিব্য জ্ঞানের সূত্রপাত হইতে পূর্ণ আত্মবিলোপ পর্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত। এই পথের চরমাবস্থাতে অহংকার-নাশ সিদ্ধ হয় ও মায়িক ধারা হইতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরে বিচ্ছেদের সংস্কার পর্যন্ত কাটিয়া যায়। সুফী সাধকগণ এই স্থিতিকে 'ফনা' বলিয়া বর্ণনা করেন। এই দীর্ঘ পথের যে যাত্রী তাহার সম্বল কি ? শুদ্ধ আত্মা ও তাহার আনুষঙ্গিক চেতনা সংস্কার, অহঙ্কার ও মন। এই অহংকার শুদ্ধ আত্মারই বিকৃত রূপ, মিথ্যা রূপ। ইহার পূর্ণ লোপই স্থিতির লক্ষ্য। অহংকার-নিবৃত্তির সঙ্গে কর্ম, বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি সব লুপ্ত হয়। এগুলি অহংকারে জড়িত হইয়া মনোময় কোষে অবস্থান করে। তখন একমাত্র চেতনা অবশিষ্ট থাকে — তাহার লোপ হয় না। সব গুণ কর্মাদির অভাব হয়, জ্ঞানেরও অভাব হয়। কিন্তু এই অভাবের

চেতনা বা বোধটা থাকে। ইহা শূন্যের বোধ মাত্র। অহংকার থাকে না বলিয়া "আমি অকিঞ্চন" এই প্রকার ভাবও থাকে না। তখন ভগবান নাই, বিশ্ব নাই, স্রষ্টা নাই, সৃষ্টি নাই, কিছু নাই — অথচ চেতনা আছে। ইহা অচেতন চেতনা। ইহা বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করা কঠিন। এই চেতনা স্থূল, সূক্ষ্ম, মিথ্যা, সত্য, জগৎ বা ভগবানের বিষয় নহে — অথচ চেতনা আছে। ইহা উপরাগ-রহিত চেতনা। সংস্কার, অহংকার, মন প্রভৃতি লুপ্ত হওয়ার পরও চেতনা থাকে বলিয়া তখন প্রকৃত আমির দিকে লক্ষ্য যায়। বিকৃত অহং নাই, তাই শুদ্ধ অহং ভাসে।

সাধারণ মানব-চেতনাতে সংস্কার বশতঃ এই প্রকৃত আমি ধরা পড়ে না। ঐ চেতনা ভ্রান্ত। সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মাও অন্তশ্চেতন ছিলেন। সিদ্ধগণ বলেন যে তিনি পরমাত্মা বলিয়া নিজেকে চিনিতেন না। তাই বলা চলে যে তাঁহার "প্রকৃত আমি" ছিল না। আপাততঃ বিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহা সত্য কথা। মিথ্যাজ্ঞানের উপরই সত্যজ্ঞান নির্ভর করে। সংস্কার-জন্য মিথ্যাজ্ঞানমূলক মিথ্যা অহংএর উপরেই প্রকৃত আমি নির্ভর করে।

পথের প্রথম অংশের চরম লক্ষ্য যে শূন্য অবস্থা তাহার কথা বলা হইল। এবার দ্বিতীয় অংশের কথা বলিতেছি। পূর্বোক্ত চেতনা ক্রমশঃ প্রকৃত আমিকে প্রাপ্ত হইবে। ইহার ইতিহাসই দ্বিতীয় অংশের বিষয়। এই সময়ে ঐ অচেতন চেতনা রূপান্তরিত হইয়া "আমি চেতনা" এইরূপ ধারণ করে। এই বোধই পরমাত্মার বোধ যাহা "আমি পরমাত্মা" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় অংশের অবসানে এই উপলব্ধি জন্মে। পূর্বোক্ত সুফীগণের পরিভাষাতে ইহাই 'বকা'। ইহাই প্রকৃত ভগবত্তার বোধ।

কিন্তু ইহাও সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা নহে। সিদ্ধ পুরুষের স্থিতি যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" স্থিতি বা ব্রাহ্মী-স্থিতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা বলা হইতেছে না। তবে উভয়ে ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে বলিতেই হইবে। বস্তুতঃ "আমি ব্রহ্ম" এই দশা হইতে উচ্চতর অবস্থা হইতেই পারে না। চরম অতিচেতনা অবস্থা হইতে অধিকতর উৎকর্ষ কল্পনীয় নহে। ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের অপ্রাপ্ত বা অসিদ্ধ কিছুই থাকে না, ইহা সত্য। মন, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ, দেশ, কাল, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, লোক-লোকান্তর কিছুই তখন থাকে না। ইহা চিন্তা ও

কল্পনার অতীত, নিত্য, স্থির, ত্রিপুটীরহিত বিশুদ্ধ অদ্বয় স্থিতি। তখন একই থাকে — দ্বন্দ্বের ক্রিয়া থাকে না। সকল সাধনার ইহাই চরম সিদ্ধির অবস্থা।

সিদ্ধিলাভের পর কেহ কেহ দেহ থাকা সত্ত্বেও অগ্রসর হন না। স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাতে ইহারা পূর্ণতার প্রতীক স্বরূপ। ইহাদের সত্তা অনন্ত অসীম জ্ঞানময়।

কিন্তু পথের আরও একটি অংশ আছে উহাকে তৃতীয় অংশ বলা হইয়াছে। উহা সকলের জন্য নহে। উহা সদ্‌গুরুর বিশ্বোদ্ধার কার্যে যাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাঁহাদের জন্য। পথের তৃতীয় অংশে সূক্ষ্ম ও স্থূল চেতনার পুনরুদ্ধার ঘটিয়া থাকে। কারণ তাহা না হইলে সাধারণ জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না ও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-বিস্তার রূপ জগদ্‌-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব-পর হয় না। আধিকারিক পুরুষগণের জন্য পথের এই তৃতীয় অংশ উদ্দিষ্ট। আগমে নির্বাণ-দীক্ষার পরে আচার্য-দীক্ষার সম্ভাব্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষের অতিচেতনা ত অক্ষুণ্ণই থাকে, অথচ সৃষ্টিবিষয়ক চেতনারও অভিব্যক্তি থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ 'মজুব' ও সদ্‌ গুরু-ভাবাপন্ন অর্থাৎ 'কুতুব' সংজ্ঞক পুরুষে স্থিতিগত কোন পার্থক্য নাই — অথচ ভাবগত পার্থক্য আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠের দৃষ্টিতে সৃষ্টি নাই, কিন্তু অনুগ্রাহক গুরুর দৃষ্টিতে সৃষ্টি আছে, তবে উহা ব্যক্তিগত, অহং-এর শুদ্ধ কল্পনা-প্রসূত। এই গুরুই নররূপী বিরূপাক্ষ (God-Man)।

———

দেহবিজ্ঞান ও অমরত্ব সাধন

আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে সর্বত্রই সাধক ও যোগীর পক্ষে দেহাত্মদৃষ্টিকেই সকল প্রকার অনর্থের মূল বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাজনগণও সকলেই এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। এইজন্য মুমুক্ষুর পক্ষে যতটা সম্ভব দেহের চিন্তা হইতে বিরত হইয়া আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট থাকা উচিত, ইহাই তাঁহারা সকলে বলেন। ইহাই বৈরাগ্যের যাবতীয় উপদেশের গোড়ার কথা ঃ কারণ দেহাবেশ হইতেই বিভিন্ন প্রকার ভোগবিলাসের প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। অবিদ্যাত্মক দেহাদি হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া চিৎস্বরূপ আত্মার দিকে উহা স্থাপন করা, ইহাই বিবেকেরও মূল লক্ষ্য। চিদ্‌চিদ্‌গ্রন্থি ভেদ করিতে না পারিলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই হইল এক দিক্‌কার কথা। অপরদিকে দেহের, বিশেষতঃ নরদেহের, একটি পরম উপযোগিতার কথাও শাস্ত্রমুখে জানিতে পারা যায় — "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্‌" — কবির এই উক্তি লোক-সমাজে সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। এই রক্তমাংসময় যাট্‌কৌশিক নরদেহই কর্মদেহ। এই দেহ ব্যতীত কর্মসাধন সম্ভবপর নহে ; যদিও নরদেহ ভোগায়তনও বটে ; কারণ এই দেহেই প্রাক্তন জন্মের পাপপুণ্যের ফল-ভোগও হইয়া থাকে। তথাপি প্রধানতঃ ইহা কর্মদেহরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। এই দেহাশ্রয়ে শুভকর্ম সঞ্চয় করিতে না পারিলে দেবদেহ অথবা অমানবীয় অন্য কোন প্রকার দেহ দ্বারা পূর্ণত্বের পথে কর্মযোগে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। যে সকল উচ্চ আত্মা দিব্য স্তরে পরমানন্দময় ভোগাস্বাদনে নিমগ্ন আছেন তাঁহাদিগকেও পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে কর্মের পথে পদার্পণ করিতে হয়, এবং ইহা অনিত্য সুখদুখঃসঙ্কুল মানবদেহ আশ্রয় না করিয়া হইতে পারে না। অতএব ইহা নিশ্চিত যে শুধু ভোগের জন্য নহে, বিশেষতঃ পরমার্থসিদ্ধির জন্যই মানবদেহের গৌরব।

ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভেদে এই দেহ দুই প্রকার। ব্যষ্টি দেহকে পিণ্ড বা পিণ্ডাণ্ড (Microcosm) বলে ; সমষ্টি দেহের নামান্তর ব্রহ্মাণ্ড (Macrocosm)। সমষ্টি ও মহাসমষ্টিভেদে ব্রহ্মাণ্ডেরও

দুই প্রকার স্থিতি আছে। একটি পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডরূপে এবং অপরটি যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিরূপে। বলা বাহুল্য এই প্রসঙ্গে আমরা প্রকৃত্যণ্ড (যাহা ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি হইতেও বিশাল), মায়াণ্ড (যাহা প্রকৃত্যণ্ডের সমষ্টি হইতেও বিশাল) এবং শাক্তাণ্ড (যাহা মায়াণ্ড হইতেও অনন্তগুণে বিরাট্) প্রভৃতির আলোচনা করিব না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে তাহার সব কিছু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই ক্ষুদ্র নরদেহেও রহিয়াছে ; সেইজন্য ঠিকভাবে এই নরদেহের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ড তো দূরের কথা — সমগ্র বিশ্বের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভবপর হয়। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত 'দহর-বিদ্যা' আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে বহিরাকাশে যাহা কিছু বিদ্যমান তাহার সবই মানবের অন্তরাকাশরূপী হৃদয়-পুণ্ডরীকে বিদ্যমান আছে। সুতরাং বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া অন্তরমুখী দৃষ্টির দ্বারা হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য নিবিষ্ট করাই ঋষিগণের মুখ্য উপদেশ ছিল।

ক্ষুদ্র বলিয়া মানবদেহ উপেক্ষার যোগ্য নহে ; ইহা পরম সত্য বস্তু। কবি বলিয়াছেন ঃ—

"তুমি জানো ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নহে ;
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রহে।"

শুধু তাহাই নহে ; ব্রহ্মাণ্ড বা বিপুল বিশ্বকে যেমন দেহজ্ঞান হইতে জানিতে পারা যায় — তেমন বিশ্বের অতীত সত্তার সন্ধান পাইতে হইলেও এই ক্ষুদ্র মানবদেহেরই আশ্রয় আবশ্যক হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই যোগিগণ ইহা জানিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট-যোগ্যতা-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা যোগ-সাধনাতে এই সত্যের উপযোগ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যদি কেহ ঠিক ভাবে দেহের তত্ত্ব জানিতে পারে অর্থাৎ এই মানবদেহের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে — তাহা হইলে সে দিব্যদেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং অমরত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারে। প্রাচীন কালে নাথপন্থীয় হঠযোগিগণ, রসসিদ্ধ-সম্প্রদায়, পাশুপত জ্ঞানের সাধক আচার্যগণ এবং অন্যান্য অনেক মহাজন নানা প্রকারে দেহতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন যোগ-সাহিত্যের

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে সেই সকল উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। দেহস্থিত যে সকল বিষয় ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি প্রধান ঃ—

ছয়টি চক্র, ষোলটি আধার, তিনটি লক্ষ্য, পাঁচটি আকাশ, বারটি গ্রন্থি, তিনটি শক্তি, তিনটি ধামপথ এবং নাড়ীচক্র।

নাড়ীচক্র বলিলে বুঝিতে হইবে সর্বপ্রথম একটি নাড়ী — ইহাই ব্রহ্মনাড়ী অথবা সুষুম্নানাড়ী। তারপর তিনটি নাড়ী — অর্থাৎ মধ্যস্থিতা ব্রহ্মনাড়ী সহ উহার উভয় পার্শ্বস্থ বাম ও দক্ষিণ নাড়ী অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। ইহার পর দশটি বা চতুর্দশটি নাড়ীর পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত তিনটি সহ আরও সাতটি বা একাদশটি নাড়ী আছে ; যথা — (১) গান্ধারী, (২) হস্তিজিহ্বা, (৩) অলম্বুষা, (৪) পয়স্বিনী, (৫) কুহূ, (৬) রাকা, (৭) শংখিনী। নাড়ীজাল যখন আরও বিস্তৃত হয় তখন ইহাদের সংখ্যা হয় ৩২, তারপর হয় ৭২ হাজার, তারপর ৩½ কোটি — ব্যস্তবিক পক্ষে নাড়ীর সংখ্যা নাই ; নাড়ী অনন্ত। প্রতি রোমকূপের সহিত নাড়ীর যোগ রহিয়াছে — ইহা দেহতত্ত্বের একটি অত্যন্ত উপযোগী অংশ। যে দেহ বিবিধ মলের দ্বারা কলুষিত এবং ব্যাধি ও জরার দ্বারা পীড়িত এবং ক্লেদময় ও জীর্ণ সেই দেহকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হইবে। এইপ্রকার সূক্ষ্ম দেহ-জ্ঞান লাভ হইলে ক্রিয়া-কৌশলের দ্বারা আপ্যায়নের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়। ইহার ফলে দিব্যদেহের প্রাপ্তি ঘটে। এই জ্ঞানলাভ এবং আপ্যায়ন যে প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত তাহাকে কৌলিক প্রক্রিয়া বলে। ইহার সবিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে।

এই যে ছয়টি চক্রের কথা বলা হইল, কেহ যেন মনে না করেন ইহা প্রচলিত ষট্‌চক্রের দ্যোতক। এই চক্রগুলির মধ্যে প্রথমটি জন্মস্থানে স্থিত নাড়ীচক্র, যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেহ-সংশ্লিষ্ট বিশাল নাড়ীজাল বিধৃত রহিয়াছে। দ্বিতীয় চক্রটি 'মায়াচক্র' নামে প্রসিদ্ধ, ইহার স্থান নাভি। এই স্থান হইতেই বিশ্বব্যাপী মায়ার প্রসার ঘটিয়া থাকে। তৃতীয় চক্রটি হৃৎপ্রদেশে অবস্থিত এবং 'যোগচক্র' নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ চক্রের স্থান তালু। ভ্রূমধ্যে বিন্দুর স্থানে যে চক্রটি অবস্থিত তাহার নাম 'দীপ্তিচক্র'। ইহার উর্ধ্বে নাদস্থানে 'শান্তচক্র' নামে ষষ্ঠচক্রের স্থিতি কথিত হয়।

দেহ-তত্ত্বের প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে সর্বত্র ১৬টি আধারের কথা পাওয়া যায়। এইগুলি জীব-ভাবের আধার নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নের পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে উর্ধ্বে মূর্দ্ধাস্থান দ্বাদশান্ত পর্যন্ত এই সকল আধার অবস্থিত। অঙ্গুষ্ঠ, গুল্‌ফ, জানু, মেঢ্র, পায়ু, কন্দ, নাড়ী, জঠর, হৃৎপদ্ম, কূর্মনাড়ী, তালু, ভ্রূমধ্য, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র ও দ্বাদশান্ত এইগুলি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহাদের মধ্যে হৃৎপদ্মকে সংজীবনী শক্তির আধার এবং জঠরকে সর্বকামনার আধার মনে করা হয়। কূর্মনাড়ীর স্থান বক্ষঃস্থল। তালু সোমকলামৃত দ্বারা আচ্ছন্ন ; ইহা সুধার আধার। ভ্রূমধ্যে বিদ্যাকমলের স্থান।

লক্ষ্য তিন প্রকার পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই তিনটির নাম অন্তর্লক্ষ্য, বহির্লক্ষ্য ও উভয়লক্ষ্য। কোন কোন আচার্য উভয়লক্ষ্যকে মধ্যলক্ষ্যও বলিয়া থাকেন। মণ্ডল ব্রাহ্মণ উপনিষৎ, অদ্বয় তারক উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে যেটিকে অন্তর্লক্ষ্য বলা হইয়াছে তাহা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর। ইহা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ-স্বরূপ। এই লক্ষ্য সম্বন্ধে দৃষ্টিভেদ বশতঃ কিছু কিছু মতভেদ আছে। যোগীর দৃষ্টিতে ইহা সহস্রারে জ্যোতিঃস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈষ্ণব সাধকের দৃষ্টিতে ইহা বুদ্ধি-গুহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষরূপে প্রকট হয়। শৈব সাধকের দৃষ্টিতে উহা শীর্ষের অন্তর্গত মণ্ডল মধ্যে শক্তিযুক্ত পঞ্চমুখ শিবের আকারে প্রকাশিত হয়। আর যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদিত 'দহরবিদ্যার' উপাসক তাহাদের নিকট ইহা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন মতে ষোড়শান্ত-স্থিত তুরীয় চৈতন্যও লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা তারকযোগের সাধনা করেন তাঁহারা এই লক্ষ্য সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। মানুষ মাত্রেরই দুইটি চক্ষু আছে। এই দুইটি চক্ষুর অন্তঃস্থিত দুইটি তারকে চন্দ্র ও সূর্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বামটিতে চন্দ্রের ও দক্ষিণটিতে সূর্য্যের প্রতিফলন হয়। এই দুইটি তারকের দ্বারা যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্যের দর্শন করিতে হয়। যোগিগণ বলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় পিণ্ডাণ্ডে অর্থাৎ মানবদেহের মধ্যস্থিত আকাশে চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্যমণ্ডল অবস্থিত আছে। এই দুইটি মণ্ডলকে পূর্বোক্ত দুইটি তারকের দ্বারা উর্ধ্বদিকে একীভূত করিয়া দর্শন করিতে হয়। ইহার ফলস্বরূপ তারকযোগে সিদ্ধিলাভ হয়।

অযোগী যেমন ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চন্দ্র-সূর্যকে মনঃসংযুক্ত তারকদ্বয়ের দ্বারা দর্শন করে তদ্রূপ যোগী নিজের মস্তকাকাশে প্রতিভাসমান চন্দ্র-সূর্যকে মনঃসংযুক্ত তারকদ্বয়ের দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। মনঃ-সংযোগ ব্যতীত এই দর্শন সম্ভবপর নহে। সুতরাং অন্তর্লক্ষ্য দ্বারা এই তারকই অনুসন্ধানের বিষয়। মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে এই তারক দুই প্রকার। যাহা মূর্ত তারক তাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর, কিন্তু অমূর্ত তারক ভ্রূযুগের অতীত এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও মনঃসংযুক্ত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত রন্ধ্রে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে দুইটি দৃষ্টি নিবিষ্ট করিয়া ঊর্ধ্বদিকে লক্ষ্য করিলে যে তেজের আবির্ভাব অনুভব করা যায় তাহাই তারক-যোগের লক্ষ্য। উহার সঙ্গে মনংযুক্ত তারক যোজনা করিয়া অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ভ্রূদ্বয়কে উপরের দিকে উৎক্ষেপ করিতে হয়। ইহাই পূর্বতারকের সাধনার সারাংশ।

যেটি উত্তর তারক বা অমূর্ত তারক তাহারই নামান্তর অমনস্ক।

বহির্লক্ষ্য, নাসাগ্র হইতে বহির্দেশের দূরত্বের তারতম্যানুসারে, বিভিন্ন প্রকার। লক্ষ্য দ্বারা নানা বর্ণসমন্বিত ব্যোম বা আকাশের দর্শন হয়। মধ্যলক্ষ্য অন্তরিক্ষে বিভিন্ন প্রকার দর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দর্শনের ফলে ক্রমশঃ পাঁচ প্রকার আকাশের দর্শন হয়। তারমধ্যে প্রথমটি নির্গুণ আকাশ, দ্বিতীয়টি পরাকাশ, তৃতীয়টি মহাকাশ, চতুর্থটি তত্ত্বাকাশ এবং পঞ্চমটি সূর্যাকাশ নামে প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্যের পর ১২টি গ্রন্থির জ্ঞানও যোগীর পক্ষে পাওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থিগুলি বিশুদ্ধ চৈতন্যের আবরণ বলিয়া গ্রন্থি নামে প্রসিদ্ধ। মায়া হইতে শক্তি পর্যন্ত ১২টি গ্রন্থির পরিচয় তান্ত্রিক যোগ-সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের নাম প্রথমে (১) মায়া ও (২) পাশব এই গ্রন্থিদ্বয়। ইহার পর কারণস্থিত পাঁচটি গ্রন্থি—(৩) ব্রহ্মা, (৪) বিষ্ণু, (৫) রুদ্র, (৬) ঈশ্বর, (৭) সদাশিব। এই পাঁচটি কারণ বা অধিকারী পুরুষের স্থানে বিদ্যমান, — অর্থাৎ হৃদ্দেশে, কণ্ঠে, তালুতে, ভ্রূমধ্যে ও ললাটে অবস্থিত। ইহার পর ইন্ধিকা, দীপিকা, বৈন্দব, নাদ ও শক্তি এই পাঁচটি গ্রন্থি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এইগুলি নিরোধিকার ঊর্ধ্বে নাদশক্তি রূপে পরিচিত। পরম চৈতন্যের প্রকাশের পক্ষে এইগুলিও আবরণ স্বরূপ। ইহার মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য আছে, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

প্রথমে যে মায়া শক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহার স্থান কৌলিক আচার্যগণের মতে আনন্দ ইন্দ্রিয়, কারণ উহাই দেহোৎপত্তির হেতু। পাশব গ্রন্থির স্থান কন্দ। পশুবর্গ সংকুচিত দৃক্‌শক্তি সম্পন্ন বলিয়া কন্দস্থিত এই গ্রন্থি পাশবদ্ধ জীবগণের প্রথম উদ্ভেদ স্বরূপ। ব্রহ্মাদি পাঁচটি কারণ-গ্রন্থি পশুর সৃষ্টি প্রভৃতির কারক বলিয়া নিরোধের হেতু। তাই এইগুলিকেও গ্রন্থিরূপে গণনা করা হয়।

পূর্বে যে পঞ্চ আকাশের কথা বলা হইয়াছে সেগুলি শূন্যস্বরূপ ও সৌষুপ্ত আবেশের উৎপাদক, তাই বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপলব্ধির জন্য এইগুলিকেও অতিক্রম করা আবশ্যক হয়।

চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি নামে তিনটি ধাম আছে, যাহারা বাম, দক্ষিণ ও মধ্যস্থান অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। এই তিনটি ধামের সঙ্গে ত্রিবিধ বায়ুর সম্বন্ধ আছে। ঐ সকল বায়ুর দ্বারা মানবদেহ অধিষ্ঠিত। তিনটি বায়ুর আশ্রয়ে তিনটি প্রধান নাড়ী — ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ব্যাপক দৃষ্টিতে নাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশী। বস্তুতঃ নাড়ীর সংখ্যা নাই, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই সকল বৈচিত্র্য সমনা পর্যন্ত স্তরভেদে বিভিন্ন প্রকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের ঊর্ধ্বে বা পরে উন্মনাভূমি পরমপদ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বে যে অমনস্কের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইহারই নামান্তর। ইহাই পরম শিবপদ এবং পূর্ণ সামরস্য বা অদ্বয় স্থিতি। এই পরমপদই পরমব্যোম। স্বচ্ছন্দ সংগ্রহের মতে ইহা দ্বাদশান্তেরও উপর। দ্বাদশান্ত ললাটের ঊর্ধ্বে কপালের ঊর্ধ্বস্থান পর্যন্ত, কিন্তু পরমব্যোম কাহারও কাহারও মতে শিরোদেশ হইতে দুই আঙ্গুল ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা মানবদেহ সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির নাম ও পরিচয় প্রদান করিলাম। দিব্যদেহ লাভ ও পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথে এইগুলির জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। দিব্যদেহের সাধনাই অমরত্বের সাধনা। কালের অধীন ক্ষণভঙ্গুর, জরাব্যাধি সংকুল নশ্বর দেহের পরিবর্তে শাক্তদেহ প্রাপ্তিই অমরত্ব সাধনার লক্ষ্য। এই দেহ চিৎশক্তিময় বলিয়া চিদানন্দময় ও অমৃত দ্বারা ইহা ব্যাপ্ত। পরাচিৎ-শক্তির অমৃতরূপে উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শাক্তদেহের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ইহার বহু প্রক্রিয়া আছে — তন্মধ্যে কৌলিক প্রক্রিয়াই এখানে আলোচ্য। আনুষঙ্গিক ভাবে তান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিও আলোচনা

করা হইল। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই দুইটিরই বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম প্রক্রিয়াটির তত্ত্ব নিরূপণের জন্য সর্বপ্রথম পরাশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরাশক্তি যে ভগবৎশক্তি অথবা আত্মশক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শক্তি হইলেও ইহা স্বরূপের সহিত অভিন্ন ভাবে অথবা সমরস ভাবে অবস্থিত। আধারাধেয় ভাবে নহে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ইহার আশ্রয় ও ইহা স্বরূপের আশ্রিত, এইরূপ ভাবে নহে। এই পরাশক্তি চিতিরূপা স্বাতন্ত্র্য শক্তি। ইহাকে আশ্রয় না করিয়া পূর্ণত্বের অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু মানুষ নিরন্তর শ্বাস-প্রশ্বাসের অথবা তজ্জাতীয় অন্যান্য দ্বন্দ্ববৃত্তির অধীন বলিয়া সহজে এই মধ্যমাশক্তির সন্ধান পায় না। প্রাণ ও অপানের বৃত্তিরূপে এই দ্বন্দ্বশক্তি অথবা বিরুদ্ধশক্তি মানবদেহে কার্য করিয়া থাকে। সেইজন্য যে কোন প্রকারেই হোক্ প্রাণ ও অপানের বৃত্তিকে অভিভূত র‍্যাখা আবশ্যক। বিরুদ্ধ-শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধভাব সাময়িকভাবে উপশান্ত হইলে অর্থাৎ সাম্য প্রাপ্ত হইলে সুষুম্নাস্থিত মধ্যমপ্রাণে অর্থাৎ উদান নামক প্রাণব্রহ্মে পূর্ববর্ণিত পরাশক্তির সঞ্চার ভাবনা দ্বারা অনুভব করিতে হয়। কিন্তু ইহা করিবার পূর্বে সর্ব-প্রথমে দেহাদিতে যে অহং ভাব থাকে তাহা দূর করিয়া পূর্ণাহন্তা স্বরূপে আবিষ্ট হইতে হয়। ইহা একমাত্র অহং ভাবের চিন্তার দ্বারাই হইতে পারে। ইহার পর পূর্ণাহন্তাময় মূলমন্ত্রকে পরাশক্তির সহিত সমরস অথবা অভিন্ন চিন্তা করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্বয়মুদিত প্রাণাদি সংস্পর্শহীন স্পন্দনের অভিব্যক্তি হয়। এই স্পন্দনই পূর্বোক্ত সামরস্য সম্পাদনের সহায়ক। এই পর্যন্ত ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইলে মন্ত্রবীর্যের সার ভাবনাপথে উদিত হয়; তখন ঐ অভিমানটিকে দেহপ্রাণাদি পরিচ্ছিন্ন প্রমাতৃভাবের অভিমান শান্ত করিয়া জন্মাধার আনন্দচক্রে আরোপ করিতে হয়। এই প্রকারে পরিমিত অহংভাব প্রশান্ত হইলে ঐ অভিমানটিকে আনন্দচক্র হইতে উঠাইয়া মূলাধারে অথবা কন্দস্থানে স্থাপন করা আবশ্যক। এই পর্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল তাহা প্রাথমিক প্রক্রিয়ার বিবরণ। ইহার পর যে ১৬টি আধারের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহাদিগকে এক একটি করিয়া বিদ্ধ করিতে হয়। এই বেধন ক্রিয়াতে সূচীস্থানীয় হইতেছে নাদ অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক প্রাণের অথবা স্ফুরণভাবের উন্মেষ।

এই ব্যাপারে সূক্ষ্মযোগ ও প্রয়োগের সাহায্য অধিকার ভেদে অল্পাধিক পরিমাণে আবশ্যক। সূক্ষ্মযোগ বলিতে উন্মেষ প্রাপ্ত স্ফুরণের তীব্র উত্তেজনার ফলে পূর্বোক্ত প্রাণাত্মক মন্ত্র ক্রমশঃ স্বস্থান হইতে একটু একটু করিয়া উর্ধ্বে আরোহণ করিতে থাকে। ইহারই নাম প্রয়োগ। বলা বাহুল্য, এই আরোহণ প্রক্রিয়া সুষুম্না বা মধ্যনাড়ীর মার্গ দিয়া ঘটিয়া থাকে। এই আরোহণ ব্যাপারে কুলশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে সবগুলি আধার ও সবগুলি গ্রন্থির পর পর ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ ১৬টি আধার ও ১২টি গ্রন্থি অতিক্রান্ত হয়। সর্বান্তে দ্বাদশান্ত নামক ধ্রুবস্থানকেও বেধ করিয়া বাহির হইতে হয়। এই বেধ ক্রিয়া বস্তুতঃ আবেগেরই ক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বাদশান্তে প্রবেশ করিলেই মহামায়া পর্যন্ত সকল বন্ধন ত্যাগ হয় বলিয়া ধ্রুবপদে স্থিতি হয়। দ্বাদশান্তের বেধ সম্পূর্ণ হইলে যে ব্যাপকতার আবির্ভাব হয় তাহা নিত্যোদিত পরাশক্তির সামরস্য। এই পর্যন্ত যোগ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের ফলে পরাশক্তির সঙ্গে অভেদ সিদ্ধ হয়। পরাশক্তির সঙ্গে অভেদ এবং পরমশিবের সঙ্গে তাদাত্ম্য একই জিনিস।

অমরত্ব সাধনের কৌলিক প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব এখানে শেষ হইল। এই প্রথম পর্বেই পরমশিবের সঙ্গে তাদাত্ম্য ঘটিয়া থাকে। ইহার পর উক্ত সাধনার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়। যখন দ্বাদশান্তের ভিতর প্রসরণশীল শক্তিধারা মধ্যম মার্গ দ্বারা হৃদয়কে আপূরিত করিয়া থাকে তখন পরমানন্দের আবির্ভাব হয়। উহার প্রবাহই অমৃত ধারা। বলা বাহুল্য, হৃদয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত পরমানন্দ ঠিক রসায়নের কার্য করিয়া থাকে। যতক্ষণ হৃদয়ে বিশ্রান্তি থাকে ততক্ষণ ভাবনার দ্বারা ইহা অনুভব করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহার পর হৃদয় হইতে উচ্ছলিত ঐ পরমানন্দকে প্রবাহমুখে চারিদিকে প্রসারিত করিতে হয়। ইহার ফলে একপ্রকার অনন্ত নাড়ীপ্রবাহ প্রসারলাভ করিয়া থাকে।

এই অমৃত প্রসারের অনুরূপ ধ্যান সমাপ্ত করিয়া, ঐ অমৃত দ্বারা নিজের দেহকে ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ করিতে হয়। এইভাবে নিজের দেহ অমৃতময় সম্পন্ন হওয়ার পর দ্রুতবেগে ঐ প্রবাহ দেহস্থিত যাবতীয় লোমকূপ দ্বারা বাহ্য জগতে অথবা বিষয়গ্রামে অনবচ্ছিন্নভাবে প্রেরণা করা আবশ্যক। ইহার পর সূক্ষ্ম শাক্তানন্দ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত হইয়াছে, ধ্যান করিতে পারিলে অজর ও অমর

ভাবের প্রাপ্তি ও অন্তে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। কৌলিক সাধন সাহিত্যে ইহা মৃত্যুজয়ের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া।

বলা বাহুল্য, দেহের অঙ্গ ও উপাঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ব্যতিরেকে কৌলিক প্রক্রিয়ামূলক অমরত্ব সাধনের ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

প্রসঙ্গতঃ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণও এই স্থানে দেওয়া হইল। এই প্রক্রিয়াতে সর্ব প্রথম সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিকে অশ্বিনীমুদ্রার অনুরূপ সঙ্কোচ-বিকাশাত্মক ক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত করিতে হয়। তাহার পর এই সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিকে অধিষ্ঠান করিয়া পরবর্তী ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই শক্তি স্পন্দাবিষ্ট 'মধ্যম কলা' নামে প্রসিদ্ধ। এই জাগ্রত প্রাণশক্তিকে নিরন্তর মনোযোগপূর্বক ঈক্ষণ করিতে করিতে উহাতে আবেশলাভ করা আবশ্যক হয়। তদনন্তর পাদাঙ্গুষ্ঠ নামক আধারকে ভাবনার দ্বারা আশ্রয় করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইবার পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই অঙ্গুষ্ঠই দেহের অথবা নিজের, সর্বনিম্নস্থ কালাগ্নির আশ্রয়। এই পর্যন্ত সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইলে কন্দভূমিতে উপলব্ধ শাক্তানন্দরূপ বীর্য ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া পরিস্ফুট ভাবনা বলে উহাকে অভিব্যক্ত করিতে হয়। ইহার ফলে প্রাণস্পন্দরূপা ক্রিয়াশক্তি উক্ত শাক্তস্পন্দ দ্বারা আপূরিত হইয়া অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া জাগিয়া উঠে ও নাভিকে প্রাপ্ত হয়। এই নাভিপ্রাপ্তি ব্যাপারে বিভিন্ন উপায়ের নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ইচ্ছা অথবা সঙ্কোচক্রম হইতে উৎপন্ন ঊর্ধ্বারোহণে প্রযত্ন এবং বিজ্ঞান বা ভাবনা প্রধান। মূলস্পন্দ আশ্রয় করার কথা যেখানে যেখানে বলা হইয়াছে সেখানে বুঝিতে হইবে পূর্বোক্ত অশ্বিনীমুদ্রার অনুরূপ সঙ্কোচন-প্রসারণপূর্বক স্থানবিশেষে নিরোধ। কোন কোন তন্ত্রে দিব্যকরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে — ইহা তাহারই উপলক্ষণ। দক্ষিণ ও বামস্থিত দুই নাড়ী ত্যাগ করিয়া পূর্ববর্ণিত ইচ্ছা ও জ্ঞানের আশ্রয়পূর্বক মধ্যমার্গের প্রবহণশীল প্রাণ-ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সুষুম্না নাড়ীকে অবলম্বন করা আবশ্যক। সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-গোচর বিচার সকল হইতে বিরত হইবে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্মুখ করিয়া ইহার পর মায়াহীন বিজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ চিদানন্দ-রূপী জ্ঞানশক্তির দ্বারা, যাহাতে প্রাণ প্রভৃতির প্রাধান্য-নিবন্ধন অবিদ্যাংশ থাকে না, হৃদয় কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানস্থিত ব্রহ্মাদি কারণবর্গকে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিবে। ইহার পর মায়াদি গ্রন্থিগুলিকে

ভেদ করিবে ও হৃদাদি স্থানস্থিত ৫টি আকাশকেও ত্যাগ করিবে। ইহার পর ব্রহ্ম হইতে শিব পর্যন্ত ৬টি কারণের ঊর্ধ্বে কুণ্ডলশক্তি অথবা সমনা শক্তিতে উপনীত হইবে। এই সমনা শক্তির গর্ভে শূন্যাতিশূন্য পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব কুণ্ডলরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। সমনা-শক্তির প্রাপ্তির পর বিজ্ঞানের দ্বারা ঊর্ধ্বে বিরাম লাভ করিবে। ইহাই উন্মনা পরতত্ত্ব প্রাপ্তি অথবা পরমশিবের অবস্থা বা সামরস্য। পূর্ণত্ব লাভের এই সাধন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত তন্ত্র সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য, কৌলিক ও তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ভেদ আছে। সূক্ষ্মধীসম্পন্ন পাঠক সমাজ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কাল ও ক্ষণতত্ত্ব

কাল ও ক্ষণের তত্ত্ব সম্বন্ধে দু একটি কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে কতকটা আলোকপাত হইবে এবং পথের সন্ধান বুঝিয়া লইতে কতকটা সাহায্য লাভ হইবে।

কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান সকলেরই আছে। ইহা হইতেই আপাততঃ আলোচনার সূত্রপাত করা চলিতে পারে। যখন বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে কোনটি পূর্ববর্তী এবং কোনটি পরবর্তী এইরূপ পৌর্বাপৌর্বের যে প্রতীতি জন্মে তাহা হইতে কালের ধারণা সাধারণের মনে উদিত হয়। ঘটনাবলীর মধ্যে এই যে পৌর্বাপৌর্ব সম্বন্ধ ইহাকে ক্রম বলে। সুতরাং ক্রম যে কালের ধর্ম ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কোনো একটি মনুষ্য দেহের বিকাশের পথে জন্মের পর হইতে — বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং স্থবিরতা কতকগুলি ক্রমবর্দ্ধ অবস্থা। একই দেহ পর পর এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। এইজন্য বলা হয় দেহ কালের অধীন। অনিত্য বস্তু মাত্রেই সৃষ্টি হইতে বিকাশ পর্যন্ত এইপ্রকার একটি ক্রমের ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য তাহাকে পরিবর্তনশীল অথবা পরিণামী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাই কালের অধীনতা। নিত্য-বস্তুতে কালের কোনো প্রভাব বর্তমান থাকে না কারণ, যাহা নিত্য তাহা একভাবে চিরদিন প্রকাশমান থাকে। কখনই তাহাতে ভাবান্তর হয় না। ক-খ-গ এইগুলিকে যদি নিত্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে "ক" চিরদিন "ক" ই আছে, "খ" চিরদিন "খ" ই আছে এবং "গ" চিরদিন "গ" ই আছে। 'ক' কখনো 'খ' রূপে, কিংবা 'খ' কখনো 'গ' রূপে পরিণত হয় না। এই স্থলে বুঝিতে হইবে ক, খ, গ কালের অধীন নহেন কারণ ইহাদের মধ্যে পরস্পর কালগত ক্রমিক কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। আমাদের সুপরিচিত দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার প্রকট স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বালভাবই প্রকাশমান, ইহা নিত্য। পক্ষান্তরে তাঁহার

কৈশোর লীলাতে তিনি নিত্য কিশোর। তাঁহার বালভাবটিও যেমন নিত্য তেমনি তাঁহার কিশোর ভাবটিও নিত্য। লৌকিক দেহ যেরূপ বালভাব হইতে কিশোরভাবে পরিণত হয় তদ্রূপ অলৌকিক শ্রীকৃষ্ণ-দেহ বালভাব হইতে কিশোরভাবে পরিণত হয় না কারণ তাঁহার বালদেহ এবং কিশোর দেহ উভয়ই যুগপৎ বর্তমান এবং উভয়ই নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের বালদেহ পূর্বকালীন এবং তাঁহার কিশোর দেহ পরবর্তীকালের একথা বলা চলে না। গোপালরূপী বালক কৃষ্ণ সহস্রকল্প অতীত হইয়া গেলেও বালকই থাকিবেন, কিশোর বা যুবক হইবেন না। তদ্রূপ অন্যান্যভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে নিত্যবস্তু কালের অধীন নহে এবং ভিন্ন ভিন্ন নিত্যবস্তুতে কালগত কোন সম্বন্ধ নাই। তবে খেলাচ্ছলে যে কোন প্রকার সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া তদনুসারে বৈচিত্র্যের আস্বাদন করা চলিতে পারে।

কিন্তু রহস্যের কথা এই যে শুদ্ধ জ্ঞান দৃষ্টিতে অনিত্যও মূলত নিত্যেরই কালিক প্রকাশ। সুতরাং যাহাকে আমরা জাগতিক ঘটনা বলি অথবা অনিত্য ব্যাপার বলি তাহার মূলেও নিত্য সত্তা রহিয়াছে। জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা যে পূর্ব ও পর বলিয়া বর্ণনা করি তাহা জাগতিক দৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয় হইলেও বস্তুতঃ আপেক্ষিক। যাঁহার শুদ্ধ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে তাঁহার পক্ষে উহা অপরিবর্তনীয় নহে। দেশগত পরত্ব এবং অপরত্বের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে। ক, খ, গ এমনভাবে উপবিষ্ট আছে যে "ক" এর পশ্চিমে "খ" এবং "খ" এর পশ্চিমে "গ" এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই স্থলে 'ক' "খ" এর পূর্বে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'ক' যদি নিজের স্থান পরিবর্তন করিয়া 'গ' স্থানে উপবিষ্ট হয় তাহা হইলে 'ক' কেও "খ" এর পশ্চিমে বলা যাইতে পারে। তদ্রূপ 'গ' যদি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া 'ক' স্থানে উপবিষ্ট হয় তাহা হইলে "গ" কে "খ" এর পূর্ববর্তী বলা যাইতে পারে। এই প্রকার "খ" এর স্বস্থান ত্যাগ এবং স্থানান্তর গ্রহণের ফলেও সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হইয়া যাইবে। অতএব "ক" "খ" ও "গ" এই তিনটিই যদি স্থির বলিয়া ধরা যায় আর যদি ইহাদের স্বস্থান ত্যাগ সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে তাহাদের দেশগত সম্বন্ধ যাহা আছে তাহাই থাকিবে। কিন্তু যদি একটিও স্থির ভাবের পরিবর্তে গতিমত্তা স্বীকার করা যায় তাহা

হইলে সম্বন্ধের পরিবর্তন হইবে। তবে সবগুলি যদি সমরূপে সমবেগে এবং পরস্পরের ব্যবধান রক্ষা করিয়া গতিশীল হয় তাহা হইলে গতিশীলতা সত্ত্বেও সম্বন্ধের পরিবর্তন হইবে না।

দেশগত সম্বন্ধের এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ লোক বুঝিতে পারে। কিন্তু কাল সম্বন্ধে এই প্রকার গতিমত্তার সম্ভাবনা সাধারণ জাগতিক লোকের পক্ষে বিদ্যমান নাই, কারণ সাধারণ লোক স্বীয় স্থিতি পরিহার করিয়া (পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ) স্থিত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না। একমাত্র যোগীর পক্ষেই তাহা সম্ভবপর। তবে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও স্পষ্টীকৃত হইবে। কলিকাতায় যখন সূর্যোদয় ব্রহ্মদেশে তাহার অনেক পূর্বেই সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে কিন্তু কাশীতে তখন সূর্যোদয় হয় নাই। অতএব কলিকাতাবাসীর পক্ষে যেটা উদয়কাল ব্রহ্মবাসীর পক্ষে তাহা পূর্বাহ্ন এবং কাশীবাসীর পক্ষে তাহা শেষরাত্রি। দেশের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক কালের স্ফূর্তি হয় না। উদয়কাল বলিলেই কোন না কোন দেশকে গ্রহণ করিয়াই উদয়কাল বলিতে হইবে।

মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কাল সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। দেশ সম্বন্ধবর্জিত উদয়কাল সম্ভবপর নহে। জাগতিক দেশ গতিশীল বলিয়া তাহার উদয়কাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু নিত্যধামে বাস্তবিক পক্ষে গতি না থাকার দরুণ সেখানকার প্রত্যেকটি কালই নিত্য অর্থাৎ এমন নিত্য দেশ আছে যাহা স্থির বলিয়া সেখানকার উদয়কালও নিত্য। অর্থাৎ সেখান হইতে সর্বদাই নবোদিত ভাবেই দেখা যায়। সেখান হইতে সূর্যের উর্ধ্বগতি অর্থাৎ পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন প্রভৃতিকাল কখনই প্রতীতি-গোচর হয় না। তদ্রূপ এমন দেশ আছে যেখানে সর্বদাই মধ্যাহ্ন, যেখানে পূর্বাহ্ন নাই, অপরাহ্ন নাই, রাত্রিও নাই। নিত্য দেশ অনন্ত। দেশভেদে প্রত্যেকটি কালই নিত্য। কিন্তু অনিত্য জগতে গতিশীলতা আছে বলিয়া ব্যবহারিক কোন কালকেই আমরা নিত্যরূপে প্রাপ্ত হই না। কিন্তু দেশের গতিশীলতার অনুরূপ গতিশীলতা নিজের মধ্যে আরোপ করিতে পারিলে নিত্যকালের আভাস এই জগতে বসিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। নিত্যকালকে নির্বিশেষ বলিয়া মনে করিও না। কারণ নির্বিশেষ কালে উদয়কাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল এইপ্রকার ভেদ থাকে না। আমি সবিশেষ কালের কথাই বলিতেছি। সবিশেষ কালও যে নিত্য ইহার রহস্য একমাত্র যোগীই ভেদ করিতে

পারেন। এই রহস্য ভেদ না করিলে নিত্যলীলার অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। কারণ কূটস্থে লীলা নাই। নির্বিশেষ সত্তাতে লীলা নাই। শক্তিহীন স্বরূপে লীলা নাই। এই লীলা আবিষ্কারই যোগের মহিমা।

সূর্যের উদয়কালে 'ক' নামক দ্রষ্টা কলিকাতায় বর্তমান। তাহার পক্ষে উহা প্রাতঃকাল, ছয় ঘন্টা পরে কলিকাতাস্থ 'ক'র পক্ষে মধ্যাহ্নকাল। কিন্তু ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে তখন প্রাতঃকাল। কিন্তু 'ক' যদি স্বীয় যোগশক্তি প্রভাবে গতিশীল হইয়া মনোবেগে অর্থাৎ বিদ্যুৎ অপেক্ষাও তীব্রতর বেগে ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত হয় তখন সে সূর্যের উদয় দেখিতে পাইবে এবং তাহার পক্ষে তখন প্রাতঃকাল। কলিকাতা হইতে তাহার দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করিতে পারে না বলিয়া সে মধ্যাহ্নকাল অনুভব করে এবং তখন প্রাতঃকাল অনুভব করিতে পারে না। পৃথিবী অথবা সূর্যের অনুরূপ গতি নিজের মধ্যে বিকশিত হইলে যে কোন বিশিষ্ট কালকে — লৌকিক পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই — সর্বদা অনুভব করিতে পারা যায়।

এখানে অনুরূপ গতিশীলতা দ্বারা সবিশেষ কালের নিত্যতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম রহস্য আছে। 'ক' স্বীয় যোগশক্তির দ্বারা ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে বিদ্যুৎ-বেগে উপস্থিত হইবে একথা বলা হইল কিন্তু জগৎব্যাপী সত্তার সহিত "ক" যদি নিজেকে যুক্ত করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে ইউরোপে যাইতে হইবে কেন? কারণ ব্যাপকসত্তা সেখানেও আছে। এবং 'ক' ঐ ব্যাপক সত্তার সহিত যুক্ত বলিয়া ইচ্ছামাত্রই অন্যান্য স্থানের পশ্চিম ইউরোপেও স্ফুরিত হইতে পারে। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে 'ক' প্রাতঃকালের অনুভব করিবে তাহাতে সন্দেহ কি অথচ তাহাকে ইউরোপে যাইতেও হইবে না। এইরূপ অখণ্ড ব্যাপক সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার সবিশেষ কালকেই আস্বাদন করা যাইতে পারে। ব্যাপক সত্তার অংশবিশেষের সহিত দ্রষ্টা বিন্দুর যোগস্থাপনই কোন একটা বিশিষ্ট কালের অনুভূতির মূল।

অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিকালের সহিত সাধারণতঃ সকলেই পরিচিত আছে, কিন্তু বস্তুতঃ এক অনন্ত বর্তমান রূপ মহাকালই আছে — অতীত ও অনাগত অব্যক্তরূপে রহিয়াছে।

বর্তমানের প্রকাশ আবরণ-শূন্য হইলে সর্বদেশ যুগপৎ অভিন্নরূপে স্ফুরিত হয় বলিয়া অতীত ও অনাগত থাকে না। একমাত্র মহা-বর্তমানই বিদ্যমান থাকে। এই মহাবর্তমানই যোগীর ক্ষণ। ইহাকেই সন্ধিক্ষণ বলে। ভূত-ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে উহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। যোগী ভিন্ন কেহই ভূত ও ভবিষ্যত হইতে পৃথক করিয়া এই অন্তরালবর্তী ক্ষণকে গ্রহণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ গ্রহণ সকলেই করে কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারে না।

ক্ষণের সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, পরে বলিব।

জাগতিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মূলে যেমন কাল, ঠিক সেই প্রকার আমাদের জ্ঞানের মূলেও কাল। কালগত সমসূত্রতা না থাকিলে দ্রষ্টা দৃশ্যকে দর্শন করিতে পারে না এবং ভোক্তাও ভোগ্য ভোগ করিতে পারে না। কাল যে আপেক্ষিক ইহা বুঝিতে অধিক সূক্ষ্ম চিন্তার আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং দ্রষ্টা ও দৃশ্য একই আপেক্ষিক কালে বর্তমান থাকিলে দর্শন ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে পারে। দ্রষ্টা শুদ্ধ অবস্থায় সর্বদা বর্তমান কালেই স্থিতি করেন। দৃশ্য বর্তমান থাকিলে, অর্থাৎ অভিব্যক্ত থাকিলে, এবং দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত তাহার সম্বন্ধ হইলে দর্শন নিষ্পন্ন না হইয়া পারে না। দৃশ্য বর্তমান থাকিলে নিত্য বর্তনান দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত তাহার সমসূত্রতা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদৃশ সমসূত্রতা সত্ত্বেও গণ্ডীবদ্ধ দ্রষ্টার পক্ষে দৃশ্য দর্শন না হইতে পারে। এই জন্যই দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত সম্বন্ধ আবশ্যক। নতুবা দ্রষ্টার দৃষ্টিগোচর হইয়াও পূর্বোক্ত দৃশ্য লক্ষীভূত হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টির সম্মুখে মহাসামান্যরূপে দৃশ্য বর্তমান থাকে — তাহার বিশিষ্ট রূপ স্ফুরিত হয় না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে কালের পার্থক্য থাকিলে ঐ দৃশ্য দ্রষ্টার অদৃষ্ট থাকিয়া যায়। কিন্তু যে কোনও প্রকারেই হউক ঐ দৃশ্যের সত্তাকে আভাস-রূপে দ্রষ্টার দৃষ্টির নিকট উপনীত করিতে পারিলে — দৃশ্য বর্তমান হয় বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। দৃশ্য বস্তুতঃ দ্রষ্টার নিকট আসে না, আভাসটাই আসে। পক্ষান্তরে দ্রষ্টা যদি তাহার দৃক্‌শক্তিকে আভাস-রূপে দৃশ্যের নিকট প্রেরণ করিতে পারে তাহা হইলেও দ্রষ্টার আভাস-দৃষ্টিতে আলোকিত হইয়া দ্রষ্টার নিকট দৃশ্যের স্ফুরণ হয়। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকেন এবং তাহার দৃকশক্তিও বর্তমানকে ত্যাগ করে না, তথাপি বিক্ষেপ বৃত্তির সহায়তায় দৃকশক্তির আভাসটা সঞ্চারিত হইতে

পারে। এই উভয়প্রকার আভাসের সঞ্চারের মূলে ঐশী শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, যাহা দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ের অধিষ্ঠাতা।

এই প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম আলোচনার পূর্বে দেশের সহিত কালের সম্বন্ধের আলোচনা করা একটু আবশ্যক। আমরা প্রচলিত ব্যবহারে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই প্রকার যুগভেদ নির্দেশ করিয়া থাকি ইহা কালের অবরোহিণী ধারার নিদর্শন। বিপরীত ক্রমে আরোহিণী ধারাও বুঝিতে হইবে। মনে কর এই অবরোহ ক্রম বুঝিবার জন্য মাত্রাগত ভেদ অনুসরণ করিয়া ১৬, ১৫ ১৪, ১৩ ইত্যাদি ক্রমে আমরা সংখ্যা বিন্যাস করিতেছি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সত্য যুগের আদি বিন্দুতে ষোড়শমাত্রার পূর্ণ প্রকাশ ছিল। এই প্রকাশ ১৬শ হইতে ১৩শ মাত্রা পর্যন্ত সত্যযুগের সীমা বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহা অবশ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টীকরণের জন্য বলা হইতেছে। তদ্রূপ ১২শ মাত্রা হইতে ৯ম মাত্রার অন্তিম অণু পর্যন্ত ত্রেতা বলিয়া পরিগণিত হয়। ৮ম মাত্রা হইতে ৫ম এর নিম্নতম অণু পর্যন্ত দ্বাপর এবং ৪র্থ হইতে শূন্যের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত কলি পদবাচ্য। এই যে কালের স্রোত, ইহা ১৬ হইতে অর্থাৎ পূর্ণ হইতে এক হইয়া শূন্যের দিকে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। কিন্তু কাল আপেক্ষিক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ বর্জন করিয়া এই কালপ্রবাহ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন সূর্য উদয়কাল হইতে পুনরুদয় কাল পর্যন্ত আবর্তিত হইতেছে, এরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, কিন্তু তথাপি সূর্যের উদয়কাল অথবা পূর্বাহ্ন প্রভৃতি অন্য কোনও কালবিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধমূলেই বুঝিতে হইবে। দ্রষ্টা নিরাধার নহে, সে যে আধার অথবা ভূমিকে আশ্রয় করিয়া দৃষ্টি করিতেছে তদনুসারেই উদয়কাল অথবা পূর্বাহ্নকাল প্রভৃতির ব্যবহার সিদ্ধ। কারণ, দ্রষ্টা একভূমিতে থাকিলে যাহা উদয়কাল,- অন্য ভূমিতে থাকিলে তাহাই অস্তকাল হওয়া বিচিত্র নহে। কালের স্রোতের রহস্য বুঝিতে হইলেও বিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ পূর্বেই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যেমন এইখানে যখন সন্ধ্যা তখন অন্যখানে প্রভাতাদি অন্যকাল বর্তমান। তদ্রূপ এইখানে যখন কলিযুগ তখন অন্যখানে সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর, অর্থাৎ অন্য কোন যুগ বর্তমান আছে। অতএব কলি বলিলেই যে সর্বত্রই সমরূপে কলির প্রভাব তাহা নহে। কোন স্থানে এখনও সত্যযুগ,

কোন স্থানে ত্রেতাযুগ এবং কোন স্থানে দ্বাপরযুগ চলিতেছে। কলি-যুগের মধ্যেও অবান্তর ভেদ বুঝিতে হইবে। এই বিশাল জগতের মধ্যে এমন স্থান আছে যেখানে এখন সত্য অথবা ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগ চলিতেছে অর্থাৎ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগ রহিয়াছে। সেজন্য এক যুগের লোক অন্য যুগের সন্ধান পায় না এবং যে সব স্থানে ঐ সকল যুগ ক্রিয়া করিতেছে সে সকল স্থানেরও সন্ধান পায় না। এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছিলাম — দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ে কালগত সমসূত্রতা না থাকিলে দর্শন হয়।

উপরে লিখিত বিবরণ হইতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা আরও বুঝিতে পারা যাইবে যে আধারগত ভেদ অথবা বৈচিত্র্য শুধু দেশেই নিবদ্ধ নহে — ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের দেহই তাহার কর্মভূমি। একই স্থানে, একই দেশে, নগরে অথবা গ্রামে দুইটি লোক ঠিক এক কালে বাস করে না। উভয়ের মধ্যে কালগত বৈষম্য থাকে। এইজন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রত্যেক ব্যক্তিই রহস্যময়। উভয়ের পরস্পর ব্যবধান কালসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিরোহিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভোগগত সমসূত্র-তার কথা পরে আলোচনা করিব।

কালতত্ত্ব

কাল সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বিবেচ্য। কাল বস্তুতঃ এক হইলেও দৃষ্টি ও অবস্থাভেদে তাহার ব্যবহারগত ভেদ অঙ্গীকার করা আবশ্যক। যে কাল পরপ্রমাতার দিক হইতে তাঁহার বিশ্বাভাসকারিণী ক্রিয়াশক্তি, তাহাই আবার মিতপ্রমাতা বা মায়াপ্রমাতার দিক্ হইতে তাঁহার স্বরূপ-আচ্ছাদক স্বেচ্ছাগৃহীত কঞ্চুকবিশেষ। প্রথমটি পরশিবের সহিত অভিন্ন ও তাঁহারই স্বভাবভূত, কারণ জ্ঞানক্রিয়াত্মক স্বাতন্ত্র্য বা বিমর্শই তাহার স্বভাব। প্রথমোক্ত কাল এই ক্রিয়ারই স্বরূপবিশেষ। ইহা সকল তত্ত্বের পরম রূপ, কারণ ক্রিয়াশক্তি হইতেই সংবিদের বহিরুন্মেষ হয়। বলা বাহুল্য, এই বাহ্য উন্মেষই বিশ্বের আভাসন। তাই কালকে ঈশ্বররূপ বলা হয়। বিশ্বকলনই শক্তির ক্রিয়াত্মক বহির্মুখ রূপ, তবে বহির্মুখ হইলেও ইহা স্বাত্মবিশ্রান্ত, কারণ বিশ্বাভাস 'ইদমহং' এই প্রতীতিকে অতিক্রম করিয়া উদিত হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়া অভিন্ন বলিয়া শক্তির ক্রিয়াত্মক রূপ বা বিশ্ব উহার জ্ঞানাত্মক বা আত্মা হইতে অভিন্ন। পরমাত্মার এই ঐশ্বররূপতা বা ক্রিয়াখ্য কালশক্তিই মায়াপ্রমাতাতে কালতত্ত্ব। শুধু ইহাই নহে, শিব হইতে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত পরমাত্মার তত্তৎ স্বরূপই পুরুষের আবরণকারী মায়াদি রাগান্ত তত্তৎ কঞ্চুকরূপে প্রকাশমান। মলরহিত পরশিবে যাহা ক্রিয়া বা কালশক্তি, মলিন পুরুষে তাহাই কালতত্ত্ব। অতএব কালকে মায়ীয় মলের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিলে উহাকে কালতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ইহা সত্য যে কঞ্চুককেও শক্তি বলা যায়, কারণ উহা মায়ার বিভূতি। সেইজন্য মহার্থমঞ্জরীতে (কারিকা ১৮) 'পঞ্চশক্তয়ঃ' বলিয়া কঞ্চুক পাঁচটির বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার বিমর্শিনীর কথাও এইজন্য প্রামাণিক। পরমাত্মায় যাহা স্বাতন্ত্র্যশক্তি তাহাই তন্ত্রবিধায়িনী পাশশক্তি।

কাশ্মীরীয় শৈবাচার্যগণ দেখাইয়াছেন যে দেশ ও কাল এই উভয় আখ্যাই সামান্যস্পন্দাত্মক প্রাণে বা ভগবানের ক্রিয়াশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে কালাধ্বা উহার পূর্বভাগে এবং দেশাধ্বা উহার উত্তরভাগে

অবস্থিত। দেশাধ্বার বিভাগ মূর্তিবৈচিত্র্যের দ্বারা এবং কালাধ্বার বিভাগ ক্রিয়াবৈচিত্র্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মূর্তিবৈচিত্র্য হইতে দেশক্রম এবং ক্রিয়াবৈচিত্র্য হইতে কালক্রমের আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাবের কর্তা ঈশ্বর। অমূর্ত, সর্বগ ও নিষ্ক্রিয় সংবিদের মূর্তি ও ক্রিয়ারূপে অবভাসই দেশ ও কাল অধ্বা। এই কাল যে ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্ত্যাত্মক রূপ কালতত্ত্ব নহে তাহা অভিনবগুপ্ত তন্ত্রালোকের ষষ্ঠ আহ্নিকে আলোচনা করিয়াছেন। শৈবাচার্যগণ যেমন মূর্তি ও ক্রিয়াবৈচিত্র্য নিবন্ধন দেশ ও কালাধ্বার বর্ণনা করিয়াছেন, কতকটা সেইভাবের বিবরণ ভর্তৃহরির সম্পদায়েও যে না আছে তাহা নহে। তবে বৈয়াকরণদের প্রস্থান অবশ্য পৃথক।

পরমেশ্বরস্থিত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিই তাহার ঐশ্বর্য বা স্বাতন্ত্র্যরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়। ভেদোন্মেষের অভাবে তাঁহার স্বাভাবিক প্রাণশক্তিই সদাশিব এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তিই ঈশ্বর। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা মতেও ক্রিয়াশক্তি যে স্বাতন্ত্র্যরূপ, তাহা নিঃসন্দেহ।

———

পরম পথের ক্রম

এক

রুচি, পূর্বসংস্কার, অধিকার-সম্পৎ প্রভৃতির বিচিত্রতাবশতঃ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ও নানা প্রকার হইয়া থাকে — কোন পথ অপেক্ষাকৃত সরল হয়, কোন পথ কুটিল ও দীর্ঘ হয়। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং মহাজনগণের ব্যক্তিগত অনুভবের দ্বারা সমর্থিত। এইজন্য সাধনশাস্ত্রে জিজ্ঞাসু কর্মিগণের বোধসৌকর্যের জন্য পরমার্থ-লাভের যাবতীয় উপায়কে স্থূলতঃ তিন বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আধারগত বৈশিষ্ট্য থাকে বলিয়া একই প্রকার সাধন-পদ্ধতি সকলের পক্ষে উপযোগী হয় না।

যাঁহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহাদের জন্য যে উপায়ের বিধান আছে, তাহার নাম শাম্ভব উপায়। হৃদয়ে চিত্তকে নিহিত করিয়া ও স্বীয় স্থিতির প্রতিবন্ধক বিকল্পসমূহকে চিন্তাশূন্যতার প্রভাবে প্রশান্ত করিয়া অবিকল্প পরামর্শ দ্বারা দেহাদি কলুষাস্পৃষ্ট নিজাত্মার চিৎপ্রমাতৃভাব পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিতে হয়। তাহার ফলে অবিলম্বে তুরীয় ও তুরীয়াতীত দশার বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে বিকল্প ত্যাগ সিদ্ধ হইলে একাগ্রতার বলে ক্রমশঃ ঈশ্বরভাবের প্রাপ্তি ঘটে। ক্ষোভের লয় হইলে পরমপদ আপনিই খুলিয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞানগর্ভস্তোত্রে মহাশক্তি বিশ্বজননীকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্রেষ্ঠ প্রণালীর ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঃ—

বিহায় সকলাঃ ক্রিয়া জননী মানসীঃ সর্বতো,
বিমুক্তকরণক্রিয়ানুসৃতিপারতন্ত্র্যোজ্জ্বলম্।
স্থিতৈস্ত্বদনুভাবতঃ সপদি বেদ্যতে সা পরা
দশা নৃভিরতন্দ্রিতাসমসুখামৃতস্যন্দিনী ॥

অর্থাৎ হে মাতঃ, শ্রেষ্ঠ সাধকগণ মনের যাবতীয় ক্রিয়া পরিহার-পূর্বক স্থিত হইয়া অচিরকালের মধ্যে তোমার অনুগ্রহবশতঃ একটি পরম দশার অনুভূতি লাভ করেন যাহা সকল প্রকার ক্রিয়াকরণের অনুসরণের পারতন্ত্র্য হইতে মুক্ত বলিয়া উজ্জ্বল, অথচ যাহা হইতে অনুপম আনন্দরূপ অমৃত অবিচ্ছিন্নভাবে ক্ষরিত হইতে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে আছে — 'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' ইহাই শাম্ভব উপায়ের উপদেশ সম্বন্ধে দিগ্দর্শন বুঝিতে হইবে।

ইহা হইতেও যে সাধক শ্রেষ্ঠাধিকার সম্পন্ন অর্থাৎ পরমেশ্বরের তীব্রতম অনুগ্রহ শক্তির সঞ্চার যাঁহার উপর রহিয়াছে, তিনি একবার মাত্র গুরুমুখ হইতে আত্মস্বরূপের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ হইতেই আত্মস্বরূপ-সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় লাভ করেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে লৌকিক অথবা অলৌকিক কোন উপায়েই শিবরূপী নিত্য সিদ্ধ স্বয়ং-প্রকাশ আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এমন কি, আত্মার আবরণ নাই বলিয়া উহার দ্বারা আবরণ নিবৃত্তিরও কোন প্রশ্ন উঠে না। একমাত্র আত্মাই সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন বলিয়া দ্বিতীয় সত্তার অভাববশতঃ আত্মস্বরূপে অনুপ্রবেশেরও কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পান, সমগ্র বিশ্ব এক চিদ্রূপিণী মহা-সত্তার প্রকাশ — ঐ সত্তা দেশ, কাল, উপাধি কিংবা আকৃতির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে — শব্দ দ্বারা উহাকে নির্দেশ করা চলে না এবং প্রমাণ দ্বারাও উহাকে ব্যক্ত করা যায় না — উহা স্বাতন্ত্র্যময় পরম তত্ত্ব — উহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ, যাহাতে সমগ্র জগৎ দর্পণে প্রতিবিম্বিত দৃশ্যের ন্যায় প্রতিভাসমান হইয়া থাকে। চিত্তে এইরূপ বিবেকের উদয় হইলে স্বপ্রকাশ শিবভাবের আবেশ ক্ষণমাত্রেই সিদ্ধ হয়। এই-রূপ সাধকের মন্ত্র, পূজা, ধ্যান, চর্য্যা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয় না।

পূর্বে যে উত্তম সাধকের শাম্ভব উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার যোগত্যা উৎকৃষ্ট হইলেও এই প্রকার বিরল সাধকের যোগ্যতা হইতে কিছু ন্যূন বলিতেই হইবে। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে অখণ্ড-মণ্ডলাকার মহাপ্রকাশময় আত্মস্বরূপে প্রবেশলাভের জন্য কিছু সাহায্য আবশ্যক হয়। এই সাহায্য উত্তম সাধক নিজের স্বাতন্ত্র্য-শক্তি হইতেই সমুচিত ভাবে পাইয়া থাকেন এবং ইহার প্রভাবে তিনি নির্বিকল্প শিবভাবে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হন। তখন তিনি নিজের আত্মাতে সমগ্র জগৎকে নিজের বিমর্শরূপে ভাসমান দেখিতে পান। এই প্রকার সাধকের জন্যও মন্ত্র, পূজা, ধ্যন প্রভৃতির অভ্যাস নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু মধ্যমাধিকারসম্পন্ন সাধক ইহা হইতে নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাঁহার পক্ষে সৎ-তর্ক, সদাগম ও সদ্গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া

ভাবনাবলে ক্রমশঃ বিকল্পের সংস্কার-কার্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। অত্যুত্তম ও উত্তম অধিকারীর স্বরূপজ্ঞান লাভে ক্রম থাকে না — উহা ক্রম-বিরহিত-ভাবে একক্ষণের মধ্যেই নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু মধ্যম ও অধমাধিকারীর সিদ্ধিলাভ ক্রমাধীন। তবে মধ্যম সাধকের পক্ষে বিকল্প অন্য কোন উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজে হইতেই নিজের সংস্কার সাধন করে, অর্থাৎ বিকল্প আপনা আপনিই শুদ্ধ হইয়া গুণান্তর উৎপাদন করে। এইজন্য ঐ বিকল্প তখন আর বদ্ধজীবের চিত্ত-ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না — উহা শুদ্ধ বিদ্যার অনুগ্রহে সাক্ষাৎ ভগবচ্ছক্তিরূপে পরিণত হয় ও ভগবৎপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে শাক্ত জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। বিরুদ্ধ অন্য বিকল্পের উদয় না হইলে শাক্ত উপায়ের দ্বারাই বিকল্পের শোধন সম্ভবপর হয় এবং বিকল্প শুদ্ধ হইয়া অবিকল্প স্বরূপে পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু যখন বিকল্প নিজেকে নিজে শুদ্ধ করিতে পারে না এবং আত্মশোধনের জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তখন বুঝিতে হইবে ঐ সাধক অধমশ্রেণীর অন্তর্গত। এইস্থলে গণ্ডীবদ্ধ পরিমিত জড়সত্তার সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয়। এই পরিমিত সত্তা বুদ্ধি হইতে পারে, প্রাণ হইতে পারে অথবা দেহ কিংবা বাহ্য পদার্থের মধ্যে যে কোন বস্তুও হইতে পারে। ইহা সাধকের ব্যক্তিগত স্থিতির উপর নির্ভর করে। অধম সাধকের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া বিকল্প-শুদ্ধির কার্যে অগ্রসর হন, তাঁহা-দিগকে ধ্যানমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। ধ্যানের স্বরূপ ও প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রাণকে আশ্রয় করিয়া বিকল্পের সংস্কার করিতে উদ্যত হন তাঁহাদিগকে উহার অনুরূপ মার্গে চলিতে হয়। স্থূল প্রাণের প্রাণাদি যে সকল বৃত্তি আছে তাহাদিগকে সামূহিক ভাবে 'উচ্চারণ' বলা হইয়া থাকে। উহা প্রাণের ক্রিয়ারই নামান্তর। সূক্ষ্ম প্রাণ বর্ণাত্মক — উহারও উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু উহার আলোচনাও বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। যে সকল অধম সাধক আপন আপন দেহকে আশ্রয় করিয়া সাধনপথে চলিতে থাকেন, তাঁহাদিগকে অনেক রকম আসন, বন্ধ, মুদ্রা, করণ প্রভৃতির অবলম্বন করিয়া বিকল্পের সংস্কার করিতে হয়। অধমশ্রেণীর মধ্যে এমন সাধকও আছেন যাঁহাদিগের

অধিকার এত স্বল্প যে তাঁহারা স্বচ্ছন্দভাবে নিজের দেহকেও আশ্রয় করিতে পারেন না। তাঁহারা বাহ্য পদার্থ অবলম্বন করিয়া উপাসনা পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। এই সকল বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা যথাসময়ে তাঁহাদের আণবজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

দুই

পূর্বে যে সব উপায়ের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে যে কোন উপায়ে অভ্যাসাত্মক ভাবনা দ্বারা উচ্চারণ করণ প্রভৃতি দেহগত উপায়ের সাহায্যে যে সাধক পূর্ণতত্ত্বে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থা বা ভাবের লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইচ্ছা করিলেই যে এই অবস্থার লাভ হয়, তাহা বলা যায় না। তবে যোগ্যতা লাভের পর যদি সাধকের ইচ্ছার উদয় হয়, এবং তখন পূর্ণত্বের স্পর্শ বা উন্মুখতা ঘটে, তাহা হইলে এই সকল লক্ষণ আত্ম-প্রকাশ করে। পূর্ণের কিঞ্চিৎ আভাসেই এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পূর্ণের সমগ্র আবেশ হইলে ত কথাই নাই — তখন পূর্ণত্বেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

পূর্ণের স্পর্শ মাত্রে হৃদয়ে প্রথমে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের উল্লাস জাগিয়া উঠে। স্বীয় আত্মার সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একটি অপূর্ব চমৎকারময় অবস্থার উদয় হয়, যাহাকে 'আনন্দ' না বলিয়া অন্য ভাবে বর্ণনা করা চলে না। তাহার পর বিদ্যুৎপাত হইলে যেমন সকল বস্তু নিজ নিজ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া তন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ পরমতত্ত্বে একটি মাত্র ক্ষণের জন্য সমাবেশ হইলে দেহাদিতে যে আত্ম-বোধ এতদিন ছিল, তাহা বিগলিত হয় ও চিরন্তন বদ্ধাবস্থা কাটিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পরমধামের দিকে অধিরোহণ রূপ একটি ঊর্ধ্ব-গতির সূচনা হয়। ইহাকেই 'উদ্ভব' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা দেহবর্জিত অথবা দেহাতীত ভাব ভিন্ন অপর কিছু নহে। ক্ষণমাত্রের সমাবেশই এই অবস্থার উদয়ের জন্য পর্যাপ্ত। দীর্ঘকালীন সমাবেশের ফলে পূর্ণত্বের সর্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে।

দেহ ও চৈতন্যরূপী আত্মা বা সংবিৎ স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও অনাদি কালের অভ্যাসবশতঃ পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতেই অভিন্নরূপে প্রতীত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা যে কত জন্মের দৃঢ় অধ্যাসের ফল, তাহা বলা যায় না। পূর্বোক্ত উদ্ভবাবস্থার উদয় হইলে

আত্মা ও দেহে এই একত্ববোধ আর থাকে না। তখন ইহারা যে পৃথক্ তত্ত্ব, এই জ্ঞান উদ্ভূত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহারই নাম বিবেক জ্ঞান।

ইহার পর একটি ক্ষণের জন্য চৈতন্যরূপী আত্মার নিজস্বরূপের বল প্রকাশিত হয়। ইহাই মহাবীর্যস্বরূপ অহংতা। দেহ বা জড় সত্তা হইতে আত্মা বিবিক্ত হইলে তাহার নিজ বল প্রকট না হইয়া পারে না। এতদিন অনাত্মবস্তুতে 'অহম্'-অভিমান ছিল, এখন বিবেক লাভের পর আত্মস্বরূপে 'অহম্'-অভিমান উদিত হইয়াছে। তাই ইহার প্রভাবে অনাত্মাতে আত্মাভিমান শিথিল হয়। তখন দেহাদি বিনশ্বর বলিয়া কম্পিত হইতে থাকে এবং এতদিন তাহাদের মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল তাহা শিথিল হইয়া আসে। এই অবস্থাটির পারিভাষিক নাম — 'কম্প।'

এইভাবে এতদিন চৈতন্যের সহিত দেহের যে ঐক্যাভিনিবেশ ছিল তাহা নিবৃত্ত হইবার পরে চৈতন্যের উন্মুখতা মাত্রের প্রভাবে এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে নিদ্রার সহিত উপমিত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন বাহ্য বৃত্তির উপরম হয় এবং চিত্তে কোন আন্তরানুভব স্ফুটভাবে থাকে না। তাই এই অবস্থাটি সাধারণতঃ 'নিদ্রা' রূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। আত্মস্বরূপে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিতে থাকে — প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য অবস্থার উদয় হয় এবং ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বস্তুতঃ পরমচৈতন্য স্বরূপ সত্যপদে অধিষ্ঠান। ইহা সম্পন্ন হইলে একটি অভিনব সাক্ষাৎকার জন্মে। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বরূপই চৈতন্য। কোন পদার্থই চৈতন্য হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক নহে। এইরূপে সর্বত্র চৈতন্যের সাক্ষাৎকারের ফলে একটি মহাদশার উদয় হয় যাহাকে আগম শাস্ত্রে 'ঘূর্ণি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা স্পন্দরূপা মহাশক্তিময়ী পূর্ণাবস্থার উপলব্ধি। এই অবস্থাটিকে অনেক স্থানে 'মহাব্যাপ্তি' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় অধিষ্ঠিত হইয়া যোগী সর্বদা সৃষ্টি-সংহার কার্যে নিরত হন বলিয়া পরমৈশ্বর্য লাভ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম পরম-শিব অথবা পূর্ণ পরমেশ্বরাবস্থা।

অনেকে মনে করেন যে দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমান বন্ধন, কিন্তু ইহা সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে। আত্মাতে আত্মাভিমান

উদিত হইবার পর যদি অনাত্মাতে আত্মাভিমান জাগে, তবেই উহা প্রকৃত বন্ধন-পদ-বাচ্য হয়, নতুবা নহে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বন্ধনের লয়ই প্রস্তুত মুক্তি। তাই বন্ধন দুই প্রকার — আত্মাতে আত্মাভিমান ও অনাত্মাতে আত্মাভিমান। সেইজন্য সৃষ্টির আদিতে যখন পরমেশ্বর আপন স্বাতন্ত্র্যবলে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া অণুরূপী 'পশু' সাজেন, তখন তাঁহার ঐ আণব আবরণরূপ সঙ্কোচের মধ্যে দুইটি দিক্ স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয় — অর্থাৎ পশুভাবের মধ্যেই দুইটি দিক্ ফুটিয়া উঠে। তন্মধ্যে একটিতে চিদাত্মক বোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাই পরমেশ্বরের স্বরূপ। কিন্তু বোধ থাকিলেও বোধের অনুগামী স্বাতন্ত্র্যশক্তি থাকে না। ইহা নিষ্ক্রিয় বোধরূপী চিদণু। ইহা যে পশুরই অবস্থা, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই জাতীয় পশুতে কর্মজ সংস্কার ও মলিন মায়ার আবরণ থাকে না, শুধু বিশুদ্ধ মায়া বা মহামায়ার আবরণ থাকে। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ থাকে না বলিয়া বোধস্বরূপ হইয়াও ইহারা পশু, শিব-পদ বাচ্য নহেন। ভগবৎসাধর্ম্য-বোধ ইহাদের থাকে না। দ্বিতীয় প্রকার পশু ইহা হইতে ভিন্ন — এই সকল পশুতে স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু বোধ থাকে না। এইটি জড়াবস্থা। এই সকল বোধহীন ক্রিয়াশীল অণু মায়াগর্ভে কর্মজ সংস্কারে জড়িত হইয়া নিদ্রিত থাকে। কালপ্রভাবে মায়িক সৃষ্টির উন্মেষের সময় ইহারা মায়িক দেহ প্রাপ্ত হইয়া কর্মসংস্কার অনুরূপ ফলভোগের জন্য ভোগায়তন দেহ প্রাপ্ত হয় ও চতুর্দশ ভুবনাত্মক সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে।

অতএব এই দুই প্রকার পশুভাব হইতেই কর্মাবরণ ও মায়াবরণ অভিব্যক্ত হয় জানিতে হইবে।

সুতরাং বন্ধনের লয়ক্রম এই প্রকার ঃ—

(১) প্রথমে দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমানের লয়।

২। তাহার পর চৈতন্যরূপী স্বাত্মাতে অভিমানের উদয়। ইহারই নাম আত্মশক্তির উন্মেষ।

৩। তাহার পর আত্মাতে অনাত্মাভিমানের নাশ।

৪। পরিশেষে মহাব্যাপ্তি বা পরমৈশ্বর্য্য।

অতএব প্রথমে পূর্ণের স্পর্শবশতঃ আনন্দের অনুভব হইলেই যে দুই প্রকার বন্ধের নিবৃত্তি হয়, তাহা সত্য নহে।

হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভক্তিমার্গে শক্তির সত্তা স্বীকার করা আবশ্যক। শক্তির বিশুদ্ধ ও নির্মল স্বরূপ স্বীকার না করিলে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সমস্তই অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া হেয় হইয়া পড়ে; ভক্তি, করুণা, কর্ম প্রভৃতির উৎস শুষ্ক হইয়া যায়। শৈব, বৈষ্ণব কিংবা শাক্ত আগমে যে অদ্বৈতবাদ আছে তাহা ভক্তি-সাধনার কিংবা রসাস্বাদনের পরিপন্থী নহে, কারণ তাহা শক্তিত্যাগমূলক নহে, শক্তিগ্রহণমূলক। মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়েও এই জন্য প্রজ্ঞাপারমিতার সত্তা অঙ্গীকার করিয়া বোধিসত্ত্ববাদের ভিত্তি-পত্তন হইয়াছে। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ শক্তি ও শক্তিমানের সমন্বয়মূলক। উভয়ের সমবায় বা অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্যগণ শক্তির নিষ্ক্রিয় কিংবা অব্যক্ত অবস্থাতেও সত্তা মানিয়া লইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবানের সঙ্কল্পবশতঃ তাঁহাতে বিলীন মহাশক্তি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুদ্দামের প্রকাশের ন্যায়, উন্মেষ লাভ করে। অব্যক্ত-দশাতে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ থাকিলেও তাহার প্রতীতি থাকে না। ইহাকে একপ্রকার নির্বাত স্পন্দনরহিত নির্বাণাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যে সঙ্কল্পনিবন্ধন প্রসুপ্তা মহাশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয় তাহা ভগবানের অনির্বচনীয় স্বাতন্ত্র্য। ইহা তাঁহার স্বভাব। এই উদ্বোধন-কালে লেশমাত্র শক্তিরই উন্মেষ হইয়া থাকে, বাকী সমগ্র শক্তিই অব্যক্ত থাকিয়া যায়। অভিব্যক্ত শক্তি ক্রিয়া এবং ভূতিভেদে দ্বিবিধ। ক্রিয়াশক্তিকে অহির্বুধ্ন্যসংহিতাতে সৌদর্শনী কলা বলিয়া নির্বচন করা হইয়াছে। ইহা নিষ্কল এবং প্রাণাত্মক। ভূতিশক্তি সকল এবং নানাপ্রকার ভেদসম্পন্ন। ক্রিয়াশক্তির তুলনায় ভূতিশক্তি অতি ক্ষুদ্র। ভূতির পরিবর্তনাদি সকল ব্যাপারই ক্রিয়াসাপেক্ষ। এই ক্রিয়াশক্তিই সৃষ্টিকালে মূলা প্রকৃতিতে পরিণামসামর্থ্য, কালে কলনসামর্থ্য এবং আত্মায় ভোগসামর্থ্য সঞ্চার করে, এবং সংহারকালে ঐ সকল সামর্থ্য প্রত্যাকর্ষণ করে।

শক্তির বিকাস এবং সঙ্কোচ পর্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। তাই সৃষ্টির পরে প্রলয়, এবং তদনন্তর পুনঃসৃষ্টি স্বভাবের নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টি শুদ্ধ, মিশ্র এবং অশুদ্ধভেদে তিন প্রকার। কাশ্মীরাগমে ও ত্রিপুরাসাহিত্যেও এই প্রকার ত্রিবিধ অধ্বা স্বীকৃত হইয়াছে। শুদ্ধ সৃষ্টির নামান্তর গুণোন্মেষদশা। এই সময়ে

ভগবানের অপ্রাকৃত ষড়্গুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সকল গুণের সদ্ভাববশতঃ ভগবান্ প্রাকৃতিক গুণত্রয়বর্জিত হইয়াও অর্থাৎ তথাকথিত নির্গুণাবস্থাতেও নিত্য সগুণ। জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য এবং তেজের সমষ্টি তাঁহাতে সদা বর্তমান, তাই বৈষ্ণবাগমে বহু স্থানে তাঁহাকে ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ এবং ধর্ম, অন্যান্য গুণ কেবলই ধর্ম, স্বরূপ নহে। ইচ্ছাশক্তিই ঐশ্বর্য। অবাধিত ইচ্ছার নাম ইচ্ছাশক্তি। ভগবদিচ্ছার প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, তাই তিনি ঐশ্বর্যময় বা ঈশ্বর। জগতের প্রকৃতিভাব বা উপাদানকে শক্তি বলে। ভগবৎসৃষ্টি বাহ্য উপাদান-সাপেক্ষ নহে। ভগবান্ জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান একাধারে উভয়ই। বল শ্রমের অভাব। বীর্য বিকাররাহিত্য। সাধারণতঃ দেখা যায় দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হয়, — প্রকৃতি বিকৃত না হইয়া পরিণামলাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবৎ-সামর্থ্য অচিন্ত্য — তিনি জগৎ প্রসব করিয়াও নির্বিকারভাবেই বর্তমান থাকেন। তেজঃ সহকারিনিরপেক্ষতা। এই ছয়টি গুণের মধ্যে জ্ঞানাদি প্রথম তিনটি বিশ্রামভূমি এবং বলাদি গুণত্রয় শ্রমভূমি বলিয়া কথিত হয়। এই গুণসমুদায়ের মিলিতরূপই ভগবানের ও লক্ষ্মীর মূর্তি। পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠনিবাসী মুক্ত আত্মগণ এই রূপ সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

ষাড়্গুণ্যযুক্ত অথচ শক্তি হইতে পৃথগ্ভূত ভগবানই বাসুদেব। বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদি তিনটি ব্যূহের ক্রমশঃ আবির্ভাব হয়। একটি প্রদীপ হইতে অপর একটি প্রদীপ যে প্রকারে প্রজ্বলিত হয় একটি ব্যূহ হইতে অপর একটি ব্যূহও সেই প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জ্ঞান ও বল সঙ্কর্ষণে, ঐশ্বর্য ও বীর্য প্রদ্যুম্নে, শক্তি ও তেজঃ অনিরুদ্ধে প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গুণ গৌণভাবে থাকে। সঙ্কর্ষণ হইতে অনিরুদ্ধ পর্যন্ত ব্যূহের আবির্ভাবকালকে শুদ্ধ সৃষ্টির কাল বলিয়া ধরিতে পারা যায়। শুদ্ধসৃষ্টির প্রলয়কালও ঐ পরিমাণে বুঝিতে হইবে।[৪]

সঙ্কর্ষণ হইতেই সমস্ত বিশ্ব প্রকটিত হয়। কথিত আছে যে, সঙ্কর্ষণের দেহে সমগ্র বিশ্ব তিলকালকবৎ বীজভূত হইয়া এক ক্ষুদ্র অংশে বর্তমান। সঙ্কর্ষণ অনন্ত ভুবনসমূহের আধার বলদেবের স্বরূপ। প্রদ্যুম্ন হইতে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ অভিব্যক্ত হয়। ইনি

ঐশ্বর্যযোগে মানবসর্গ ও বিদ্যাসর্গ বিস্তার করেন। সমষ্টি পুরুষ, মূলা প্রকৃতি এবং সূক্ষ্ম কাল এই ব্যূহ হইতেই প্রকাশিত হয়। অনিরুদ্ধ হইতে ব্যক্তজগৎ, স্থূল কাল এবং মিশ্র সৃষ্টি উদ্‌ভূত হয়। তিনি আপন শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও তদন্তর্গত বিষয়রাজি নিয়মিত করেন। ব্যূহাদি কার্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু মতভেদ আছে।

ভগবানের পরমরূপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী বা শ্রী। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা প্রভৃতি কোন কোন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে পরাশক্তির এই একরূপই স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে শ্রী এবং ভূ এই দুই শক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। পাদ্মতন্ত্র, পরমেশ্বরসংহিতা প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। বিহগেন্দ্রসংহিতা প্রভৃতি সংহিতানুসারে শক্তি ত্রিবিধ — শ্রী, ভূ ও লীলা (বা নীলা)। সীতোপনিষদে এই বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। শক্তিত্রয়বাদিগণ বলেন যে, শ্রী কল্যাণবাচক এবং ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ, ভূ প্রভাবদ্যোতক ও ক্রিয়াশক্তিরূপা এবং লীলা চন্দ্রসূর্যাগ্নিময়ী সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপা।

পরব্যোমে নিত্য এবং মুক্ত, এই দ্বিবিধ জীবের আবাস। নিত্যজীবগণ সদামুক্ত, ইঁহাদের সংসারস্পর্শ কখনও হয় নাই। বৈদিক

৪। ব্যূহশক্তির সৃষ্টিপ্রণালী মহাসনৎকুমারসংহিতাতে এই প্রকার আছে :—

বাসুদেব
|
শ্বেতবর্ণা শান্তি দেবী (ভগবানের মনোজন্যা)
=সঙ্কর্ষণ (উভয়কে একত্র শিবতত্ত্ব বলে)
|
রক্তবর্ণা শ্রী (সঙ্কর্ষণের বামপার্শ্বজাতা)
=প্রদ্যুম্ন (বা ব্রহ্মা)
|
পীতা সরস্বতী
=অনিরুদ্ধ (উভয়ে একত্রে পুরুষোত্তম)
|
কৃষ্ণবর্ণা রতি। ইনি ত্রিবিধ মায়াকোশ।

এই সৃষ্টি বহিরণ্ডজ, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-সংসৃষ্ট শিবাদি হইতে এই শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পৃথক্ তত্ত্ব।

সাহিত্যে অনেক স্থলে 'সুরি' শব্দে ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইঁহারা সর্বজ্ঞ এবং ভগবানের সেবক। ইঁহাদের সেবাধিকারের বৈশিষ্ট্য ভগবানের নিত্য-ইচ্ছানুসারে অনাদিকাল হইতে ব্যবস্থিত আছে। এতন্মধ্যে চণ্ড, প্রচণ্ড, ভদ্র, সুভদ্র প্রভৃতি বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন প্রভৃতি নগরপাল, অনন্ত বা শেষ ভগবানের শয্যা, গরুড় তাঁহার বাহন এবং বিষ্বক্‌সেন তাঁহার মন্ত্রণা-সহায়ক। ভগবানের পার্ষদগণ নিত্যজীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা জগতে যথেষ্ট অবতীর্ণ হইতে পারেন। মুক্তজীবগণ জ্ঞানানন্দময়, কোটিরশ্মিবিভূষিত ত্রসরেণুর ন্যায় পরব্যোমে বিরাজ করেন। ইঁহারা ভগবানের পার্ষদ বা অধিকারিমণ্ডল হইতে পৃথগ্‌ভূত। মুক্তগণের প্রাকৃত দেহ নাই বটে, তবে অপ্রাকৃতদেহ গ্রহণপূর্বক তাঁহারা ইচ্ছানুসারে জগতে বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু জগতের কোন ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ভগবৎসেবাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

বৈকুণ্ঠধাম যে প্রকৃতির উর্ধ্বদেশে অবস্থিত, বিশুদ্ধসত্ত্বময়, শক্তি-সমন্বিত পরম পুরুষের ক্রীড়াভূমি, তাহা নিম্নলিখিত পাঞ্চরাত্রবচন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় —

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যং ষাড়্‌গুণ্যসংযুতম্।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতম্ ॥
নিত্যমুক্তৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভাপ্রমোদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভৈঃ ॥
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষখণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
অপ্রাকৃতসুরৈর্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভম্ ॥
প্রকৃষ্টসত্ত্বরাশিং ত্বাং কদা দ্রক্ষ্যামি চক্ষুষা।
ক্রীড়ন্তং রময়া সার্ধং লীলাভূমিষু কেশব ॥

রামানুজাচার্য তাঁহার গদ্যত্রয়ান্তর্গত "শ্রীবৈকুণ্ঠ গদ্য" নামক নিবন্ধে বৈকুণ্ঠের অপূর্ব মনোহর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

আমরা অতি সংক্ষেপে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের ব্যূহ ও শুদ্ধসৃষ্টি-প্রণালী বিষয়ে দুই একটি কথা বলিলাম। এখন সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্থূলভাবে কিছু আলোচনা করিব। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী ও ব্রহ্মসম্প্রদায় শক্তি ও শক্তিমান্‌কে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্বার্কসম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের উপাসক — বিষ্ণুস্বামীর

সম্প্রদায়ও তাই। শ্রীচৈতন্যদেব যদিও মাধ্বীয় গুরুর শিষ্য ছিলেন, তথাপি তিনি রাধাকৃষ্ণেরই প্রাধান্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাঞ্চ-রাত্রে সাধারণতঃ বিষ্ণু-লক্ষ্মীর উপাসনাই কীর্তিত হইয়াছে। তবে রাধাকৃষ্ণের প্রাধান্য কিংবা বৃন্দাবন-লীলার মহত্ব যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। নারদ-পাঞ্চরাত্রে রাধার কথা পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের জ্ঞানামৃতসার নামক অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও ডাক্তার ভাণ্ডারকর এবং তদনুসরণে ডাক্তার শ্রেডার নারদ-পাঞ্চরাত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি উক্ত গ্রন্থ যে অত্যন্ত অর্বাচীন তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ হইতে যে ব্রহ্মসংহিতা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা যে প্রাচীন ও প্রমাণিক গ্রন্থ তাহা নিঃসংশয়। তাহাতেও বৃন্দাবন-তত্ত্বই প্রধানরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে দেখা যায়। কাশী সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে সনৎকুমার সংহিতার যে পুঁথি আছে তাহা পাঞ্চরাত্র-সংহিতা হইলেও রাধাকৃষ্ণতত্ত্বপ্রতিপাদক। সুতরাং পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ে যে রাধাকৃষ্ণের স্থান নাই তাহা সর্বথা বলা যায় না। আমার বিশ্বাস, প্রাচীনকালে ভাগবতসম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের মহিমা বিশেষভাবে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যখন উক্ত সম্প্রদায় পাঞ্চরাত্রের সহিত মিলিত হইয়া গেল তখন হইতেই এই সাঙ্কর্যের আবির্ভাব হইয়াছে। তত্ত্ব বা রসের দিক্ ছাড়িয়া দিলেও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ-বাসুদেব এবং যশোদানন্দন কৃষ্ণ-গোপালের আখ্যায়িকার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত আছে।

———

ভাব সাধনার বৈশিষ্ট্য

আধ্যাত্মিক সাধনার নানা প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু সাধন পথে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটি অবস্থা সকলকেই লাভ করিতে হয় — ইহার নাম শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস। যতক্ষণ পর্যন্ত "একটি সত্য বস্তু আছে" এই বিশ্বাস হৃদয়ে উদিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহার অন্বেষণের জন্য প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে স্থান পায় না। এই বিশ্বাস বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উদিত হইতে পারে অথবা স্থান বিশেষে পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার হইতেও জাগিতে পারে। এমন কি, পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার না থাকিলেও অচিন্ত্য ভগবৎ কৃপার প্রভাবে আবির্ভূত হইতে পারে। বিশ্বাসের উদ্ভব কারণভেদে বিভিন্ন উপায়ে হইলেও বিশ্বাসের স্বরূপ এক ও অভিন্ন। মাত্রার তারতম্য, প্রকারের বৈচিত্র্য এবং লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য অধিকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস অথবা শ্রদ্ধা প্রকটভাবে হৃদয়ে ক্রিয়াশীল না হইলে সাধনপথে অগ্রসর হইবার প্রশ্ন উঠে না। বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, এমন কি জ্ঞানকাণ্ডের মূলে শ্রদ্ধার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সাধনার পৃষ্ঠভূমিতেও শ্রদ্ধার অস্তিত্ব সর্বত্রই উপলব্ধ হয়। যোগভাষ্যকার ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রদ্ধাকে "মাতেব হিতকারিণী" অর্থাৎ মাতার ন্যায় হিতকারিণী বা কল্যাণদায়িনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং যোগসূত্রকারও বলিয়াছেন যে শ্রদ্ধা হইতে বীর্য, বীর্য হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে সমাধি এবং সমাধি হইতে প্রজ্ঞা বা সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। গীতাতেও — "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" এই বাক্যে শ্রদ্ধার সবিশেষ মহিমাই কীর্তিত হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই দুইটি শব্দ সমানার্থক।

প্রকৃতিভেদে বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে এক প্রাকৃতশক্তি কার্য করিতেছে। কেহ কেহ ধারণা করেন যে এই বিশাল প্রকৃতির পৃষ্ঠভূমিতে স্থির, অপরিণামী, চিন্ময়, নিত্য ও বিভু এক পরমসত্তা বিরাজমান রহিয়াছে, যাহাকে কেহ

ব্রহ্মরূপে এবং কেহ আত্মা বা পুরুষরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই সত্তা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। প্রকৃতিরাজ্য ভেদ করিতে না পারিলে সেই চিন্ময়ী মহাসত্তার সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন এই বিশাল প্রকৃতি এবং এই অপরিণামী চিদাত্মক সত্তার পশ্চাতে এক পরম আনন্দময় ও পরম প্রেমময় অখণ্ড সত্তা বিদ্যমান আছে। তাঁহাকে সাধারণতঃ ভগবান বলিয়া ইঁহারা বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই তিন প্রকার বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিন প্রকার সাধক আপন আপন বিশ্বাসের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পথে তত্ত্বের অন্বেষণে অগ্রসর হয়। প্রথম পথটি কর্মের পথ, দ্বিতীয় পথটি জ্ঞানের পথ এবং তৃতীয়টি ভাবের পথ। অবশ্য এই বিভিন্ন পথের মধ্যে অনন্ত প্রকার মিশ্রণ সম্ভবপর এবং সাধক জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহা দেখিতেও পাওয়া যায়। কারণ সরল পথের ন্যায় বক্র পথও ত আছে এবং বিভিন্ন পথের পরস্পর সম্মিলন বশতঃ অনন্ত বৈচিত্র্য উদ্ভূত হয়।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা ভাব সাধনার দিক্ হইতে আলোচনা করিব। ইহা জ্ঞান সাধনা অথবা প্রাকৃত শক্তি সাধনার দিকের আলোচনা নহে। জ্ঞান সাধন বিচারকে প্রধান মনে করিয়া সাধন পথে তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে বৈরাগ্য এবং বিবেকজ্ঞান আপনিই উদিত হয়। আত্মসত্তা চিৎস্বরূপ। ইহা নিত্য অপরিণামী ও দেশ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইহা প্রাকৃত জগতে কালের দ্বারা ও দেশের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া জন্মমৃত্যুর আবর্তমান প্রবাহে ঘুর্ণিপাক খাইতেছে। বিচার দ্বারা ক্রমশঃ পর পর বিন্যস্ত প্রাকৃত তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়া ঐ সকল তত্ত্বের প্রত্যেকটির সহিত আত্মার অনুভূত তাদাত্ম্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় অর্থাৎ আত্মসত্তাকে বা চৈতন্যকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর রূপ উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া শোধন করিতে হয়। এই ভাবে শোধন করিতে করিতে অনাত্মসত্তা হইতে আত্মসত্তা বিবিক্ত হইয়া নির্মল চিদ্‌রূপে ফুটিয়া উঠে। ইহার নানা প্রকার পদ্ধতি আছে সত্য, কিন্তু মূল ধারাটি বিবেক ও বিচারের ধারা। এই চৈতন্য সত্তায় বিশ্রান্তি লাভ করাই এই পথের পথিকের মুখ্য লক্ষ্য। ইহাকে কৈবল্য অথবা মুক্তি বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই অবস্থা লাভ করিলে প্রকৃতির ঘুর্ণিতে আর পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

প্রাকৃত শক্তি সাধক বিশ্বের সঞ্চালিনী শক্তির দিকে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিয়া থাকে — সে প্রকৃতির অন্তরালবর্তী শুদ্ধ চৈতন্য-সত্তা দেখিতে পায় না। তাহার বিশ্বাস প্রকৃতির মধ্যেই উর্ধ্ব ভূমিতে এমন একটি স্থিতি আছে যেখান হইতে শক্তির স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া প্রাকৃত রাজ্যের সর্বত্র সর্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতেছে। এই শক্তির স্রোত যে স্থান হইতে প্রবৃত্ত হয় সেই স্থানটি প্রাকৃত ঐশ্বর্যের আদিপীঠ। প্রকৃতির মধ্যে সর্বপ্রকার শক্তির প্রস্রবণের মূল কেন্দ্র উহাই। কোনও সাধক যোগ-সাধনার দ্বারা অথবা সাধনার অন্য কোনও পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক যদি সৃষ্টির ঐ মধ্য বিন্দুতে প্রবেশ করিয়া ঐখানে অধিষ্ঠিত রহিতে পারে তাহা হইলে প্রাকৃতিক সকল শক্তিই তাহার আয়ত্ত হইয়া থাকে। শক্তি সাধকের লক্ষ্য যদি শক্তিতে নিবদ্ধ থাকে তাহা হইলে এই কেন্দ্র স্থানের পৃষ্ঠভূমিতে যে বিরাট্ চৈতন্য-সত্তা বিরাজমান রহিয়াছে তাহার সন্ধান লাভ করা যায় না। এই সকল সাধক জ্ঞান পথের পথিক নহে এবং আত্মজ্ঞান লাভ তাহাদের ঘটেও না। কিন্তু একটি বিশাল শক্তির সন্ধান লাভ করিয়া সেখানেই ইহারা সাধন উদ্যম সমাপ্ত করে।

এই শক্তি বা বিভূতি সাধক প্রকৃতির মধ্যে স্থিত হয়, আত্মাকে পায় না। জ্ঞান সাধক শুদ্ধ জ্ঞান বা চিদাত্মক পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, তাহার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কিন্তু আমরা যে ভাব সাধকের কথা বলিতে ইচ্ছা করি তাহার লক্ষ্য প্রকৃতিও নয়, পুরুষও নয়, অর্থাৎ ঐশ্বর্যও না এবং মুক্তিও না। সে বিশ্বাস করে প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের অধিষ্ঠাতারূপে এক বিশাল সত্তা আছে। তাঁহাকে পাইতে হইলে খণ্ড শক্তি সাধনার পথ পর্যাপ্ত নহে এবং খণ্ড জ্ঞান সাধনার পথও পর্যাপ্ত নহে। ভাবের পথে অগ্রসর হইতে না পারিলে সেই মহাভাবময় সত্তার সন্ধান লাভ করা যায় না। এই সকল সাধক ভক্তি মার্গের সাধক বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত হয়। পরম সত্তা বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ দুই দিক হইতে ইহাদের দৃষ্টিতে পতিত হয় বটে, কিন্তু ইহারা তাহার বহির্মুখ দিক্ পরিহার করিয়া অন্তর্মুখ দিক্‌কে আশ্রয় করে। অর্থাৎ ইহারা বলে যে শ্রীভগবান্ বহির্মুখ ভাবে পরমাত্মরূপে মায়ার অধিষ্ঠাতা হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার প্রভৃতি ব্যাপার নিরন্তর সম্পাদন করিতেছেন এবং অসংখ্য প্রকারে নিজ সৃষ্টির শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। এইটা তাঁহার

বাহ্য দিক্। রাজা যেমন অমাত্যবর্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজসভায় প্রজার শাসন কার্য নির্বাহ করেন ইহাও কতকটা তাহারই অনুরূপ। কিন্তু শ্রীভগবানের অন্তর্মুখ দিকের সহিত জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি কোন অবান্তর ব্যাপারেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, এমন কি অনুগ্রহ নিগ্রহ প্রভৃতি মৌলিক ব্যাপারেরও। সেখানে তিনি অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তগণকে লইয়া অনন্তকাল অনন্ত প্রকার রসাস্বাদন করিতেছেন ও করাইতেছেন। রসিক ভক্তগণ বিচিত্র ও বিশাল ভাবরাজ্য ভেদ করিয়া এই অনন্ত রসের মূল কেন্দ্রে রসরাজ ও মহাভাবের সামরস্যে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করে। এখানে শ্রীভগবানের হ্লাদিনী-প্রধান অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির খেলা হইয়া থাকে।

ভাব সাধনার মূল কথা এই, শ্রীভগবান্ প্রেমময় বলিয়া প্রেমের পথ অবলম্বন করিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে যুক্ত হওয়া যায় না, তাই রসাস্বাদও ঘটিতে পারে না। সেইজন্য এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দুইটি ব্যাপার সম্যক্ রূপে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। প্রথমে নিজের প্রাকৃত দেহের সহিত তাদাত্ম্যের বিস্মৃতি এবং তদনন্তর ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এমন কি কারণ দেহ পর্যন্ত নিজের স্মৃতিতে বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্তির আশা নাই। গুরুকৃপাতে অথবা প্রাক্তন সুকৃতির বলে, যোগানুষ্ঠান করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, নিজের প্রাকৃত দেহ হইতে নিজেকে পৃথক্ জানিয়া যদি সেই মহাসত্তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা যায় তাহা হইলে তাঁহারই অনুকম্পা বলে যোগ্য পথ প্রদর্শক প্রাপ্ত হইবার আশা থাকে এবং ভাবরাজ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া উঠে। ভাবসাধনার পূর্বে শ্রীভগবানের সহিত নিজের ভাব সম্বন্ধের নির্ণয় হওয়া আবশ্যক এবং এই সম্বন্ধ আবিষ্কারের পূর্বে সামর্থ্যবান সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক। কারণ গুরু ভিন্ন কোন্ জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ তাহা অন্য কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। ভগবান্ এক অনন্ত ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং জীব তাঁহারই চিদণুরূপ অংশ। জীব সংখ্যায় অনন্ত। পরন্তু প্রতি জীবের সহিত তাঁহার যে বিলক্ষণ আকর্ষণ বিকর্ষণের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভাবের খেলা চলিতে ত পারেই না, তাহার আরম্ভও হইতে পারে না।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্ম-সত্তা শান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় নিস্তরঙ্গ থাকে। তাহাতে কোনও প্রকার চঞ্চলতা, এমন কি ক্ষুদ্রতম স্পন্দন পর্যন্ত, অনুভূত হয় না। কিন্তু তাঁহাতে সৃষ্টির ইচ্ছার উন্মেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনন্ত সমুদ্র স্বরূপতঃ নিশ্চল এবং শান্ত থাকিয়াও যেন কিঞ্চিৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে তাঁহার মধ্যে লীন এবং তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন রূপে বিদ্যমান অনন্ত চিদণু স্পন্দনের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন মাত্রায় জাগ্রত হইয়া উঠে। এইগুলি সেই শান্ত মহাসমুদ্রের অংশীভূত জলবিন্দুর ন্যায় অনন্ত অখণ্ড চিৎ সত্তার কল্পিত আণবিক ভাব মাত্র। বলা যায়, যেন এক অখণ্ড চৈতন্যই স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব চিদ্‌রশ্মি ও চিদণুরূপে নিজেরই মধ্যে অস্ফুট ভাবে প্রকট হইয়া উঠে। এই সকল অণুই চিদ্‌রশ্মি সহকারে চিৎ সত্তা হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়া 'জীব' নামে পরিচিত হয়। এই সকল জীব এবং তাহাদের উৎপত্তি স্থান পরম-চৈতন্য স্বরূপতঃ অভিন্ন। অর্থাৎ সেই পরম সত্তা যেমন প্রকাশাত্মক বা চিন্মাত্র, জীব সত্তাও তদ্রূপ প্রকাশাত্মক বা চিন্মাত্র। কিন্তু উভয়ে চিদংশে অভেদ থাকিলেও এই অভেদের মধ্যে তখন কিঞ্চিৎ ভেদেরও স্ফুরণ লক্ষিত হয়। স্পন্দন হওয়ার পূর্ববর্তী অথবা স্পন্দনের অতীত যে প্রশান্ত সত্তা তাহা নিঃস্পন্দ বলিয়া এই ভেদ সেখানে বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু স্পন্দনের পরে যে চিদণুরূপ অংশ-সত্তা প্রকট হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ ভেদ না থাকিয়া পারে না। এইখান হইতেই সামান্য সত্তার উপরে বিশেষের উন্মেষ ধরা যায়। অর্থাৎ সামান্যতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মাতে সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত কোন প্রকার ভেদ না থাকিলেও বিশেষ দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে একটি নিত্য ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই ভেদ শুধু পরমাত্মাতে ও জীবাত্মাতে নহে, ইহা জীব সকলের পরস্পরের মধ্যেও লক্ষিত হয়। সৃষ্টির ভিতরে একদিকে যেমন অখণ্ড অবিভক্ত সামান্য বিদ্যমান রহিয়াছে অপর দিকে তেমনই প্রতি বস্তুর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে, যাহার দরুণ সৃষ্টির অন্তর্গত কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর সহিত সর্বথা অভিন্ন প্রতীত হয় না। আদি সৃষ্টিতেই বৈশিষ্ট্য ভাসিয়া উঠে। ইহাই "বিশেষ" তত্ত্ব। ইহা না বুঝিলে ভাব রাজ্যের সাধনার এবং লীলা তত্ত্বে প্রবেশের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তাৎপর্য এই, প্রতি জীবের সহিত মূল

আত্মার একটি বিশিষ্ট নিত্য ও নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। মায়িক সৃষ্টিতে আসিবার পর যতদিন জীব বহির্মুখ থাকে — বলা বাহুল্য জীবের এই বহির্মুখ ভাব সৃষ্টিতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই বহিরঙ্গ শক্তির প্রভাবে হইয়া থাকে — ততদিন পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধটি অব্যক্ত থাকে। বস্তুতঃ সংসার-জীবনে পরমাত্মার সহিত বহির্মুখ জীবের সম্বন্ধ শুধু প্রের্য-প্রেরক ভাবরূপে প্রকাশ পায়। অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব কর্ম কর্তা এবং পরমাত্মা তাহার কৃতকর্মের ফলদাতা — কতকটা এইরূপ, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যাদি দ্বারা বহির্মুখ ভাব কাটিবার পর জীব পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যের উপলব্ধি করিলে চিৎস্বরূপে বা কৈবল্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা তটস্থ শক্তি হইতে উদ্‌ভূত জীবাণুর স্বরূপে অবস্থান। বলা বাহুল্য, তখন পূর্বোক্ত বিশেষ সম্বন্ধের স্ফুরণ হয় না। বস্তুতঃ কোন সম্বন্ধেরই স্ফুরণ হয় না। কিন্তু যাহারা জ্ঞান পথের পথিক নয় কিন্তু ভাবরাজ্যে প্রবেশার্থী তাহাদের পক্ষে ঐ বিশেষ সম্বন্ধের আবিষ্কার দেহাবস্থান কালে হইলেই ভাল হয়। আচার্যগণ বলেন —

শ্রীবৈষ্ণব সম্বন্ধ বিন্দু প্রভু সেবা অধিকার।
সপনেহু পাবত নহীঁ করেঁ কোটি উপচার ॥

অবশ্য শুদ্ধ চিন্মাত্রে প্রতিষ্ঠিত জীবও শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাতে অন্তর্মুখ হইয়া ঐ বিশেষ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহা কঠিন। যাহা হউক, ভগবানের তীব্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত ভক্ত-জীব বুঝিতে পারে যে পরমাত্মা হইতে তাহার অনাদি বহির্মুখ ভাবের নিবৃত্তি মাত্রই তাহার জীবনের প্রকৃত সাফল্য নহে। কারণ বহির্মুখতা নিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখতার উদয় না হইলে শুধু তটস্থ ভাবে মায়ার বহিঃপ্রদেশে স্থিতি কৈবল্যেরই নামান্তর। তাহা জাগতিক ত্রিতাপের নিবৃত্তি হইলেও ভাবরাজ্যে বা ভগবদ্ ধামে প্রবেশের অনুকূল নহে, বরং বাধক। অন্তর্মুখতা লাভ শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গশক্তির প্রভাব বশতঃ ঘটিলে ভাগ্যবান জীবের এই জাতীয় বোধ স্বতঃই উদিত হয়।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইবে যে শুধু প্রাকৃত জগৎ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া এবং নিত্য চিৎস্বরূপে শান্ত হইয়া অবস্থিত হওয়া ভাবুকের জীবনের আদর্শ নহে। যে ভাবুক সে ভবিষ্যতে ভাব সাধনার সিদ্ধি অবস্থায় রসিক পদে উন্নীত হয়। রসিকের উদ্দেশ্য রসাস্বাদ। রসাস্বাদের বীজ ভাব। ভাব অথবা স্থায়ী ভাব ব্যতিরেকে রসের

অভিব্যক্তি ও আস্বাদন হইতে পারে না। এইজন্য ভাবুক সাধক প্রাকৃত ত্রিবিধ দেহ বিস্মৃত হইয়া অথবা অবস্থা বিশেষে ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্ত হইয়া সমর্থ গুরুর কৃপায় উদ্‌ঘাটিত ভাবরাজ্যের দ্বার দেখিতে পায় এবং শ্রীভগবানের পরম সত্তা হইতে নির্গত অনুরূপ চিদ্‌রশ্মির সাহায্যে রসময় পরম পুরুষের দিকে রসাস্বাদনের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন এইঃ দিব্য ভাব অখণ্ড হইলেও বুঝিবার সুবিধার জন্য উহাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রীতি — এই কয়েকটি প্রধান। ভাবুক সাধক কোন্ ভাবের অধিকারী? এই প্রশ্নের নির্ণয় না হইলে অনন্ত ভাবরাজ্যের মধ্যে ভাবুক তাহার নির্দিষ্ট আসন প্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ সকলেরই প্রিয়। যে যেভাবে তাঁহাকে দেখে বা চায় তাহাকে তিনি সেইভাবেই দর্শন দেন এবং তাহার আকাঙ্ক্ষা সেইভাবেই পূর্ণ করেন। সুতরাং তিনি এক হইলেও ভাবুক সাধকের বিচিত্রতা অনুসারে তাহার ভাব ও রূপের বৈচিত্র্য হয়। সব ভাব সকলের জন্য নহে এবং সব খেলাও সকলের জন্য নহে। এই বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক পূর্বোক্ত বিশেষ। যাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ আদি সৃষ্টিকালে স্বভাব সিদ্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীগুরুর কৃপাতে তাহাই যথাসময়ে প্রাকৃত দেহের বিস্মৃতির পর ভাবুকের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। তদনুসারে ভাব-রাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বোক্ত সম্বন্ধের অনুরূপ ক্ষেত্র, স্থান, ব্যবধান, সেবা প্রভৃতি যথাযোগ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

———

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ একমাত্র রাধাভাবে উপনীত হইতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পরম স্বরূপটির স্ফুরণ সম্ভব হয় — তৎপূর্বে ঠিক ঠিক স্ফূর্তি হয় না। যাহা হয় তাহাতে স্বভাবতঃই পরিচ্ছিন্নতা দোষের স্পর্শ থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্বের স্বরূপভূত হইয়াও তাহার অতীত একটি দিক্, যাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে ভগবৎ-তত্ত্বের পূর্ণ আস্বাদন লাভ করা যায় না। এই কথার সার্থকতা ক্রমশঃ আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট হইবে। পূর্ণ সত্তাকে সর্বতত্ত্বের নির্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং উহা তত্ত্বরূপে প্রকাশমান হইলেও নির্দিষ্ট কোন তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে — ইহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার মুখ্য বিষয়।

এই পূর্ণ সত্তা অখণ্ড এবং অদ্বৈত ; ইহার অনন্ত প্রকাশ আছে, অনন্ত প্রকার স্ফুরণ আছে — কলা আছে, অংশ আছে, অংশেরও অংশ আছে, অথচ এই সকল থাকা সত্ত্বেও ইহা নিষ্কল, নিরংশ, সমরস, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। ইহাতে অনন্ত শক্তির নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল শক্তির সহিত পূর্ণ স্বরূপের যে সম্বন্ধ তাহাকে অভেদ বলিয়া ধরা যায়, আবার ভেদ ও অভেদ উভয়াত্মক বলিয়াও ধরা যায়। সুতরাং সম্বন্ধের ভিন্নতাবশতঃ তাঁহার অনন্ত শক্তি ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। স্বরূপ এবং তাহার শক্তি যেখানে অভিন্ন সেখানে উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধকে অভেদ সম্বন্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এইপ্রকার ভেদ সম্বন্ধ এবং ভেদাভেদ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। শক্তি বর্জন করিয়া স্বরূপকে চিনিবার চেষ্টা আকাশকুসুম চয়নের ন্যায় উপহাসাস্পদ। বস্তুতঃ শক্তি ব্যতীত স্বরূপের সন্ধানই পাওয়া যায় না, পরিচয় তো দূরের কথা। শক্তির মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বরূপের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। বস্তুতঃ স্বরূপের আস্বাদন এবং পরিজ্ঞান সবই শক্তির উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। যে সকল শক্তির সহিত স্বরূপের ভেদ সম্বন্ধ, সে সকল শক্তিকে

সাধারণতঃ জড় শক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যে সকল শক্তি অভিন্নরূপে স্বরূপে আশ্রিত রহিয়াছে তাহাদিগকে এক কথায় চিৎশক্তি বা চৈতন্যশক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে যে স্বরূপের সহিত জড় শক্তির কোন বিরোধ নাই। যাহা কিছু বিরোধ প্রতীত হয় তাহা জড় শক্তির সহিত চৈতন্যশক্তির বিরোধ। কিন্তু চৈতন্যশক্তি স্বরূপের সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন বলিয়া চৈতন্যশক্তির বিরোধকেই কেহ কেহ স্বরূপের বিরোধ মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্বরূপের সহিত যদি কোন শক্তির বিরোধই হইবে তাহা হইলে উহা ঐ শক্তির আশ্রয় কি প্রকারে হইতে পারে? বাস্তবিক পক্ষে স্বরূপ সর্বশক্তির আশ্রয়। চৈতন্য-শক্তিও যেমন তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ জড় শক্তিও তাহাতেই আশ্রিত। পরস্পর ভেদ ও ব্যাবৃত্তি চৈতন্যশক্তি এবং জড় শক্তিতে অবশ্যই রহিয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানে কখনই কোন বিরোধ থাকে না। এই যে চৈতন্যশক্তির কথা বলা হইল ইহা স্বরূপশক্তি নামে পরিচিত এবং কেহ কেহ ইহাকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলিয়া থাকেন। এই শক্তিরই ব্যাপক প্রকাশের অন্তর্গতরূপে অনন্ত খণ্ড খণ্ড অংশ বিদ্য-মান রহিয়াছে। এই সকল খণ্ড অংশ বস্তুতঃ শক্তিরই অংশ। তথাপি স্বরূপশক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া ইহাকে স্বরূপের অংশ বলিয়াই পরিচয় দিতে হয়। এই অংশাংশি ভাব থাকার দরুণ এই স্তরটিকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অখণ্ড স্বরূপ শক্তির মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই অংশগুলি স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে দুই প্রকার। ইহারা অণুরূপ, অর্থাৎ ইহাদিগকে চিৎ-পরমাণু বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে। এই ভিন্নাংশগুলি স্বরূপশক্তির ব্যাপক সত্তার যে প্রদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ঐ শক্তির অন্তরঙ্গ স্বরূপের বাহ্যভাগে অবস্থিত। এই প্রদেশটি স্বরূপশক্তির অন্তর্গত হইলেও অখণ্ড নিরংশ শক্তিরাজ্যের বহির্ভূত এবং জড় রাজ্যেরও বহির্ভূত। এই প্রদেশটির নাম তটস্থ প্রদেশ এবং এই পরমাণুপুঞ্জই অনন্ত জীবকণা, যাহা চিৎ-শক্তির বাহ্যাংশকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

চিৎ-শক্তি অত্যন্ত রহস্যময়ী। এই রহস্যের যথাশক্তি উদ্ঘাটন করিতে ক্রমশঃ একটু একটু চেষ্টা করা যাইবে। সম্প্রতি ইহা জানা আবশ্যক যে চিৎ-শক্তি দুইটি বিভিন্ন ধারাতে কার্য করিয়া থাকে। একটি ধারাতে তাহা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যেও

অনেক অবান্তর বৈচিত্র্য আছে, যাহা লীলা-রহস্যের আলোচনা কালে বুঝিতে পারা যাইবে। আর একটি ধারাতে ইহা বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে, অর্থাৎ ইহার ক্ষরণ হয়। এই যে ক্ষরণ ইহা অক্ষরের ক্ষরণ ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই ক্ষরণশীল ধারাই স্বরূপের তটস্থ শক্তি। ইহার আত্যন্তিক পৃথক্ সত্তা নাই। অবশ্য আত্যন্তিক অভেদ সত্তাও নাই — ইহাও সত্য। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তদ্রূপ এই মূল অক্ষর সত্তা হইতে কণারূপে ক্ষরণশীল অক্ষরগুলি নির্গত হইতেছে। সৃষ্টির আদি ক্ষণে স্পন্দনে যে বহির্মুখ ভাব উদিত হয় তাহারই প্রভাবে এই অক্ষর কণার নির্গম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা এই কণাগুলিকেই জীবকণা বা জীবাণু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি।

এই যে জীবকণার কথা বলা হইল ইহা চিৎকণা। জীবের স্বরূপ এবং উদ্ভব বুঝিতে হইলে এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। পূর্ণ স্বরূপের সহিত পূর্ণরূপা অন্তরঙ্গা শক্তি বা চৈতন্যশক্তি বস্তুতঃ সমরস ভাবে ব্যাপ্ত থাকিলেও বহিঃপ্রকাশের দিক্ দিয়া ঐ ব্যাপ্তিতে যে একটি স্বগত ন্যূনাধিক-ভাব রহিয়াছে তাহা বলিতেই হইবে। পূর্ণ স্বরূপটিকে যদি সচ্চিদানন্দ বলিয়া ধরা যায় এবং উহা নিরংশ হইলেও যদি উহাতে উহার অচিন্ত্য প্রভাব-বশতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি অংশ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বুঝিবার সুবিধার জন্য বলিতে পারা যায় যে ঐ অন্তরঙ্গা শক্তিও স্বীয় অখণ্ডতা সত্ত্বেও তিন অংশে আপেক্ষিক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। অর্থাৎ উহার সদংশের অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, চিদংশের অন্তরঙ্গা শক্তির ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত অল্প এবং আনন্দাংশের ব্যাপ্তি আরও কম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যেখানে ব্যাপ্তি কম সেখানে গভীরতা অধিক। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে আনন্দাংশের শক্তি মণ্ডলের বিন্দুরূপে, চিদংশের শক্তি মণ্ডলের বিন্দু হইতে পরিধি পর্যন্ত রেখারূপে এবং সদংশের শক্তি মণ্ডলের পরিধিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। মায়া বা জড় শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির সদংশের দ্বারা ব্যাপ্ত। এইজন্যই মায়িক জগতের সর্বত্রই পূর্ণ স্বরূপের সত্তাংশ প্রতিফলিতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তটস্থ বা জীব-শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির চিদংশ দ্বারা ব্যাপ্ত। অখণ্ড স্বরূপশক্তি নিজ স্বরূপের আনন্দাংশের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। মায়াশক্তির বৈভব, তটস্থ শক্তির

বৈভব এবং অন্তরঙ্গা শক্তির বৈভব সর্বত্রই অন্তরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিয়া উহাকে কার্যোন্মুখ করিতেছে। মায়াতে এবং মায়িক জগতে শুধু সদংশ কার্য করে। জীব-জগতে সদংশ সহিত চিদংশ কার্য করে এবং আনন্দময় ভগবদ্ধামে সচ্চিৎ-অংশের সহিত আনন্দাংশ কার্য করে। অথচ সকল অংশই সর্বাত্মক বলিয়া প্রত্যেক অংশেই অপরাংশের অনুপ্রবেশ না থাকিয়া পারে না।

পূর্বে যে জীবরূপী অণুর কথা বলা হইয়াছে তাহা চিদাত্মক হইলেও অখণ্ড চিৎ-শক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাসমান হয়। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে স্ফুরণের অভাববশতঃ পৃথক্‌রূপে ভাসমানতা থাকে না। মহা ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষে যখন সৃষ্টির সূচনা হয় তখন ঐ সকল অন্তর্লীন পরমাণুপুঞ্জ চৈতন্যের তলদেশ হইতে বহির্মুখে উর্ধ্বে উত্থিত হয়। উত্থিত হইলেই উহাদিগের মধ্যে একটি বেগের সঞ্চার হয়। এই বেগের প্রভাবে পরমাণু সকলের মধ্যে যাহার যে প্রকার প্রকৃতি সে তদভিমুখে আকৃষ্ট হয় ও বাকী পরমাণুপুঞ্জ অনাদিকালের ঘোর সুষুপ্তিতে পূর্ববৎ মগ্ন থাকে। জাগ্রত পরমাণুর মধ্যে যেগুলির প্রকৃতি অন্তর্মুখ সেগুলি পরমতত্ত্বের নিত্য বৈভবে অর্থাৎ চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিত্য আনন্দময় লীলায় স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ-ভাবে যোগদান করে। পক্ষান্তরে যেগুলির প্রকৃতি বহির্মুখ তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া বাহ্য শক্তিরূপা মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মায়াগর্ভে প্রবেশ করে। এই সকল জীবের প্রকৃতি বহির্মুখ বলিয়া উল্লেখ করা হইল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্তঃপ্রকৃতি আচ্ছন্ন এবং বহিঃপ্রকৃতি বহিরুন্মুখ, আবার কাহারও অন্তর্মুখ প্রকৃতি এত গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন যে তাহার অস্তিত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু তাহার বহিঃপ্রকৃতি জাগ্রত হইয়া সৃষ্টিদশায় তাহাকে বহির্মুখে প্রেরণ করে। মোটের উপর জীবতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। জীবস্বরূপ চিদাত্মক, শুধু এইটুকু জানিলেই জীব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞান হয় না, বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

যে সকল জীব সৃষ্টির আদিতে উদবুদ্ধ হয় না তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ অব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতির বিচার করা চলে না। কিন্তু যে সকল জীব প্রবুদ্ধ হয় তাহারা কোনও না কোন প্রকৃতি নিয়াই প্রবুদ্ধ হয়, এইজন্য তাহাদের প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক। আদিম উন্মেষের সময় জীব

জাগিয়া উঠিয়া স্বীয় প্রকৃতির প্রেরণায় যখন আনন্দ শক্তির দিকে অথবা সৎ-শক্তির দিকে ধাবিত হয় তখন হইতেই তাহার জীবনের সূচনা। সুষুপ্তাবস্থায় জীবের নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। জীব চিদণু বলিয়া কখনই চিৎ-শক্তি হইতে পৃথক্‌কৃত হয় না বটে, কিন্তু অব্যক্তাবস্থায় চিৎ-শক্তির কোন ক্রিয়া থাকে না। ইহাই জীবের আত্মচৈতন্যের আচ্ছন্নতা। 'আমি আছি' এই মৌলিক বোধটুকুও তখন তাহার থাকে না অর্থাৎ আবৃত থাকে। কিন্তু জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রথমে স্বীয় সত্তাবোধ উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। তখন দৃক্‌শক্তির স্ফুরণ হয় এবং স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ঐ দৃক্‌শক্তির ক্রিয়ার দিক্ নিরূপিত হয়। ইহার ফলে কেহ কেহ যেমন আনন্দময়ী জ্যোতিঃ-স্বরূপা শক্তির গর্ভে প্রবেশ করে, কেহ কেহ তেমনি আনন্দহীন অমারূপা জড় শক্তির গর্ভে প্রবেশ করে। কিন্তু এমনও জীব আছে যাহার প্রকৃতিতে এই উভয় দিকের আকর্ষণ সমরূপে আছে বলিয়া জাগ্রত অবস্থায় যে কোন দিকে আকৃষ্ট না হইয়া মধ্যে অবস্থান করে।

বলা বাহুল্য, ইহা সুষুপ্ত অবস্থা নহে। এই যে মধ্যাবস্থা বলা হইল জাগ্রৎ জীব ইহাতে অবস্থিত হইয়া নিজের নবোন্মেষিত আমিত্ব-বোধকে এই ব্যাপক নিষ্কল চিন্ময় মধ্য সত্তার সহিত অভিন্ন বোধ করে। চিন্ময় স্বরূপানুভূতি মধ্যাবস্থার অনুভূতি।

এই যে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কথা বলা হইল ইহার অবান্তর ভেদ এত অধিক যে বলিতে গেলে তত্ত্বদৃষ্টিতে শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর হইলেও অতি কঠিন — প্রত্যেক জীবেরই এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা শুধু তাহারই সম্পত্তি এবং যাহা অন্য জীবে থাকিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের মূল কোথায় জানিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পূর্ণ স্বরূপের অন্তরঙ্গা শক্তির আনন্দাংশের স্বগত বৈচিত্র্যই ইহার মূল। যদিও জীব চিদণু তাহাতে সন্দেহ নাই এবং চিৎ-শক্তিতে কোন প্রকার বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না ইহাও সত্য, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে চিদংশের অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে আনন্দাংশের অন্তরঙ্গা শক্তি জড়িত রহিয়াছে। আনন্দাংশের শক্তিতে বৈচিত্র্য থাকিবার দরুণ চিদংশে বৈচিত্র্য না থাকিলেও উহাতে ঐ বৈচিত্র্যের একটা ছাপ লাগিয়া যায়। ইহা অত্যন্ত গুপ্তভাবে জীবের স্বরূপে নিহিত থাকে। জীব নিজে ইহার সন্ধান জানে না এবং তাহার

জানিবারও কোন উপায় নাই। মায়ারাজ্যে জীব যতদিন পরিভ্রমণ করে ততদিন সে ইহা জানিতে পারে না। মায়ামুক্ত হইয়া আত্ম-স্বরূপজ্ঞান লাভ করিলেও (ব্রহ্মের সহিত বিবিক্ত ভাবেই হউক বা অবিবিক্ত ভাবেই হউক) ইহা জানিতে পারে না। একমাত্র সাধু গুরুর কৃপায় ভগবদনুগ্রহে জীব যখন ভগবদ্‌-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পায় তখন তাহার এই গুপ্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠে। এই প্রকৃতি না জাগিলে নিত্য লীলায় প্রবেশই হইতে পারে না।

স্বরূপ শক্তির আনন্দাংশগত বৈচিত্র্যই মূল প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। চিদণুতে এই বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়। এই বৈচিত্র্য এমনই অদ্ভুত যে ইহার অচিন্ত্য প্রভাব বশতঃ সর্বত্র অনুস্যূত অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈত সত্তা যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। এই বৈচিত্র্যবশতঃ আনন্দগত দুইটি অংশ ঠিক এক প্রকার হয় না — এবং হইতেও পারে না। এই বৈশিষ্ট্য চিদংশে প্রতিবিম্বিত হইলে ইহা চিৎ-এর অব্যক্ত ধর্মরূপে বর্তমান থাকে। চিদণু যেমন অনন্ত তেমনি এই আনন্দাংশগুলিও অনন্ত। এক একটি চিদণুতে এক একটি অংশ ধর্মরূপে নিহিত রহিয়াছে। এই আনন্দ ভক্তি, প্রীতি বা রাগেরই নামান্তর। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করা হইবে। সুতরাং প্রত্যেকটি জীব-অণুতেই একটি বিশিষ্ট রকমের প্রীতির ভাব উহার স্বধর্মরূপে নিত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহাই উহার প্রকৃতি বা স্বভাব। যতদিন এই স্বভাবের উন্মেষ ও ক্রিয়া না হইবে ততদিন জীবের পরমানন্দ লাভ ঘটিবে না।

এইখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অণুস্বরূপ জীব নিদ্রাভঙ্গের পর হয় অন্তর্মুখে অথবা বহির্মখে অথবা উভয় শক্তির সাম্যময় মধ্যভূমিতে অবস্থান করে। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ অবস্থিতির স্থলে যে গতি রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। নিত্যধাম আনন্দময়ীর স্বরূপশক্তির রাজ্য, কালের অতীত। ভগবানের পরিকররূপে মহাকাল সেখানে কালের ক্রিয়া করিয়া থাকেন। কারণ সেখানে একমাত্র বর্তমান ভিন্ন অন্য কাল নাই। অথচ লীলা-প্রসঙ্গে অতীত ও অনাগতেরও আভাস জাগিয়া উঠে। যে সকল অণু জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যধামে প্রবেশ করে তাহারা নিত্যলীলার অন্তঃপাতী হইয়া স্বভাবের খেলা খেলিতে থাকে। কিন্তু যাহারা জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই জড়শক্তি মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহির্মুখে ধাবিত হয় এবং মায়া গর্ভে প্রবেশ করে, তাহারা কালশক্তির

অধীন হইয়া পড়ে। তাহাদের সমগ্র সাংসারিক জীবনের ধারাটাই কালশক্তির অধীন হইয়া চলিবার ধারা, কিন্তু যে সকল জীব জাগিয়া উঠিয়া কোন প্রকার গতি লাভ করে না, বেগের অভাববশতঃ নিত্য কিংবা অনিত্য কোনও রাজ্যেই যাহাদের প্রবেশ হয় না, যাহাদের মধ্য ভূমিতে বিরাট চৈতন্যস্বরূপে এক প্রকার অভেদজ্ঞানে স্থিতি লাভ হয়, তাহারা নিষ্ক্রিয় নিরাকার নির্বিশেষ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যতদিন এই অবস্থা হইতে অন্তরঙ্গা শক্তির বিশেষ প্রেরণা দ্বারা তাহারা উত্থিত হইতে এবং উত্থিত হইয়া ভগবানের পরম ধামে প্রবেশ করিতে না পারিবে ততদিন তাহাদের পক্ষে ইহাই পরম স্থিতি। মধ্য ভূমিতে কোন বৈচিত্র্য নাই। তাই ঐ ভূমি প্রশান্ত আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও উহাতে রসের হিল্লোল খেলে না। চিন্ময়ধামে এবং জড় জগতে উভয়েই বৈচিত্র্য সমরূপে বিদ্যমান — উভয়ত্রই আকৃতি এবং প্রকৃতিগত অনন্ত প্রকার বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে লীলা ও ক্রিয়া শক্তির বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। ভেদ শুধু এই — নিত্যধাম লীলায় স্ফূর্তি হয়, সেখানে আনন্দের সঙ্গে দুঃখের মিশ্রণ থাকে না, রোগ শোক জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা পাপ ও মলিনতা সেখান হইতে চিরতরে অস্তমিত। কুণ্ঠারহিত বলিয়া তাহা নিত্যই উজ্জ্বল — বিকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠ রূপে প্রকাশমান থাকে। বিকার এবং অপূর্ণতা সেখানে অনুভূত হয় না। কিন্তু অনিত্য রাজ্য ঠিক তাহার বিপরীত — ইহা রোগ শোক জরা মৃত্যু পাপ ও মলিনতার আধার স্বরূপ। এখানে শুদ্ধ আনন্দের প্রকাশ নাই, যাহা আছে তাহা কর্মফলরূপে সুখদুঃখের খেলা। নিত্যধাম জ্ঞানালোকে আলোকিত, অনিত্য রাজ্য আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অজ্ঞানের অধীন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আনন্দ জীবের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম। তাই মায়া বা কালের রাজ্যে আসিয়াও জীব হারানিধির ন্যায় নিরন্তর এই আনন্দেরই অন্বেষণ করিতে থাকে। অন্বেষণ করে আনন্দের, কিন্তু পায় দুঃখ, কারণ অবিদ্যার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত জীব বিপরীত গতি-বিশিষ্ট হইয়াই ধাবিত হয়। ভগবানের প্রতি বৈমুখ্যই আত্মবিস্মৃতির কারণ এবং আত্মবিস্মৃতিই মায়ারাজ্যে পতনের হেতু। বস্তুতঃ জীবের আত্মস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিলে মায়ার এমন কোন সামর্থ্য নাই যে সে তাহাকে টানিয়া নিজের দিকে আনিতে পারে। জীব আনন্দের অন্বেষণে মায়ার হাটে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে ছায়া ভিন্ন কায়া

প্রাপ্তির আশা নাই। তাই যাহাকে সে আনন্দ বলিয়া অথবা অনন্দের উপায় বলিয়া ধারণা করে তাহাই কার্যকালে তাহাকে ছলনা করে। সংসারের প্রতি বস্তুই এইভাবে জীবকে প্রতারণা করিতেছে। তাই সে মায়া মরীচিকা গন্ধর্বনগর স্বপ্নরাজ্য প্রভৃতি বলিয়া সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তাহার ভুল। সে প্রথমেই আত্মাকে বিস্মৃত হইয়াই সংসারে আসিয়াছে, এখন সংসারকে দোষ দিলে চলিবে কেন? আনন্দের যাহা মূলস্থান, দিব্য জ্ঞানের যাহা একমাত্র উৎস, নিত্যধামের যাহা কেন্দ্রস্বরূপ, তাহার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহাই মায়াকৃত জীবের দণ্ড।

বাস্তবিক পক্ষে সংসারে দুঃখ ভোগ করাও জীবের পক্ষে অমঙ্গল নহে। কারণ এই দুঃখ ভোগের অভিজ্ঞতা হইতেই সে নিত্যধামে যাইয়া নিজের প্রকৃতিগত আনন্দকে চিনিয়া লইতে পারে। দুঃখের সহিত পরিচিত না হইলে আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করিয়াও আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না।

নিত্যধাম হইতে অনিত্য জগতে জীবের অবতরণ হয়। আবার অনিত্য জগৎ হইতে নিত্যধামে জীবের উদ্ধার হয়। ব্রহ্মচক্রের অচিন্ত্য আবর্তনের মহিমায় সবই হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। নিত্যধাম হইতে যে অবতরণ হয় তাহা স্থূলতঃ দুই প্রকার —

১। নিত্যধামের পরমানন্দের সন্ধান দুঃখমগ্ন অনিত্য জগৎকে দিবার জন্য। এই সন্ধান অনিত্য জগৎ হইতে পাওয়ার উপায় নাই, অথচ এই সন্ধান না পাইলে অনিত্য জগতের জীব কিসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিত্য রাজ্যে যাইবার চেষ্টা করিবে? যাঁহাদের এই প্রকার অবতরণ হয় তাঁহারা ভগবানের (অর্থাৎ পরমাত্মার) ভিন্নাংশ জীব বলিয়াই এখানে ধরিয়া লইলাম। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাঁহার অভিন্নাংশেরও অবতরণ হইয়া থাকে। ইহার আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে।

২। জাগতিক ক্ষোভ অথবা বিপ্লব অত্যন্ত তীব্র হইলে শুধু ঐ সাময়িক উপদ্রবের উপশমের জন্য কখনও কখনও নিত্যধাম হইতে অনুরূপ শক্তি অর্থাৎ ঐ কার্য সম্পাদনে সমর্থ শক্তি অবতীর্ণ হইয়া থাকে। মায়াচ্ছন্ন জীবের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইলে যখন জাগতিক সত্তা সংঘর্ষ নিবারণে সমর্থ হয় না তখন সাম্য সংস্থাপনের

জন্য নিত্যধাম হইতে শক্তির অবতরণ হইয়া থাকে। এখানে আপাততঃ আমরা ঐ শক্তিকে জীব বলিয়াই ধরিয়া লইলাম, কিন্তু উহা ভগবানের স্বাংশেও হইতে পারে।

আনন্দের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য যেমন তটস্থ ভূমির জীবাণুতে তাহার প্রকৃতি বা ধর্মরূপে নিহিত আছে, তদ্রূপ প্রত্যেকটি অণুতেই প্রতিবিম্বিত-রূপে পূর্বোক্ত আনন্দাংশ নিত্য জাগ্রৎ রহিয়াছে, ইহা একটি অত্যন্ত গভীর তত্ত্ব এবং রহস্যময়। ইহা না বুঝিলে নিত্যলীলায় জীবের স্থান কোথায় এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এই যে নিত্য-ধামে প্রতি জীবের অবস্থিতির কথা বলা হইল ইহাই জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-দেহ বলিয়া পরিচিত। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে বলিব।

জীবের স্বরূপ দেহের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সত্যই জীবের স্বরূপ দেহ আছে। প্রতি জীবেরই আপন আপন স্বরূপ দেহ আছে। ইহাই আত্মা। ইহা সাকার — নিরাকার নহে। আত্মার নিরাকার স্বরূপের কথা এখানে আলোচ্য নহে।

এই স্বরূপ-দেহ বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপেরই অন্তর্গত। শুধু অন্তর্গত নহে, তাহারই অংশ। এই দেহই জীবের প্রকৃতি। ইহা আনন্দাত্মক। ইহার কর-চরণাদি অবয়ব বিন্যাস আছে, অথচ সব এক রস — এক বিশুদ্ধ আনন্দতত্ত্ব দিয়াই যেন ইহা গঠিত।

গঠিত বলিলাম বটে, কিন্তু গঠিত নহে। ইহার রহস্য পরে স্পষ্টী-কৃত হইবে। একটি চৈতন্যস্বরূপ আনন্দঘন বস্তুই যেন অনন্ত পৃথক্ পৃথক্, অথচ পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্ আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই দেহ আবরণে আচ্ছন্ন। ইহাই লিঙ্গাবরণ। মহাকল্পের সূত্রপাত ও লিঙ্গাবরণের প্রারম্ভ সমকালীন। কল্পারম্ভে লিঙ্গাবরণের উপর আর একটি আবরণ পড়ে — তাহাই ভৌতিক আবরণ। এই ভৌতিক শরীরটাকে কর্মদেহ বলা হয়। ইহা প্রতি কল্পে ভিন্ন ভিন্ন। কল্পের আদিতে এই দেহের জন্ম হয়। কল্পের অবসানে এই দেহের নাশ হয়। সমস্ত কল্পব্যাপী এই দেহের জীবন। এই দেহের সত্তাও ভৌতিক সত্তা। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই কর্মসংস্কার ক্রিয়া করিয়া থাকে। যিনি কোন কৌশলে কর্মের অতীত হইতে পারেন তিনিই ভৌতিক আবরণ হইতে মহাকল্পে প্রবেশ করেন।

ইহাই লিঙ্গাবরণ। ইহা মহাকল্পের প্রারম্ভ হইতেই আছে। লিঙ্গভঙ্গ না হওয়া পর্যন্তই মহাকল্প — ইহাই হিরণ্যগর্ভের জীবিত

কাল। লিঙ্গাবরণ হইতে অব্যাহতি না পাইলে স্বরূপদেহ চেতন হয় না। মহাকল্প ভেদ করাও যা, স্বরূপদেহের উপলব্ধিও ঠিক তাহাই। স্বরূপদেহ সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু লিঙ্গের আবরণ অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত জীব তাহার সন্ধান পাইতে পারে না। জীব যে প্রাকৃতিক সৃষ্টি প্রবাহে পতিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য এই আবরণের অপসারণ। কর্মের স্রোতে জীবকে চলিতে হয়। যে জীব যে গুণপ্রধান তাহাকে সেই প্রকার কর্মই করিতে হয়। তবে লিঙ্গভঙ্গ হয়। মহাকল্পের অবসানে ইহা নিষ্পন্ন হয়। তখন সকলেই আপন আপন স্বরূপদেহে অবস্থান করে।

আসল কথা, কালের স্রোতে উজাইয়া যাইতে হয়। গুরু ধারার কথা বলিতেছি না। কালের ধারা ধরিয়া গেলে উজাইয়া যাইতেই হইবে। কালের আবর্তের মধ্যে যেটি মহত্তম আবর্ত বলিয়া লৌকিক দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়, তাহা ভেদ করিতে পারিলেই স্বরূপদেহের সন্ধান পাওয়ার রাস্তা ধরা যায়। কালের ক্ষুদ্রতম আবর্ত ভেদ করিলেও ঐ সন্ধান পাওয়া যায়।

মহাকল্পই লৌকিক হিসাবে বৃহত্তম আবর্ত — ইহা ভেদ করা এবং মহাপ্রলয়ের সাক্ষী হওয়া মোটের উপর একই কথা। লোকোত্তর দৃষ্টিতে ইহার চেয়েও বড় আবর্ত আছে। বস্তুতঃ তাহাও ভেদ করিতে হইবে। তবে স্বরূপ দেহের প্রকৃত পরিচয় পাইবার উপায় আয়ত্ত হইবে। ইহা অতি-মহাপ্রলয়ের অতিক্রমণ। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই সুষুম্নাতে প্রবেশ। যোগ ও শব্দবিজ্ঞান আলোচনাকালে ইহার চর্চা প্রাসঙ্গিক হইবে। তাই এখানে অধিক বলা হইল না। এখন বুঝা যাইবে যে এক হিসাবে প্রত্যেকের স্বরূপদেহই ভগবান্ — অর্থাৎ ভগবদংশ। তাহাই যেন বিম্ব। একই মহাবিম্বে অনন্ত স্বগত ভেদ রহিয়াছে। সব লইয়াই এক অখণ্ড ভগবৎসত্তা। ইহা মহাসৃষ্টি ও মহাপ্রলয়ের অতীত অবস্থা। এই বিম্বই যেন অনন্ত প্রতিবিম্বরূপে জগতে প্রতিভাসমান হইতেছে। প্রত্যেকটি বিম্বের ভগবৎস্বরূপাত্মক আত্মবিম্বে প্রবেশই জীবের স্বরূপ স্থিতি। শুধু প্রবেশ নহে, নির্গমেরও অধিকার থাকা চাই। ইহা অতি দুর্লভ অবস্থা। ইহাই যোগ। কেহ কেহ ইহাকে সাযুজ্য নাম দেন। কালের স্বাভাবিক ধারা আশ্রয় করিয়া উর্ধ্ব গতিতে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া অতি কঠিন। এক একটি মহাপ্রলয়ে এক এক জন এই অবস্থা লাভ করেন। তবে

সাধনা বা কৃপার ধারায় কালকে বঞ্চনা করিয়া এই অবস্থায় যাওয়ার কৌশল আছে।

আত্মাবম্বলাভ না করিলেও আত্মবিম্বের সদৃশ বিম্বলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা মুক্ত পুরুষ মাত্রেরই হইয়া থাকে।

স্বরূপদেহ সকল জীবের একপ্রকার নহে। যাহার যেটি স্বরূপ-দেহ তাহার পক্ষে তাহাই প্রাপ্য। প্রকৃতির ক্রম বিকাশের ধারা বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্বরূপদেহটিকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য একটি কালগত ক্রিয়া মাত্র। স্বরূপদেহের অভিব্যক্তিই মুক্তি।

স্বরূপ প্রাপ্ত এই সকল মুক্ত পুরুষ অভিনব সৃষ্টিতে নানাস্থানে নানাভাবে স্থিতি ও সঞ্চরণ করেন। কিন্তু সৃষ্টির সাময়িক অবসান কালে ঐ সকল স্বরূপ বিশুদ্ধ চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সিদ্ধগণের মধ্যে সকলেরই সর্বাবস্থায় ভগবৎসেবা মুখ্য কার্য।

এখন ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বরূপের সহিত অনন্ত শক্তির নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সম্বন্ধ শক্তির ব্যক্তাবস্থাতেই সম্ভবপর। যিনি এই অনন্ত শক্তির একমাত্র আশ্রয় তিনিই ভগবান্। ভগবান্ ব্যতীত শক্তিমান — সর্বশক্তিমান্ আর কাহাকেও বলা চলে না। সুতরাং স্বরূপশক্তির সত্তাই ভগবত্তা। তটস্থ শক্তির ও মায়া শক্তির অধিষ্ঠানও স্বরূপশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যিনি স্বরূপশক্তিহীন তিনিই একদিকে জীবের ও অপরদিকে জগতের অন্তর্যামী হইতে পারেন না। কারণ সূত্র ধরিতে না পারিলে সূত্রধর হওয়া যায় না। সূত্রই স্বরূপ শক্তি — যাহাদ্বারা জীব ও জগৎকে জ্ঞান ও কর্মপথে প্রেরণা দেওয়া হয়।

এই স্বরূপশক্তি চিৎকলা ব্যতিরেকে অপর কিছুই নহে। ইহাতে অনন্ত কলার সমাবেশ আছে, কিন্তু অনন্ত কলাতেও সমাধান হয় না। ষোড়শী কলাতেই পূর্ণতার স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। সপ্তদশী কলা অনন্ত কলার প্রতীকস্বরূপ। ইহা মহাশক্তিরূপে নিত্যজাগরূক থাকে। কলার তারতম্য অনুসারেই শক্তির নিত্যসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। সৎশক্তি বা সন্ধানী কলা, চিৎশক্তি বা সংবিৎ কলা এবং আনন্দ শক্তি বা হ্লাদিনী কলা বস্তুতঃ চিৎকলারই মাত্রাগত ক্রমোৎকর্ষজনিত বৈশিষ্ট্য মাত্র। চিৎকলার উজ্জ্বলতা একটু ক্ষীণ না হইলে আত্মস্বরূপ ভিন্ন অপর কিছু দেখা যায় না। জীব ও জগৎকে দেখিতে গেলে

তদনুসারে চৈতন্যশক্তির সঙ্কোচ আবশ্যক। যেমন, অত্যন্ত তীব্র জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, শুধু জ্যোতিই দৃশ্য হয়, তদ্ভিন্ন দৃশ্য-পদার্থের দর্শন হয় না, তদ্রূপ চিৎকলা অত্যন্ত অধিক মাত্রাতে প্রকাশিত থাকিলে চৈতন্য ভিন্ন অপর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। যে অবস্থায় জীব ও জগতের ভান পর্যন্ত হয় না সে অবস্থায় তাহাদের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই উঠে না। এইজন্যই ভগবান পূর্ণ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাতা থাকিলে জীবের হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পুরুষরূপেও প্রকাশিত হন না, জগতের চালক পুরুষরূপেও নহে। স্বরূপশক্তির কিঞ্চিৎ ন্যূনতা না হইলে ঐ নিয়মন কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি নাই। তাই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। ব্রহ্ম জীবভাবের ও মায়ার অধিষ্ঠান মাত্র। ভগবান তিনি, যাঁহাতে স্বরূপশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি আছে, তাঁহাতে সকল শক্তিই আশ্রিত — স্বরূপশক্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং অন্যান্য শক্তি স্বরূপ শক্তির মধ্যস্থতায়। কিন্তু স্বরূপের যে অবস্থায় চিৎকলা পূর্ণ মাত্রায় অভিব্যক্ত থাকে না তাহা ভগবদ্‌ভাবও নহে, ব্রহ্মভাবও নহে। তাহাই পরমাত্ম ভাব। সুতরাং পরমাত্মাই জীব ও জগতের ঈশ্বর। সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানকে জীব ও জগতের ঈশ্বর বলা চলে না। কারণ ভগবৎস্বরূপ পূর্ণ চিৎশক্তিময় বলিয়া সেখানে স্বভাবসিদ্ধভাবে জীবের কোন স্থান নাই এবং জড়েরও কোন স্থান নাই — তাহা চিদ্রূপা নিজ শক্তিরই বিলাসে ভরপুর। তবে পরমাত্মা ভগবানেরই একাদশ বলিয়া যে কোন ধর্ম পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইবার যোগ্য তাহা ভগবানেও আরোপিত হয়।

পরমাত্মা মায়াচক্রের অধ্যক্ষ, জীব ও মায়ার অধিষ্ঠাতা, উভয়েরই প্রভু। যোগী যোগবলে চিত্তবৃত্তি একাগ্র করিয়া হৃদয়াকাশে যাঁহার দর্শন লাভ করেন তিনিই পরমাত্মা — অর্থাৎ পরমাত্মার অংশভূত চৈত্য পুরুষ বা অন্তরাত্মা। ইনি দেহযন্ত্রের যন্ত্রী — ইনি দ্রষ্টা বটেন, কিন্তু ইঁহার দৃষ্টিই ক্রিয়া। এই দৃষ্টির প্রভাবে দেহযন্ত্র চলিতে থাকে। ইনি অসঙ্গ বলিয়া দেহে অভিমানহীন — অথচ ইঁহারই দৃষ্টিতে দেহ সঞ্চালিত হয়। জীব যন্ত্রে আরূঢ় পশু, দেহাত্মবোধে বদ্ধ। জীব যখন দেহাত্মভাব ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখ হয় তখনই পরমাত্মার দর্শন লাভ করে — পরমাত্মা নির্লিপ্ত দ্রষ্টামাত্র, জীব নিজেকেও তখন তদ্রূপ অনুভব করে। ইহা জীবের মুক্তাবস্থা, দ্রষ্টা

পুরুষরূপে স্থিতি। অন্তর্যামী পুরুষের দৃষ্টিই যে সৃষ্টি, তাঁহার জ্ঞানই যে ক্রিয়া, তাহা পুরুষ মুক্ত অবস্থাতেও প্রথমে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু প্রথমে না পারিলেও পরে পারে। তখন জীব আর জীব থাকে না — জীবে ঈশ্বরত্ব অভিব্যক্ত হয়। সে তখন দ্রষ্টামাত্র নহে, দৃষ্টি দ্বারা সে প্রকৃতির নিয়ামক হয়, সে তখন প্রকৃতির স্বামী। মায়া তখন তাঁহার অধীন। ইহাই যোগৈশ্বর্য। যোগবলে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত হইয়া প্রথমে শুদ্ধ দ্রষ্টা বা নিষ্ক্রিয় চিৎস্বরূপে অবস্থান হয়; তারপর ধীরে ধীরে ঐ প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিয়া ক্রিয়া শক্তির দ্বারা উহার নিয়ন্ত্রণ বা ঈশ্বরত্ব লাভ ঘটে। বাহ্য যোগের দ্বারা এই পর্যন্তই হইয়া থাকে। ইহার পরে অগ্রসর হইতে হইলে অন্য উপায় আবশ্যক হয়।

এই যে যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, বস্তুতঃ ইহাও ভগবত্তাই। তবে ইহা ভগবত্তার পূর্ণ স্বরূপ নহে — অংশমাত্র। অংশমাত্র বলিয়াই যোগী বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর বা মায়িক জগতের অধিষ্ঠাতা হয়, জড় সাম্রাজ্যের সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হয়। ইহাও যে চিৎকলারই মহিমা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও জড় সম্বন্ধ অতিক্রান্ত হয় নাই।

কিন্তু জড়রাজ্যের ন্যায় চিদানন্দময় সাম্রাজ্যও আছে। তাহার প্রভুত্ব যাঁহাতে নিহিত, যিনি এ মহান্ রাজ্যের অধীশ্বর, যাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্যের কণিকা মাত্র অবলম্বন করিয়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডময় মায়িক জগতের বিভূতি প্রকাশিত হয়, তিনিই প্রকৃত ভগবান্। চিৎকলার অভিব্যক্তি অত্যন্ত অধিক মাত্রায় না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। যোগীর ইষ্টদেব হৃদয়ে নিহিত, কিন্তু তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহির করিতে হইলে পূর্ববর্ণিত যোগশক্তি অপেক্ষা আরও অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়।

যোগী দর্শন পায় স্বপ্নবৎ ধ্যানের মধ্যে, ভক্ত পায় সাধারণ জাগ্রৎ ভাবের মধ্যে। তাই ভক্তের অনুভূতিতে যে তৃপ্তি তাহা যোগীর অনুভূতিতে আশা করা যায় না।

এই অধিক শক্তি ভক্তি হইতে উপলব্ধ হয়। ভক্তি আপনিই আপনার বিষয়কে ফুটাইয়া তুলে। ভক্তির বিষয় ভগবান্ — ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবে ভগবান্ আবির্ভূত হন। তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৃত্তি রোধ করিতে হয় না। বৃত্তির বাহ্য অবস্থাতেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, ভাবের অঞ্জন মাখাইয়া নিলে সকল ইন্দ্রিয়

দ্বারাই ভগবানের ইন্দ্রিয় লাভ করা যায়। যোগীর দর্শন হয় অন্তরাকাশে, ভক্তের দর্শন হয় বহিরাকাশে। যোগী জ্যোতির্ময় পুরুষ-রূপে হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শন পান, কিন্তু ভক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য পুরুষের ন্যায় বহির্জগতেও ভাবসংস্কৃত ইন্দ্রিয়গোচর রূপে ভগবানের দর্শন লাভ করেন। ভক্ত প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভগবদ্দেহের অনুভূতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু যোগীর ইষ্টানুভূতি সেরূপ হয় না।

ভগবান চিদানন্দ দ্বারা গঠিত জীবন্ত মূর্তি। এই মূর্তির রচয়িতা ভক্ত স্বয়ম্।

ভগবদনুভূতি ও পরমাত্মানুভূতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। স্বরূপশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ না হইলে পরমাত্মার অনুভূতি হয় না। যে শক্তির প্রভাবে এই অনুভূতি হয় তাহা যদিও স্বরূপশক্তিই বটে, তথাপি তাহাতে অতি সূক্ষ্মতম ভাবে মায়ার আভাস ঘেরিয়া থাকে। পরমাত্মা মায়ার অধিষ্ঠাতা, জীবেরও অধিষ্ঠাতা। সুতরাং যে শক্তি জীব ও মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে সেই শক্তিই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের অনুকূল। তাহা বস্তুতঃ স্বরূপশক্তি হইলেও চৈতন্যের পূর্ণকলা তাহাতে বিকশিত থাকে না। শাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে বলিতে পারা যায় যে প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণ যখন রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করে, যখন ত্রিগুণের পরিণামস্বরূপ চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখনই উহা পরমাত্ম দর্শনের উপযোগী হয়। প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণকে অতিক্রম না করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করা যায় না — যদিও ইহাও সত্য যে যতক্ষণ ঐ সত্ত্বগুণে রজগুণের চঞ্চলতা বা বিক্ষেপ এবং তমোগুণের আবরণ বা লয় বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ চিত্ত স্বীয় উপাদানে সত্ত্বগুণের পুষ্টিতে প্রবলতা লাভ করিতে না পারে ততক্ষণ সমাধি ও সমাধিজনিত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হইতেই পারে না। শুদ্ধচিত্তে পরমাত্মার অনুভূতি হয় বলিয়াই পরমাত্ম দর্শন হৃদয় মধ্যেই হইয়া থাকে, কারণ হৃদয়ই চিত্তের বিশ্রামের উপযোগী অবকাশ। কিন্তু যেখানে দেহ নাই, সেখানে হৃদয় কোথায়? দেহকে আশ্রয় করিয়াই সাক্ষী ও প্রেরয়িতারূপে পরমাত্মা এবং কর্তা ও ভোক্তারূপে গুণবদ্ধ জীবাত্মা অবস্থান করে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে প্রাকৃতিক পিণ্ডে অবস্থিত হইয়াই সাক্ষিরূপে পরমাত্মার অনুভব হয়। শুধু সাক্ষিভাবে নহে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পিণ্ডের নিয়ামকরূপেও হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে অনুভব

করা যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও সাক্ষিস্বরূপ নিজেরই অনুভূতি। কিন্তু ভগবদ্দর্শন এইভাবে হয় না। চিৎকলার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ চিৎকলাময় ভগবৎ সত্তার সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। স্বরূপ শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হ্লাদিনীতে। হ্লাদিনীর আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে ভগদ্দর্শন হইতেই পারে না। হ্লাদিনী শক্তিরও একটি ক্রমবিকাশ আছে। এই বিকাশের নিম্নতর স্তরে যদি হ্লাদিনী শক্তির স্ফুরণ হয় তখনও বস্তুতঃ উহা হ্লাদিনী শক্তি, অন্য কিছু নহে। এইজন্য সে অবস্থাতেও ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর। কিন্তু প্রাকৃতিক চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না, হইতেও পারে না। কারণ ভগবান্ প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণের অগোচর। অপ্রাকৃত সত্ত্ব বা বিশুদ্ধ সত্ত্বই ভগবৎদর্শনের জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক। ইহা গুণবদ্ধ জীবের স্বায়ত্ত নহে। যদিও জীব-স্বরূপের গভীরতম প্রদেশে কণারূপে অপ্রাকৃত সত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তথাপি উহাকে উদ্রিক্ত করিবার জন্য বাহির হইতে অপ্রাকৃত সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ আবশ্যক। বিশুদ্ধ সত্ত্ব হ্লাদিনী শক্তিরই বৃত্তি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাদ্‌ভাবে জীবে হ্লাদিনীশক্তি সঞ্চার না করেন, অথবা হ্লাদিনীশক্তি প্রাপ্ত ভগবদ্ ভক্ত কৃপারূপে ইহা জীবকে অর্পণ না করেন, ততক্ষণ জীবের স্বকীয় সত্ত্ববীজ অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ পায় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের ক্ষোভজনিত প্রথম উন্মেষই ভাব, যাহা ক্রমশঃ পরিণত হইয়া প্রেমের আকার ধারণ করে। ইহা নিত্যসিদ্ধ, তবে সাধনার দ্বারা হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। বস্তুতঃ ইহা সাধনার ফল নহে। সাধনার সহিত ভাবোদয়ের যে কার্য-কারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মৌলিক নহে। সাধনা অভিব্যঞ্জক, ভাব অভিব্যঙ্গ্য। এই ভাবকেই সাধ্য-ভক্তি বলে — ইহা প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ। ভাব আবির্ভূত হইয়া দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অবতীর্ণ হইলে ঐ সকল বস্তু যে পরিণতি লাভ করে তাহা হইতেই ভাবের আবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবই ভক্তির বীজ, প্রেম তাহার ফল। প্রেমও ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া বিভিন্ন প্রকার বিলাসে আস্বাদনের বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া থাকে। প্রেমবিলাসের পূর্ণ এবং পরিণত স্বরূপই রাধাতত্ত্ব। ইহার বিবরণ পরে করা যাইবে।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধের আভাস মাত্র থাকিলেও ভগবদনুভূতি আসে না। ভগবদ্ অনু-

ভবের জন্য চিৎকলার পূর্ণ আবির্ভাব আবশ্যক। যেখানে চিৎকলার অভিব্যক্তি পূর্ণ সেখানে অচিৎ বা মায়ার আভাস থাকিবে কি করিয়া? তাই চিৎশক্তির যতখানি বিকাশে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইতে পারে তাহার অধিক বিকাশ না হইলে হৃদয়ের অতীত প্রদেশে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। চিৎশক্তির এই পূর্ণতা বিশুদ্ধ হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বে উপনীত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণামই ভক্তি। যাঁহারা সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিসমবেত সারকে ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহারাও বস্তুতঃ এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভগবানকে অনুভব করিবার জন্য কোন ইন্দ্রিয়কে রোধ করিতে হয় না, কারণ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ তৃপ্তি ভগবদ্ আস্বাদনে হইয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মার অনুভব ইন্দ্রিয়ের অন্তর্মুখী গতি ভিন্ন হইতে পারে না। আসল কথা এই, জীব নিজভূমি ত্যাগ না করিয়া ভগবানকে দেখিতে বা জানিতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবান নিজেকে নিজেই দেখেন, নিজেকে নিজেই জানেন এবং নিজেই নিজেকে আস্বাদন করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ শক্তির লীলা। জীব ঐ শক্তির অনুগত হইয়া তাঁহাকে দেখিতেও পারে, জানিতেও পারে, এবং অনন্ত প্রকারের আস্বাদনও করিতে পারে। ইহাই শক্তির খেলা।

ভগবদনুভূতি ও পরমাত্মানুভূতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা হইয়াছে। এবার ব্রহ্মানুভূতির বৈশিষ্ট্য বলা যাইতেছে। ব্রহ্ম স্বরূপ-শক্তিহীন হইলে অর্থাৎ শুধু স্বরূপাবস্থায় অসৎকল্প, থাকিয়াও না থাকিবার মতন। তাহা প্রকাশস্বরূপ হইয়াও স্বপ্রকাশ পদবাচ্য হইতে পারে না। প্রকাশের স্বরূপভূতা বিমর্শরূপা শক্তিই প্রকাশকে প্রকাশরূপে পরিচিত করে। অর্থাৎ প্রকাশ যে প্রকাশ তাহা তাহার স্বকীয় শক্তি বিমর্শ দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। স্বরূপশক্তির সংবিৎ কলা দ্বারা ব্রহ্মের এই স্ব-প্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। যাহাকে ব্রহ্মানুভূতি বলা হয় তাহা ব্রহ্মের স্ব-প্রকাশত্ব। সংবিৎ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মানুভূতি সিদ্ধ হয়। এই অনুভূতিতে জীবের পৃথক্ সত্তা স্পষ্টতঃ ধরা যায় না। ব্রহ্মের সহিত অপৃথগ্‌ভাবে জীব নিজেকে নিজে অনুভব করে। এই অনুভব অখণ্ড আনন্দাত্মক। ইহা দেশ কাল প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানপথের পথিক তাঁহারা শুদ্ধ সংবিৎশক্তির প্রভাবে অভেদ জ্ঞানরূপে ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি ও ভগবদনুভূতি — তিনটি অনুভূতিই ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। তাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি। ব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে ব্রহ্মানুভূতি বলিয়া কোন পারমার্থিক অবস্থা স্বীকার করা চলে না। অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তিরই নামান্তর বিশেষ। ব্রহ্মে স্বরূপশক্তি স্বীকৃত না হইলে ব্রহ্মানুভূতির কোন অর্থই থাকে না। কারণ প্রকাশের প্রকাশমানতাই স্বরূপশক্তির ব্যাপার — তাহার অভাবে "ন প্রকাশঃ প্রকাশেত"। বস্তুতঃ অনুভূতি-হীন চিৎস্বরূপে স্থিতিই ব্রহ্ম — ইহা বাক্য ও মনের বৃত্তির অগোচর। স্বরূপভূতা শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ইহা নিজের কাছেই নিজের প্রকাশ এবং নিজে হতেই প্রকাশ। এই শক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। তাই ব্রহ্মাত্মক প্রকাশকে স্ব-প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

দৃষ্টান্তরূপে একটি বিশাল জ্যোতিঃ গ্রহণ করা যাইতেছে। জ্যোতিঃ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা ঠিক ঠিক উহা বুঝান যায় না, তাই জ্যোতিঃ বলিলাম। বস্তুতঃ জ্যোতিঃও স্বরূপের ঠিক বাচক শব্দ নহে। উর্দ্ধ, অধঃ, আট দিক্ — সর্বত্র এক অখণ্ড অনন্ত জ্যোতিঃ আপন আলোকে আপনি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দেখিবার পৃথক্ কেহ নাই, দৃশ্যও পৃথক্ কিছু নাই — যেন জ্যোতিঃই দ্রষ্টা, জ্যোতিঃই দৃশ্য, জ্যোতিঃই দর্শন। স্বরূপটি যেন আপনাতে আপনি বিশ্রান্ত, তরঙ্গ নাই, ক্ষোভ নাই, হিল্লোল নাই, স্পন্দন নাই, ক্রিয়া বিকার নাই — আছে একটি প্রশান্ত চৈতন্যময় অবস্থা। নিদ্রা নয়, স্বপ্ন নয়, জাগরণ নয় — স্বয়ংপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র। ইহাই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাব।

ব্রহ্মের অনুভব সংবিদ-শক্তির প্রকাশ। এই প্রকাশে বৈচিত্র্যের ভাব থাকে না, সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ পূর্ণ, কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। উহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পরস্পর ভেদও নাই, দৃশ্যের স্বগতভেদও নাই — একটি বৈচিত্র্যহীন অভিন্ন সত্তা নিজাধারে নিজে বিদ্যমান।

যখন এই স্ব-প্রকাশ জ্যোতিঃকে কেন্দ্র করিয়া কোন জড়পিণ্ড রচিত হয়, যাহা এই জ্যোতিঃর প্রকাশে প্রকাশিত এবং ইহার শক্তিতে শক্তিমান্ তখন এই জ্যোতিঃ স্ব-প্রকাশ থাকিয়াও পরপ্রকাশক অবস্থা লাভ করে। এই জ্যোতিঃই তখন মূল জড় সত্তা মায়াকে আবিষ্ট করে এবং মায়ার কার্যভূত পিণ্ডে অবস্থিত থাকিয়া উহার জ্ঞান ও

ক্রিয়ার ধারা নিয়ন্ত্রিত করে। জ্যোতিঃ স্বতঃ শুদ্ধ থাকিয়াও যে শক্তির প্রভাবে মায়াকে দর্শন বা চালনা করে — তাহাই তাহার স্বরূপশক্তি। স্বরূপশক্তি ব্রহ্মানুভূতি কালে অন্তর্মুখ ছিল, এখন ইহা বহির্মুখ হইয়া বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে দর্শন করে। ইহা এখন আর 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ' পদবাচ্য নহে। ইহা পরমাত্মা, যাহার অনুভব হৃদয় প্রদেশে হইয়া থাকে।

সংবিৎশক্তির অন্তর্মুখ দৃষ্টিতে অভেদ দর্শন হয়। ইহার বাহ্য দৃষ্টিতে মায়া দর্শন হয়, — মায়িক জগতের সৃষ্টি হয় ও মায়িক সৃষ্টির নিয়মন হয়। একটি শক্তির নিমেষ, অপরটি উহার উন্মেষ। ব্যবহারতঃ একটির পর অপরটির আবির্ভাব হয়। কিন্তু তত্ত্বতঃ উভয়ই যুগপৎ বিদ্যমান। যখন কোনটিই বর্তমান নাই বলিয়া মনে করা হয়, যখন শক্তি অন্তর্মুখও নয় বহির্মুখও নয়, তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অথবা পরমাত্ম সাক্ষাৎকার অথবা পরমাত্ম কর্তৃক মায়া দর্শন কিছুই থাকে না। যাহা থাকে তাহাই ব্রহ্ম — তাহা সৎ হইয়াও অসৎকল্প, তাহার স্ব-প্রকাশত্বও একপ্রকার অসিদ্ধ। তাহাই অলখ।

ব্রহ্ম-শূন্য-জগৎ, ইহাই সৃষ্টিবিকাশের ক্রম। ব্রহ্ম পূর্ণ — তাহাতে অভাব নাই, শূন্যের অবকাশ নাই। তাই পূর্ণ হইয়াও তাহা অব্যক্ত। শূন্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম অনুভূতির গোচর হইয়া পড়িলেন — ব্যক্ত হইলেন ; যেমন মহাকাশে সূর্যমণ্ডল, ঠিক সেইরূপ। সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টার স্ফুরণ হইল। শূন্যের অতীত অবস্থায় দ্রষ্টা কোথায় ? উহা অভেদ সত্তা। এই শূন্যটি হইল হৃদয়, জগৎটি দেহ। শূন্যস্থিত ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিবিম্বটি হইল পরমাত্মা, দেহের মধ্যে হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শন হয়। তখন দেহ থাকে, কিন্তু অভিমান থাকে না, দেহ যে আছে সে বোধ থাকে না। কারণ দেহবোধই পরমাত্ম দর্শনের প্রতিবন্ধক। অথচ দেহ না থাকিলেও পরমাত্ম দর্শন হইতে পারে না। বিদেহ কৈবল্যে পরমাত্মা কোথায় ?'

ভগবদ্ দর্শন কিন্তু এই প্রকার নহে। ব্রহ্মদর্শন হয় বৃত্তির নিরোধে, পরমাত্মদর্শন হয় বৃত্তির একাগ্রতায়, ভগবদ্দর্শন হয় বৃত্তির বৈচিত্র্যে। প্রথমটিতে বৃত্তির উপশম হয়। তাহার পর ঐ নিরুদ্ধ দশাতে মহাশূন্যে জ্যোতিঃপিণ্ডের উদয়ের ন্যায় এক জ্যোতিঃ উদিত হয়। ইহাই পরমাত্মা। তারপর এই একের মধ্যেই একত্বের

অবিরোধে অনন্ত বৈচিত্র্য খেলিতে থাকে। ইহাই ভগবদ্ধাম। তিনটিই অদ্বৈত। প্রথমটিতে দ্বৈতনিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে অদ্বৈতের শক্তির স্ফূর্তি হইয়াছে, তবে তাহা বহির্মুখ বলিয়া ঐ স্ফূর্তির সঙ্গে জীব ও জগতের বিকাশ হইয়াছে। তৃতীয়টিতে শক্তি অন্তর্মুখ বলিয়া অদ্বৈতের মধ্যেই অনন্ত বৈচিত্র্যের বিলাস উপলব্ধি হইতেছে। জাগতিক অবস্থার দৃষ্টান্তে বলা যায় — ব্রহ্মদর্শন সুষুপ্তিবৎ, পরমাত্ম-দর্শন স্বপ্নবৎ, এবং ভগবদ্ দর্শন জাগ্রদ্‌বৎ।

আর একদিক দিয়াও দেখিতে পারা যায়। ব্রহ্মে জগতের উদয়, ব্রহ্মে জগতের স্থিতি এবং ব্রহ্মে তাহার অবসান। পরমাত্মা তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা জগতের প্রত্যেকটি ব্যাপারে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে নিয়ামক রহিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ জগতের ও সৃষ্টির অতীত। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাদ্ ভাবে সৃষ্টির কোনই সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টির অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, সৃষ্টির কারণ পরমাত্মা ও মায়া। ভগবান্ সৃষ্টি হইতে, মায়া হইতে, বহু দূরে।

জীব যতক্ষণ মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত না হয়, ততক্ষণ ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, ততক্ষণ অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। ভগবৎ কৃপার কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইলেই জীব অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়া মায়ার অধিকার হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয় — মায়া ও মায়িক জগৎ আর তাহার ভোগনেত্রের বিষয়ীভূত হয় না। ব্রহ্মানুভূতি কালে একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তাই অর্থাৎ :আত্মসত্তাই স্ব-প্রকাশ-রূপে বিরাজ করে। সেই নির্বিকল্পক চৈতন্যে জগৎবোধ চিরদিনের জন্য অস্তমিত থাকে। ভগবৎ কৃপা বা চিৎশক্তির তীব্রতর সঞ্চার থাকিলে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ চিৎকলার সাহচর্য নিবন্ধন পরমাত্মরূপে প্রকটিত হয়। পরমাত্মভাবে স্থির হওয়ার পূর্বে পরমাত্মভাবের সাক্ষাৎকার হয়। জীব তখন সাক্ষিভাবে বা মুক্ত পুরুষের ভাবে, প্রকৃতি ও তাহার খেলা দর্শন করে। ভোক্তৃ-ভাব আর থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে বদ্ধজীব যেভাবে জগৎ দর্শন করিত — ইহা সেরূপ দর্শন নহে। ইহা মুক্ত পুরুষের দর্শন — পরমাত্মার সহিত যুক্তভাবে দর্শন, প্রেক্ষকবৎ দর্শন। ইহার পর পরমাত্মার স্বরূপে স্থিতি হয়। যখন পরমাত্মার দৃষ্টিই যে ক্রিয়াশক্তি তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় তখন জীব নিজেই পরমাত্মা। তখন তাহার দৃষ্টি দ্বারাই প্রকৃতিযন্ত্র ও দেহযন্ত্র চালিত হয়। ভগবৎ

কৃপার আরও অধিক সঞ্চার থাকিলে মুক্ত পুরুষ ভাবও আর থাকে না — সাক্ষিভাবও নহে — পূর্ণ পরমাত্ম ভাবও নহে। ভগবৎ দর্শনও থাকে না। জগতের নিয়ন্ত্রণও থাকে না। দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই, দর্শনও নাই, অথচ সবই আছে।

অনন্ত বৈচিত্র্যময় চিদানন্দময় লীলারাজ্য তখন খুলিয়া যায়। কিন্তু জীবের তাহাতে প্রবেশ নাই। মায়া বা প্রকৃতিরও তাহাতে সঞ্চার নাই। অথচ নাই যে তাহাও বলা যায় না।

কি ভাবে ইহা হয় তাহাই বলিতেছি।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভগবদ্ রাজ্যে ত্রিগুণের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্যরূপ জগতের কিছুই সেখানে থাকিতে পারে না। এইজন্যই এই ধামকে প্রাকৃতিক জগতের অতীত, এমন কি প্রকৃতি বা মায়ারও অতীত বলা হইয়া থাকে। জীব যতদিন প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ততদিন ঐ পরমধামের কোন সন্ধান পায় না, এমন কি মায়াতীত হইলেই যে পাইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, কারণ দীর্ঘকাল তটস্থ ভূমিতেও সে থাকিয়া যাইতে পারে। মোট কথা, যতক্ষণ জীবের অন্তঃস্থিত আনন্দের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির প্রচ্ছন্ন সত্তা উদ্দীপিত না হয়, যতদিন ভাবের বিকাশ না হয়, ততদিন হ্লাদিনী শক্তির বিলাস আস্বাদন করিবার জন্য তাহার যোগ্যতা থাকে না। অর্থাৎ ততদিন শ্রীভগবানের লীলামণ্ডলে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

ভগবদ্ধাম অদ্বৈত চিদানন্দময়। সেখানে অনন্ত বৈচিত্র্য থাকিলেও সবই একের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং মূলতঃ এক শক্তি হইতেই সকলের স্ফুরণ। সেখানে ভক্ত ও ভগবান্, ভগবানের অনন্ত পরিবার, অনন্ত প্রকারের দৃশ্যরাজি, সমস্তই ভাবময়। এই ভাবই — স্বভাব। এই ভাবের অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীব লীলারাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই অনুগত ভাবই জীবের পরতন্ত্রতা — ইহাই তাহার কৈঙ্কর্য বা দাস্য।

জীব কাহার অনুগমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় — জীব নিজের স্বভাবেরই অনুগমন করে। সুতরাং নিত্য লীলায় অনুগতরূপেই জীবের স্থিতি। ইহাই

তাহার লীলানন্দ আস্বাদনের একমাত্র দ্বার। ইহার ক্রমবিকাশ হইতে কি কি অবস্থার স্ফুরণ হয় তাহা যথাসময়ে আলোচনা করিব।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্, তিনটি অনুভূতির প্রত্যেকটিরই এক একটি স্থিতির অবস্থা আছে। স্থিতি প্রাপ্ত হইলে এক অনুভূতি হইতে অন্য অনুভূতিতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন ব্রহ্মানুভূতির ফলে ব্রহ্মস্থিতি লাভ করিয়া পরমাত্মার অনুভূতি প্রাপ্ত হওয়া কঠিন — তদ্রূপ পরমাত্মানুভূতির ফলে পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া ভগবদনুভূতি লাভ করা কঠিন। বস্তুতঃ ভগবদনুভূতিও অনুরূপ স্থিতিতে পর্যবসিত হইয়া যাইতে পারে। যে পূর্ণত্বের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাহার পক্ষে কোন স্থিতিতে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রত্যেকটি স্থিতি লাভ করিয়া এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। নিত্যলীলায় যাঁহারা ব্রত হইয়াছেন তাঁহারা পরিপূর্ণ স্থিতি লাভ করিয়াও স্থিতিতে আবদ্ধ থাকেন না — তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াও অতৃপ্ত। নিত্য মিলনের মধ্যেও তাঁহারা নিত্য বিরহের অনুভব করিয়া থাকেন। বিরহ অনুভব করেন বলিয়াই যে তাঁহাদের মিলনের সার্থকতা নাই তাহাও নহে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মিলন নিত্য বলিয়াই যে তাহাতে বিরহের উন্মেষ থাকিতে পারে না এমনও নহে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি স্থিতিই পূর্ণ স্থিতি। ব্রহ্মরূপে যে বস্তু অভিন্ন সত্তাস্বরূপ, পরমাত্মরূপে সেই বস্তুই অনন্ত জীব ও অনন্ত জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্। পক্ষান্তরে ভগবদ্রূপে সেই একই বস্তু আপনারই মধ্যে — অর্থাৎ স্বীয় অখণ্ড অনন্ত সত্তার মধ্যে স্বীয় স্বরূপময় অনন্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। আবার ভগবদ্রূপের মধ্যে সেই একই বস্তু চিদানন্দময় অখণ্ড অদ্বিতীয় সম্রাট্ ভাব হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া অচিন্ত্য মাধুর্য ভাবের আস্বাদনে আপনাতে আপনি বিভোর। প্রত্যেকটি স্থিতিই পূর্ণ অথচ কোনটিই চরম নহে। আবার চরম নহে যে তাহাও বলা যায় না। কারণ যাহার যে প্রকার দৃষ্টি এবং লক্ষ্য — সে তদনুরূপ সত্তাতেই চরমত্ব অনুভব করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। এই যে মহাস্থিতির মধ্যেও অনন্ত চলিষ্ণুতা, এই যে পাইয়াও আশা না মেটা — পরিপূর্ণতম তৃপ্তির মধ্যেও অতৃপ্তির পুনরুদয়, এই যে ভাবের মধ্যেও অভাবের অনুভূতি — ইহাই নিত্যানন্দময় স্বভাবের খেলা। কিছুই নাই — অথচ সবই আছে।

পক্ষান্তরে সবই আছে অথচ কিছুই নাই। দুইই এক — উভয়ে কোনই ভেদ নাই। ইহাই অদ্বয় আস্বাদনের নিষ্কর্ষ।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য এই যে শক্তির সঙ্কোচ এবং বিকাশ এই দুইটি অবস্থা আছে। কিন্তু শক্তিমানের স্থিতিতে কখনই কোন পরিবর্তন হয় না — ইহা নিত্যই সাক্ষিরূপে নিজ শক্তির সংকোচ ও বিকাশ রূপ খেলা দেখিতে থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাও চরম কথা নহে। কারণ এই যে নিজ শক্তির খেলা দেখা ইহাও শক্তির কার্য। তাহা অন্তরঙ্গ শক্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাও তো শক্তি। সুতরাং এই দেখারও ভাব এবং অভাব দুইটি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন এই দেখা এবং না দেখার পার্থক্য লুপ্ত হইয়া যায়, অথচ দেখাও থাকে এবং না দেখাও থাকে ও উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, তাহাই প্রকৃত অদ্বৈত অবস্থা।

যাহা হউক অত ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া কতকটা বাহিরের দিক হইতেই কয়েকটি কথা বলিতেছি। মায়াশক্তি এবং তাহার অন্তর্গত যে সকল অবান্তর শক্তি আছে তাহাদের স্ফুরণ হইলেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি সৃষ্টির বিস্তার আরম্ভ হয়। আবার ঐ সকল শক্তির প্রত্যাহরণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মায়িক সৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া কারণের মধ্যে অন্তর্লীন হইয়া যায়। যে সময়ে সমগ্র মায়িক প্রপঞ্চ সমষ্টিভাবে উপসংহৃত হয় তখন যে সকল জীবাণুপুঞ্জ মায়ার অন্তর্গত কোন না কোন তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, দেহেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া কার্য ও ভোগপথে বিচরণ করিতেছিল তাহারা আপনাপন আশ্রয়ভূত তত্ত্বে সুপ্তবৎ লীন হইয়া থাকে। ঐ সকল মায়িক তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবের ক্রম অনুসারে লীন হইতে হইতে চরম অবস্থায় মূলা প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। একটি মহাকল্পের মধ্যে একটি মহা জীব অঙ্গিভাবে মায়াচক্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। অন্যান্য জীবের মধ্যে কতকটি ঐ মহাজীবের সঙ্গে অভিন্নভাবেই হউক অথবা ভিন্ন ভাবেই হউক উহাকে আশ্রয় করিয়া উহারই সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি লাভ করে। ইহাদের ক্রমোন্নতির ধারা স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় মহাকল্পে আবার পর্ব সৃষ্টির ন্যায় ঐ সৃষ্টির বিস্তার হইতে থাকে। বহু নূতন জীব তখন অনাদি সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হয়। প্রাচীন জীবের মধ্যে বহু জীব পুনরুদ্ভূত হয়। যে সকল জীব বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে তটস্থ ভূমিতে অবস্থিত হয় তাহারা আর মায়াচক্রে ফিরিয়া আসে না। ঊর্ধ্বে উত্থিত

হইবার উপযোগী আকর্ষণ লাভ করিলে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে। যতদিন সেরূপ অবসর না আসে ততদিন তটস্থ ভূমিতেই প্রতীক্ষা করে।

বলা বাহুল্য, তটস্থ শক্তিরও সংকোচ-প্রসার আছে। তটস্থ শক্তির সংকোচ অবস্থায় জীবাণুসকল তটস্থ ভূমিতে অন্ধকারময় অথবা আলোকময় প্রদেশে সুপ্তবৎ বিদ্যমান থাকে। ইহা একজাতীয় কৈবল্য। যখন তটস্থ শক্তির ক্ষোভ হয় তখন ঐ সকল অণু উদ্রিক্ত হয় এবং অন্তর্নিহিত অভাবের তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। পূর্ণ চৈতন্য পরিচ্ছিন্ন হইয়াই অণু চৈতন্য আকার ধারণ করে। ইহা অনাদি সিদ্ধ ব্যাপার হইলেও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্পষ্টতার জন্য তত্ত্ববোধের দিক্ দিয়া অসংকুচিত এবং সংকুচিত অবস্থার মধ্যে একটি ক্রম স্বীকার করিতেই হয়। চৈতন্যই আনন্দ। পূর্ণাবস্থায় চৈতন্যের সহিত আনন্দের পৃথক্‌ভাব থাকে না এবং অপৃথক্ ভাবও থাকে না। উভয়ই তখন এক। কিন্তু অপূর্ণাবস্থায় অর্থাৎ যখন চৈতন্য স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বলে নিজেকে সংকুচিত করিয়া অণুরূপ ধারণ করে তখন চিদংশ হইতে আনন্দাংশ পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অণুচৈতন্যে অর্থাৎ চিদণুতে আনন্দাংশের অভাব থাকিয়া যায়। ইহাই চিদণুর চঞ্চলতার মূল কারণ। চৈতন্যের সংকোচের সঙ্গে সঙ্গেই অচিদরূপিণী মায়া বাহির হইতে আসিয়া তাহাতে আপন ছায়া প্রদান করে। এইজন্যই চিদণুর গর্ভে তাহার স্বরূপভূত ও স্বধর্ম আনন্দের প্রতিবিম্ব থাকিলেও উহা মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অণুতে শুধু অস্ফুট অভাব বোধটি মাত্র থাকে। ইহাই অস্পষ্ট স্থিতিরূপে পুনর্বার তাহাকে আনন্দের সন্ধানে চালিত করে। ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গেই জীবাণুতে এইজন্য অভাব বোধ জাগিয়া উঠে। বস্তুতঃ জড় রাজ্যে অর্থাৎ মায়া রাজ্যেও ইহারই অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে মায়িক জগতের যে প্রতিক্ষণের পরিণাম উহাও এই সুপ্ত আনন্দকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্যই। চিদণুর সহযোগ ব্যতিরেকে অচিদণু এই আনন্দ বা সাম্যাবস্থা লাভ করিতে পারে না। এই জন্য অচিদণুও চিদণুকে চায়। পক্ষান্তরে চিদণুও অচিতের সাহায্য ব্যতিরেকে আনন্দকে লাভ করিতে পারে না বলিয়া অচিদণুকে চায়। বস্তুতঃ উভয়ে উভয়কে চায় আনন্দের জন্য। আনন্দই পূর্ণতা। পরে আমরা বুঝিতে পারিব চিৎ ও অচিৎ

উভয়ের সার্থকতা এই প্রাপ্তির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম এই তিনটি তত্ত্বের ইহাই রহস্য। কারণ পুরুষোত্তমে ক্ষর এবং অক্ষর এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয়। পূর্ণ চৈতন্য, যাহার নামান্তর পূর্ণানন্দ, অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। ইহাই সচ্চিদানন্দ। কিন্তু খণ্ড সত্তাত্মক অণুচৈতন্যে আস্বাদনও নাই, বোধও নাই। ইহা প্রসুপ্ত ভাবের অবস্থা। ইহার পর ক্ষোভের উদয় হইলে পূর্ণ থাকিয়াও অপূর্ণবৎ প্রতিভাসমান হয়। ব্যাপক চৈতন্য অণু চৈতন্যে পরিণত হয় এবং চৈতন্যাত্মক বলিয়া এই অণু বস্তুতঃ আনন্দস্বরূপ হইলেও আনন্দের অভাবে চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। ইহা অভাব অবস্থা। ইহার পর যখন এই অণু প্রত্যাবর্তন মুখে ব্যাপকের সহিত মিলিত হয় — যখন বহিরঙ্গা মায়ার ছায়া তাহার স্বরূপ হইতে অপগত হয় তখন তাহার সমগ্র আনন্দ ফিরিয়া আসে। নিজের স্বরূপভূত এবং স্বরূপধর্মভূত আনন্দকে ফিরিয়া পাইয়া অণুচৈতন্য বিভুর সহিত যোগাবস্থায় সেই পূর্ণানন্দের আস্বাদন অনন্ত প্রকারে লাভ করিতে সমর্থ হয় — ইহাই স্বভাব অবস্থা।

আমরা যে শক্তির সংকোচ-বিকাশের কথা বলিয়াছি তাহা অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। স্বরূপশক্তির সংকোচ অবস্থায় — শক্তি স্বরূপে লীন হইয়া যায়। প্রসার অবস্থায় উহা পুনর্বার স্বরূপ হইতে প্রসারিত হয়। অষ্টকালীন লীলারহস্য উদ্ঘাটন করিতে গেলে স্বরূপশক্তির মধ্যেও যে সংকোচ ও প্রসার রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরূপশক্তির রাজ্যে অণুচৈতন্য প্রবিষ্ট হইলে স্বরূপশক্তির অনন্ত বিলাস বস্তুতঃ তখন অণুচৈতন্যেরই আনন্দবর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকে। অণুরূপী অংশ বিভুরূপী অংশীর সহিত মিলিত না হইলে নিত্যলীলারই বা আস্বাদন কে করে! যদিও অণু অনুগত ভাবেই এই আস্বাদন প্রাপ্ত হয়, তথাপি ইহা সত্য যে এই অনন্ত লীলাবিলাস তাহারই জন্য। স্বভাবে প্রবেশ করিতে গেলে অনুগত হইতেই হয়। বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপ ও স্বরূপশক্তি এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া যে অনন্ত লীলাবিলাস অবিচ্ছিন্ন ধারাতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা জীবের ভোগের জন্য। অথচ জীব জীব থাকিয়া তাহা ভোগ করিবার অধিকারী নয়। জীবের আত্মবলি পূর্ণ না হইলে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইতে পারে না।

মায়াশক্তির বিস্তার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে অব্যাকৃত আকাশের মধ্যে প্রকাশিত হয়। চিৎশক্তির বিস্তার অনন্ত বৈকুণ্ঠরূপে চিদাকাশের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অনন্ত বৈকুণ্ঠের সমষ্টি মহাবৈকুণ্ঠরূপী সাম্রাজ্য যে আকাশে বিদ্যমান তাহাই চিদাকাশ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি যে যে মহাশূন্যে প্রকাশ পায় তাহাই অব্যাকৃত আকাশ বা অচিদাকাশ। উভয়ের মধ্যে যে সাম্যরূপা শুদ্ধা শক্তি বিরাজ করিতেছে তাহারই নাম বিরজা নদী। এইজন্যই জীবকে ভগবদ্‌ধামে যাইতে হইলে পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিরজাতে অবগাহনপূর্বক সেখান হইতে উত্থিত হইয়া চিদাকাশস্থিত ভগবদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাকৃত শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় না। এইজন্য প্রথমে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনটি শরীর চিরতরে বিসর্জন দিয়া এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অপ্রাকৃত বিগ্রহ গ্রহণপূর্বক ভগবদ্‌ধামে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্বে যে আমরা স্বরূপদেহের কথা বলিয়াছি এই অপ্রাকৃত দেহ বস্তুতঃ তাহারই নামান্তর। এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, ক্রমে বলিব।

স্বরূপদেহ ভগবদ্ধাম প্রভৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে অপ্রাকৃত জগতের কথা কিছু কিছু বলা হইয়াছে। অপ্রাকৃত জগতের কথা শুনিয়া বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। যদিও প্রচলিত দার্শনিক শাস্ত্রে এবং তদনুকূল সাধনায় নিরত সাধকশ্রেণীর মধ্যে অপ্রাকৃত জগতের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না তথাপি ইহা সত্য যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে কোন কোন বিশিষ্ট সাধক ও সাধক সম্প্রদায় অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোন না কোন প্রকারে তাহার আভাসও দিয়াছেন। এই প্রশ্নের সম্যক্ আলোচনা ঐতিহাসিক দৃষ্টি হইতে করিবার প্রয়োজন নাই। এইজন্য এই বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে কোনও সমালোচনা করা হইল না।

———

জীব ও ঈশ্বর

ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ আলোচ্য। সূর্য হইতে যেমন নীরবে কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে, তেমন ঈশ্বর হইতেও শক্তি সদাই বিকীর্ণ হইতেছে। কালাকাল বিচার নাই — অহেতুক, স্বাভাবিক, ইহাই general grace. ইহাতেই জীব ও জগৎ চলিতেছে। ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি, জীব ও জগৎ সদাই এই শক্তি গ্রহণ করিতেছে। ইহাও স্বাভাবিক। যদি এ শক্তি জীব ও জগৎ না পাইত, তা হইলে ক্ষণমাত্রও চলিতে পারিত না। সব যে বাঁচিয়া আছে, ইহাও তো ঐ শক্তি পাওয়ার নিদর্শন। প্রথমটি স্বভাবতঃই active, দ্বিতীয়টি স্বভাবতঃ passive, উভয়ই নিরুপাধিক। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে জীবের শক্তি পাওয়া আধার বা অধিকার অনুসারে। সকলে সমান শক্তি পায় না, কারণ, গ্রহণযোগ্যতা বা passivity সকলের সমান নহে। যদি ইহা বলা চলে তাহা হইলে ইহাও বলে যে, ব্যবহারক্ষেত্রে ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি দেন না।

অতএব কর্মদৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, যার যেমন যোগ্যতা, ঈশ্বর তাঁহাকে তেমন শক্তিই দেন। বেশীও নহে, কমও নহে। অহং-ভাবের প্রাধান্যে এই দৃষ্টি হয়। ইহাই কর্মবাদ। যেমন কর্ম জীবের, তেমন ফলের দাতা ঈশ্বর। জীবের যোগ্যতা কেন ভিন্ন হয় তাহার জন্য ঈশ্বর দায়ী হন না। যোগ্যতা বা আধার যেমন, ঈশ্বর তেমনি শক্তি দেন বিচারপূর্বক। ইহাই ন্যায়, নীতি বা কর্মরহস্য। এখানে জীবের ইচ্ছা প্রধান। কেন জীবের ইচ্ছা শুভ ও প্রবল হয়, কোথায় বা হয় না — কারণ কেহই জানে না।

আর ভক্তি দৃষ্টিতে বলিতে হয় — ঈশ্বর যাহাকে যেমন দিতে-ছেন, তাহার সেই প্রকার যোগ্যতা হইতেছে। জীবের কর্ম ও কর্মফল কথার কথা। যে পরিমাণ শক্তি জীব পায় তাহার যোগ্যতা বা আধার ততটুকুই হয় — বেশীও নহে, কমও নহে। অহংভাব কাটিলে এই দৃষ্টি হয়। ইহাই কৃপাবাদ। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কেন দেন, তাহার জন্য জীবের কর্ম দায়ী নহে। কারণ জীবের

কর্ম তো তেমনি হইবে যেমন প্রেরণা ঈশ্বর হইতে সে পাইবে। জীব তো তাঁহারই হাতের পুতুলমাত্র। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রধান। ঈশ্বরের ইচ্ছা কেন বিভিন্ন হয় তাহার কারণ কেহ জানে না।

মোট কথা — জীবেরও কোন ক্ষমতা নাই, ঈশ্বরেরও নাই। জীবকে বাদ দিয়া ঈশ্বরের শক্তি বা কৃপা যাহা, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া জীবের পৌরুষ বা পুরুষকারও তাহাই, উভয়ই নিষ্ফল।

ঈশ্বর ও জীব উভয়ই যেখানে এক, তিনিই পরাৎপর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন. তিনিই স্বভাব। তাঁহার স্ফুরণই মূল — ইহাই ঈশ্বরে কৃপারূপে, জীবে পুরুষকাররূপে প্রকাশ পায়। উহা স্বতন্ত্র। তাহাই অহেতুক, নিত্য।

জীবের ইচ্ছা থাকিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিবন্ধক সরাইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে মাত্র।

বস্তুতঃ উভয় ইচ্ছার মূল তো একই ইচ্ছা।

দুই

ঈশ্বর দাতা, জীব গ্রহীতা। কিন্তু প্রধানতঃ, ঈশ্বর যদি কিছু না পান, তাহা হইলে তিনি দানও করিতে পারেন না। তেমনি জীবও যদি কিছু দান না করে, তাহা হইলে সেও কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, পাইতে পারে না।

তাহা হইলে বুঝা যায় ঈশ্বর দাতা হইলেও তাঁহারও কিছু পাওয়ার আছে, লইবার আছে, যাহা না পাইলে তিনি অপূর্ণ। অপূর্ণ বলিয়াই ঠিক ঠিক দান করিতে পারেন না। তেমনি জীব গ্রহীতা হইলেও তাহারও কিছু দিবার ধন আছে, যাহা না দিলে সেও অপূর্ণ। তাই ঠিক ঠিক প্রাপ্তি হয় না। ঈশ্বর যদি ঠিক ঠিক দিতে পারেন, জীব যদি ঠিক ঠিক নিতে পারে, তাহা হইলেই উভয়ে যোগ হইয়া পূর্ণব্রহ্মে স্থিতির পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। অতএব জীবের পক্ষে যাহা বাস্তবিক দিবার জিনিস, ঈশ্বরের পক্ষে পূর্ণতার জন্য ঠিক তাহাই নেওয়া আবশ্যক। তেমনি ঈশ্বরের পক্ষে যাহা বস্তুতঃ দিবার জিনিস, জীবের পক্ষে পূর্ণতার ভন্য ঠিক তাহাই পাওয়া আবশ্যক। জীবের মাধুর্য (ভক্তির সারাংশ) ঈশ্বরে অর্পিত হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য জীবে অর্পিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে মুক্ত অবস্থায়

ঐশ্বর্য-মাধুর্যের একত্র সন্নিবেশে উভয়ের অতীত অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

জীবের মাধুর্য = তাহার ইচ্ছার সারাংশ — জীবের আত্মসমর্পণ।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য = তাঁহার ইচ্ছার সারাংশ — ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ। সুতরাং পূর্ণতার পথে উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে — প্রেমে ভগবান বশ হন। অর্থাৎ প্রেম বা মাধুর্য বা জীবকৃত আত্মসমর্পণের ফলে যদি ঈশ্বরও জীবকে আত্মার্পণ করেন, তাহাকেই জীবের নিকট অধীন হওয়া বলে। ঈশ্বরের জীবে আত্মার্পণ করা মানেই জীবের লাভ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া, God in Man ও Man in God মিলিয়া যায়।

কিন্তু উভয়ের পক্ষেই নিরপেক্ষভাবে উভয় অসম্ভব। ঈশ্বর জীবকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না, জীব যদি সেইরূপ না করে। জীবও ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না, ঈশ্বর যদি সেইরূপ না করেন। স্বভাবের কৃপা হইলে উভয়ই যুগপৎ হইতে থাকে।

আমি থাকা পর্যন্ত, বিন্দু থাকা পর্যন্ত, কাঠিন্য থাকে, পার্থক্য থাকে, গলিয়া গেলে চারিদিকে ঢলিয়া পড়ে। জীব যখন গলিয়া যায় (প্রেমাবস্থায়) তখন আর জীব বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকে না। চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। ইহাই তাহার আত্মসমর্পণ, জীবত্বের বিলোপ, ঈশ্বরত্ব লাভ এক হিসাবে, তাৎকালিক, তদ্রূপ ঈশ্বরের আত্ম-সমর্পণ হইলে ঈশ্বরত্ব কিছু থাকে না, ছড়াইয়া যায়, জীবত্বলাভ হয়, মাধুর্য ফোটে — এক হিসাবে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে গলাইতে না পারিলে জীব ঐশ্বর্য পাইবে কোথায়? জীবকে গলাইতে না পারিলে ঈশ্বর মাধুর্য পাইবে কোথায়? উভয়ই দ্রুতিনিমিত্ত ব্যাপকতামূলক।

তিন

পর্দার পরপারে ঈশ্বর জীবকে চায় ও পায় — নিত্য জীবও ঈশ্বরকে চায় ও পায়; নিত্য। উভয়ই নিত্য মিলিত, ইহাই ভালবাসা। ছাড়াছাড়ি নাই, মনের পরপারে জীবের বিষয়-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগ স্বাভাবিক, নিত্য। মায়ার পরপারে ঈশ্বরের জীব-প্রেম স্বাভাবিক, নিত্য। যোগাবস্থা।

কিন্তু এপারে জীব ঈশ্বরকে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরও যেন জীবকে ভুলিয়া গিয়াছেন। 'যেন' বলিলাম কারণ, জীব অস্পষ্ট ভাবে

তাঁকে সদাই চায়, বিষয়জগতে আনন্দের ছলে (বাহানায়) তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়ায়। ঈশ্বরও তদ্বৎ অস্পষ্টভাবে জীবকে সদা চান। নতুবা তাঁহার বহুমুখী বহির্মুখী বৃত্তি কেন? ইহার মূল করুণা, নিমিত্ত দুঃখ। জীব যেমন না জানিলেও আনন্দ চায়; তিনিও তেমনি দুঃখ চান। এই আনন্দেই জীব তাঁহাকে পাইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহাতে মিলন পায়। এই দুঃখেই ঈশ্বর জীবকে ধরিতে পান বলিয়া ক্ষণেকের জন্য জীবের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন। করুণার মূল এইখানেই।

চার

দেবতারাও স্বাধীন নহেন — তাঁহারাও নিয়মের অধীন, তাঁহাদের ক্ষমতা অনেক। কিন্তু তাঁহারা ভগবদিচ্ছা বা নিয়তি বা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা শুধু কর্মের ফলদাতা। কর্মের নেতা কে? জীব নয়, দেবতা নয় — স্বভাব বা ভগবান্। ফলেরও তাই।

যিনি অন্তর্যামী হইয়া কর্মে প্রেরণা দেন, তিনিই আনন্দরূপ ফল দান করেন। ফল দিতে হইলে তিনিই কর্ম করাইয়া লন। মনে হয় — কর্ম হইতেই ফল হয়, তাহা নহে। কর্ম যে করিতে প্রবৃত্তি হয়, সামর্থ্য হয়, — ইহাও তাঁহার কৃপার অঙ্গ।

নিজের চেষ্টায় কিছু হয় না, দেবতারাও অর্থাৎ অন্যেও কিছু সাহায্য করিতে পারেন না, করেনও না। এই অবস্থায় সব অবস্থা ভাঙ্গিয়া যায়। নিজের উপর আস্থা থাকে না, অন্যের উপরও আস্থা থাকে না। দুই-ই সমানরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই নিরাশ্রয় ভাব — নিজেকে বা অপরকে, কাহাকেও আশ্রয় করিতে পারা যাইতেছে না। বোধহয় ইহাকেই দীনতা বলে, — ইহাই meekness। এই ভাব খাঁটি হইলেই পূর্ণের দৃষ্টি পড়ে। কারণ, অভাবের পূর্ণতা ভিন্ন ভাবের উন্মেষ হওয়ার উপায় নাই।

যখন পূর্ণের দৃষ্টি পড়ে তখন নিজের মধ্যেও তাহাকে পাওয়া যায়, বাহিরে — অন্যেও — তাহাকে পাওয়া যায়। নিজের মধ্যে উহাই পুরুষকার বা পৌরুষ, অন্যের মধ্যে উহাই কৃপা। বস্তুতঃ দুই-ই একই ব্যাপারের প্রকাশ।

এটি ভুলিয়া গেলে পুরুষকারের ফলে কৃপার বিকাশ বা কৃপার ফলে পুরুষকারের বিকাশ — ইহার মীমাংসা হয় না।

জীব কর্মের কর্তা।

ঈশ্বর ফলদাতা।

কর্মের একটা সাধারণ ও ব্যাপক রূপ আছে — যে কোন কর্মই হউক, তাহারই প্রকারভেদ মাত্র। তেমনই ফলেরও একটা ব্যাপক রূপ আছে — সকল প্রকার ফল তারই অবস্থাভেদ। কর্ম করার একটা অনুভূতি আছে, — স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে গেলেই একটা সংঘর্ষজন্য তাপ অনুভব করা যায়। বোধক্ষেত্রে ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া যদি এই তাপ সহা যায়, তাহা হইলে একটা শীতলতা বা আনন্দ বোধক্ষেত্রে অবশ্যই পাওয়া যাইবে, ইহাই ফল। কোন্ কর্ম হইতে কোন্ ফল — এখানে সে বিচার ওঠে না। ঐভাবে যদি কর্ম করা যায় যে কোন কর্মই হউক্ — তাহা হইলে উহা হইতে যে কোন ফল লাভ হইতে পারে। নির্দিষ্ট ফলের দিকে আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া ঐ প্রকার কর্ম করিলে নির্দিষ্ট ফলই মিলিবে। কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। কারণ, অসীম শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ কার্যসাধন অনুচিত — তাহাতে ক্ষতি আছে। নির্দিষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে নির্দিষ্ট কর্ম করাই বিধি। তাতে কখন ক্ষতি হয় না।

বোধক্ষেত্রে ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া নির্দিষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিলে ঐ কর্মের ফলবিশেষের দাতা ভগবানই হন। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে ফলের quality, kind ও quantity সব অনির্দিষ্ট থাকে সুতরাং ফল যে কোন প্রকার ও যে কোন পরিমাণ ঐ সাধারণ কর্ম হইতে প্রয়োজন অনুসারে আপনিই আবির্ভূত হয়। কেন না, ভগবৎ প্রসন্নতা বা প্রীতিই সাধারণ কর্মের লক্ষ্য। যদি তাহা সিদ্ধ হয় — তবে তাহা হইতে যে কোন ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ভগবানকে সম্মুখে না রাখিয়া কর্ম করিলে ঐ কর্মের উপর জড়শক্তির প্রভাব পড়িয়া থাকে। এই প্রভাবই নানাপ্রকার বিঘ্নরূপে অনুভূত হয় ও কর্মের বেগকে মন্দীভূত করে এবং লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

———

আমি কে ?

মনুষ্যজীবনের অভিব্যক্তি ও পরম আদর্শ

এক

চিন্তাশীল সকল মানুষের জীবনেই অন্তর্দৃষ্টি উন্মেষের পটভূমিকাতে নিজেকে জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। আমি কে? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব? আমার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই সমস্ত আনুষঙ্গিক প্রশ্ন ঐ মূল আকাঙ্ক্ষারই অন্তর্গত। ইহাই আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং ইহারই সমাধানের উপর মানুষের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, বুদ্ধিমান, অজ্ঞানী নির্বিশেষে সকলের মনেই এই সরল অথচ গভীর প্রশ্নের উদয় হয় — 'আমি কে,' কোঽহম্? দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতি যে আমি নহি এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে। কিন্তু আমি বস্তুতঃ কে, সে ধারণা অনেকেরই নাই। তাই দেহাদি হইতে পৃথক্‌রূপে নিজকে জানিলেও উহাকেই নিজের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনা যায়, 'আমিই সেই,' সোঽহম্। ইহাই আমার প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু আবার প্রশ্ন উঠে, সেই বা কে? তাহারই বা স্বরূপ কি? তাহাকে চিনিবার উপায় কি? তাহাকে চেনাই কি আমাকে চেনা? তাহাকে পাওয়াই কি নিজকে পাওয়া? পর কি কখনও আপন হয়?

তবে কি বুঝিতে হইবে, আপন পর হইয়াছে, তাই আবার তাহাকে আপন করিয়া লইতে হইবে? বস্তুতঃ আপনই বা পর হয় কেন? ইহার মূলে কি ভ্রম আছে? না, ইহা লীলা মাত্র, কিংবা স্বভাবের প্রেরণা? অথবা ইহার এমন কোন হেতু আছে যাহা জানিবার উপায় নাই, যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে হেতুও বলা চলে না?

কিন্তু মূলে আপন-পরই বা কোথায়? সেখানে বহু নাই, দুই নাই, যুগল নাই, একমাত্র স্বয়ং বা স্বয়ংরূপ নিত্য বিরাজমান। উহা রূপ হইয়াও অরূপ এবং অরূপ হইয়াও রূপ। উহাই একমেবা-দ্বিতীয়ম্ — উহাই একমাত্র। কিন্তু 'এক' বলিয়া বোধ সেখানে

নাই। উহাই চরম ও পরম সত্য। ওখানে দ্বৈত নাই, অদ্বৈতও নাই, সৎ, অসৎ প্রভৃতি কোন বিকল্পই নাই — উহা বিশ্বের অতীত অথচ বিশ্বাত্মক, একসঙ্গে উভয় অথচ অনুভয়। উহাই সব, উহাতেই সব। অথচ উহাতে কিছুই নাই। আবার কিছু না থাকিয়াও সবই আছে। এই নিগূঢ়তম অব্যক্ত স্থিতিটি যোগিসমাজে পরম সাম্যরূপে, জ্ঞানি-সমাজে পূর্ণব্রহ্মরূপে, রসিক মহলে রসস্বরূপে বর্ণিত হয়। ইহাই সচ্চিদানন্দের স্বরূপ-স্থিতি ও স্বরূপ-লীলা উভয়ই।

দুই

এই মহাসত্তাতে হঠাৎ যেন একটি স্পন্দন উঠে।* কিন্তু এই স্পন্দনের উদয় সত্ত্বেও মহাসত্তার নিঃস্পন্দতা যেমন ছিল তেমনই থাকে। এই স্পন্দন একবার মাত্র ওঠে, অথবা নিরন্তর ওঠে, তাহা মনুষ্যের গণ্ডীবদ্ধ ভাষাতে নির্দেশ করিয়া বলা কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে একবার মাত্র ওঠে ইহা যেমন সত্য, নিরন্তর উঠিতেছে ইহাও তেমনই সত্য। কারণ সামান্যরূপে যাহা এক, বিশেষরূপে তাহা নানা। কালের তরঙ্গে নানাপ্রকার দর্শন স্বাভাবিক, কিন্তু কালের ঊর্ধ্বে মহাকালের বক্ষে স্পন্দনের নানাত্ব লক্ষিত হয় না — মহাকালের একই স্পন্দন কালের রাজ্যে অনন্ত স্পন্দনরূপে ফুটিয়া উঠে। এই নিঃস্পন্দ-স্পন্দাত্মক যুগল অবস্থাই বিশ্বের অতীত স্থিতি। ইহারও যেটি অতীত অবস্থা সেইটিই চরম-পরম অবস্থা। এই অতীতের অতীত সত্তা নির্বিকল্প অদ্বৈত স্থিতিরূপে স্বীকৃত হইলেও ইহাকে ঐভাবে নির্দেশ করা চলে না। কেহ কেহ ইহাকে পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপস্থিতি বা আনন্দময়ী নিষ্ঠা বলিয়া উল্লেখ করেন।

এই স্পন্দোদয়টি বাস্তবিক পক্ষে প্রকারান্তরে প্রণবের উল্লাস, অর্থাৎ পরব্রহ্ম-সত্তাতে শব্দ-ব্রহ্মের আবির্ভাব। বস্তুতঃ ইহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মহামায়ার উন্মেষ, যাহার প্রভাবে পরব্রহ্মের স্বরূপের সন্ধান, জ্ঞান ও সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। এক হিসাবে ইহা নিত্যসিদ্ধ অবস্থা হইলেও বুদ্ধিক্ষেত্রে ইহা চরম-পরম-দশার পরক্ষণবর্তী বলিয়া প্রতি-ভাসমান হয়। চরমস্থিতিটি স্বয়ংপ্রকাশ বোধরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে অন্তর্বিশ্লেষণরূপ স্ব-স্বরূপের অবধান অথবা অনবধান

---

* ইহাকে ভাস্কর রায় সৌভাগ্যভাস্করে বলিয়াছেন, 'ঝটিত্যুচ্ছলনাকার-প্রতিভোন্মজ্জনাত্মকঃ অন্তঃ পরিস্পন্দঃ।'

কিছুই থাকে না। উহা ইতর নিরপেক্ষ স্ব-স্বরূপে স্বতন্ত্র স্থিতি। উহা কেবল-ব্রহ্মভাব মাত্র। কিন্তু মহামায়ার দশা বা মায়ার দশা শবল-ব্রহ্মভাবরূপে বর্ণনীয়।

পূর্ণানন্দময়ী নিষ্ঠা বা স্ব-স্বরূপে স্থিতি চিৎ ও সতের অবিভক্ত প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মহামায়া ও মায়ার স্থিতিতে যেন চিৎ হইতে সতের এবং সৎ হইতে চিতের বিভাগ ঘটে। সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ অদ্বয় স্থিতির উপর স্পন্দনের উদয়ে প্রণবের আত্মপ্রকাশ নিবন্ধন একদিকে চিৎ ও অপরদিকে সৎ যেন অনাদি সিদ্ধরূপেই ফুটিয়া উঠে। ইহাই বিরুদ্ধভাবের প্রথম স্ফুরণের পৃষ্ঠভূমি। চিতের দিক্‌টাতে যেন চিরজাগ্রদ্‌ভাব ও সতের দিকে সুষুপ্তির ভাব বিদ্যমান থাকে। অবিভক্ত স্বরূপটি ভাবাতীত, গুণাতীত ও নিঃস্পন্দ। কিন্তু বিভক্তবৎ সচ্চিৎ স্বরূপটির একদিকে (চিতের দিকে) বহিরংশে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শুদ্ধা প্রকৃতি ও অপরদিকে (সতের দিকে) ত্রিগুণময়ী মলিন প্রকৃতি বা মায়া অবস্থিত রহিয়াছে জানিতে হইবে। ভাবাতীতের উপর ভাব যেন একটি আবরণ। স্বচ্ছ-জ্ঞানময় আলোকের আবরণই হউক অথবা গাঢ় অজ্ঞানাত্মক অন্ধকারের আবরণই হউক, উভয়ই ভাবাতীত নগ্ন-স্বরূপের স্বেচ্ছাগৃহীত আচ্ছাদন, ইহা মানিতেই হইবে। ইহার মূলে রহিয়াছে প্রণবের উন্মেষ। অবধূত মতে এই মহামায়া — প্রণব-পুরুষের অর্দ্ধ মাত্রা এবং মায়া তাহার তৃতীয় মাত্রা বা 'ম'-কার। জল জমিয়া হিমশিলাতে পরিণত হয় এবং ঐ হিমশিলা জলের উপরেই যেন ভাসিতে থাকে ও জলকে যেন আবৃত করে। বস্তুতঃ জলের স্বরূপ আবৃত হয় না, হইতেও পারে না। অথচ একটা আবরণের ও আবরণ-ভঙ্গের অভিনয়ও যেন হইয়া যায়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। অভিনয় যে করে সেই আবার সাক্ষী হইয়া নির্লিপ্তভাবে অভিনয় দর্শন করে। আবার অভিনয় করেও না, দেখেও না। পক্ষান্তরে ঐ অভিনয় দেখিয়া সাক্ষিভাব হারাইয়া ফেলে ও আত্মবিস্মৃতবৎ এবং মুগ্ধবৎ হইয়া ও কর্তা সাজিয়া সুখ-দুঃখরূপ সংসার-ভার বহন করিতে থাকে। সবই যুগপৎ।

এই যে বিশুদ্ধ সত্ত্বের কথা বলিলাম ইহা পরব্রহ্মের স্বাভিন্ন পরা-শক্তির প্রথম উন্মেষিত একটি পরিণতি, যাহা পরব্রহ্মের মহাকারণ বা মহামায়া-শরীরের উপাদান ও তাঁহার স্ব-স্বরূপের জ্ঞানরূপ বলিয়া উক্ত স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ প্রকাশ হইয়াও উহার আবরণ মাত্র। বস্তুতঃ

স্বয়ংপ্রকাশ স্ব-স্বরূপ ইহারও অপেক্ষা রাখে না। মহামায়া-শরীর প্রণবের বীজ-পদবাচ্য ও পরনাদ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এইটি নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যশুদ্ধ অবস্থার দিক্। আর একটা দিকের কথা বলা হইয়াছে যেখানে স্ব-স্ব-রূপের বোধই থাকে না; ইহাও সঙ্গে সঙ্গেই আছে। কিন্তু বুদ্ধিক্ষেত্রে ইহাকে শুদ্ধ সত্ত্বের পরবর্তী বলিয়া ক্রমমধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে দুইটি স্থিতিই যুগপৎ-সিদ্ধ এবং ক্রমহীন। পরব্রহ্ম নিজকে নিজে জানেন ইহাও যেমন অনাদিসিদ্ধ তেমনি তিনি নিজকে নিজে জানেন না ইহাও অনাদিসিদ্ধ। তবে বুদ্ধির প্রতিভাসে উভয়ের মধ্যে একটা কল্পিত ক্রম মানিয়া নেওয়া যায়। জানা-অজানার অতীত সত্তার উপর জানা-অজানার এই দুইটি দিক্‌ও আরোপিত, ইহাও সত্য।

'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'ব্রহ্মৈবাহং' এই জ্ঞানই পরমেশ্বরের আপন স্বরূপের জ্ঞান বা মহামায়া। যে স্থিতিতে এই জ্ঞানের তিরোধান ঘটে — সেখানে স্ব-প্রকাশ অদ্বয় জ্ঞান মাত্রের প্রকাশ থাকে, যাহা তত্ত্বাতীত পরম তত্ত্ব। যে স্থিতিতে এই জ্ঞানেরও তিরোধান হয় ও স্বপ্রকাশ অদ্বয় জ্ঞান মাত্রও ভাসে না তাহাই অজ্ঞান বা মায়া। এইটি প্রলয়াত্মক স্থিতি।

শরীর থাকিলেই অভিমান থাকে। চরম-পরম অবস্থা ব্যতীত সকল অবস্থাতেই শরীর থাকে ও তাহার অভিমানী পুরুষও থাকে। মহাকারণ ও মহামায়া শরীরের অভিমানী পরব্রহ্মের ঈশ্বর বা সদাশিব মূর্তি। তদ্রূপ তাঁহার কারণাত্মক মায়াশরীরের অভিমানী তাঁহার রুদ্রমূর্তি।

তিন

প্রশ্ন হইতে পারে, ভাবাতীত স্থিতি হইতে আদি ভাবময় ও মহাভাব-স্বরূপভূত মহামায়ার বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব কি প্রকারে ঘটে? ইহা অত্যন্ত গম্ভীর প্রশ্ন। মানবীয় বুদ্ধি ইহার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারে না বলিয়া পরব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানময় বুদ্ধ অবস্থা ও নিত্য অজ্ঞানময় জড় অবস্থা, অর্থাৎ তাঁহার অনাদি জাগরণ ও অনাদি নিদ্রা, উভয়কেই নিত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। মহামায়া ও মায়ার ক্ষোভের পরবর্তী প্রবাহ-নিত্য অবস্থাকেও নিত্য বলা হয়, যদিও এই উভয় নিত্যতাতে পার্থক্য লক্ষিত হয়। চরম-পরম স্থিতি ক্ষোভের

অতীত ও স্পন্দাতীত বলিয়া নিত্য ও অনিত্য উভয়ের অতীত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রহস্যবিদ্ যোগী জানেন যে যবনিকার অন্তরালে মহাশক্তির নির্মাণশালাতে স্পন্দনের খেলা নিরন্তর চলিতেছে বলিয়া রচনার কার্য সর্বদা গুপ্তভাবে চলিতে থাকে। বস্তুতঃ প্রণবের অর্দ্ধ-মাত্রাই বা কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি ও মহাজনগণের বচন হইতে জানা যায় যে প্রণবের এমন একটি স্বরূপ আছে যেখানে মাত্রা না থাকিলেও ('অমাত্র') অনন্ত মাত্রা আছে, এবং অনন্তমাত্রা ('অনন্তমাত্র') থাকিলেও মাত্রা নাই। উভয়ই পূর্ব-বর্ণিত ভাবাতীতের অন্তর্গত। কিন্তু সৃষ্টি-সঙ্কল্পের সমকালে যে পরম পুরুষের উত্থান ঘটে তাহাতে 'এক'-ভাবের স্ফূর্তি হইয়া উহা হইতে 'নানা'-ভাবের বিস্তার হয়। এই একভাবের স্ফুরণের পৃষ্ঠভূমিতে শুদ্ধ মনোময় সত্তাতে খণ্ড খণ্ড অনন্ত ভাবের আভাস জাগিয়া উঠে। ইহা যোগমায়া রাজ্যের ব্যাপার। অবয়বের সমষ্টিতে যেমন অবয়বী সিদ্ধ হয় — তেমনি অবয়বীর স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াও স্বীকার করা আবশ্যক। দ্রব্য গুণের সমষ্টিমাত্র অথবা গুণ হইতে অতিরিক্ত, শিব শক্তির সঙ্ঘাতরূপী অথবা শক্তি হইতে ভিন্ন, প্রকৃতি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থামাত্র অথবা উহা হইতে বিলক্ষণ, এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টি অনুসারে সত্যের বিভিন্ন রূপ সমরূপেই প্রামাণিক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্থান-ভেদে সব মতই উপাদেয়।

অতীত অবস্থা হইতে যখন 'এক' আবির্ভূত হয় তখন ক্ষণমাত্রেই হয় ও অখণ্ডভাবেই হয় — তাহাতে ক্রম থাকে না। সর্ব-সমষ্টি যুগপৎ প্রকট হয়। ইহা নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার অবস্থা। কিন্তু অন্তরালবর্তী রহস্যজাল ভেদ করিতে পারিলে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাতে বিজ্ঞানবিৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। তাই "আশ্চর্যবৎ পশ্যতি" বলিয়া বিস্ময়ের প্রকাশ করা হয়। একের মধ্যে যে অনন্তের খেলা চলিতেছে তাহা দেখিতে পাইলে চকিত না হইয়া থাকিবার উপায় নাই। এক-মাত্রাই একাগ্র মনের মাত্রা, যাহার উপর সৃষ্টির সামূহিক জ্ঞান বা বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। এককে ভাঙ্গিতে গেলেই সর্বপ্রথমে দুইটি ভাগের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুইটি ভাগই গুণপ্রধান-ভাববর্জিত সাম্যে স্থিত হইয়া অদ্বয়রূপে বা একরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভাঙ্গিবার সময় এক প্রথমে দুইরূপে বিভক্ত হয়। সেই জন্য একমাত্রা হইতে অর্দ্ধমাত্রাতে উন্নয়ন ঘটে। একে প্রকাশ পায় দুইটি অর্দ্ধমাত্রা।

তন্মধ্যে একটি একের দিকে যুক্ত থাকিয়া একে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে শক্তিরাজ্যের সম্বন্ধ অচ্যুত রাখে। অপরটি ক্রমশঃ পূর্ববৎ অর্দ্ধমাত্রাক্রমে বিভক্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে প্রধাবিত হয়। অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা দ্বিধা বিভক্ত হইলে তাহা হইতেও আবার অর্দ্ধমাত্রা জাত হয়। এই স্থলেও উহার এক অর্দ্ধমাত্রা প্রথম অর্দ্ধমাত্রার দিকে যুক্ত হয় ও দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আদিদৃষ্টি সম্মত এক চতুর্থাংশ মাত্রা অনন্তের দিকে ধাবমান হয়। এই সকল মাত্রা মনেরই মাত্রা। সুতরাং একমাত্রা মন হইতে অর্দ্ধমাত্রা মন সূক্ষ্ম। তাহা হইতে এক চতুর্থাংশ মন আরও সূক্ষ্ম। এইভাবে মন ক্রমশঃ পিষ্ট হইয়া চূর্ণাকার ধারণ করিতেছে বুঝা যায়। এই বিভাগ বা বিশ্লেষণের ক্রমের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম-স্থান নাই। ব্যবহারের অনুরোধে বিশ্রান্তি মানিতে হয়।* যোগিগণও তদ্রূপ মনোবিশ্লেষণের ব্যবহার-সম্মত একটি অভাব-স্থান স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ১/৫১২ মাত্রার পর। যুক্তির দ্বারা ইহাকেও বিভাগ করা চলে। কিন্তু পরিমিত-শক্তি যোগী যত ঐশ্বর্যবল-সম্পন্নই হউন না কেন, তাঁহাকে কোথাও বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়। অমিত শক্তি অধিকারে থাকিলে এই অবধিই হইবে ১/অনন্ত মাত্রা। ইহাই পরব্রহ্মাভিন্ন মহাশক্তির মাত্রা। মহাযোগিগণ ইহাকেই ব্রহ্মের অণু বলিয়া 'পরমাণুরূপে' নির্দেশ করেন।

বিজ্ঞানদৃষ্টিতে যাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইতে নিরোধের দিকে অভিমুখীন গতির বিশ্লেষণ করিতে পারেন তাঁহারা পূর্বোক্ত আলোচনার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অনন্ত মাত্রাকে যোজনা করিয়া একমাত্রাতে পরিণত করা জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহা মহামায়ার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সাধকের বা যোগীর ব্যক্তিগত পুরুষকার সাধ্য ব্যাপার নহে। এককে পাইতেই হইবে অথবা অর্ধমাত্রাকে

---

* যেমন বৈশেষিক আচার্যগণ অনিত্যদ্রব্যের বিভাগ কল্পনাতে অবধি স্বীকার করিয়া তাহাকে পরমাণু বলিতেন। কিন্তু বৌদ্ধাদি দার্শনিকগণ এই প্রকার অবধি স্বীকার করিতেন না। বস্তুতঃ বৈশেষিক-সম্মত পরমাণুও যে সঙ্ঘাত মাত্র ইহা যোগভাষ্যকার ব্যাসদেবও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। অযুতসিদ্ধ অবয়ব-সঙ্ঘাতই পরমাণু, ইহাই তাঁহার মত। বস্তুতঃ এই অবয়বেরও বিভাজ্যতা আছে। প্রকৃত পরমাণু তাহাই 'যাহা সত্যই অবিভাজ্য'। তাহাই ব্রহ্মাণু বা আগম শাস্ত্রের কলা।

ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শূন্যে পরিণত করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা মানবীয় সামর্থ্যের অতীত। তাই মহাকরুণার আশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ৫ইহ মাত্রা যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ভাঙ্গিতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া পুরাপুরি কৃৎস্নভাবে অর্পণ করিতে হয়। তাহাতেই সমনা হইতে উন্মনা ভূমিতে প্রবেশ লাভ ঘটে, নতুবা নহে। মনের দ্বারাই মনের অতীত ভূমিলাভ সম্ভবপর।

যাহাকে পূর্বে মহামায়া বলিয়াছি তাহারই আর একটা দিক যোগমায়া। এই যোগমায়ার রাজ্যই অর্দ্ধমাত্রার লীলা-নিকেতন। এক অর্দ্ধমাত্রা হইতে অনন্ত বিভজ্যমান অর্দ্ধমাত্রা ইহার অন্তর্গত জানিতে হইবে। ইহাই বিজ্ঞান-রাজ্য. বৈন্দব জগৎ, অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, জ্ঞানানন্দময় লীলাভূমি। অর্দ্ধমাত্রাই যোগমায়া। মায়াটি কারণ-সমুদ্র। কার্যাত্মক মায়িক জগতের উদ্ভব ঐ কারণ-সমুদ্র হইতে হইয়া থাকে। নিষ্কল স্থিতি হইতে স্পন্দ সহকারে কলাময়ী প্রকৃতির উন্মেষ হইলে উহার কিছু কলা ঐ কারণ-সলিলে পতিত হয়। এই সকল কলা কারণ সলিলে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার পর যোগমায়ার আবির্ভাব হয়। মহামায়ার জগৎ শুদ্ধ বিশ্বের রূপ, মায়া-জগৎ মলিন বিশ্বের রূপ এবং যোগমায়া বিশ্বে ভগবৎ-লীলার সংযোজন-কারিণী আদিশক্তি অর্দ্ধমাত্রা। কারণ-সলিল হইতেই কালের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক।

চার

স্বাতন্ত্র্যবশতঃ যখন স্পন্দনের উদয় হইল তখন একদিকে যেমন সর্বজ্ঞ নিত্য জাগ্রৎ অবস্থার আবির্ভাব হইল অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানহীন অনাদি-নিদ্রাময় একটি অবস্থা আবির্ভূত হইল। প্রথমটি মহান্ এবং দ্বিতীয়টি অণু, অর্থাৎ অনন্ত অণুর সামূহিক স্বরূপ। যিনি মহান্ তিনি নিত্য-বুদ্ধ পরমাত্মা ও এক এবং যিনি অণু তিনি অনন্ত অণুর সঙ্ঘাতরূপী সুষুপ্ত মহাসত্তা অর্থাৎ নানা। যদিও বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে সংকোচ বশতঃ অণুভাবের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অণু মায়া-কবলিত হয় তথাপি ইহা সত্য যে এই স্থিতিতে কালগত ক্রম থাকে না বলিয়া ক্রমিক ব্যাপার লক্ষিত হয় না।

অণুত্ব মহামায়াকৃত সঙ্কোচ, যাহার ফলে স্বরূপগত অহংনিষ্ঠ পূর্ণতার অভাব হয় এবং অহংকে আশ্রয় করিয়া ইদংরূপের বা দ্বিতীয় ভাবের উদয় হয়। নির্বিকল্প অদ্বয় সত্তাই মূল। বুদ্ধির দৃষ্টিতে উন্মেষকালে প্রথমে হয় অভেদ-দর্শন, এবং তাহার পর এই অভেদ-দর্শন মায়াতে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর মায়া হইতে উত্থিত হইলে ভেদ-দর্শন আরম্ভ হয়। শিবাবস্থাতে অভেদ-দর্শনের মূলে আত্মাতে আত্মভাব বজায় থাকে। ইহাই নিত্য জাগ্রৎ অবস্থা। এইখানে একটি ধারা আছে তাহাই মহামায়ার জগৎ, যেখানে দুই প্রকার চেতন সত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয় — একটিতে অহন্তার লোপ হয় নাই অথচ তাহারই উপরে ইদন্তার আভাসনে বিশুদ্ধ অধ্বার বিকাশ হইয়াছে; অপরটিতে কিন্তু অহন্তার লোপ হইয়াছিল এবং তাহার পর উহার অঙ্গরূপে ইদন্তাকে আশ্রয় করিয়া অহন্তার পুনরুদয় হইয়াছিল। এই অবস্থাতেই সাংসারিক জীবরূপে কর্ম করিয়া ও তাহার ফল ভোগ করিয়া জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া গিয়াছে। অবশেষে বিবেক-জ্ঞানের উদয়ে ইদংভাবে আশ্রিত অহংবোধ নিবৃত্ত হইয়াছে এবং আত্মস্বরূপে অহংবোধের পুনর্বার উদয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার চেতন সত্ত্ব দিব্যসৃষ্টির অন্তর্গত। ইহারা নিত্যসিদ্ধ। যদিও এই সৃষ্টিতেও ইদন্তার আভাস স্তরানুসারে ক্রমিকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবু এই ভূমিতে মলিন মায়ার স্পর্শ মোটেই নাই। দ্বিতীয় প্রকার চেতন সত্ত্ব মায়িক জগতে পতিত হইয়া পুনরায় মায়া হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ শিবত্বের উপলব্ধি এখনও ঘটে নাই। এই দ্বিতীয় প্রকার সত্ত্ব যথাসময়ে শিবত্ব লাভ করিবে। কিন্তু প্রথম প্রকার সত্ত্ব কখনই শিবত্ব লাভ করিবে না। কারণ ঐ সকল সত্ত্ব জগৎ-ব্যাপারের জন্য আবশ্যক সৃষ্টির অন্তর্গত।

মায়াগর্ভে অনন্ত জীবাণু প্রসুপ্ত রহিয়াছে। এই প্রসুপ্তি কালের অন্তর্গত নিদ্রাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা অনাদি-সুষুপ্তি। এই সকল জীব অণুরূপী হইলেও প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাব বিদ্যমান। ইহাই তাহাদের স্ব-ভাব। সৃষ্টিকালে যে বৈচিত্র্য ঘটে ইহাই তাহার কারণ। এই বৈচিত্র্য কর্মনিবন্ধন নহে। যে অনাদিকাল হইতে নিদ্রামগ্ন তাহার কর্ম কোথায়? নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে যথাসময় কর্ম আরম্ভ হইবে — মনুষ্য-দেহে। যতক্ষণ নরদেহ লাভ না ঘটে

ততক্ষণ কর্মের সূত্রপাত হয় না। চৌরাশী লক্ষ যোনিতে যে বৈচিত্র্য তাহা যোনিগত বৈচিত্র্য, কর্মগত নহে।

মায়াগর্ভে লীন অনন্ত জীব পরমাত্মারই অংশ বটে (ভিন্নাংশ), কিন্তু প্রত্যেকের ভেদ আছে। এই ভেদ চিরদিনই বিদ্যমান থাকে। এমন কি মুক্তিতেও ইহা তিরোহিত হয় না। অবশ্য ইহা দ্বৈত দৃষ্টির দিক্ হইতে বলা হইল। অদ্বৈত দৃষ্টিতে সকলেই শিবরূপী অর্থাৎ সকলেই পরস্পর পৃথক্ হইয়াও শিবরূপে অভিন্ন। আত্মগতবিশেষ এবং মূলের পৃথকত্ব প্রয়োজন অনুসারে মানিতেই হয়, কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে সকলেই সেই ভাবাতীত অদ্বয় সত্তা, যাহা এক হইয়াও নানা এবং নানা হইয়াও এক অথচ অব্যক্ত।

ব্যক্তি-জীবনের সার্থকতা তখনই সিদ্ধ হয়, যখন এই স্ব-ভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। 'শিবোহং' রূপে নিজের শিবত্বের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ ভাবেরও অনুভূতি জাগিলে ভাবাতীতে প্রতিষ্ঠা সার্থক বলা চলে। 'আমি কে ?' এই প্রশ্ন অত্যন্ত দুরূহ। এই প্রশ্নের উদয় ও সমাধানের জন্যই এই বিরাট জাগতিক লীলার সূত্রপাত হইয়াছে। কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির নানা সূত্র দ্বারা যুক্ত হইয়া অদ্বৈত মহাদর্শনে স্থিতি গ্রহণপূর্বক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে যোগমায়ার লীলাভূমিতে অভিনয়ের প্রক্রিয়া অবলম্বনে নিজরসের আস্বাদনের মধ্যেই এই প্রশ্নের সমাধান দৃষ্ট হয়।

পাঁচ

অনাদি-নিদ্রার ভঙ্গকালে জীব মায়া গর্ভ হইতে কালরাজ্যে ক্রমবিকাশের ধারাতে পতিত হয়। নিদ্রাভঙ্গের কারণ নিত্যজাগ্রৎ পরমাত্মার চৈতন্যময় উল্লাস। এই উল্লাস মায়াকে ক্ষুব্ধ করে ও তদ্‌গর্ভস্থিত জীবের দেহ মায়িক কলা দ্বারা রচনা করিয়া ও তাহাকে ঐ দেহে জড়িত করিয়া কালরাজ্যে প্রেরণ করে। মায়া যোনিরূপা — 'যোনেঃ শরীরম্'। শরীর যোনি হইতেই জাত হয়। প্রচলিত ভাষাতে আছে যে জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া সর্বশেষে মনুষ্য আকারে উপনীত হয়। ইহা খুবই সত্য।

পরমাত্মা নিজ অংশ জীবকে নিজ সত্তা হইতে বিভক্তবৎ করিয়া মায়াগর্ভে প্রক্ষিপ্ত করেন। ইহাই তাহার নিগ্রহ, ইহা পরমাত্মার ঈশ্বর-ভূমিকার অভিনয়। বস্তুতঃ পরমাত্মা স্বয়ংই অংশাত্মক অণু সাজিয়া

— নিজ হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথক্‌বৎ হইয়া — মায়াতে নিক্ষিপ্ত হন অর্থাৎ সদা-জাগ্রৎ পুরুষ তিরোধান-শক্তির প্রভাবে ঘুমাইয়া পড়েন। আবার তিনি অনুগ্রহশক্তির প্রেরণায় সদাশিব বা গুরুদয়ালরূপে স্বীয় চিন্ময়ী দৃষ্টি মায়াস্থিত জীবের দিকে নিক্ষেপ করেন, যাহার ফলে সুপ্ত জীব জাগিয়া উঠে। মায়ার গর্ভে জীবাণু দেহ ইন্দ্রিয়াদি বর্জিত হইয়া মূর্চ্ছিতবৎ থাকে, কিন্তু জাগিয়াই নিজের অনুরূপ দেহাদি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমবিকাশের পথে চলে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন নিত্য জাগ্রৎ পুরুষ হইতে চিদংশ চিৎকণরূপে সুষুপ্তিময় মায়াতে প্রক্ষিপ্ত হয়, তেমনি সুষুপ্তির আবরণও অল্লাধিক নিত্য-জাগ্রৎপুরুষে সঞ্চারিত হয়। দুইটি ব্যাপারই একই সময়ে ঘটে। মায়ার সম্বন্ধ ব্যতীত মহানের অণুরূপতা প্রাপ্তি ও স্খলন ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে চিতের সম্বন্ধ-বিশেষ ব্যতীত মায়াও ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা জীবকে পরমাত্মার ভিন্নাংশ অথচ সনাতন অংশ বলেন তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকেই ক্রিয়া করিয়া থাকে।

সুষুপ্তি ভঙ্গের পর কালের স্রোতে আসিবার সময় জীব চিৎ-অচিৎ-মিশ্রভাব ধারণ করে। প্রধানতঃ চিদংশ আত্মরূপে ও অচিদংশ উহার আবরণ ও ব্যঞ্জক দেহরূপে প্রকাশিত হয়। আসল কথা, দেহাবচ্ছিন্ন ক্ষীণতম জ্ঞান ক্রমবিকাশের পথে অবতীর্ণ হয় ও দেহের ক্রমিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্ট হইয়া ক্রমিক পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। ইহারই নাম আত্মার চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ। ইহা হয় প্রকট ভাবে। কিন্তু জ্ঞানে যে অজ্ঞান প্রবিষ্ট হয় তাহা হয় গুপ্তভাবে। জ্ঞানের পৃষ্ঠভূমিতে অজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে অণুভাবের উৎপত্তি ও জ্ঞানের ক্রমসংকোচ অবশ্যম্ভাবী। তদনন্তর এইটি দুই ধারা মানুষে আসিয়া মিলিত হয়। দেহের ক্রম-বিকাশের সীমা চৌরাশী লক্ষ যোনির পর মনুষ্যদেহ প্রাপ্তিতে এবং জ্ঞানের ক্রম-সংকোচের সীমা অসংখ্য ক্রমনিম্ন চিদ্‌জ্ঞানের পর মানবীয় জ্ঞানে। এই মানবীয় জ্ঞানই অহং-জ্ঞান। অহং-জ্ঞান ইদং ভাবাপন্ন সম্যক্-অভিব্যক্ত মানবদেহকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাসরূপে পরিস্ফুট হয়।

ছয়

যদি বিকাশ ও সঙ্কোচের মার্গে সাতটি বিভাগ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, যেমন পরমাত্মা হইতে মানুষের স্থান সপ্তম তেমনি মানুষ হইতেও পরমাত্মার স্থান সপ্তম। অবশ্য বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধার জন্য এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। একদিকে নিদ্রিত আত্মা মহাসুপ্তিতে মগ্ন, অপর দিকে চিরজাগ্রৎ আত্মা অনাদি বোধ সহকারে পরম পুরুষরূপে বিরাজমান — যেন একই আত্মার দুইটি পৃষ্ঠ। শক্তির উল্লাসের ফলে সুষুপ্তির দিক্ হইতে স্বপ্নের মধ্য দিয়া গতি প্রবর্তিত হয় জাগরণের অভিমুখে। সঙ্গে সঙ্গে পরম জাগ্রৎ পুরুষের দিক্ হইতে স্বপ্নের মধ্য দিয়া সুষুপ্তির দিকে গতি চলে। মানবে আসিয়া বিন্দু-গর্ভে এই দুইটি ধারা মিলিত হইয়া এক হয়। এইজন্য মানুষের দেহে চৌরাশী লক্ষ যোনি ব্যাপক প্রাকৃতিক রচনার চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিকাশের সঙ্গে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত চেতনা ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতে হইতে জাগ্রৎ চেতনাতে পরিণত হয়। ইহাই মানবদেহে অভিব্যক্ত চেতনা। এই চেতনাতে প্রকৃত অহং-ভাবের স্ফূর্তি হয়। ইহা অতি মূল্যবান বস্তু। এই অহং ভাবটি ফুটাইবার জন্যই পরমাত্মার সুপ্তি ভঙ্গ হয় ও স্বপ্নাবস্থার পর্যাবসান হয়। ক্রম-বিন্যস্ত বিভিন্ন যোনির মধ্য দিয়া চেতনার ক্রমবিকাশের পথ প্রসারিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ কায়ার ক্রমিক বিকাশই পরিস্ফুট অহংরূপে চেতনার অভিব্যক্তি লাভের ক্রম। নর-দেহের রচনাতে এই বিপুল প্রাকৃতিক ধারার পরিসমাপ্তি হয়। ইহার পর কর্তৃত্বাভিমান-সম্পন্ন মানবে কর্মের উদয় দৃষ্ট হয় বলিয়া উহার ফলভোগের জন্য অনুরূপ ভোগায়তন বা দেহ-প্রাপ্তির প্রসঙ্গে সংসার জীবন আরব্ধ হয়। নরদেহের রচনার পূর্বে সংজ্ঞাহীন পাষাণ ও ধাতুরূপে, অন্তঃসংজ্ঞ উদ্ভিদ্‌রূপে, বহিঃসংজ্ঞ স্বল্প-চেতন কীট ও সরীসৃপরূপে ও তদনন্তর অধিক-চেতন পক্ষী ও পশুদেহরূপে আবির্ভাব হয়। ইহাই যোনিক্রম। যে ক্রম অবলম্বন করিয়া দেহের আবর্তন ঘটে তাহাতে সংস্কার সঞ্চিত হয়। শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মদেহ ও কারণ-দেহের রচনা হয় এবং অহংজ্ঞানের উদয় ও পুষ্টি হয়। চেতনার স্ফুরণ হইলে ইদংভাব বা অনাত্মভাব দেহরূপে ঘনীভূত হয়। অন্নময় দেহ ও প্রাণময় দেহ এই জাতীয় দেহ। মনোময় দেহে এই ইদংভাব বিশেষভাবে পুষ্ট হয়। তখন অহংভাবের আবির্ভাবের

ভূমিকা রচনা হয়। অহংভাব বিজ্ঞানের আভাস নিয়া মনুষ্য দেহে ফুটিয়া উঠে। অন্নময় কোষ হইতে বিজ্ঞানময় কোষ পর্যন্ত এই আভাসের বিকাশই ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তত্ত্ববিচারে পৃথিবী হইতে মহত্তত্ত্বের সীমা পর্যন্ত এই বিকাশের অধিকার জানিতে হইবে। সেইজন্যই মনুষ্যদেহ সমগ্র বিশ্বের প্রতীক। কারণ পিণ্ডমধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ রহিয়াছে। এই মনুষ্যদেহই ক্ষেত্র এবং ইহাকে যে যথাবৎ জানিতে পারে সেই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ।

আর একটি কথা। দেহরূপ এই অনাত্মবস্তু রচনার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে ওতপ্রোত হইয়া জ্ঞান জড়িত থাকে। ইহাই অহংভাবের অভিব্যক্তির প্রণালী। এই প্রণালীটি বড়ই অদ্ভুত। এখানে সব স্থানে সব তত্ত্ব আছে। ঐ যে মূল অজ্ঞান সত্তা ঐটিই প্রকৃতি, আর যেটি মূল জ্ঞান সত্তা সেইটি পুরুষ। প্রকৃতিতে অহং নাই ইহা সত্য, তদ্রূপ পুরুষেও অহং নাই, অথবা উভয়ত্রই অব্যক্তভাবে আছে। কিন্তু এই প্রকার থাকা বিচার-দৃষ্টিতে না থাকারই সমান। উভয়ের মিলনে অহংভাব জাগিয়া ওঠে। যোগশাস্ত্রে যেখানে অস্মিতার উদয় বর্ণিত হয় ঠিক তাহার পশ্চাতে অন্তরালে পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ রহিয়াছে। এই অহং-এর পূর্ণত্বই একাধারে পূর্ণ পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির মিলিত রূপ বা শ্রীভগবান্।

ভগবান্ হইতেই সৃষ্টি হয় — পুরুষ প্রকৃতির যোগেও হয় এবং সাক্ষাৎ ভাবেও হয়। প্রথমটি যোনিজ সৃষ্টি, যাহার বিকাশ ও বিস্তার চৌরাশী লক্ষ যোনিভেদে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়টি অতিমানস বা মহামানস সৃষ্টি। এই অতিমানস সৃষ্টি দিব্য আত্মার সংঘ। দিব্যসূরি, নিত্য আত্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ইহাদের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে যে Arch angel, Throne প্রভৃতির দিব্যচেতন বর্গের সন্ধান পাওয়া যায় তাহারা এই দিব্য আত্মার কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল চেতনবর্গ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপ। ইহারা তাঁহার সত্তা হইতে অব্যবহিত ভাবে বিসৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল আত্মা কখনও কালের প্রবাহে বা প্রকৃতি রাজ্যে অবতরণ করে না। ইহারা স্বভাবতঃ কিঙ্করভাবাপন্ন- ভগবৎ ইচ্ছা কার্যে পরিণত করাই ইহাদের স্বভাব, ভগবৎ আজ্ঞা পালনই ইহাদের একমাত্র কার্য। ইহাদের কোন ব্যক্তিগত অভাব নাই, তাই ইহারা নিত্য আনন্দময় ও নিত্য নির্মল। ইহারা স্বাতন্ত্র্য-

হীন। ইহাদের কখনও ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না। ইহারা রক্ত-হীন, জ্যোতির্ময়, অজয় ও অমর। ইহারা শ্রীভগবানের মহিমা ও বিভূতি স্বরূপ। ইহাদের অহংভাব নাই, কখন ছিলও না, হইবেও না। তাই ইহাদের স্বাতন্ত্র্যলাভের সম্ভাবনা নাই, আর ইহারা তাহা চায়ও না।

অহং-এর আবির্ভাব বড়ই রহস্যময়। মহাজনগণ বলেন, অজ্ঞানের ভঙ্গে অনাদি সুপ্তি হইতে যে জাগরণ হয় তাহাই অণুভাব বা পরিচ্ছিন্ন মলিন জীবভাবের প্রথম উদ্ভব। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের উদয় হয় ও দেহের ক্রম-বিকাশের ফলে মনুষ্য আকার প্রাপ্তির পর এই সংশয় জিজ্ঞাসার আকার ধারণ করে, অর্থাৎ 'আমি কে' এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হয়। ইহার সম্যক্ সমাধান বা মীমাংসার জন্যই এই বিরাট বিশ্বসৃষ্টির উপক্রম জানিতে হইবে। 'কোঽহং'রূপে সংশয় জাগে এবং 'সোঽহং'রূপে নিশ্চয়াত্মক অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে ঐ সংশয়ের অবসান হয়। ইহা সাক্ষাৎকারের ফল। 'কোঽহং' ও 'সোঽহং' এর মধ্যে সমগ্র মানব সৃষ্টি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্বপ্রথম বিশ্বের রচনা ও বিশ্বের সারনিষ্কর্ষরূপে মনুষ্য-দেহের অভ্যুদয়। মনুষ্যদেহ নির্মাণই প্রকৃতির বিশাল বিজ্ঞানাগারে মধুরতম ফল। কারণ মনুষ্যদেহ রচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশের সার্থকতা পাওয়া যায় না। নিত্য জাগ্রৎ পরমপুরুষকে ধরিবার জন্য প্রকৃতির এই বিরাট অয়োজন। কারণ মনুষ্যের আধার ভিন্ন অন্য কোন আধারে পরমপুরুষের ছায়া পড়ে না, অর্থাৎ অহং ভাবের সম্যক স্ফূর্তি হয় না। এইজন্য মনুষ্যদেহ ভিন্ন পূর্ববর্তী অন্য কোন দেহে ভগবৎ-দর্শন এবং নিজের ভগবত্তার অনুভূতি হইতেই পারে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার বলিয়াই নর পিণ্ডের এত মাহাত্ম্য। প্রথম খণ্ড কর্মের আবর্তন ও কর্মময় মনুষ্যের সংসার-ভ্রমণ ধরা যাইতে পারে। মনুষ্যদেহ সৃষ্টির পর ঐ দেহে 'অহম্' অভিমানের উদয় হইলেই কর্তৃত্বভাবের আবির্ভাব হয়। তখন কর্মের সৃষ্টি হয় এবং কর্মের তারতম্য অনুসারে উহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখের ভোগ হয়। এইভাবে কালের ব্যাপ্তি হিসাবে কোটি কোটি জন্ম বিভিন্ন দেহ আশ্রয়ে কাটিয়া যায়, এবং দেশের ব্যাপ্তি হিসাবে লোক লোকান্তরে পরিভ্রমণ সংঘটিত হয়। ভোগ করিতে করিতে এমন এক সময় আসে যখন আর কোন স্পৃহা থাকে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও

শব্দময় বাহ্য জগতে ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া গেলে চিত্ত স্বভাবতঃ বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত হয়। ইহার পর অন্তর্মুখী গতির আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে এই অন্তর্মুখী গতি অথবা বিষয়-জগৎ হইতে আত্মার প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস বিদ্যমান। এই দ্বিতীয় খণ্ডেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি দেহ হইতে ও জগৎ হইতে অহং-ভাবকে প্রত্যাহৃত করিয়া চরম স্থিতিতে, পূর্ণ আত্মস্বরূপে বিশ্রাম নিবার অবসর উদিত হয়। এইখানেই স্থূলসত্তা হইতে পরমাত্মা পর্যন্ত একটি সরল মার্গ পরিলক্ষিত হয়। স্থূল দেহ অথবা স্থূল জগৎ অতিক্রম করিতে না পারিলে, মার্গে প্রবেশ করা যায় না এবং পক্ষান্তরে মার্গে প্রবিষ্ট না হইলেও স্থূল জগৎ ও স্থূল দেহের অভিমান হইতে অব্যাহতির উপায় পাওয়া যায় না। সত্যস্বরূপ পরমাত্মা এই মার্গের লক্ষ্য। তিনি মার্গের অন্তর্গত নহেন।

পরিপূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা যেটি তাহাই শিবাবস্থা। জীবাবস্থা হইতে শিবাবস্থায় যাওয়া ব্যক্তজীবনের খেলা এবং শিবাবস্থা হইতে জীবাবস্থাতে আগমন অব্যক্ত জীবনের রহস্য। সৃষ্টি-উন্মেষের সঙ্গে আত্মাতে সঙ্কোচের ভাব আসে এবং অহং-এর প্রতিযোগিরূপে ইদংভাব ফুটিয়া উঠে। ইহার ফলে অহন্তার মধ্যে ইদন্তার ক্ষীণ আভাস দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রমশঃ ইদংভাব পুষ্ট হয় ও অহংভাব ক্ষীণ হয়। পরে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ অহন্তা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। মায়াগর্ভ ও মাতৃগর্ভ বস্তুতঃ একই সত্তা।

এই গর্ভে ক্রমহীন ভাবে অবতরণ ঘটিতে পারে এবং ক্রম দ্বারাও ঘটিতে পারে। চিদণু মায়াতে প্রবিষ্ট হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এই ঘুমই চিদ্‌বস্তুর অচিদ্‌ভাবের প্রাপ্তি। এই ঘুমই কুণ্ডলিনীর কুণ্ডলিত ভাব, নিদ্রা বা মহামায়া ভেদ করিয়া মায়াতে পতনরূপ। বস্তুতঃ ইহা অনাদি জাগ্রৎ হইতে অনাদি স্বপ্নের মধ্য দিয়া সুষুপ্তিতে নিমজ্জন মাত্র। এই মায়াসুপ্ত জীব বস্তুতঃ মানুষেরই বীজ। মায়াগর্ভই মাতৃগর্ভ। জীব বিশ্বপিতা হইতে বিসৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে প্রকৃতির ধারা হইতে একটি জিনিষ আসিল এবং পুরুষের ধারা হইতেও অপর একটি জিনিষ আসিল — এই দুইটি কারণবিন্দু রক্ত ও শুক্রবিন্দু নামে প্রসিদ্ধ। আমরা আদি পিতামাতার কথা বলিতেছি। কারণ তখন স্থূলদেহ সম্পন্ন পিতামাতা ছিল না। উপাদান অবশ্যই ছিল, তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বশতঃ উভয়ের যোগে সৃষ্টি হইয়াছে। রজঃ

পৃথিবীর সার ও বীর্য আকাশের সার। পৃথিবী মাতা, আকাশ পিতা। চৌরাশী লক্ষ যোনির সার সত্তাময় ও ষট্‌কঞ্চুক-বেষ্টিত চিদণু এক হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সদগুরু বা নরদেহী ভগবানের মহাকারণ শরীর এবং মহামন ব্যতীত স্থূল মানবদেহের রহস্য ভেদ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।

সাত

মার্গে প্রবেশ কখন হয়? মানবদেহ লাভ ও ঐ দেহে অহং-জ্ঞানের উদয় অবশ্য হইয়াছে। কিন্তু এই জ্ঞান স্থূল সত্তার সহিত জড়িত। এই জ্ঞান পরিপক্ব না হইলে ইহাকে পৃথক্ করিয়া মার্গে প্রবেশের উপযোগী করান যায় না। আণব মল পরিপক্ব না হইলে যে ভগবৎ-অনুগ্রহের সঞ্চার অনুভব-গোচর হয় না ইহাই তাহার কারণ। মল পরিপক্ব হইলেই জ্ঞান অন্তর্মুখ হয় ও স্থূল সংস্কার ঘনীভূত ভাব পরিহার করে। তখন সূক্ষ্মভাব প্রবল হয়। এই যে পরিপক্বতা বা স্থূল অনুভূতির পাক তাহা লাভ করিতে জন্মজন্মান্তর কাটিয়া যায়। অন্তিম অবস্থায় ক্রমশঃ স্থূল সংস্কার সূক্ষ্মে পরিণত হয় এবং সূক্ষ্ম সংস্কার কারণ সংস্কারের রূপ ধারণ করে। তারপর সংস্কার আর থাকে না। স্থূল সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। কারণ মানব-দেহ রচনার বহু পূর্ব হইতেই সাকার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিজড়িত রহিয়াছে। তাই ইহার ক্ষয় হইতে দীর্ঘ সময় আবশ্যক হয়। ক্রমশঃ ক্ষয় ব্যতীত হঠাৎ ইহার উপশম সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। সর্বসংস্কারের নিবৃত্তি ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার একসঙ্গেই হয়। পরমাত্মার অনুগ্রহে এই সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন ক্ষণেকের মধ্যে যাবতীয় সংস্কার তিরোহিত হয়। এইজন্য বলা হয় পরমাত্মার দর্শন মেঘমুক্ত প্রভাকরের ন্যায় অকস্মাৎ সংঘটিত হয়। হঠপাক সদ্যো-মুক্তির উপায় এবং ক্রমপাক ক্রমমুক্তির সোপান। বলা বাহুল্য, সদ্যোমুক্তি খুবই দুর্লভ। সর্বসংস্কারের উপশম ঘটিলে লোকোত্তর অবস্থার উদয় হয়।

অভিজ্ঞ যোগিগণ বুঝাইবার সৌকর্যের জন্য এই মার্গে ছয়টি ক্রম-বিন্যস্ত ভূমি স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল ভূমির মধ্যে প্রথম তিনটি ভূমি সূক্ষ্ম জগতে অবস্থিত। চতুর্থটি সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সন্ধিতে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি কারণ জগতের অন্তর্গত।

ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করিতে পারিলে আর কোন ভূমি পাওয়া যায় না। তখন আত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইয়া বিরাজ করে।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে একদিকে স্থূল জগৎ ও স্থূল দেহাভিমানী মানবরূপী জীবাত্মা ও অপরদিকে নিত্য জাগ্রৎ পরমাত্মা, এই দুইটি প্রান্ত মার্গের সীমার বাহিরে। মার্গটি যেন একটি যোগসূত্র যাহা স্থূলকে পরমাত্মার সঙ্গে এবং পরমাত্মাকে স্থূলের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়াছে। স্থূলদেহে আত্মভাব নিবৃত্ত না হইলে মার্গে প্রবেশ লাভ হয় না। অথবা মার্গে প্রবেশ না করিলে স্থূলের অহঙ্কার কাটে না। মার্গে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই স্থূলজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয় তাহা নহে। চিত্তের অন্তর্মুখ ভাবের উদয় ও পুষ্টি — ইহাই মার্গে প্রবেশের প্রধান লক্ষণ। তখন নিবৃত্ত্যুন্মুখ স্থূলজ্ঞানী বিকশিত সূক্ষ্মদেহ দ্বারা সূক্ষ্ম-স্তরে অনুভব লাভ করে। এই অনুভব সূক্ষ্ম-জগতের প্রথম স্তরের অনুভব। ইহা লাভ করার সময় স্থূল জগতের বোধ থাকে। এই অনুভূতির যাহা করণ তাহা কেবল স্থূল দেহ নহে ও কেবল সূক্ষ্ম দেহও নহে, তাহা এক সঙ্গে উভয়ই। বস্তুতঃ উহা স্থূল সূক্ষ্মের সন্ধি। তখন মনে হয় স্থূল দৃষ্টি দ্বারাই যেন দিব্যরূপ দেখা যাইতেছে, স্থূল কর্ণ দ্বারাই যেন দিব্যসঙ্গীত শুনা যাইতেছে ইত্যাদি। সন্ধিস্থানের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সন্ধিস্থান ভেদ হইলে স্থূল ভাবটা আর থাকে না। তখন সূক্ষ্ম জগতের দ্বিতীয় স্তরের দর্শন হয়। এই স্তরটি প্রাণময় জগৎ। ভগবানের অনন্ত শক্তি এই স্তরে মুক্তভাবে খেলা করিয়া থাকে। সাধকের যখন এই স্তরের জ্ঞানলাভ হয় তখন একদিকে যেমন তাহার স্থূলসত্তার বোধ থাকে না তেমনি অপর দিকে তাহার মনোময় সত্তারও বোধ থাকে না। কিন্তু সিদ্ধগণ বলেন যে বোধ না থাকিলেও সাধক ঐ সূক্ষ্মস্তরে স্থূল ও মনোময় করণ সত্তা দ্বারা কার্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ সূক্ষ্মজ্ঞানী সাধক স্থূল ও কারণ-দেহে চেতন থাকে না বলিয়া স্থূল ও কারণ জগৎ দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু ইহা স্থূলদেহের ব্যবহার করিতে পারে ও করিয়াও থাকে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (দর্শনাদি), নিদ্রা, পান ভোজনাদি তখন অনুবৃত্ত থাকে। তদ্রূপ ইহা মানসদেহের ব্যবহারও করিয়া থাকে, কারণ বাসনা, কামনা, চিন্তা, ভাব প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার তখনও পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় ভূমির আত্মা সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মকরণ-দ্বারা সূক্ষ্ম জগতের অনুভব করে — স্থূলের অনুভব তাহার মোটেই থাকে না। অথচ

বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাকে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় স্থূলাভিমানী বলিয়া মনে হয়। মোট কথা, তাহার চেতনা আংশিকভাবে অন্তঃসংজ্ঞ বলিয়া সে সূক্ষ্মজগতেরও অনুভব করে। এই অনুভবের ফলে তাহার দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অভিনব সংস্কার উৎপন্ন হয়।

প্রত্যাবর্তন মার্গে আরও অগ্রসর হইলে তৃতীয় ভূমিতে প্রবেশ লাভ ঘটে। ইহাও সূক্ষ্মজগতে অবস্থিত। বলা বাহুল্য, এখানে শক্তির উপলব্ধি আরও অধিক পরিমাণে হয়। তবে ইহা পরিমিত শক্তি সন্দেহ নাই। এই স্তরে উঠিলে সূক্ষ্ম জগতের সীমাভুক্ত লোক-লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায়।

তৃতীয় ভূমি ভেদের পর চতুর্থ ভূমিতে পদার্পণ করিয়া সাধক অনন্ত শক্তির সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ইহা সন্ধিভূমি, অথবা মনো-জগতের প্রবেশের দ্বার। মার্গস্থিত এই ভূমিটি সূক্ষ্ম ও কারণের মধ্যে অবস্থিত। এই ভূমিতে শক্তির বিকাশ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। অভিনব সৃষ্টি-সাধনের সামর্থ্য পর্যন্ত তখন সাধক অর্জন করিয়া থাকে। ইহা কারণ-জগতের দ্বারা বলিয়া সকল শক্তির নিয়ন্ত্রণ এই ভূমি হইতে হইয়া থাকে। এখানে ভাব ও বাসনার তীব্রতা অধিক, শক্তির প্রয়োগ বিষয়ক প্রলোভনও অধিক এবং অহংকারের প্রকোপ অত্যন্ত উগ্র। বস্তুতঃ ইহা যোগীর পরীক্ষার স্থান।

এই সকল অলৌকিক শক্তির সদ্ব্যবহার করিলে অথবা কোন শক্তিরই ব্যবহার মোটেই না করিলে যোগী নিরাপদে পঞ্চম ভূমিতে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয়। চতুর্থ ভূমিতে পতনের আশঙ্কা খুব অধিক থাকে*, পঞ্চম ভূমিতে পতনের সম্ভাবনা মোটেই নাই। চতুর্থ ভূমিতে অবস্থিত হইয়া যোগী যদি স্বোপার্জিত শক্তির সদ্ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি আপনা আপনি ষষ্ঠ ভূমিতে উন্নীত হন, নিজেকে কোন বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু ঐ উদ্ধার-কার্যে যিনি সহায়ক হন তিনিই সদগুরু। তিনি শুধু জীবন্মুক্ত পুরুষ নহেন, কিন্তু মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মা।

---

* পাতঞ্জল যোগ সম্প্রদায়ে প্রথমকল্পিক অবস্থার পর এবং ভূতেন্দ্রিয় জয়ের পূর্বে মধুমতী ভূমিতে কতকটা এই জাতীয় আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। তখন বিশেষরূপে আসক্তি ও অহংকারেরই পরীক্ষা হইয়া থাকে। অবশ্য ভয় লজ্জা প্রভৃতি অন্য ভাবেরও যে পরীক্ষা না আছে তাহা নহে।

চতুর্থ ভূমিতে থাকিয়া যে পরোপকার করা হয় তাহা স্থূল জগতের আত্মকল্যাণের চাইতেও অধিক, ইহা সাধকের আধ্যাত্মিক উপকার। কোন ভগবৎ-উন্মুখ সাধক যদি অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হয়, তখন চতুর্থ ভূমিস্থ আত্মা অর্থাৎ যোগী তাহাকে নিজ শক্তিবলে ঐ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। উৎকট রোগ হইতে মুক্তি, ও মরুক্লান্ত পর্যটককে জলদান, ভীতমনের ভীতির উপশম, হতাশের প্রাণে আশার সঞ্চার — নানা প্রকারে সাধারণতঃ গুপ্তভাবে এই পরোপকার ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বোধিসত্ত্বগণ এই কার্য করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এই প্রকার সেবাধর্মী মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন। ইঁহারাই Invisible Helpers নামে অভিহিত হন। তবেই মনে রাখিতে হইবে শক্তির সদ্ব্যবহারেও কখন কখন বন্ধনের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। ভগবান পতঞ্জলিদেব এই আশঙ্কার একটি কারণ কে স্ময় অথবা অহংকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অহং-কারের নানাপ্রকার ভেদ আছে। দীন সেবকভাব গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে সেবা করিয়াও যদি ঐ সেবাজনিত অহংকার হৃদয়ে উদিত হয় উহাও পতনের কারণ হইয়া থাকে। অহংকার যে-কোন প্রকারেই হউক রিপুরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। চতুর্থ ভূমির কাঠিন্যের প্রধান কারণ এই যে এই ভূমিতে অপরিমেয় শক্তি সাধকের আয়ত্ত হয়। অথচ ঐ সকল শক্তির ধারণের উপযোগী চিত্তসংযম তখনও আয়ত্ত হয় না। মনকে সম্পূর্ণ জয় করিতে না পারিলে অথচ শক্তির আয়ত্ত হইলে সাধকের পতিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। অবশ্য যদি সদ্‌গুরুর উপর পূর্ণ নির্ভর থাকে এবং তাঁহাকে আত্মরক্ষার ভার দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে শক্তির স্ফূর্তিদ্বার অবরুদ্ধ থাকে বলিয়া সাধকের অহংকার করিবার কোন হেতু বিদ্যমান থকে না। শুধু তাহাই নহে। অনেক সময় সদ্‌গুরু স্বতঃ প্রেরিত হইয়া সাধকের বাস্তব কল্যাণ সম্পাদন করিবার জন্য তাহাকে অনেক সময় নানাপ্রকার কঠিন পরিস্থিতিতে এবং বিপদ্‌জালে জড়িত রাখেন। অন্তর্জগতেও শান্তি এবং আনন্দের স্বচ্ছধারা প্রবাহিত হইতে দেন না। এই প্রকার অবস্থায় সাধকের হৃদয়ে গভীর নৈরাশ্য ও নিরাশ্রয় ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা পরীক্ষার অবস্থা। সেইজন্য সাধক যে পরিমাণে নিজেকে নিরাশ্রয় ও অসহায় বোধ করিতে থাকে ঠিক সেই পরিমাণে জীবনের লক্ষ্য স্থির থাকিলে

চিত্তের সর্বতোমুখ গতি একাগ্র হইয়া ঐ লক্ষ্যের দিকে স্থির হয়। অর্থাৎ বিপদে পতিত হইয়াও ভগবৎ-স্মৃতি ও পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইলে গুরুকৃপাতে স্বোপার্জিত শক্তির আবরণ সরিয়া যায় এবং সাধক অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে পঞ্চম ভূমিতে উন্নীত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই ভূমিতে মনের চঞ্চলতা থাকে না বলিয়া সাধকের পতনের আশঙ্কা একপ্রকার থাকে না বলিলেই চলে।

পতন বলিতে কি বুঝায় তাহার সুস্পষ্ট ধারণা হয়ত অনেকের নাই। যুগযুগান্তর ও জন্মজন্মান্তরের চেষ্টায় ধীরে ধীরে বহু আয়াসে উপাদান সঞ্চিত হইয়া যে জ্ঞানের প্রাসাদ গঠিত হইয়াছে তাহা ভঙ্গিয়া গেলেই বুঝিতে হইবে পতন হইয়াছে। এইরূপ পতন সংঘটিত হইলে একেবারে বিদ্যুতের বেগে সেই আদিম পাষাণ খণ্ডের ন্যায় স্থাবর অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে। অবশ্য ইহা কদাচিৎ হয়, কারণ ভগবানের নিয়োজিত বহু মঙ্গলময় শক্তি জীবকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাপৃত থাকে। জীবের অজ্ঞাতসারে তাহারা জীবকে অসময়ে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু অবিনয়ের মাত্রা সীমা লংঘন করিলে এই প্রকার শক্তির কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় অনুতাপ দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্ত হয় না, তখন ভাঙ্গা জিনিষকে পুনর্বার গঠন করিবার আবশ্যকতা হয়। সাধারণতঃ যে পতন হয় তাহা এত ভয়াবহ নহে। কারণ তখন অনুতাপ ও আত্মশোধনের প্রণালীদ্বারা ব্যবহারযোগ্যতা ফিরিয়া আসে বলিয়া পুনর্বার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। চেতনাত্মা পতিত হইয়া শিলাখণ্ডে পরিণত হইলে উঠিবার সময় আবার কালের ক্রমবিকাশে ও পর পর ভূমি জয় আবশ্যক হইয়া পড়ে। চতুর্থ ভূমি হইতেই এই প্রকার পতনের সম্ভাবনা। শক্তির অযথা প্রয়োগে ইহা ঘটিয়া থাকে। শক্তির বিকাশ অবরুদ্ধ থাকিলে অথবা বিকাশ সত্ত্বেও শক্তির অসদ্ব্যবহার না করিলে এবং বাসনা দ্বারা মন সঞ্চালিত না হইলে পতনের প্রশ্ন উঠে না। শক্তির সদ্ব্যবহারের ফলে যোগী চতুর্থ ভূমি হইতেই একেবারে ষষ্ঠ ভূমিতে উত্থিত হয়। শক্তির প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকিলে চতুর্থ ভূমি হইতে পঞ্চমে উত্থিত হইয়া সেখান হইয়া যথাসময়ে ষষ্ঠে উন্নতিলাভ করে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই দুইটি ভূমি মনোময় কারণ জগতে অবস্থিত।

অন্তর্মুখভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সূক্ষ্ম চেতনাত্মক কারণ জগতে মনের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ হয়। যোগিগণ বলেন যে কারণ জগতের বহির্ভাগে

চিন্তারাজ্য ও অন্তর্ভাগে ভাবরাজ্য প্রকাশিত হয়। পঞ্চম ভূমির যোগী স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনবর্গের চিন্তার নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইয়াও ভাবের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের চেতনা না থাকাতে সেখানে বিভূতি প্রকাশ চলে না। সেইজন্য অখণ্ড মনের উপর তাহার আধিপত্য থাকে না। অন্তর্মুখতার আত্যন্তিক বিকাশ সিদ্ধ হইলে ও ষষ্ঠভূমিতে স্থানলাভ করিলে যোগী নির্বিকল্পক স্থিতিতে আরূঢ় হয়। কারণ-জগতের বহিরংশ হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তরঙ্গ অবস্থায় প্রবেশ করিলে এই স্থিতি স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে কারণ-জগতের বাহিরের দিকে চিন্তার রাজ্য ও ভিতরের দিকে বিকল্পহীন বোধময় অবস্থা। ইহাই ষষ্ঠ ভূমির পরিচয়। তখন যোগী সর্বদা বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া সাক্ষাৎভাবে বিশ্বমনের অনুভব করেন। তখন বিশ্বের যাবত মনের ভাবই তাহার নিজভাব বা স্ব-ভাবরূপে পরিণত হয়। এই অবস্থায় সে সর্বদা সর্বত্র ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে। কিন্তু তাহা সত্বেও সে কখনও নিজকে ভগবানের সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে না। দর্শন না করিবার কারণ এই যে তাহার এই ভগবৎ-দর্শন মনেরই ব্যাপার। সে এখনও নিজকে মনের অতীত বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাই ভগবান্‌কেও মনোময় রূপেই দর্শন করিয়া থাকে। ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা মনেরই ব্যাপার। ইহা শুদ্ধ মন বা, ব্যাপক মনের খেলা, কিন্তু ইহাও চরমস্থিতি নহে। কারণ মনকে অতিক্রম করিতে না পারিলে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াও তাঁহার সহিত নিজের অভিন্নতা বোধ জাগে না। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন ও তাঁহার সহিত নিজের অভেদ দর্শন এক নহে। এই সময়ে স্বভাবতই ভগবানের সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকে। সর্বদা, সর্বস্থানে, অন্তরে ও বাহিরে ভগবানের দর্শন জাগরূক থাকে ইহা সত্য, কিন্তু তবুও একটা আকুল বিরহের ভাব জাগিতে থাকে, কারণ ভগবৎ-দর্শন ভগবৎ-প্রাপ্তি নহে। তাঁহাকে না পাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ নিজকে ভগবৎরূপে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত এই বিরহ কাটিতে পারে না। কারণ-জগতের অভ্যন্তর প্রদেশে কেন্দ্র বা বিন্দুরূপে এই নিত্য ভগবৎ-বিরহ জাগিয়া রহিয়াছে। বহির্মুখ অবস্থায় এইখান হইতেই সৃষ্টি হয়, কিন্তু তখন বিরহ বোধ থাকে না। কিন্তু অন্তরতম অবস্থাতে বিরহ বোধ জাগে, তাঁহার দর্শনও

ফুটিয়া ওঠে এবং এই বিরহের তীব্রতায় মনের পর্দা ফাটিয়া যায়। তখন অদ্বৈত স্থিতি বা অভেদ-ভাবের প্রকাশ আপনা আপনি হইয়া থাকে। কারণ-জগতের এই ভিতরের দিকই ভাবরাজ্যের ব্যাপার, যাহার প্রস্ফুটিতরূপ ভগবৎ প্রেম এবং যাহার পরিণত ফল ভগবৎ-সাযুজ্য বা মহামিলন। এই মহাভাবময় প্রেমরাজ্যে চিন্তার কোন স্থান নেই। সুতরাং যোগীর ষষ্ঠভূমি ভগবৎ প্রেমের ও ভগবানের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বিকাশের স্থান। এই আকাঙ্ক্ষার একটা দিক্ বিরহ-বোধ, ইহা অতি মূল্যবান সম্পদ্। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর কর্তৃত্ব-সম্পন্ন মনুষ্য দেহে অভিমানের ফলে কোটি কোটি জন্ম পরিভ্রমণের অন্তে এবং মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্মুখ গতির ক্রমিক বিকাশের চরম বিন্দুতে এই তীব্র বিরহবোধের উদয় হয়। ভগবৎ-দর্শনে এই বিরহ নিবৃত্ত হয় না, কারণ ভগবৎ-দর্শনই ইহার উদ্দীপক। ষষ্ঠভূমি ভেদ হইলে সমগ্র মনোরাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়, — কল্পনা-রাজ্য অপসারিত হয়, কারণ-জগৎ অতিক্রান্ত হয়, মায়া ও মহামায়ার খেলা নিবৃত্ত হয়। তখন নিজের সঙ্গে অভিন্নরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং ভগবানের সঙ্গে অভিন্নরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। ষষ্ঠভূমির ভগবৎ দর্শন হইতে ইহা অত্যন্ত ভিন্ন। কারণ ষষ্ঠভূমির দর্শনে দ্বৈতভাব থাকে। এইজন্য উহা মিলন হইয়াও প্রকৃত মিলন নহে। কারণ মাঝখানে ব্যবধান রহিয়াছে, ইহাই বিরহ। এইজন্য দ্বৈতভূমিতে মনোরাজ্যে পূর্ণতম মিলনও বিরহেরই নামান্তর। ষষ্ঠভূমি ভেদের পরে যে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় তাহাই প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞানের পরিচয়।

ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত মনোরাজ্য। এখানকার চৈতন্য যতই উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হউক তবুও উহা মনোময়। সপ্তম ভূমি বস্তুতঃ কোন ভূমি নহে। উহা পরমাত্মার স্বরূপস্থিতি। সপ্তম ভূমি মনের অতীত। সেই জন্য ষষ্ঠ হইতে সপ্তম ভূমিতে কেহ নিজের চেষ্টায় যাইতে পারে না। সদ্‌গুরুর করুণা ব্যতিরেকে মানস জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ-জ্ঞানের ও অনন্ত আনন্দের চেতনভাবে আস্বাদন করিতে পারে না। এই অবস্থায় স্পষ্ট জানা যায় এবং দেখা যায় যে আত্মা নিত্যই আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ ও অনন্ত। শক্তি ও মনের আবির্ভাব প্রণালী যোগী তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। সে বুঝিতে পারে ইহা তাহার অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের শান্ত স্ফুরণ মাত্র। এই অবস্থায় দুইটি ব্যাপার

উল্লেখযোগ্য। এই পরমাত্মপ্রতিষ্ঠ ভগবৎ-ভাবাপন্ন আত্মা শুধু যে নিজে অনন্ত শক্তি জ্ঞান ও আনন্দ অনুভব করে তাহা নহে, উহা সে সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র বিকিরণও করে, এবং কখনও কখনও সাক্ষাৎভাবে ও সজ্ঞানে ইহার প্রয়োগও করে। এই প্রয়োগ বাস্তবিক পক্ষে অন্য আত্মাকে প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত করিবার জন্য। যতদিন আত্মা পরমাত্মাতে নিজের অভিন্ন স্থিতি উপলব্ধি না করে, ততদিন অজ্ঞান অবস্থায় ক্রমশঃ নানা প্রকার সংস্কার অর্জন করিতে থাকে। পরে ঐ সকল সংস্কার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। অন্তে সংস্কার রহিত অবস্থার উদয় হয়। তখন বুঝিতে পারে এই সুদীর্ঘ সংসার ভ্রমণ একটি মায়া-রচিত স্বপ্ন মাত্র।

এই আত্মা জ্ঞান ও শক্তি সমন্বিত ভগবৎ-স্বরূপে নিত্য জাগ্রত। ইহা একাধারে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান — একাধারে প্রেমিক, প্রেমপাত্র ও প্রেম। আশ্রয় ও বিষয় অভিন্ন। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমির অন্তরালে যেন গভীর সমুদ্র রহিয়াছে। একদিকে প্রাকৃত জগৎ ও অপর দিকে অপ্রাকৃত ভগবৎ সত্তা — মধ্যে এই বিরজা নদীর দিগন্তপ্রসারী ব্যবধান। ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত সাকার সংস্কারযুক্ত সগুণ কল্পনা — সপ্তমে আকার নাই, সংস্কার নাই, গুণ নাই, কল্পনা নাই। এইখানেই সৃষ্টির উন্মেষকালীন 'কোহহং' সংশয়ের — যাহা মানব মনে অহং ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়াছিল — ভঞ্জন হয় — আত্মা 'সোহহং'-বোধের সমাধানে নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও দেখিতে পায় "আমি কে।" ইহাই আত্ম-বিজ্ঞান ভূমি।

আট

এইখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য। এই বর্তমান প্রবন্ধে একটি বিশিষ্ট ধারা অবলম্বনে ভূমি-সপ্তকের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে এই বিশিষ্ট ধারা ভিন্ন আরও ভিন্ন প্রকারের ধারা আছে। আপাতত সে বিষয়ে আলোচনা অনাবশ্যক। সপ্ত ভূমির মধ্যে প্রথম ছয়টি ভূমি সাধনার অবস্থা ও দ্বৈতভাবের দ্যোতক। কিন্তু সপ্তম ভূমি সিদ্ধ অবস্থা ও অদ্বৈত স্থিতির অভিব্যঞ্জক। এই স্থিতিটি সাক্ষাৎ পরমাত্মার সহিত অভেদ প্রাপ্তির অবস্থা। এই অবস্থাকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই বর্ণনা করা চলে। বস্তুতঃ এই সপ্তম ভূমি ভূমিরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য

নহে। তথাপি প্রথম ছয়টি ভূমির সাথে যোগসূত্রে ইহাকে ভূমি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ষট্‌ভূমিময় পথ ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের মধ্য দিয়া ষষ্ঠভূমির অবসানে পরম লক্ষ্যের দিকে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। পথটি পর্যায়ক্রমে আকুঞ্চন-প্রসারণময়, এক ও অনেক প্রতীতিময়, সমাধি-ব্যুত্থানময় ক্রমোচ্চ একটি আবর্তসঙ্কুল ধারা। এই পথে চলিতে হইলে প্রথমেই এই বৈচিত্র্যময় প্রতিভাস — যাহা স্থূলজ্ঞানের সম্মুখে অনন্ত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে — প্রত্যাহৃত হয়। বস্তুতঃ এই প্রত্যাহারের পরে সন্ধি অবস্থা হইতেই মহাপ্রস্থানের পথের সূচনা হয়। এই প্রত্যাহারটি বাহ্য উন্মুখবৃত্তির অন্তর্মুখ আকুঞ্চনের ফল। ইহা একটি বিন্দু অবস্থা। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না, প্রত্যাহারের অবসানে বৈচিত্র্যময় জগতের ছবি আবার ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ইহা ঠিক পূর্বের জগৎ নহে, অন্য স্তরের জগৎ, কিন্ত ইহাও স্থায়ী হয় না। ইহার পর আবার অন্তরাকর্ষণের প্রভাবে প্রত্যাহার ঘটে। তখন পুনরায় একটি বিন্দুস্বরূপে স্থিতি হয়। তাহার পর আবার বাহ্যভাবের উন্মেষ হয়। এইরূপ গতিতে সাধক ক্রমশঃ উঠিতে থাকে। পর্বতারোহণ কালে যেমন একবার পর্বতে আরোহণ করিয়া পুনরায় উপত্যকায় অবরোহণ করিতে হয়, তারপর আবার উচ্চতর পর্বতে আরোহণের পর উচ্চতর উপত্যকায় অবরোহণ করিতে হয় এবং এই প্রকারে ধীরে ধীরে আরোহণের দ্বারা উচ্চতম শৃঙ্গ পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া যায়, ঠিক সেই প্রকার এই মহাপ্রয়াণের মার্গেও পর্যায়ক্রমে আরোহ-অবরোহ অথবা সঙ্কোচ-প্রসার বিদ্যমান রহিয়াছে। দিনের পর রাত্রি, আবার রাত্রির পর দিন — এইভাবে চলিতে চলিতে এমন একটি স্থিতি আসিয়া পড়ে যেখানে দিন ও রাত্রির দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়, যেখানে একমাত্র দিনই চিরস্থায়িরূপে বিরাজ করে। ইহাকে শ্রুতি 'সকৃৎ দিবা' বলিয়া ইঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই পথটি উর্ধ্ব আকর্ষণের পথ — বিন্দুগুলি পর পর অধ-উর্ধ্ব বিন্যস্ত থাকিলেও সবগুলিই পথের অন্তর্গত। নিম্ন বিন্দু হইতে উর্ধ্ব বিন্দুতে গতি, আকর্ষণের বলে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিন্দু অবস্থাতে প্রসারণ থাকে না বলিয়া, দৃশ্য বা সৃষ্টি থাকে না। তবে এই অবস্থা স্থায়ী নহে। কারণ প্রসারণ আসিলে আবার সৃষ্টির বিস্তার হয়। হৃদয়স্থ বাসনার বীজ উন্মূলিত না হইলে সেই সৃষ্টিরাজ্য হয় ভোগ করিয়া পার হইতে হয় নতুবা জ্বালাইয়া বা গলাইয়া শেষ করিতে হয়।

সাধক প্রকৃত দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে কারণের দর্শন ও অনুভব লাভ করিয়া থাকে। তাহার পর কারণ ভেদ হইলে সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি হয়। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্যন্ত ছয়টি ভূমিই কল্পনাময়। কল্পনা ত্যাগ হয় মনোনাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্যদর্শনের ফলে সপ্তম ভূমিতে। তাই ষষ্ঠ ভূমি পর্যন্ত যে আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলা হয় তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে। তবে ইহা সত্য যে কল্পনা হইলেও এই সকল ভূমির অনুভব আবশ্যক। কারণ ইহার ক্ষয় না হইলে সত্যদর্শন অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ গুরুকৃপা ব্যতীত সত্য-দর্শন হইতেই পারে না। তখন বাসনা-ক্ষয় প্রভৃতি আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। তবে কৃপা ধারণের জন্য আধার-শুদ্ধির প্রযত্ন আবশ্যক। গুরু বর্তমান থাকিলে তিনি শিষ্যকে ছয়টি ভূমিতে সঞ্চালিত করেন। এই সঞ্চালন ব্যাপারে কখনও সাধকের চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয়, কখনও চক্ষু খোলাও থাকে। ইহা সাধকের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং গুরুর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। চক্ষু বাঁধিয়া দিলে চিত্ত-নিহিত বাসনা থাকে না। চক্ষু-বন্ধ অবস্থায় ক্রিয়া ভাল হয় ইহা বলিতে হইবে। ষষ্ঠ ভূমি হইতে সপ্তম ভূমিতে একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত প্রবেশ করা একান্তই অসম্ভব।

দ্বিতীয় ভূমি হইতে বিভূতির উদয় হয়। তৃতীয়ে বিভূতির বৃদ্ধি হয় এবং চতুর্থে বিভূতির সীমা থাকে না। কারণ, তখন সূক্ষ্ম ও কারণ সত্তার পরস্পর যোগ হয়। কিন্তু মন তখনও আয়ত্ত হয় না। দুর্দমনীয় বাসনা তখনও সম্পূর্ণ ক্ষীণ হয় না। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে পতনের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। অবশ্য সংযমী ও বিবেকবান্ হইলে উর্ধ্বগতির সম্ভাবনাও থাকে। পঞ্চম ভূমিতে মনের জয় হয়, তখন সচেতন ভাবে ইন্দ্রিয় ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের কার্য শুধু মন দিয়াই করা সম্ভবপর হয়। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ জগতে ইচ্ছামাত্র স্থান বিশেষে প্রকট হইতে পারা যায়। "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা" এবং "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" এই শ্রুতিবাক্য কিয়দংশে এই অবস্থায় সার্থক হয়। এই ভূমিতেই ক্রমশঃ ভগবানের সঙ্গে যোগ হয় ভাবের পথে। কেহ কেহ ভাবে ডুবিয়া মহাভাব পর্যন্ত পেঁছিতে পারে। তখন ব্যুত্থিত হইলে দেখা যায় অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত বাসনা সকল কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়াছে। মন তখনও থাকে বটে, কিন্তু সে

মনে বাসনা নাই। ইহা অতি স্বচ্ছ বিশুদ্ধ মন। যাবতীয় অন্তরায় ও বিঘ্ন কাটিয়া গিয়াছে। তবে ছোট অহংটি তখনও থাকে। ষষ্ঠ ভূমির শেষ পর্যন্ত এই অহংটি বিদ্যমান থাকে। তখন মহা কৃপার ফলে সর্বত্র ও সর্বসময়ে অনন্ত নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপের দর্শন হয় এবং এই ব্রহ্মদর্শনের ফলেই মনের সমাপ্তি ঘটে এবং তীর্থযাত্রীর সুদীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণের পরিসমাপ্তি হয়। ভগবৎ সাক্ষাৎকারের ফলে ছোট আমিটি হারাইয়া যায় — এক অনন্ত ব্রহ্মদর্শন বিরাট আমিকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে। এইভাবে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করা সম্ভবপর। কাল, কর্ম, নিয়তি, সংস্কার কেহই তখন যোগীকে বাধা দিতে পারে না। এই অবস্থা হইতে ব্যুত্থান লাভ হইতে পারে। যদি কাহারও ব্যুত্থান হয় তাহা হইলেও ব্রহ্মদর্শন ও অদ্বৈত দর্শন পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই থাকে। ব্যুত্থানকালে দ্বৈত দর্শন ফুটিয়া ওঠে মাত্র। তখন সর্বদা সর্ববস্তুতে একত্ব দর্শন হয়। ইহাই পূর্ণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। ইহা ষষ্ঠ ভূমির জাগ্রৎ দশা। এই প্রকার সিদ্ধ যোগী ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত জিজ্ঞাসু সাধককে সাহায্য করিতে পারেন, পূর্ণ চৈতন্য সহ সর্বত্র উপস্থিত থাকিতে পারেন। এইখানে মনের আভাসটি থাকে। ইহার পর মন থাকে না, ছোট আমিও থাকে না। চিরদিনের জন্য উহা অপগত হয়। তখন একমাত্র পূর্ণ আমিই থাকে। ইহাই প্রকৃত ভগবৎ সাযুজ্য। ইহা মনের অতীত মহাব্যাপ্তির অবস্থা। ইহাই অদ্বৈত স্থিতি। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর ইহারই নাম পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্তি।

প্রথম হইতে ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত যে স্তর, তাহা হইতে সপ্তম ভূমির ব্যবধান রহিয়াছে। দ্বৈত হইতে অদ্বৈতের যে ব্যবধান ইহাও তাহাই। দুইটির মধ্যে মাত্রাগত ভেদ ত আছেই, তা'ছাড়া স্বরূপগত ভেদও আছে। স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া এই ব্যবধান অনন্ত। দ্বৈত সত্তা পরিমিত সত্তা ও খণ্ড সত্তা। কিন্তু অদ্বৈত সত্তা অপরিমিত, অখণ্ড ও অনন্ত ভগবৎ সত্তা। তাই উভয়ের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। মহাকৃপা ব্যতীত বা পরম পুরুষকার ব্যতীত এই ব্যবধান কাটান যায় না। প্রথম ছয়টি ভূমির মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, ব্যবধানও আছে। তবে উহা সান্ত ব্যবধান, কারণ উভয় ভূমির পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ে সধর্মতা রহিয়াছে, যেহেতু উভয়েই দ্বৈত বা খণ্ড সত্তা। পরিচ্ছিন্নভাবে সত্তামাত্রই তাহাই। কিন্তু ষষ্ঠ হইতে সপ্তমের ব্যবধান অনন্ত ব্যবধান।

ষষ্ঠ ভূমি প্রথম ভূমি হইতে বহু ঊর্দ্ধস্তরে হইলেও সপ্তমের তুলনায় উভয়ই সমভাবে অনন্ত ব্যবধান দ্বারা ব্যবহিত। ষষ্ঠ ভূমি প্রথম হইতে যে সপ্তমের অধিকতর নিকটবর্তী তাহা বলা চলে না। তথাপি সাধকের আত্মবিকাশের পক্ষে এই সকল ভূমি ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। কারণ আধারের বিকাশও পূর্ণত্বের পথে একান্ত আবশ্যক।

মন হইতে উন্মনা

মনুষ্যের লৌকিক জীবন এবং লোকোত্তর জীবন উভয়ের সঙ্গেই মনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। পঞ্চ কোশের মধ্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে মনোময় কোশেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। চুরাশী লক্ষ যোনির মধ্য দিয়া অন্নময় ও প্রাণময় কোশের বিকাশ সম্পন্ন হইলে মনুষ্য-দেহকে আশ্রয় করিয়া মনোময় কোশের বিকাশ হইতে থাকে। কর্ম-সংস্কার এবং অনুভব-সংস্কার উভয়ই মনোময় কোশে সঞ্চিত থাকে। এই সংস্কার অনুসারে অভিনব কর্ম নিষ্পন্ন হয় এবং তাহার পর ঐ কর্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই ভোগ-সংস্কারও মনোময় কোশেরই সম্পত্তি। জন্ম-জন্মান্তর সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে গুরুকৃপাতে মহাক্ষণে জ্ঞানের উদয় হয়, তখন বিজ্ঞানময় কোশের কার্য আরম্ভ হয়। বিজ্ঞানময় কোশের পর কারণ-ভূমিতে আনন্দময় কোশের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

মন ত্রিগুণাত্মক। যদিও চিত্ত-সত্ত্ব সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া ইহাতে সত্ত্বের প্রাধান্য রহিয়াছে তথাপি ইহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। সত্ত্বের উৎকর্ষ হইলেও একেবারে পূর্ণভাবে রজঃ ও তমঃ হইতে বিশ্লেষ কখনও ঘটে না, কারণ ত্রিগুণাত্মক কার্যে ত্রিগুণের ক্রিয়া অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু সত্ত্বের এমন একটি অবস্থা আছে যাহাকে বৈষ্ণবগণ বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব প্রকৃষ্ট সত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা অপ্রাকৃত ও রজঃ ও তমঃ হইতে চিরমুক্ত। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব সাধারণ মনুষ্যে উপাধিরূপে বিদ্যমান থাকে না, অথবা থাকিলেও উহা অভিব্যক্ত থাকে না। তান্ত্রিকগণ ইহাকে বিন্দু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। বিন্দু ক্ষুব্ধ না হইলে ঊর্ধ্বগতি হয় না, এবং দিব্য ভুবনের বিকাশও হয় না। যোগিগণ মূঢ়, ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা পরিহার করিয়া যখন একাগ্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন তখন সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ উজ্জ্বলভাবে লক্ষিত হয় এবং চিত্তক্ষেত্রে রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্বে অন্তর্লীনবৎ বিদ্যমান থাকে। একাগ্র ভূমিতে অস্মিতারূপে পরম প্রজ্ঞার উদয় হয়। এই

প্রজ্ঞাভূমিতে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব নামক বিশোকা সিদ্ধির উদয় হয়। ইহা যোগীর ঐশ্বর্য, কিন্তু ইহাতে অবিবেক বা অজ্ঞান রহিয়াছে। এইজন্য যোগীকে যোগৈশ্বর্য পরিহার করিয়া ও বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানের মূলচ্ছেদ করিতে হয়। ইহার পর গুণাতীত ভূমিতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা আসে।

একাগ্র ভূমিতে চিত্ত ধ্যেয় অবলম্বনকে জ্ঞেয়রূপে প্রাপ্ত হয়। চিত্ত স্বয়ংই জ্ঞান এবং স্বয়ংই জ্ঞাতা। অর্থাৎ যে এক সত্তা একাগ্র ভূমিতে প্রজ্ঞারূপে ফুটিয়া উঠে তাহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। বস্তুত উহা চিত্ত ভিন্ন অপর কিছু নয়। স্বচ্ছ চিত্তে চিদালোক পতিত হইলে প্রতিবিম্বরূপে যে জ্যোতির বিকাশ হয় এই প্রজ্ঞার স্বরূপ তাহাই। ইহা যেন পূর্ণিমার চন্দ্রমা। কিন্তু বিশুদ্ধ চিদালোককে পাইতে হইলে উপাধিরূপ দর্পণকে অতিক্রম করা আবশ্যক হয়, কিন্তু আবশ্যক হইলেও উহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। একাগ্র ভূমি হইতে নিরোধ ভূমির মধ্য দিয়া যোগীর গতিমার্গ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিরোধ চিত্তের নিরোধ — বৃত্তিরও নিরোধ এবং সংস্কারেরও নিরোধ। নিরোধ পূর্ণ হইলে বৃত্তি ত থাকেই না, সংস্কারও থাকে না — বলিতে কি তখন নিরোধও থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন চিত্তই থাকে না, থাকে শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্য। চিত্তের সম্যক্ অভাবই উন্মনা ভাব। ইহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ-শক্তি বা নিজ শক্তি-রূপে যোগি-সমাজে পরিচিত।

মনের একমাত্রাতে স্থিতি হইলে একাগ্র ভূমির প্রতিষ্ঠা হয়। তখন দ্রষ্টার দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে সমগ্র বিশ্ব মুছিয়া যায় — একমাত্র অনন্ত চিদাকাশ প্রকাশমান হয়, কিন্তু চিদাকাশ হইলেও উহা তখন চিদ্‌রূপে ভাসমান হয় না, মহাশূন্যরূপে প্রকাশিত হয়। এই মহাশূন্যের মধ্যে যোগীর লক্ষ্যস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ একতত্ত্ব — তাহা যাহাই হোক না কেন — উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে। এই জ্ঞানে ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে কোন ভেদ নাই এবং পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে দেশ ও কালের কোন ব্যবধান থাকে না। ইহা নিত্যোদিত ও নিত্য বর্তমান। ইহার পর এই প্রজ্ঞা অতিক্রান্ত হয়। তখন একও থাকে না, বিশ্ব ত পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে। এই 'এক' বস্তুত চিত্ত অথবা মনেরই একত্ব। ইহাকে অতিক্রম না করিতে পারিলে শুদ্ধ চৈতন্য উপলব্ধি করা কঠিন।

কিন্তু প্রশ্ন এই — জ্ঞানপ্রাপ্তি যেমন আবশ্যক তেমনি প্রাপ্ত জ্ঞানের নিবৃত্তিও আবশ্যক। অজ্ঞানকে নাশ করিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করাই জ্ঞানের কার্য, সুতরাং অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে জ্ঞান স্বতঃই নিবৃত্ত হয়, তাহাকে নিবৃত্ত করিবার পৃথক্ চেষ্টা আবশ্যক হয় না।

বলা বাহুল্য, জ্ঞানে 'এক' ফুটিয়া উঠিলেও এই জ্ঞান চিদ্‌রূপী জ্ঞান নহে। ইহাও মানস জ্ঞান। এইজন্য শুদ্ধ চৈতন্যে স্থিতি লাভ করিতে হইলে এই জ্ঞানকেও ক্রমশঃ অথবা একই মহাক্ষণে ত্যাগ করিতে হইবে। তখন ক্রমের পথে চলিতে হইলে একাগ্রভূমি-প্রতিষ্ঠ সমগ্র মনকে ভাঙ্গিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিতে হয়। ইহারই নাম অর্দ্ধ-মাত্রা। মন যতই ক্ষীণমাত্র হইতে থাকে ততই চৈতন্যের এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট আনন্দের প্রকাশ উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। অন্তিম অবস্থায় মন এত সূক্ষ্ম হইয়া যায় যে তখন মন থাকিলেও উহা প্রায় না থাকার সমান হয়। ঐ সময়ে ঐ ক্ষীণতম মনকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহাই উৎসর্গ — ইহারই নামান্তর আত্ম-সমর্পণ। তখন লেশমাত্র মনও আর অবশিষ্ট থাকে না। ইহারই নাম চিদানন্দময় দিব্য-ভূমিতে প্রবেশ। জীব তখন শুধু শিব নয়, পরম শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই উন্মনা শক্তিই হয় তাহার পরাশক্তি। পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমার কলা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে যখন কলা আর দেখিতে পাওয়া যায় না তখন অমাবস্যার উদয় হয়। তদ্রূপ মনও বিন্দু অবস্থায় চন্দ্রবিন্দুরূপে পূর্ণ থাকে, — তাহার পর অর্দ্ধমাত্রা ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা অতিক্রম করিয়া নাদমণ্ডলে প্রবেশপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারে নাদান্ত পার হইয়া শক্তিকে অবলম্বনপূর্বক ব্যাপিনীরূপ মহাশূন্যে প্রবেশ করে। তাহার পর সমনাতে উপস্থিত হইয়া বিকল্পহীন মনের দ্বারা বিকল্পহীন মনকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপা উন্মনা শক্তির আবির্ভাব হয়। তখন পূর্ণতা স্বভাবতই ফুটিয়া উঠে। যতদূর চঞ্চল মনের গতি ততদূরই কালের রাজ্য। মন একাগ্র হওয়ার পর স্থূল কাল না থাকিলেও সূক্ষ্ম কাল থাকিয়া যায়। এই সকল কালের অংশ, মাত্রা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং অমাত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতভাবে কালরাজ্যের অবসান হইয়া যায়। ইহাই ভগবৎ ধামে প্রবেশ। মন হইতে উন্মনার দিকে গতির ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বৈষ্ণবগণ নিত্য লীলাভূমিরূপে যোগমায়া ক্ষেত্রের বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই লীলাক্ষেত্র আগম সাহিত্যে বিশুদ্ধ অধ্বা নামে পরিচিত। ইহা মায়ার উর্ধ্বে হইলেও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অন্তর্গত নহে। এই যোগমায়ার রাজ্য বস্তুতঃ অর্দ্ধমাত্রার রাজ্য ভিন্ন অপর কিছু নহে। ভগবানের অনন্ত প্রকার রসের লীলা এই রাজ্যেই ঘটিয়া থাকে, কারণ উহা মায়ারাজ্যের অতীত। লীলাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যে কোন লীলাই নাই। ত্রিগুণের উর্ধ্বে শুদ্ধ সত্ত্বময় বৈন্দব জগতে এ লীলার প্রকাশ হয়। এই রাজ্যের সীমা নাই, কারণ এক মাত্রাকে যত অধিক সংখ্যাতে বিভক্ত করা হউক না কেন তাহা কখনই শূন্যে পরিণত হইতে পারে না। অথচ এক মাত্রা অথবা তদ্-অংশভূত সূক্ষ্ম মাত্রা যে কোন ক্ষণে আত্মসমর্পণ করিলেই অবাধে শূন্যরূপে পরিণত হইতে পারে। মাত্রা শূন্য হইয়া গেলে একমাত্র অনন্তই অবশিষ্ট থাকে।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সংক্ষেপতঃ ভগবৎ সত্তার মধ্যে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায় — একটি সীমারেখা বা ক্ষেত্রের পরিধি, ইহাকেই পূর্বে বিন্দু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। একাগ্র ভূমিতেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর নিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ হয়। যতই অন্তরে প্রবেশ করা যায় ততই চৈতন্যের স্বরূপ গভীরতররূপে অনুভূত হয়। কিন্তু এই প্রবেশে ক্রম বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত। এই ক্রম ধরিয়া চলিলে কখনই কেন্দ্রে স্থিত হওয়া যায় না, কিন্তু ক্রম ত্যাগ করিলে একই ক্ষণে কেন্দ্রে স্থিতি হয়, তখন পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপে অভেদ-স্থিতি ঘটে। এই অবস্থাটি জ্ঞানের, কিন্তু ভাব আস্বাদনের সময় অনন্তকাল কেন্দ্রের দিকে গতি চলিতে থাকে, কখনও তার অবসান হয় না এবং হইতেও পারে না। ইহাই প্রেম ও ভক্তির দিক্। তখন চিৎ এবং আনন্দ, অদ্বৈত এবং দ্বৈত, নিরাকার এবং সাকার এক মহা-অনুভূতিতে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে।

———

অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতি

এক

স্মৃতি কাহাকে বলে, ভগবৎ স্মৃতি কি, অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির স্বরূপ কি প্রকার এবং এই প্রকার স্মৃতির ফলই বা কি, এই সব বিষয়ের যথাশক্তি আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্মৃতি বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় স্মরণ। অনুভূত বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে। যে বিষয় কখনও অনুভূতিগোচর হয় নাই তাহা স্মরণ করা যায় না। শাস্ত্রোক্ত গুরূপদিষ্ট বা মহাজনগণের প্রদর্শিত প্রণালীতে অথবা আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব-বিচারের ফলে যে বোধ উদিত হয় এখানে তাহাকেই অনুভব বলা হইতেছে। এই অনুভব হইতে তজ্জন্য সংস্কারের উদ্দীপন বশতঃ স্মরণ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। সাধারণতঃ স্মরণের উৎপত্তি এই প্রকারেই ব্যাখ্যাত হয়। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা হইতে যে বীর্য উৎপন্ন হয় উহার ধারণের ফলেই স্মৃতি উদ্ভূত হয়, যাহাকে শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থানে উপাসনা বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারই পরিপক্ব অবস্থা সমাধি। সমাধি হইতে প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়। স্মৃতিটি ধ্যানের অবস্থা বা একতান-ভাব। ইহা একাগ্রতার পূর্বাভাস। শ্রদ্ধা কিংবা বিশ্বাস ইহার মূলে থাকা আবশ্যক। সন্তান-বৎসলা জননী যেমন অঙ্কগত শিশুকে সর্বদা রক্ষা করেন সেই প্রকার মাতৃরূপা শ্রদ্ধা দেবীও শ্রদ্ধালু সাধককে বিঘ্ন ও ও বিপদরাশি হইতে রক্ষা করেন।

প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিতেন যে শ্রদ্ধার প্রভাবে চিত্ত নির্মল হইলে উহাতে শ্রদ্ধেয় বস্তুর প্রতিবিম্ব সঞ্চারিত হয়। চিত্তের যে পাঁচটি প্রসিদ্ধ নীবরণ বা আবরণ-গ্রন্থি আছে সেইগুলি শ্রদ্ধার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হইয়া যায়। অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব না থাকিলে কোনও প্রকার পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। এই শ্রদ্ধা যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস মাত্র নহে — ইহা শুধুই মানিয়া নেওয়া নহে। বৌদ্ধ সাধকগণ আরও বলিতেন, সাধন ক্ষেত্রে স্মৃতি শব্দের তাৎপর্য সাধারণ স্মৃতি নহে, কিন্তু সম্যক্ স্মৃতি, কুশল আলম্বনকে স্মরণ করা, অকুশলকে স্মরণ করা নহে। যাহাকে

স্মৃতি বলে তাহা ঠিক ঠিক গঠিত হইলে চিত্তে অকুশল অবস্থা জাগিবার অবকাশই পায় না। বুদ্ধদেব স্মৃতিকে "সর্বার্থিকা" বলিয়াছেন; কারণ ইহা যাবতীয় কুশল উদ্দেশ্যের সিদ্ধির মূল। আলম্বনে নিমজ্জন অর্থাৎ ডুবিয়া যাওয়া স্মৃতির মুখ্য লক্ষণ, প্রমাদ-নাশ অথবা অবিস্মৃতি অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকা (awareness) ইহার মুখ্য কৃত্য এবং ইহার মুখ্য ফল হইল আলম্বনের অভিমুখীভাব। স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুশীলনের বিষয়। তাহা না হইলে ইহা ঠিক ঠিক গঠিত হয় না। শ্রুতিতে আছে, আহারশুদ্ধি হইতে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে ধ্রুবাস্মৃতির উদয় হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের আহরণই আহার। সুতরাং বিষয়ের আহরণ বা গ্রহণ শুদ্ধ হইলে বিনা চেষ্টাতেই চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। তখন শ্রুতি ধ্রুব অথবা অবিচ্ছিন্ন রূপ ধারণ করে। অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির ফল সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ।

স্মৃতি ভগবৎ বিষয়ক হওয়া চাই এবং অখণ্ড হওয়া চাই, তবেই তাহা হইতে মহৎ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। জপ, অর্চন, নামকীর্তন, ভজন, ধ্যান প্রভৃতি ভগবৎ স্মৃতিরই অন্তর্গত। কারণ এই সকল কার্য ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকূল। সাধক নিজের যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে এই সকলের মধ্য হইতে যে কোনও কার্যই করুক না কেন, যদি সে মনে প্রাণে ভগবৎ অভিমুখ হইয়া তাঁহাকেই হৃদয়দেবতা রূপে হৃদয়ে বসাইয়া এই সব অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে তাহাকে স্মৃতি সাধক বলা যাইতে পারে। স্মৃতির মূলে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস ত থাকিবেই, তদ্ব্যতীত আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তাও থাকিবে। স্মৃতির অনুষ্ঠানে ভাবনারই প্রাধান্য। ইহা ক্রিয়ারূপ অর্চনাদিতে ও স্থূল জপাদিতে প্রথমেই পরিস্ফুট না হইলেও পরে অবশ্যই হয়, যখন সব কিছু ভাবরূপে ফুটিয়া উঠে। বৈষ্ণবগণের ক্রিয়াভক্তি যেমন ভাবভক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ইহাও অনেকটা সেই প্রকার। স্মৃতির অখণ্ডতা মানে ভাবনার অবিচ্ছিন্নতা। ক্রিয়ার স্তরে ইহা সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইলেও ভাবের স্তরে উন্নীত হইলে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ ভাব প্রথমে সঞ্চারী অথবা অস্থায়ী থাকিলেও অনুশীলনের ফলে উহা স্থায়ীরূপ ধারণ করে। উহা তখন অন্তঃসলিলা স্বচ্ছ ফল্গুধারার ন্যায় সমগ্র চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যদিও প্রারম্ভকালে অহোরাত্রের অন্তর্গত একটি

বিশিষ্ট সময় অভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট হয় তথাপি প্রতিদিন ঐ বিশিষ্ট সময়টি লঙ্ঘন না করিলে নিয়মিত অভ্যাসের ফলে একটি শুভ সংস্কার উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। গাঢ়তার প্রভাবে স্বভাবতঃই অভ্যাসের ক্রিয়াংশ অলক্ষ্যভাবে ভাবরূপ ধারণ করে। তখন পূর্বোক্ত বিশিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়ও ঐ নবোদিত ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়; অর্থাৎ অন্য সময়ে চর্যা ও ক্রিয়ার অভাব থাকিলেও ভাবের অভাব থাকে না। সমগ্র অহোরাত্রই তখন এই অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবিত হয়। ইহা স্বভাবের নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। তখন খণ্ড খণ্ড ক্রিয়ার মধ্যে অখণ্ড রূপে একটি ব্যাপক ভাব সূত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে প্রণালীতে অহোরাত্রের ২৪ ঘন্টা এক ভাবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র রচিত হয় সেই প্রণালীতেই একদিন ও অন্যদিনের, এক মাস ও অন্য মাসের এবং এক বৎসর ও অন্য বৎসরের কালগত ব্যবধান যখন মিটিয়া যায় তখন এক অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকালের প্রকাশ হয়। বস্তুতঃ ইহা খণ্ডভাবের অন্তরস্থ যোগরূপী মহাভাবেরই আবির্ভাব। মহাভাব উদিত হইলে ভাবাতীতকে আর দূরে বলা চলে না। যদিও বাস্তবিক পক্ষে ভাবাতীত কালের অতীত, দেশের অতীত এবং সর্বলীলার অতীত হইয়াও সদাসর্বত্র সকলের নিত্য সন্নিহিত, তথাপি খণ্ড ভাব মহাভাবে পরিণত না হওয়াতে উহা সন্নিহিত থাকিয়াও এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও খণ্ডভাবের দৃষ্টিতে অপ্রকটই থাকে।

যাহা বলিলাম তাহা ব্যক্তিগত একটি সাধকের দিক্ হইতে বিচার করিয়া। এক মহাশক্তির ইঙ্গিতে বহু সাধকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐ অহোরাত্রব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন ভাবের অভ্যুদয় অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, যদি ঐ বিশিষ্ট নির্দিষ্ট সময়খণ্ডগুলির মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান না থাকে; অর্থাৎ একজনের ক্রিয়ার দ্বারা না হইলেও বহুজনের সমবেত উদ্যমের দ্বারা দিবারাত্রির সমগ্র সময়টি আপূরিত হওয়া আবশ্যক। ইহার ফলে সমগ্র কর্মী সাধকের শক্তি পরস্পর যুক্ত হইয়া পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে অবসর পায়, যাহার ফলে প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প উদ্যমে অধিক ফলের ভাগী হইতে সমর্থ হয়। ইহা সম্ভবপর হয়, কারণ সকল আত্মার মূলে একই মহাশক্তির ইঙ্গিতরূপ প্রেরণা কার্য করিতেছে। আরও এক কথা। এক ক্ষেত্রে ক্রিয়া ভাবরূপে পরিণত হইলে অন্য ক্ষেত্রেও এই পরিণামের শুভফল প্রসূত হয়। তাই সেখানেও অল্প আয়াসে ক্রিয়া হইতে ভাবের অভি-

ব্যক্তির সূত্রপাত হয়। নিরপেক্ষ চেষ্টায় প্রয়াস অধিক আবশ্যক হয়। তাহার পর আরও একটু বিবেচনার বিষয় আছে। যে মহাশক্তির ইঙ্গিতে বহু সাধক এই কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাহার আদেশ যথাশক্তি পালন করিতে পারিলে, অন্ততঃ সরল প্রাণে পালনের চেষ্টা করিলে মহাকৃপার অবতরণ অনুভব অবশ্যম্ভাবী।

দুই

সুতরাং অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির যে কি মহাফল তাহা প্রকারান্তরে বলা হইল। এই ফলটি আর কিছু নহে — নিজেকে নিজে জানা, আত্মার জ্ঞানলাভ। আত্মাই ভগবান্, আত্মাই মহেশ্বর, আত্মাই পূর্ণ-ব্রহ্ম। সকলের আত্মাই একই আত্মা। সুতরাং আত্মজ্ঞান মানে পূর্ণত্বের জ্ঞান, স্বয়ংই যে পূর্ণ তাহা উপলব্ধি করা।

আত্মার স্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন নিরাবরণ প্রকাশ। এই প্রকাশে অনন্ত শক্তিচক্রঘটিত মহাশক্তি অভিন্ন সত্তা লইয়া বিদ্যমান আছেন। ইনি আত্মার স্বাতন্ত্র্যশক্তি। ইনি আছেন বলিয়াই আত্মা শিবরূপী ও চৈতন্যস্বরূপ। ইনি না থাকিলে প্রকাশরূপী আত্মাকেও অপ্রকাশ-রূপী বলিতে হয়। কিন্তু না থাকার প্রশ্ন উঠে না। ইনি আত্মার স্বরূপ-শক্তি, স্বভাবতই চিদানন্দস্বরূপা। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ইঁহারই প্রসারমাত্র।

এই যে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি ইহাই আত্মার পূর্ণ ভগবত্তা — এই মহাপ্রকাশের কোলে কোনও স্থিতিতে অখণ্ড শক্তিচক্রচুম্বিত অনন্ত ভাব দ্বারা অভিব্যক্ত অনন্ত খণ্ড প্রকাশ নিরন্তর আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। এই সকল ভাব বীজস্বরূপ বা কারণ, আর এই সকল খণ্ড প্রকাশ অঙ্কুরস্বরূপ বা কার্য। এই সব খণ্ড প্রকাশ শুদ্ধ মহাপ্রকাশ ব্যতিরেকে খণ্ড শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাবরূপে মায়িক অহংএর নিকট প্রকাশিত হইতেছে, যাহার ফলে মায়িক অহং-এর দৃষ্টিতে শুদ্ধ প্রকাশ বা স্বাত্মা স্ফুরিত হইতে পারিতেছে না। এই অবান্তর প্রকাশসকল ব্যবধান স্বরূপ থাকিয়া শুদ্ধ প্রকাশকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জড় চেতনাদি যাবতীয় ভেদ এখানে ভাসিয়া ওঠে। তবে ইহাও সত্য যে ইহারও মূলে মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্যলীলা কার্য করিতেছে, যদিও গুপ্তভাবে। কারণ, প্রকটভাবে বহিঃশক্তি বা ভাবেরই কারণতা দৃষ্ট হয়। মূল কারণ মায়িক প্রমাতার নিকট ঢাকা থাকে।

লৌকিক ব্যবহারে যে আমরা দেখিতে পাই একটি নিষ্পাদ্য ও অপরটি নিষ্পাদক অথবা একটি অভিব্যঙ্গ্য ও অপরটি অভিব্যঞ্জক, ইহা এই মায়িক রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এমন স্থিতিও আছে যেখানে স্বীয় আত্মার প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ অকুণ্ঠিত, অবারিত ও অপ্রতিহত। এই শুদ্ধ প্রকাশে মায়ীয় অবান্তর প্রকাশের ব্যবধান থাকে না। সেখানে জাগতিক কার্য-কারণ ভাবের খেলা নাই, নিয়তি নাই, কার্য-কারণ শৃঙ্খলাও নাই। সেখানে আত্মরূপী ভগবানের মহা-ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যই একমাত্র কারণ। অবান্তর শক্তির খেলা সেখানে চলে না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যাপার এই পরম স্থিতির বৈশিষ্ট্য।

অখণ্ড বা নিরাবরণ প্রকাশই চরম সাক্ষাৎকার। উহাই পরম দর্শন। উহাই স্বরূপস্থিতি। ঐ প্রকাশে আবরণ থাকে না বলিয়া আবরণেরও প্রকাশ উহাতে হয়, অপ্রকাশেরও প্রকাশ হয়। আবরণকে আবরণরূপে, অপ্রকাশকে অপ্রকাশরূপে, দূরকে দূররূপে, অতীতকে অতীতরূপে যে প্রকাশ করে, যাহা মায়ীয় ও খণ্ড প্রমাতাতে হইয়া থাকে, তাহাও ঐ মহাপ্রকাশে নিত্য বর্তমান থাকে। ওখানে অণু নাই, মহান্ নাই, এক মহাপ্রকাশ মাত্র আছে, অথচ সেই প্রকাশে প্রকাশের অখণ্ডতা অব্যাহত থাকিয়াও অণু ও মহানের এবং তদ্‌গত ব্যবধানেরও প্রকাশ থাকে। আরও স্পষ্টভাবে বলা চলে, পরমেশ্বররূপী আত্মাই যাবতীয় তত্ত্বরূপে, তত্ত্বাতীতরূপে, জ্ঞাতারূপে জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানরূপে, আবার এই সকলের অতীতরূপে, একই সঙ্গে ভাসমান হইতেছেন। অনন্ত বৈচিত্র্যময় ভাবময় বিশ্বও তিনি, আবার বৈচিত্র্যহীন অদ্বিতীয় ভাবাতীত বিশ্বাতীত প্রকাশও তিনি — তাঁহাতে বা সেই মহাপ্রকাশে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এই কল্পিত ভেদের প্রশ্ন ওঠে না। সামান্যরূপে তাঁহার প্রকাশ, বিশেষরূপেও তাঁহারই প্রকাশ — তাঁহার অর্থাৎ নিজের বা স্বীয় আত্মার। কোথাও লেশমাত্র আবরণ নাই, আবার যেখানে অনন্ত প্রকার আবরণ আছে সেখানকার সেই সকল আবরণও এই অনাবরণ প্রকাশেই প্রকাশমান।

সেই মহাপ্রকাশ খুলিয়া গেলে সব স্থিতিই পরম স্থিতি। কারণ একই সত্তা যে এক থাকিয়াও অনন্ত সত্তারূপে বিরাজ করিতেছে ও তদুচিত অনন্তভাবে খেলা করিতেছে এবং এই সত্তাই যে প্রত্যেকের নিজ সত্তা তাহা তখন অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পায়। বিশ্ব তখন আপন হইয়া যায়, পর তখন আপন হয়। বস্তুতঃ তখন দেখা যায় স্বয়ংই

নিজের অপ্রতিহত ইচ্ছায় বিশ্ব সাজিয়াছে ও পর হইয়াছে। সব খেলা আনন্দের খেলা, নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা — সবই এক বিচিত্র অভিনয়। নিজেই পর সাজিয়াছে, আবার পরকে নিজ করিয়া কোলে লইতেছে। বিরহও রসের পুষ্টি করে, মিলনও তাহাই করে। রসের আস্বাদনের জন্য লীলার অভিনয় হয়। আবার মূলে দেখিতে গেলে একই এক — মিলন কোথায়, বিরহই বা কোথায় ?

সত্যের খেলা তাই সত্য। মিথ্যারূপে যে প্রকাশ তাহাও সত্যের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইলে দেখা যায় যে সত্যেরই প্রকাশ। ভাবাতীতের শান্তবক্ষে অচল উৎসঙ্গে মহাভাবের প্রকাশ রহিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত খণ্ডভাবলহরী ক্রীড়া করিতেছে। অবশ্য প্রথমে খণ্ডভাব হইতে ত্যাগের পথে মহাভাবে উঠিতে হয়। মহাভাবে ভোগের চরম সিদ্ধি ঘটে। তাহার পরে ভাবাতীতে সকল সমাধান। সেখানে মহাভাব আছে, খণ্ডভাব আছে, আবার কোনও ভাবই নাই। নাই, ছিল না, হবেও না, এমন একটি স্থিতি — যুগপৎ সবই। যুগপৎও ঠিক বলা যায় না। কারণ এক ও বহুর দ্বন্দ্বের প্রশ্নই সেখানে ওঠে না।

এই যে নিজেকে পাওয়া ইহাই প্রেমের অভিব্যক্তি, মহাজ্ঞানের পরিপক্ব দশাতে যাহা অবশ্যম্ভাবী। সর্বাত্মভাব না হইলে বা সর্বত্র আত্মভাব দেখিতে না পাইলে অর্থাৎ সকলকে আপন রূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে প্রেমের উদয়ের ও বিলাসের অবকাশ কোথায় ? জ্ঞান ও প্রেমে পার্থক্য থাকে না। নিরাকারে যাহা জ্ঞান, সাকারে তাহাই প্রেম। একই সত্তা একই সময়ে যেমন নিরাকার ও সাকার উভয়ই, তদ্রূপ একই সময়ে উভয়েরই অভিন্নরূপে স্ফুরণ হয়। ইহাই চিৎ ও আনন্দের অভেদানুভব।

তিন

এই যে আত্মার কথা বলা হইল ইনিই ঈশ্বর বা ভগবান্। বলা হইয়াছে ইনি স্বাতন্ত্র্যময় খেয়ালী পুরুষ। অনন্ত ভাবেই ইঁহার প্রকাশ হইতেছে, সুতরাং অপ্রকাশ রূপেও ইঁহার প্রকাশ আছে। এই অপ্রকাশ রূপ স্থিতিতে কিছুরই প্রকাশ নাই — জড়, শূন্যতা মাত্র। এইটি মহাশূন্যের অবস্থা। কিন্তু কিছুরই যে প্রকাশ নাই সেই অপ্রকাশেরও প্রকাশ আছে। না থাকিলে অপ্রকাশের সন্ধান কোথা হইতে পাওয়া

যাইতেছে ? অথবা অপ্রকাশ রূপে যে প্রকাশ উহা প্রমেয় রূপে অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটপটাদি রূপে প্রকাশ। আবার প্রকাশ রূপেও ইহার প্রকাশ আছে। ইহা অবিভক্ত অখণ্ড প্রকাশ রূপেও হইতে পারে কিংবা বিভক্ত খণ্ড প্রকাশ রূপেও হইতে পারে। অবিভক্ত প্রকাশের নামান্তরই শিব — যিনি অখণ্ড চিৎস্বরূপ। ইহা শুধু প্রকাশই প্রকাশ। এই স্থিতিতে অপ্রকাশ কিছু থাকে না। কিন্তু ইহা অখণ্ড প্রকাশ হইলেও, পূর্ণ নহে, — পরমতত্ত্ব হইলেও তত্ত্বাতীত নহে। বিভক্ত প্রকাশের মধ্যেও দুইটি স্থিতি আছে। একটি হইতেছে পরস্পর ভিন্নরূপে। জীব মাত্রই প্রমাতা রূপে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ, তাহারা ভেদজ্ঞানের মূল মায়ার আশ্রিত বলিয়া নিজেদের পরস্পর ভেদ অনুভব করে, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ অনুসারে প্রমেয় বা জ্ঞেয় পদার্থের ভেদ অনুভব করে। অর্থাৎ নিজ আত্মা হইতে জ্ঞেয়ের ভেদ, নিজ আত্মা হইতে পর আত্মার ভেদ, এক জ্ঞেয় হইতে অন্য জ্ঞেয়ের ভেদ, পরমাত্মা হইতে জ্ঞেয়ের ভেদ এবং পরমাত্মা হইতে নিজ আত্মা ও পর আত্মা উভয়ের ভেদ ইহাদের অনুভবসিদ্ধ। শুধু মানুষ নহে উর্ধ্বে দেবকুল ও নিম্নে অসুরকুল মোট চৌদ্দ প্রকার ভূতসর্গ এই শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। বিভক্ত প্রকাশের দ্বিতীয় স্থিতিতে যে প্রকাশ হয় তাহা পরস্পর অব্যতিরিক্ত রূপে। মন্ত্র-মহেশ্বর প্রভৃতি শুদ্ধ জগতের উর্ধ্বলোকনিবাসী মহাপুরুষগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা সকলেই অভেদদর্শী, পূর্ব শ্রেণীর ন্যায় ভেদদর্শী নহেন। এই চারিপ্রকার স্থিতি হইতে অতিরিক্ত আরও স্থিতি আছে। পঞ্চম স্থিতিতে কাহারও কাহারও অংশতঃ ভিন্ন ভাবে প্রকাশ থাকে। ইঁহারা বিদ্যেশ্বর নামে পরিচিত। ইঁহাদের নিজ আত্ম বিষয়ে ভেদদৃষ্টি থাকে না ইহা সত্য, কিন্তু জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে ভেদদৃষ্টি থাকে। কারণ ইঁহারা সকলেই জ্ঞেয় বিষয়কে নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপে দর্শন করেন। আবার এমন স্থিতিও আছে যাহাতে কাহারও কাহারও অংশতঃ অভিন্ন ভাবে প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকলেই জ্ঞেয় সত্তাকে শুদ্ধ বোধাত্মক ও স্বাভাবিক ভেদশূন্য দেখিয়া থাকেন। ইঁহারাই কেবলী পুরুষ। প্রাচীন সিদ্ধ সম্প্রদায়ের পরিভাষা অনুসারে এই জাতীয় মুক্ত পুরুষকে "বিজ্ঞানাকল" নামে বর্ণনা করা হয়। ইঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই বটে, কিন্তু জড় প্রকৃতি বা মায়া হইতে আত্মস্বরূপের বিবেক সিদ্ধ হইয়াছে।

অশুদ্ধ স্থিতিতেও ইঁহারা কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত চক্র হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত। শুদ্ধাবস্থাতে ইঁহারা মহামায়া নামক বিশুদ্ধ অচিৎ তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের সকলেরই শিবজ্ঞানের অভাব। ইঁহারা সকলেই বিদেহী। এই শ্রেণীকে ষষ্ঠ স্থিতি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ইহার পর যে স্থিতি আছে তাহাই পরম স্থিতি। উহাই পূর্ণত্ব বা পরম শিবের অবস্থা। পূর্ণের মধ্যে যাবতীয় খণ্ড স্থিতি সকল নিহিত থাকিলেও পূর্ণ পূর্ণই, কারণ উহা নিজের মহিমাতে চির উজ্জ্বল।

এই সকল স্থিতিই স্বাতন্ত্র্যময় আত্মারই স্থিতি। নিজেকে জানিয়া নিজেকে প্রাপ্ত হইলে নিজেরই বিশ্বরূপতার দর্শন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিশ্বাতীত পরম সত্তাও জাগ্রত হয়। অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির ইহাই ফল নির্দেশ।

———

পরমশিবের পৃষ্ঠভূমি

অদ্বৈত সুফী সাহিত্যে পরমাত্মার তিনটি যাত্রার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম যাত্রা, পরমাত্মা হইতে বহির্মুখ গতিতে অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া এবং জীবভাব ধারণ করিয়া মনুষ্যভাবের প্রাপ্তি পর্যন্ত। দ্বিতীয় যাত্রা, মনুষ্যভাব হইতে জ্ঞানপ্রাপ্তির পরে অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধনপূর্বক পুনরায় সচেতনভাবে নিজভাব বা পরমাত্মভাবের প্রাপ্তি এবং সোহংরূপে সম্যক্ প্রকারে বোধস্বরূপে নিজের পরিচয় পর্যন্ত। এই দুইটি যাত্রার কথা অধ্যাত্ম সাহিত্যে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। প্রথম যাত্রা অজ্ঞানের যাত্রা। দ্বিতীয় যাত্রা জ্ঞানের যাত্রা। পরমাত্মা অজ্ঞানকে গ্রহণ করেন, জীবভাব ধারণ করেন এবং চরমে মনুষ্যদেহ অবলম্বন করেন — ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য চৈতন্যের বিকাশ সম্পাদন, যাহার জন্য দেহধারণ ও চৌরাশী লক্ষ যোনির মধ্য দিয়া দেহের ক্রমবিকাশ আবশ্যক হয়। এই ক্রমবিকাশের ফলে দেহের ও চৈতন্যের বিকাশ পূর্ণ হইয়া মানবীয় সত্তার অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়। তখন মানব নিজেকে নিজে পূর্ণরূপে সচেতন ভাবে জানিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, কারণ তখন অহংভাবের বিকাশ হয়। কিন্তু অবসর প্রাপ্ত হইলেও নিজেকে নিজে অহংরূপে জানিতে পারে না। তাহার কারণ, ক্রমবিকাশের ফলে বিকশিত জ্ঞানের উপরে সংস্কারের ঘনীভূত আবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আবরণ অপসারিত না হইলে আত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। আবরণের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দেহ-ইন্দ্রিয় প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতির প্রাকৃত সত্তা হইতে অহংবোধ মুক্ত হইয়া যায় এবং চরমস্থিতিতে উহা 'আমি' বর্জিত হইয়া নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে।

এই দুইটি যাত্রার ফলে আত্মা নিজের সর্বজ্ঞত্ব সর্বকর্তৃত্ব ও অন্যান্য যাবতীয় ভাগবত গুণের প্রকাশ অনুভব করে ও নিজের ভগবৎ-সত্তাতে জ্ঞানপূর্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরমাত্মা সম্বন্ধে বস্তুতঃ বোধ ও অবোধ পৃথক্‌ভাবে গৃহীত হয় না। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে বুদ্ধির সৌকর্যের জন্য বলা হয় যে তাহাতে যেমন এক পক্ষে বোধ ও

অবোধের কোন ভেদ নাই, অপর পক্ষে তেমনই তাহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ও স্পষ্টভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে যেটি অবোধের দিক্ সেটি নিত্য সুষুপ্তি বা জড়ভাব বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই সুষুপ্তিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই জড়ভাব খণ্ডিত হইয়া জড়রূপ ধারণ করে এবং চিদ্ভাবের উন্মেষ জীবরূপ ধারণ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। এই পথে চিতের সঙ্গে অর্থাৎ জীবভাবের সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ — অর্থাৎ অচেতন দেহের সংযোগ জীবের অগ্রগতিতে মনুষ্য-দেহ ধারণ পর্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। চৈতন্যের ক্রমবিকাশ বা ক্রমজাগরণই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও নিয়ামক। পক্ষান্তরে অন্য যেটি বোধের দিক্ — সেটি নিত্য জাগ্রত স্থিতিরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ চৈতন্যের অবস্থা, মহাসুষুপ্তি হইতে ইহা পৃথক্। এই অবস্থায় আত্মা স্বভাবতঃ নিজেকে অনাবৃত চেতন পরমাত্মা ও অনন্ত শক্তিসম্পন্নরূপে বোধ করিয়া থাকে। পূর্বের অবস্থাটি প্রকৃতির পরমাবস্থা — এই অবস্থাটি পুরুষের পরমাবস্থা; মূলে কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমা-বস্থায় অহংবোধের উদয় হয় না, বস্তুতঃ কোন বোধেরই উদয় হয় না — মহাসুষুপ্তি ভঙ্গের পর সেই বোধের উদয় ও পুষ্টি লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় অহংবোধ পূর্ণাহংরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

সুফীগণ বলেন, এই দ্বিতীয় যাত্রার পর কোন কোন ক্ষেত্রে একটি তৃতীয় যাত্রার সন্ধানও প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি, ভগবৎ সত্তা নিজ স্বরূপে বাহির হইয়া আসে। অপরটি, বাহির হইতে এই সত্তা অন্তর্মুখ হইয়া নিজ স্বরূপে প্রবেশ করে। নিজ স্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়ার পর ঐ স্বরূপের মধ্যেই ভিতরে ভিতরে যে পরম অব্যক্তের দিকে যাত্রা তাহাই তৃতীয় যাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যাহাকে পরমশিবের পৃষ্ঠভূমি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সন্ধান এই তৃতীয় যাত্রার পথেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই যাত্রার একটি সীমা আছে। যদিও এই যাত্রা অনন্ত তথাপি মনুষ্য-দেহে অবস্থিত হইয়া এই যাত্রার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে একটি পরম অব্যক্তের দ্বারে আসিয়া স্তম্ভিত হওয়া অপরিহার্য। অতি সূক্ষ্মদর্শী খ্রীষ্টীয় অধ্যাত্মবিৎ যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ এইজন্যই God হইতে Godheadকে পৃথক্ করিয়া বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানদৃষ্টির নির্মলতার তারতম্যানুসারে

কেহ অল্প দূরে যাইয়াই মৌন অরলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কেহ অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ অব্যক্ত চিরদিন অব্যক্তই থাকে। তাহাকে ব্যক্ত করিবার যতই চেষ্টা করা যাক না কেন তথাপি চরমস্থিতিতে অব্যক্ত অব্যক্তই থাকিয়া যায়, "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্র, অতীব গুহ্য হইলেও, এই তৃতীয় যাত্রার সন্ধান দিতে বিরত হন নাই। বিশেষতঃ তান্ত্রিকশাস্ত্র গুহ্যতত্ত্বের প্রতিপাদক বলিয়া এই মার্গে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য শাস্ত্রেও স্থানবিশেষে ইহার পরিচয় যে না পাওয়া যায় তাহা নহে।

সাধারণ দৃষ্টিতে পরমশিবাবস্থাই পূর্ণত্বের প্রতিপাদক চরম অবস্থা বলিয়া আগম শাস্ত্রে গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ, এই অবস্থায় শিব ও শক্তিভাবের সামরস্য বা সাম্য আত্মপ্রকাশ করে। শিবভাব অভিব্যক্ত প্রকাশের ভাব — ইহাই পরম প্রকাশ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সব কিছু না থাকিলেও যাহা স্বপ্রকাশ বলিয়া নিরন্তর নিজের মধ্যেই নিজে প্রকাশমান থাকে। এই প্রকাশের যেটি আত্মবিশ্রান্তি অর্থাৎ অহংরূপে বিমর্শন তাহাই শক্তি। শক্তির স্ফূরণ হইতেই বিশ্বের উদয় ঘটিয়া থাকে — শুধু তাহাই নহে, বিশ্বের স্থিতি ও লয়ও শক্তির স্ফূরণসাপেক্ষ। সুতরাং শক্তির উন্মেষ অবস্থায় এই সমগ্র প্রকাশের মধ্যে বিশ্বের আভাস দৃষ্টি-গোচর হয়। এই আভাস অহংরূপে গৃহীত হৌক অথবা ইদংরূপে গৃহীত হৌক তাহা পৃথক্ কথা — কিন্তু এই আভাসের সত্তাই মহা-প্রকাশকে সাভাস প্রকাশরূপে নির্দেশ করে। আভাস না থাকিলে ঐ প্রকাশ নিরাভাসরূপে প্রকাশমান হয়। যাহাকে লোকদৃষ্টিতে সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা এই মহাপ্রকাশরূপী পূর্ণ অহংএর স্বাতন্ত্র্য-কল্পিত ইদংরূপী বাহ্যসত্তা মাত্র। এই বাহ্যসত্তা সর্বপ্রথম শূন্যরূপে অর্থাৎ শূন্যাতিশূন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ স্তরে স্তরে অনন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা এই বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পূর্ণ পরম শিবসত্তার অন্তরালে বা পৃষ্ঠভূমিতে কি আছে তাহাই শাস্ত্র ও গুরুশক্তির সহায়তায় কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে চেষ্টা করিব। ইহা আপাততঃ গুহ্যতত্ত্বের আবরণ উন্মোচন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যাহা প্রকৃত

গুহ্যতত্ত্ব তাহার আবরণ উন্মোচন করা যায় না। ইহা শুধু পরমশিব অবস্থার অন্তর্গত কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম স্তরের বিশ্লেষণ মাত্র। এই বিশ্লেষণে যে ক্রম উপলব্ধিগোচর হয় তাহা কালগত ক্রম নহে, বোধের ক্রমমাত্র। এই ক্রম না ধরিলে দেহবদ্ধ চৈতন্য নিজের অন্তরস্থিত অনন্ত বৈচিত্র্যের কিয়দংশ সচেতন ভাবে ধারণা করিতে পারে না।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এ কথা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। বস্তুতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি ভাব অভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটি একটি বিশিষ্ট অর্থের দ্যোতক। সৎভাব অসদ্ভাব হইতে পৃথক্ হইয়া সন্মাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে, আবার চিদ্ভাবের সহিত অভিন্ন-রূপেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। তদ্রূপ চিদ্ভাব আনন্দের অতীত পরমসত্তায় বিরাজ করিতে পারে, এবং পক্ষান্তরে উহা আনন্দের সহিত অভিন্ন হইয়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পূর্ণতত্ত্বের যেটি গভীরতম স্থিতি সেখানে সৎ, চিৎ ও আনন্দ কল্পিত হইতে পারে না। এই গভীরতম সন্মাত্র স্থিতি হইতে ইহারই আত্মপ্রকাশরূপে একটি কলা বা শক্তি নির্গত হয়, যাহাকে তান্ত্রিকগণ চিৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই চিদ্ভাব এক হিসাবে দেখিতে গেলে পূর্ণ সত্যের বহিরঙ্গভাবের আদি প্রকাশ। তান্ত্রিক সাহিত্যে এই চিদ্ভাবকে অনুত্তর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সৎ হইতে নিজ সত্তা চিদ্রূপে বহির্গত হইলে চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু যে বহির্মুখ স্পন্দন চিদ্ভাবের প্রকাশক সেই স্পন্দন চিদ্ভাবের মধ্যেও পূর্ববৎ কার্য করিয়া থাকে। তাহার ফলে চিৎ নিজ সত্তা হইতে আংশিক ভাবে বহির্গত হইয়া আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করে। কিন্তু এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যাহা শুদ্ধ সন্মাত্র তাহা এক পক্ষে নিঃস্পন্দ হইলেও অপর পক্ষে স্পন্দনরহিত নহে। এই স্পন্দন বহিঃস্পন্দন — যাহার প্রভাবে সৎ চিদ্রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার অন্তঃস্পন্দন আমরা ধরিতে পারি না। অন্তঃ-স্পন্দন স্বীকার করিলেও তাহা আলোচনার যোগ্য নহে। চিৎ প্রভৃতির প্রত্যেকটির স্থিতির মধ্যে অন্তঃস্পন্দন ও বহিঃস্পন্দন দুই-ই সমরূপে বিদ্যমান আছে। সেজন্য চিৎ যেমন স্পন্দনবশতঃ আনন্দের অভিমুখ তেমনি অন্যদিকে উহা সৎ-এরও অভিমুখ। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ এই দুইটি বৃত্তি মানব চিত্তের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি; ঠিক সেইপ্রকার পরম সত্যের ভিতরেও চিৎ ও আনন্দ এই উভয়াংশের এই দ্বিবিধ স্পন্দন গৃহীত হয়। চিৎ হইতে বহিঃস্পন্দনের ফলে

যখন দ্বিতীয় চিৎ আবির্ভূত হয় তখন বহির্মুখ প্রথম চিৎ ঐ দ্বিতীয় চিতের মধ্যে নিজেকে অর্থাৎ নিজের প্রতিবিম্বকে দেখিতে পায় এবং দেখিয়া উহা নিজ সত্তা বলিয়া চিনিতে পারে। উহারই শাস্ত্রীয় নাম আনন্দ। দর্পণে যেমন নিজের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা পৃথক্ মনে হইলেও নিজ সত্তা বলিয়া বুঝিতে পারা যায় — তদ্রূপ চিৎ হইতে বিশ্লিষ্ট চিৎসত্তাতে চিৎ যখন নিজেকে দেখিতে পায় তখন উহাকে আনন্দ বলিয়া অনুভব করে। বস্তুতঃ উহা পৃথক্ কিছু নহে। নিজেরই সত্তামাত্র। সৎ হইতে যেমন চিৎ পৃথক্ নহে, কিন্তু তথাপি পৃথক্, সেইরূপ চিৎ হইতে আনন্দ পৃথক্ নহে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি চিৎ-এর শাস্ত্রীয় নাম অনুত্তর। বর্ণমালার প্রতীক 'অ'। সর্ববর্ণের অগ্রভূত 'অ' বর্ণের দ্বারা অনুত্তরকেই লক্ষ্য করা হয়। সেরূপ 'আ' এই বর্ণটি আনন্দের প্রতীক। এই সৎ চিৎ ও আনন্দ অখণ্ডভাবে গৃহীত হইলে এক অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে নিজের নিকট নিজে প্রকাশিত হয়। এই ব্রহ্মসত্তা নিরংশ হইলেও বুঝিবার সৌকর্যের জন্য ইহাতে কল্পিত দুই অংশ আছে। একটি সন্মাত্র, যাহা চিরদিন অব্যক্ত ও অব্যাকৃত — উহা চিরনিগূঢ় এবং সত্যের গভীরতম স্থিতি। উহাকেই আশ্রয় করিয়া উহার প্রকাশ চিদ্রূপে বিরাজমান — এই চিৎ বস্তুতঃ চিৎশক্তির স্বরূপ এবং ইহা যখন নিজের অভিমুখ হয় এবং অনুকূল সংবেদনরূপে প্রকাশমান হয় তখন ইহা আনন্দ নামে পরিচিত হয়। এই আনন্দ হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপ। চিৎ অবস্থা অনুকূল-প্রতিকূল ভাববর্জিত, কিন্তু আনন্দ অবস্থা নিত্য অনুকূল ভাবময়, প্রতিকূল ভাব ইহাতে নাই। চিৎ সত্তাতে একই এক, দ্বিতীয় কেহ নাই। কিন্তু আনন্দ সত্তাতে একই দ্বিতীয় সাজিয়া নিজের সঙ্গে নিজে খেলা করিতেছে। যে অবস্থার কথা বলিতেছি উহা সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা, সৃষ্টির যাবতীয় সামগ্রীর পূর্বাবস্থা। এই আনন্দ হইতেই আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রুতি বলেন — 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' যুগলভাব ভিন্ন আনন্দ হয় না এবং আনন্দভাব ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে — 'স একাকী ন অরমত। তদাত্মানং দ্বেধা অকরোৎ' ইত্যাদি। অ হইতে আ অভিব্যক্ত হওয়া আর এক হইতে দুই অভিব্যক্ত হওয়া — একই কথা। ইহাই

আত্মরমণ — আত্মারাম অবস্থা, যাহার আস্বাদন ব্রহ্মবিদ্গণ করিয়া থাকেন।

ফোয়ারা হইতে যেমন জলকণিকা নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া নির্গত হইয়া থাকে তদ্রূপ এই আনন্দরূপ প্রস্রবণ হইতে নিরন্তর আনন্দের কণিকাসকল উচ্ছ্বসিত হইয়া বহির্মুখে ধাবমান হইতেছে। বস্তুতঃ বাহির বলিয়া কিছুই নাই, অথচ একটি কল্পিত বাহ্যসত্তা প্রতিভাসরূপে মানিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ উহা আনন্দসত্তার অভাবমাত্র, আর কিছু নহে। আনন্দের সূক্ষ্মকণা আনন্দের মূল প্রস্রবণ হইতে নির্গত হইলেই উহা একটি আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, নিজের অন্তঃস্থিত আনন্দসত্তাকে আর অনুভব করিতে পারে না। শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে ইহাই ইচ্ছার বিকাশ। ইহার প্রতীক 'ই'। আনন্দ যেখানে পূর্ণ আর অভাব যেখানে শূন্য সেখানে ইচ্ছা বলিয়া কোন শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না। ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহাকেই ইষ্ট বলা হয় — ইহা অপর কিছু নহে, আনন্দই। কারণ ইচ্ছামাত্রই আনন্দকে চায় এবং আনন্দকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছা চরিতার্থ হইয়া আপনাতে আপনি বিদীর্ণ হইয়া যায়। ইচ্ছা বস্তুতঃ আনন্দকে অন্বেষণ করিবার অথবা খুঁজিয়া বাহির করিবার শক্তি। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্যই সমগ্র জগতের অন্তঃস্থলে সর্বত্র একটা অন্বেষণের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। অণু পরমাণু হইতে সূর্যমণ্ডল অথবা নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত, স্থূল হইতে কারণ জগৎ পর্যন্ত, সর্বত্রই প্রকট ভাবেই হোক আর গুপ্তভাবেই হোক একটা অদৃশ্য আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অপর কিছু নহে, একটি হারাধন ফিরিয়া পাইবার জন্য আন্তরিক বাসনা। এই হারাধন ইচ্ছার বিষয়ীভূত আনন্দ, অপর কিছু নহে। 'আনন্দ না পাওয়া পর্যন্ত অন্বেষণের বিরাম নাই, তাই ইচ্ছারও তৃপ্তি নাই, তাই পূর্ণত্ব লাভ হয় না।

এই আনন্দরূপ ইষ্টবস্তু এখনও অমূর্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইচ্ছাশক্তি যখন ঘনীভূত হয় অথবা সংবেগে স্পন্দিত হয় তখন ঈশনশক্তির উদয় হয়। ইহার প্রতীক 'ঈ'। এই ঈশনশক্তিই ঐ শক্তির প্রাণ। বস্তুতঃ ইহা ইচ্ছা ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই ইষ্টবস্তু এখন এষণীয় অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়ীভূত। ইহার পরাবস্থায় যখন এই গুপ্তধন প্রকট হইয়া উঠে তখন উহা জ্ঞেয়রূপে আত্মপ্রকাশ

করে। তখন ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তির আকার ধারণ করে। এই জ্ঞানশক্তির নামান্তর উন্মেষ, যাহার প্রতীক 'উ'।

উন্মেষরূপা জ্ঞানশক্তি নিজের বিষয় জ্ঞেয় সত্তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইচ্ছা এবং এষণীয় যেমন পৃথক্ না হইলেও পৃথক্ বলিয়া মনে হয় তদ্রূপ জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পৃথক্ না হইলেও পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানশক্তি 'উ'কারের দ্বারা বর্ণিত হয় এবং উহার বিষয় জ্ঞেয় 'ঊ'কারের দ্বারা বর্ণমালাতে গ্রথিত হইয়া থাকে। এই 'ঊ' বস্তুতঃ 'উ'রই ঘনীভূত অবস্থা। শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে ইহাকে ঊনতা বা ঊর্মি বলে।

জল হইতে বরফ যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন তদ্রূপ 'উ'কার হইতে 'ঊ'কার অভিন্ন এবং জল যেমন ঘনীভূত হইয়া বরফরূপ ধারণ করে তদ্রূপ জ্ঞানশক্তিও ঘনীভূত হইয়া জ্ঞেয়রূপ ধারণ করে। কিন্তু বরফ ঘনীভূত হওয়ার দরুণ জল হইতে পৃথক্ মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে জলই এবং জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান থাকে। ঠিক সেই প্রকার যাহাকে আমরা জ্ঞেয় বলি অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের বিষয় বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে — তাহা জ্ঞানেরই মূর্ত অবস্থা এবং জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইয়া জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে — অবিদ্যাবশতঃ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে উহাকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ মনে হয় না। কিন্তু যে অবিদ্যার কথা এখানে বলা হইল, যাহার প্রভাবে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয়কে পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়াশক্তির নামান্তর। এই ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পৃথক্ হইয়া যায়। আমাদের পূর্বের দৃষ্টান্তে জল হইতে উৎপন্ন বরফের টুকরা যতক্ষণ জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু যখন ঐ বরফের টুকরা জল হইতে অপসারিত হয়, যখন জল হইতে বরফ পৃথক্‌রূপে প্রতীতিগম্য হয়, তখন অবিদ্যারূপা ক্রিয়াশক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বর্ণমালাতে এই ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক বর্ণ চারিটি — এ-ঐ-ও-ঔ। ক্রিয়াশক্তির অস্ফুট, স্ফুট, স্ফুটতর, স্ফুটতম এই চারিটি অবস্থা ঐ চারিটি স্বরবর্ণের দ্বারা দ্যোতিত হয়। ক্রিয়াশক্তির খেলা পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইলে ক্রিয়ার নিবৃত্তি ঘটে।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে স্পন্দনের বহির্মুখ সংবেগ-বশতঃ পর পর বিভিন্ন শক্তির অর্থাৎ কলার অভিব্যক্তি হইতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই শক্তি বা কলাগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে — চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। প্রাচীন মহাজনগণ শিব অথবা পরমেশ্বরের পঞ্চমুখ কল্পনা করিয়া এই পঞ্চশক্তিরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই পঞ্চশক্তির মধ্যে চিৎ ও আনন্দ স্বরূপশক্তির অন্তর্গত। ইহারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত এবং আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি বহিরঙ্গা শক্তিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। এই বহিরঙ্গা শক্তি ত্রিকোণরূপী বিশ্বযোনি বা মহামায়া। মূলে কিন্তু পঞ্চ-শক্তিই শক্তি। যাহাকে স্বরূপ বলি তাহাও শক্তি। শক্তি নয়, শুধু সেই সত্তা মাত্র যাহা নিগূঢ়তম রূপে এই অন্তরঙ্গা শক্তিরও অন্তঃস্থলে বিদ্য-মান রহিয়াছে। এইজন্য শ্রুতি বলেন — 'অস্তি ইতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে' — এই বলিয়া সেই পরমশক্তির স্তব করিয়াছেন। এই যে শক্তিপ্রবাহ ইহা স্পন্দনের বহিঃপ্রবাহ। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রতি স্থিতিতেই একটা অন্তঃপ্রবাহ আছে — যেমন সৃষ্টিমুখী গতি বহির্মুখ ও প্রলয়ের গতি অন্তর্মুখ, যেমন বহুর দিকে ঈক্ষণ বহির্মুখ কিন্তু স্বরূপের প্রতি ঈক্ষণ অন্তর্মুখ। সর্বত্রই এইরূপ বুঝিতে হইবে। অবশ্য যেখানে অন্তর্মুখ নাই, বহির্মুখ নাই, এমন স্থিতিও আছে। এখানে তাহার সম্বন্ধে বলা হইবে না। তাহা বাণীর অগোচর। অতএব অ হইতে উ পর্যন্ত যে ধারা, যাহাকে প্রবৃত্তি ধারা বলা হইয়াছে তাহা শক্তির বহির্মুখ ধারা, কিন্তু ক্রিয়াশক্তির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখ ধারার অবসান হয় এবং ঐ সময় স্বভাবতঃই অন্তর্মুখ ধারার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। প্রবৃত্তির ধারা এবার নিবৃত্তির ধারায় পরিণত হইল। তখন ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ অবভাসমান শক্তি বা কলা অন্তর্মুখ স্পন্দনের ফলে একীভূত হইয়া সমষ্টিভাবাপন্ন হয়, যাহার নাম দেওয়া হয় বিন্দু। এই বিন্দু যাবতীয় কলার বা শক্তির একীভূত অবস্থার নামান্তর। বিন্দুর অভিব্যক্তি হইলে ইহা স্বভাবতঃই অনুত্তর অথবা 'অ'কারকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। কারণ 'অ'কারই চিৎশক্তি বা অনুত্তর। উহাকে আশ্রয় করিয়াই অর্থাৎ উহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াই সব কিছু প্রকাশিত হয় — 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'।

ইহারই নাম অংকার অর্থাৎ বিন্দুসংযুক্ত অনুত্তর। প্রথমে বহিঃস্পন্দনের বেগে যে আবির্ভাব হয় তাহা সন্মাত্র বা অব্যক্ত হইতে হইয়া থাকে। তাহার পর যে বহির্মুখ ধারার নির্গম হয় তাহা চিৎ বা 'অ'কার হইতে হইয়া থাকে। উহার অবসান 'ঔ'কারে, অর্থাৎ চিৎশক্তি হইতে ক্রিয়াশক্তি পর্যন্ত পঞ্চশক্তির আবির্ভাব সম্পূর্ণ হইল। এইবার অনুত্তর পঞ্চশক্তি সমন্বিত অর্থাৎ বিন্দুসংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এইবার যে সৃষ্টি হইবে তাহা এই 'অং' হইতে, 'অ' হইতে নহে। প্রথম সৃষ্টি ছিল বৈন্দব সৃষ্টি। এইবার ঐ এক বিন্দুই বিভক্ত হইয়া নিজেকে দুই বিন্দুতে পরিণত করে। ইহারই নামান্তর বিসর্গ — এখন যে সৃষ্টি হইবে তাহা বৈসর্গিক সৃষ্টি। এই বৈসর্গিক সৃষ্টি বস্তুতঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সৃষ্টি — তান্ত্রিক পরিভাষাতে ইহাই তত্ত্বসৃষ্টি। 'ক' হইতে 'হ' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিভিন্ন তত্ত্বের দ্যোতক। বলা বাহুল্য, এইগুলিও প্রতীক মাত্র। যখন এই তত্ত্বগুলি অভিব্যক্ত হইয়া তত্ত্বসৃষ্টির অবসান হয় তখন বুঝিতে হইবে হকার পর্যন্ত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

বৈন্দব সৃষ্টির সময়ে যেমন কলা বা শক্তিগুলি বহির্মুখ বৃত্তির পর অন্তর্মুখ গতিতে বিন্দুরূপ ধারণ করিয়া অকারে সংযুক্ত হইয়াছে, এই স্থলেও সেইরূপ 'অ'কার হইতে 'হ'কার পর্যন্ত সৃষ্টি প্রত্যাবর্তন ক্রমে অহংভাবে পর্যবসিত হইয়া থাকে। এইবার কলাসৃষ্টি ও তত্ত্বসৃষ্টির অবসানের ফলে অহংভাবের অভিব্যক্তি হইল। বলা বাহুল্য, ইহাই পূর্ণ অহং, কারণ ইহার প্রতিযোগী অন্য অহং আর নাই। সন্মাত্র অবস্থায় অহং নাই, ইহা বলা বাহুল্য। চিদানন্দ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ অবস্থাতেও অহং নাই, এবং শক্তি বা কলাসৃষ্টি যেখানে সমাপ্ত হইয়াছে সেখানেও অহং নাই। তত্ত্বসৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে অহং-এর প্রথম অভিব্যক্তি। এই পূর্ণাহং-এর অন্তরালে সমস্ত তত্ত্ব রহিয়াছে, সমস্ত শক্তিবর্গ রহিয়াছে — অর্থাৎ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শক্তিবর্গ ও পরম অব্যক্ত গূঢ় সত্তাও রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূর্ণাহং পরম শিবাবস্থা, যাহার সঙ্গে অভিন্নভাবে পরমা শক্তি বিরাজ করিতেছে। আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি তাহা এই পরমশিব হইতেই হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহার একটি সূক্ষ্ম অবস্থা আছে — একটি স্থূল অবস্থাও আছে। আমরা অনন্ত ভুবনরাজিকে বা সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি বলিয়া ধরিয়া থাকি — অহংভাব হইতে ইদং ভাবের উদয় না হওয়া পর্যন্ত তাহা

পাওয়া যায় না। যখন এই পূর্ণাহং হইতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ ইদংভাবের প্রথম বিকাশ হয় তখনই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই ইদংভাবের আবির্ভাবের পূর্বে এক অহংই অনন্ত অহংরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। তখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা ঘটিয়া থাকে। ইহার পর ইদংভাবের স্ফূরণ হইলে সর্বপ্রথম সর্ব-শূন্যরূপ পরমাকাশের আবির্ভাব হয় এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত অহং দ্বিতীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা ইদংসৃষ্টি। কিন্তু ইহা মহাসমষ্টিরূপ। এখনও কালের আবির্ভাব হয় নাই। কালের পূর্বাভাস মহাকালের মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই সৃষ্টিতেও প্রকৃত ক্রম নাই। একটা আন্তরক্রম আছে বটে — তাহা বস্তুতঃ ক্রম নহে; সুতরাং তখন অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিনকালের ক্রিয়া থাকে না, প্রচলিত কার্যকারণভাবও থাকে না। অনন্ত বৈচিত্র্য থাকে বটে, কিন্তু সকল সত্তার মধ্যেই সকল সত্তা অনুস্যূত থাকে। দেশগত ভেদও থাকে না, অথচ একটা ভেদের প্রতীতি প্রতিভাসমান হয় মাত্র। ইহার পর এই মহাসৃষ্টি হইতে খণ্ডসৃষ্টির আবির্ভাব হয়। সেইগুলি ঐশ্বরিক সৃষ্টি — তাহাতে কালগত দেহগত স্বরূপভাব অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। সমষ্টি সৃষ্টি ব্যষ্টি সৃষ্টি ইহারই অন্তর্গত। মহাসমষ্টি সৃষ্টি ইহা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। মহাসমষ্টি সৃষ্টিতে সমষ্টি সৃষ্টির ন্যায় কর্ম-জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি প্রলয় প্রভৃতির ব্যাপার নাই।

এই পর্যন্ত যাহা বর্ণনা করা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে প্রচলিত ধারণা অনুসারে বিশ্বসৃষ্টি পরমশিব হইতেই হইয়া থাকে। ইহা যুক্তিযুক্ত ধারণা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমশিব তত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাহার অন্তরালবর্তী অবস্থাও বুঝা আবশ্যক। এই নিগূঢ় রহস্য মানবীয় ভাষার দ্বারা প্রকাশ্য নহে, তথাপি ভগবদুদ্দিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে অতি সংক্ষেপে এই অন্তরাল অবস্থার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করা হইল।

———

আরোপ সাধন

এক

সাধনা বহু প্রকার আছে এবং সাধকের অধিকার অনুসারে প্রত্যেকটি সাধনার সার্থকতা আছে। সাধকের যেমন যোগ্যতার তারতম্য আছে, তেমনি তদনুসারে সাধনের ফলগত তারতম্যও আছে। যাঁহারা সাধনার ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহারা তটস্থ দৃষ্টিতে তারতম্য অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধক নিজে তটস্থ দৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারে না। রুচি ও শক্তির বিকাশ অনুসারে যে সাধক যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন পথে চলিতে থাকে তাহার নিকট তৎকালে সেই মার্গের লক্ষ্যই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অন্য মার্গের সহিত তুলনা করিয়া তারতম্য বিচার করার সামর্থ্য তাহার থাকে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং ইহা স্বাভাবিক। তবে স্থিতিবিশেষে ইহার ব্যভিচারও যে দৃষ্ট হয় না তাহা নহে।

আমি বর্তমান প্রবন্ধে আরোপ-সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যাহা বলিব তাহা যদিও কোন বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াই বলিব তথাপি তাহার মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা অবস্থাবিশেষে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতিতেও আংশিক ভাবে লক্ষিত হইতে পারে। আরোপ-সাধন যোগি-সমাজেও অত্যন্ত নিগূঢ় সাধনরূপে স্বীকৃত হয় — ভাগ্যবান্ ভক্ত ভিন্ন অপর কেহ ইহার রহস্য অবগত নহে। প্রচলিত অধিকাংশ সাধন আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, — আত্মদর্শন হইলেই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে মনে করিয়া অগ্রিম পথে আর কেহ অগ্রসর হয় না। এই আত্মদর্শন প্রাথমিক আত্মদর্শন, পূর্ণ আত্মদর্শন নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে আত্মাকে দর্শন করাই প্রাথমিক আত্মদর্শনের উদ্দেশ্য। এই প্রারম্ভিক আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত আরোপ-সাধনের সূত্রপাতই হয় না। আরোপ-সাধনের ফলে যে পূর্ণ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা অদ্বৈত আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি। তাহা বহুদূরবর্তী আদর্শ। কিন্তু প্রাথমিক আত্মদর্শনও সাধন পথে অতি উচ্চ অবস্থার সূচনা করিয়া থাকে। যাহা হউক,

আরোপ-সাধনের বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে কিয়দংশে অনুমিত হইতে পারে।

দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ইষ্টমন্ত্র দান করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। বস্তুতঃ গুরু যে বাহির হইতে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় শিষ্যকে শব্দবিশেষ শুনাইয়া দেন তাহা নহে — তিনি দীক্ষার সময় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামিরূপে শব্দব্রহ্মময় জ্ঞান দান করেন। এইজন্যই দীক্ষাদাতা গুরুকে জ্ঞানদাতা রূপে শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, কারণ ইহা শব্দ হইতে উত্থিত হয়।

জ্ঞান দুই প্রকার। একটি শব্দজ অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরুর উপদেশ-বাণী হইতে শিষ্যের হৃদয়ে পরোক্ষরূপে উদ্ভূত। ইহাকে আগমোত্থ অথবা আগমজন্য জ্ঞান বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে ঔপদেশিক জ্ঞান বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান শব্দ হইতে উত্থিত হয় না অর্থাৎ গুরু বাক্য হইতে জন্মে না, কিন্তু শিষ্যের বিবেক হইতে আপনা আপনি উদ্ভূত হয়। ইহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলে — প্রাতিভ জ্ঞান ইহার নামান্তর। ইহা অনৌপদেশিক। কারণ, ইহা অন্যের মুখ-নিঃসৃত উপদেশ-বাণী হইতে উৎপন্ন হয় না। এইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সদ্‌গুরুর বিশিষ্ট কৃপার উদয় না হওয়া পর্যন্ত এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই তারক জ্ঞান — ইহার অবিষয় কিছুই থাকে না। ইহাতে একই ক্ষণে অতীত, অনাগত ও বর্তমান সকল পদার্থের সর্ববিধ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। এই জ্ঞানে ক্রম থাকে না, দেশগত অথবা কালগত ব্যবধানের প্রশ্ন থাকে না, — সর্বজ্ঞত্ব ইহারই নামান্তর। গুরুর মৌখিক উপদেশ হইতে এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। এই মহাজ্ঞানের সঞ্চার-কালে সদ্‌গুরু বাহ্যতঃ কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু মৌনী থাকেন, অথচ ইহার এমনি প্রভাব যে ইহাতে যাবতীয় সংশয় ছিন্ন হইয়া অখিল কর্ম-বন্ধন ক্ষীণ হয় এবং হৃদয়ের মর্ম-প্রবিষ্ট গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয়। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।"

পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করার পর সাধকের চিত্তে যতদিন পর্যন্ত ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুলতা না জন্মে ততদিন সদ্‌গুরুর কৃপার উদয় হয় না এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, অভাবের বেদনা, লাঞ্ছনা, আধি ও ব্যাধি এবং

নানা প্রকার পরীক্ষা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য উৎকট তৃষ্ণা জন্মে না। গুরুর মঙ্গলময় ইচ্ছাতে সাধককে বহু প্রকার অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কেহ কেহ এই সকল অবস্থাকে প্র্যারব্ধের ফল ভোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নানা প্রকার প্রলোভন এবং পরীক্ষা দ্বারা সাধকের চিত্ত প্রকৃত সত্যের অন্বেষণের পথে জাগ্রত থাকে। অনেক সাধকের বিশ্বাস ও ধৈর্যের পরীক্ষা এই সময়েই হইয়া থাকে। যাহার চিত্তে যে অংশে দুর্বলতা তাহার সেই অংশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভক্ত mystic গণের বর্ণনা অনুসারে এই সময়টিকে Dark Night of the Soul, এমন কি Dark Night of the Spiritও, বলা যাইতে পারে। ইহা সত্যই গভীর অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় ও আতঙ্কপ্রদ। প্রবল উৎকণ্ঠা, গুরুর আদেশানুসারে যথাশক্তি সাধনার চেষ্টা, নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধৈর্য ও সহনশীলতার দ্বারা নিজের চিত্তকে সংযত ও স্থির রাখিতে চেষ্টা করা এবং সর্বোপরি অবশ্যম্ভাবী গুরু-কৃপার উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া তাহার জন্য একান্ত মনে প্রতীক্ষা করা — ইহাই এই সময়ের একমাত্র কর্তব্য। এই অবস্থার মধ্যে অতর্কিতভাবে সদ্‌গুরুর মহাকরুণা আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধকের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দময় চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। অত্যন্ত উত্তাপময় গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে নব বর্ষার সূত্রপাত হইলে তাপ-ক্লিষ্ট জীব-জগৎ যেমন উৎফুল্ল হয়, ঠিক সেই প্রকার দীর্ঘকালের অবসাদ ও নৈরাশ্যের পর গুরুকৃপার আবির্ভাব হইলে সাধকের চিত্তও সর্বপ্রকার সংশয় ও চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি শান্ত ও স্থির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় — যে জ্ঞানে সংশয় অথবা বিকল্পের স্থান নাই। সূর্যের উদয় হইলে তিমির রাশি যেমন ঐ কিরণের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া অপসারিত হয়, তদ্‌রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তস্থিত অনাদিকালের সঞ্চিত আবর্জনারাশি মুহূর্তমধ্যে বিলীন হইয়া যায়। শব্দব্রহ্ম হইতে শব্দাতীত পরব্রহ্মের অধিগম এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

এই পরব্রহ্মরূপী আত্মা বা সাক্ষী নির্মল চৈতন্যস্বরূপ। ইনি মানবের দেহে ও বিশ্বে সর্বত্র অসঙ্গভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, দেশ কাল ও

আকৃতির বন্ধন ইহাতে নাই। তাই সর্বত্র সর্বদা ও সর্ব আকারের মধ্যে ইনি সমরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু এমনই অদ্ভুত রহস্য যে ইনি সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। এক খণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পর কুণ্ড হইতে উঠাইয়া লইলে যে অগ্নিময় লৌহখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে একাধারে যেমন অগ্নিও আছে ও লৌহও আছে, উভয়ই পরস্পর মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্‌রূপ একই আধারে দেহ ও আত্মা দুই-ই বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অপৃথক্‌ভাবে বা মিশ্রভাবে, কারণ, দেহ হইতে আত্মাকে অথবা আত্মা হইতে দেহকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র গুরূপদিষ্ট কর্ম-কৌশলে এই আত্ম-বস্তুকে দেহ হইতে বা প্রকৃতির অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করা যায়। ইহাই বিবেক-জ্ঞানের উদয়, যাহা এক হিসাবে আত্মদর্শন নামে সাধক-সমাজে পরিচিত। সর্বদা সর্বত্র সমভাবে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই সাক্ষাৎকার। ইহারই নাম জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন। এই সময়ে দীক্ষা-কালে প্রাপ্ত পরোক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। আরোপ সাধক যোগিগণ এই সাক্ষিস্বরূপ চিন্ময় সত্তাকে তাঁহাদের সরল ভাষায় 'বর্তমান' নামে অভিহিত করেন। এই 'বর্তমান' প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তার একমাত্র সমন্বয় ভূমি। গীতোপদিষ্ট উত্তম পুরুষে বা পরমাত্মাতে যেমন ক্ষর ও অক্ষর উভয় সত্তার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্‌রূপ এই নিত্য বর্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তাই বিরাজ করিতেছে। তাই আরোপ সাধক বলেন —

'সাক্ষিভূত বর্তমান দাঁড়ায়ে সাক্ষাতে,
নিরাকার ও সাকার এই দুই দেখ তাতে।'

এই বর্তমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য সমাপ্ত হইয়া যায়, কারণ এই বর্তমানই জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ও ইহাকে অভিব্যক্ত করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। কর্ম যেমন জ্ঞানের উদয়ে সার্থক হয়, তদ্‌রূপ জ্ঞানও জ্ঞেয় আবির্ভূত হইলে সার্থক হয়। জ্ঞেয়ই ইষ্ট, সুতরাং কর্ম ও জ্ঞানের প্রভাবে ইষ্টের আবির্ভাব হইলে সাধক উভয়ের অতীত এক অভিনব উন্নত স্তরে প্রবেশ লাভ করেন। যে সাধক এইখানেই নিবৃত্ত হন তাঁহার পক্ষে পরবর্তী অবস্থার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থা আত্মদর্শন হইলেও ইহা যে পূর্ণ আত্মদর্শন নহে

এবং এ অবস্থাতে স্থিতি যে অখণ্ড আত্মস্বরূপে স্থিতি নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

দুই

এইবার সাধকের জীবনে প্রেমের কার্য আরম্ভ হইবে। শ্রীশ্রী গুরুদেব বলিতেন, কর্ম হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইতে প্রেম হয়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত রস-সাধনার সূত্রপাত হইতে পারে না। রস-সাধনার জন্য ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং ভাবের বিকাশের জন্য তৎপূর্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক। কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলেই ভাবের উদয় হইতে পারে না, তাহার জন্য আনুষঙ্গিক সাধনা আবশ্যক। এইবার আমরা সেই আনুষঙ্গিক সাধনার পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আমরা যাহাকে আরোপ-সাধনা বলিয়াছি পূর্বোক্ত আত্মজ্ঞান লাভের পরেই তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় এবং এই আরোপ সাধনার ফলেই পূর্ণ আত্মস্বরূপে স্থিতি, আত্মারাম অবস্থা লাভ, নিত্য লীলার আস্বাদন প্রভৃতি মনুষ্যের পরাৎপর পুরুষার্থ সকল সিদ্ধ হয়।

সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছাদে উঠিতে পারিলে ঐ সিঁড়ির প্রয়োজন যেমন আর থাকে না, তেমনি কর্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত হইলে কর্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন আর থাকে না। পূর্বেই বলিয়াছি, জ্ঞেয়ই ইষ্ট — ইনি সদা ও সর্বত্র বর্তমান পুরুষোত্তম। কৃষ্ণ-উপাসকের ইনি নিত্য কৃষ্ণ এবং রাম-উপাসকের ইনি নিত্য রাম। সকল উপাসকেরই আপন আপন ইষ্টরূপে ইনিই একমাত্র উপাস্য।

দীক্ষাকালে যে শব্দ মন্ত্রদাতা গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সদ্‌গুরুর কৃপায় সেই শব্দই আজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় জ্ঞেয়রূপে অথবা চিন্ময় ইষ্টরূপে প্রকাশমান হইয়াছে। বৈখরী বাক্ আজ পশ্যন্তী ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছে। ক্রিয়া, মন্ত্র, জপ প্রভৃতি সার্থক হইয়াছে, কারণ, যে বস্তু এতদিন শুধু শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ছিল আজ তাহা নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রবণ-জাত জ্ঞান সাক্ষাৎ দর্শনে পরিণত হইয়াছে। এখন আর পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই। কারণ, আত্মভাবে নিষ্ঠা জন্মিলে সাধকের

সকল চেষ্টা অর্চনাতে পরিণত হয় এবং সকল বাক্যই মন্ত্র-জপের তুল্যতা লাভ করে।

এই নিত্য বর্তমান রূপই আরোপ সাধকগণের পরিভাষাতে 'শ্যামবিন্দু' নামে পরিচিত। জগতের অনন্ত রূপ, অতীত, অনাগত ও বর্তমান ত্রিবিধ কাল, দূর ও নিকট যাবতীয় দেশ, সবই এই নিত্য বর্তমানে অভিন্নভাবে স্থিত রহিয়াছে। এই রূপের উদয় হইলেই জগৎ আলোকিত হয় এবং ইহার তিরোভাবের ফলে জগৎ আচ্ছন্ন হয়।

এই রূপটি অতি গুপ্ত এবং গুহ্য। যদিও ইহা সর্বদা সর্বত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে, তথাপি আবরণে আবৃত বলিয়া সকলের চক্ষে ইহা ভাসে না। দ্রষ্টার চক্ষুতেও আবরণ আছে, আবার বস্তুর স্বরূপেও স্ব-কল্পিত আবরণ আছে। অখণ্ড সত্তার প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আবরণ থাকা স্বাভাবিক। আত্মদর্শনের পর এই দৃষ্টিগোচর আত্মস্বরূপকে নিয়ত ভজন করা আবশ্যক। ইহা কর্মের অঙ্গভূত উপাসনারূপ ভজন নহে, ইহা নিত্য ভজন — ইহাতে দিক্, দেশ ও কালের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। ইহাতে দশাগত, বর্ণগত, পরিমাণগত এবং লিঙ্গগত কোন ভেদ নাই। ইহা চিন্ময়, সর্বরূপ ও সর্বাকার। সাধকগণ ইহাকে নিষ্ক্রিয় ভজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ইহা সর্বাকার হইলেও সাধক স্বয়ং মনুষ্যরূপী বলিয়া নিজের ইষ্টকে পাইলেই তাঁহার ভজনের অনুকূলতা জন্মে। সেইজন্য সাধকের কল্যাণ-কামনায় তাঁহার জ্ঞেয় বা ইষ্ট মনুষ্যাকার হইয়া প্রকাশিত হন। মনুষ্য-আকারের বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক নিজে মনুষ্য বলিয়া এই ইষ্ট-আকার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজেরই আকার অথবা নিজের সহিত অভিন্ন আকাররূপে প্রতিভাসমান হয়। তখন ভক্ত সাধকের নিজ দেহের প্রতি যে সেবা বা পরিচর্যা করা হয়, তাহা তাঁহার ইষ্টের পরিচর্যারূপে পরিণত হয়। ভক্তের রূপ ও তাঁহার ভজনীয়ের রূপ পৃথক্ হইয়াও তখন অপৃথক্‌ভূত, উভয়ই তখন সমসূত্র। ইষ্ট তখন ভক্তের সঙ্গে যোগে থাকিয়া অনুরাগে অনুষ্ঠিত ভক্তসেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম তখন মনুষ্যাকার বা নররূপী। ভক্ত মনুষ্য, তাই ভগবান্ মনুষ্য, উভয়ে কোন ব্যবধান নাই।

এই নিত্য বর্তমানের দর্শন অপরিসীম ভাগ্যের কথা, গুরুকৃপার পরাকাষ্ঠা এই দর্শনেই জানিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি নিত্য বর্তমানে ত্রিকালই ভাসে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ত্রিকাল কোথায়? একমাত্র

বর্তমানই ভূত-ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়া নিজের অসম প্রভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইজন্যই সাধক যে কোন অবস্থাতে এই স্থিতি লাভ করেন ঐ অবস্থা তাঁহার পক্ষে আর অবস্থা থাকে না, উহা নিত্য বর্তমানরূপে প্রকাশিত হয়। তাই ভজনের প্রভাবে ঐ অবস্থা বা দশা বিকার-রহিত হইয়া নিত্য অথবা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করে। তখন উহা কালের দশারূপে পরিগণিত হয় না — উহা কালাতীত হয়। এটিকে নিত্য দেহ বলে। যে দেহ যে বয়সে যে রূপে ভজন করে তাহাই নিত্য দেহরূপে প্রকট হইয়া থাকে।

তিন

আরোপ সাধনা অভ্যাস-সাপেক্ষ। এই অভ্যাসের ক্রম আছে। স্থূলভাবে এই ক্রমের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছি।

(ক) সাক্ষিভূত সম্মুখস্থিত বর্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তা দেখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক।

(খ) মনের উৎকণ্ঠা এবং প্রাপ্তির লালসা যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর তীব্র হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিষয় ও বিষয়ীর সংসর্গ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলা উচিত, কারণ ইহা ভজনের অন্তরায়-স্বরূপ। আকাঙ্ক্ষা যাহার যত তীব্র হইবে প্রাপ্তি তাহার তত নিকটবর্তী জানিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া হৃদয় হইতে আশার কণিকা পর্যন্ত বর্জন করিতে হইবে, অর্থাৎ আশা না রাখিয়া শুধু আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইতে হইবে।

(গ) একান্ত-বাস এই সাধকের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। যত অধিক সময় সম্ভবপর হয় নির্জন স্থানে অবস্থানের চেষ্টা করা উচিত। লোক-সংসর্গ যথাশক্তি বর্জনীয়, কারণ উহাতে শক্তি-ক্ষয় হয়। একান্ত স্থানে থাকিবার সময় এমনভাবে অবস্থান করিবে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়। দেহটিকে যে কোন প্রকারেই হউক স্থির রাখার অভ্যাস করা উচিত। প্রোথিত স্তম্ভ যেমন নিশ্চলভাবে দণ্ডায়-মান থাকে দেহকে তাহার অনুরূপ-ভাবে স্থির রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

(ঘ) দেহ-স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সর্বদা যথাশক্তি ভ্রূমধ্যে ধারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহারই সহকারিরূপে নিমেষ ও উন্মেষ বর্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য চক্ষুর পলক যাহাতে দীর্ঘকাল

পর্যন্ত না পড়ে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহার নাম 'নিমেষ-বর্জন।' পক্ষান্তরে অভ্যাসের সময় তন্দ্রা ও নিদ্রার আবেশ যাহাতে না হয় সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। নিমেষপাত ও ক্ষণ-মাত্রের জন্য তন্দ্রার উদয় আদর্শ-প্রাপ্তির অন্তরায় স্বরূপ। নিমেষ বা পলক পড়িবার আশঙ্কা হইলে চক্ষুকে শিথিল করিয়া রাখা উচিত। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইচ্ছানুরূপ নিমেষ-বর্জন আয়ত্ত হয়। ইহা একটি উচ্চ অবস্থা। এইভাবে মন স্থির হয়, বায়ু স্থির হয়, এবং অপ্রার্থিত হইলেও সিদ্ধি সকল আয়ত্ত হয়। আরোপ-সাধক কৃত্রিম ভাবে প্রাণায়াম বা কুম্ভকাদির অভ্যাস করেন না — তাঁহার প্রাণ স্বাভাবিক রীতিতে উপশম প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য হঠ-যোগাদিসাধ্য প্রাণায়াম ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয় না।

চার

মন, বায়ু ও দৃষ্টি স্থির হওয়ার কথা পূর্বে বলা হইল। যখন এই স্থিতি লাভ সম্পন্ন হইবে তখনই পরবর্তী সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎপূর্বে নহে। ইহার নাম 'লক্ষ্য-বেধ'। লক্ষ্য কাহাকে বলে? সাধকের হৃদয়নিষ্ঠ গুরুদত্ত ইষ্টরূপই লক্ষ্য। এই অন্তস্থিত রূপকে চক্ষুর্দ্বয়ের বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে এবং সম্মুখে স্থান-বিশেষে স্থাপন করিতে হইবে। যাহা হৃদয়-আকাশে গুপ্তরূপে নিহিত ছিল তাহাকে বাহির করিয়া বহিরাকাশে ব্যক্তরূপে স্থাপন করিতে হইবে। হৃদয়-আকাশ* ও বহিরাকাশের যেটি সন্ধি তাহাই লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান বা কেন্দ্র। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে অধিক রহস্য প্রকাশ করা উচিত মনে করিলাম না। সন্ধির ওপারে স্থির বায়ু এবং এপারে চঞ্চল বায়ু। চঞ্চল বায়ুর সীমার বাহিরে স্থির বায়ুর প্রান্ত ভূমিতে লক্ষ্যকে স্থাপন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত প্রণালীতে ভ্রূ-মধ্যে স্থিরীভূত মনকেও ঐস্থানে বসাইবে। নিমেষ ত্যাগ করার অভ্যাস পূর্বে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এবার দৃষ্টিকে নিমেষ-বর্জন পূর্বক পূর্বোক্ত লক্ষ্যস্থানে সন্ধান করা আবশ্যক। ইহার ফলে মন, নেত্র ও লক্ষ্য এক হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহার নাম লক্ষ্য-

---

*ইহা যোগিগণের পরিচিত লক্ষ্যত্রয়ের অন্তর্গত বহির্লক্ষ্যের প্রকারভেদ মাত্র।

ভেদ*। লক্ষ্যভেদের সময় মনে যাহাতে অন্য ভাব না থাকে এবং দৃষ্টিতে অন্য কিছু না ভাসে তাহার জন্য অবহিত থাকা আবশ্যক।

পাঁচ

লক্ষ্যভেদ ক্রিয়া ঠিক ঠিক নিষ্পন্ন হইলে সাধকের হৃদয়স্থিত রূপ দৃষ্টির সম্মুখে বাহিরে প্রকাশিত হয়। রূপ নয়নগোচর হইলেই ঐ রূপের প্রত্যেকটি অঙ্গ দর্শন করা আবশ্যক। সাধক-সমাজে ইহার জন্য একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার বিধান রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ বহিরাকাশস্থিত মূর্তির পদতল হইতে ক্রমশঃ উর্ধ্বদিকে এক একটি অঙ্গের উপর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে মস্তকের অগ্রভাগস্থিত কেশান্ত পর্যন্ত নিরীক্ষণ আবশ্যক। ইহার নাম অধঃ-উর্ধ্বক্রম। ইহার পর উর্ধ্ব হইতে অধোদিকে অর্থাৎ কেশান্ত হইতে পদতল পর্যন্ত ক্রমশঃ এক এক অঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে একবার অনুলোমে এবং একবার বিলোমে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা আবশ্যক। চক্ষুকে কোমল ও সরল ভাবে রক্ষা করিয়া দৃষ্টি সন্ধান আবশ্যক। উদ্দেশ্য এই, বাহ্য রূপের প্রতি অঙ্গই যেন দৃষ্টির সম্মুখে নিরন্তর ভাসিতে থাকে। অভ্যাসের সময় ক্রম অবলম্বন করিয়া এক অবয়বের পর অপর অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে হয়, ইহা সত্য। কিন্তু অভ্যাস ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সকল অঙ্গই যুগপৎ দৃষ্টিগোচর হয়, ক্রমিক দর্শনের আবশ্যকতা আর থাকে না। যদি কখনও কোন কারণে কোন অঙ্গ দৃষ্টির সম্মুখে না ভাসে তাহা হইলে ঐ অঙ্গে পুনর্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ব অঙ্গ এক সঙ্গে উদ্‌ভাসিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রকারেই অভ্যাস করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এই রূপ-সন্ধান ব্যাপারে কালাকাল অথবা শুচি-অশুচির কোন বিচার

---

* মুণ্ডকোপনিষদে প্রকারান্তরে লক্ষ্যবেধের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দেহ-সাধকের ব্রহ্মই লক্ষ্য, আত্মাই শর এবং প্রণবই ধনুঃ। প্রণব দ্বারাই ব্রহ্মে আত্মাকে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। লক্ষ্যবেধের নিদর্শন সুসংহিতাকার এইভাবে দেখাইয়াছেন —

লক্ষ্যং সর্বগতং চৈব পরোক্ষং সর্বতোমুখম্।
বেদ্ধা সর্বগতশ্চৈব বিদ্ধং লক্ষ্যং ন সংশয়ঃ॥

নাই। ইহা সর্বদাই করা উচিত — শয়নে, উপবেশনে, চলনে, স্থিতিকালে সব সময়ে ইহা করণীয়। কোন সময় বাদ দেওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে বাহ্য রূপের সর্বাঙ্গ একই সময় দৃষ্টিতে ভাসিবে। তখন অখণ্ড মণ্ডলাকারে সমস্ত শরীর প্রকাশিত হইবে এবং শরীরটি প্রাণযুক্ত অর্থাৎ জীবন্তরূপে প্রতিভাসমান হইবে। এই অবস্থায় সাধকের নয়নের সহিত সাধ্য-রূপের নয়নের মিলন ঘটিবে। এই চারি চক্ষুর মিলনই শুভদৃষ্টি বলিয়া জানিতে হইবে। এই সময় হইতে সাধক বা সাধ্য বা ইষ্ট উভয়ের জন্য উভয়ের অস্থিরতা অথবা চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইবে। ইষ্ট প্রাণময় না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকার চাঞ্চল্য জন্মে না। বস্তুতঃ উপাস্য মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহা না হইলে, মূর্তি মূর্তিমাত্র, উহা মৃন্ময়, শিলাময়, দারুময় অথবা জ্যোতির্ময় হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাহ্যরূপ প্রাণময় না হওয়া পর্যন্ত উহা সাধকের ভাবানুসারে সাড়া দিতে সমর্থ হয় না।

ছয়

ইহার পর ভাবের উদয় হয়। সাধক তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিজের কায়, মন ও বাক্য, এমন কি তাহার সর্বস্ব অর্থাৎ তাহার চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় শরীর ইষ্টকে সমর্পণ করে এবং তখন হইতে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। ইহার ফলে সাধক ঐ জীবন্ত ইষ্টরূপ সর্বদাই দেখিতে পায়। বেদে আছে, 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' ইহা কোন কোন অংশে তাহারই অনুরূপ অবস্থা। যতক্ষণ রূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর সাধকের হৃদয়ে ভাবের জাগরণ না হয় ততক্ষণ ঐ রূপ ঠিক ঠিক চেতন রূপ নহে এবং উহা সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনও উহা দৃষ্টিগোচর হয়, আবার কখনও উহা দৃষ্টি হইতে অন্তরাল হইয়া যায়। সূর্যের যেমন একবার উদয় হয় এবং একবার অস্ত হয়, তার পর কিছু সময় অদর্শনের পর পুনর্বার উদয় হয়, ঐ রূপও তখন উদয়াস্তময় দ্বন্দ্ব অবস্থার মধ্যে থাকে। শাস্ত্রে এ প্রকার রূপকে শান্তোদিত রূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে ভাব জাগিয়া উঠিলে এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। তখন আবির্ভূত রূপ চিন্ময় বলিয়া আর তিরোহিত হয় না। বস্তুত তখন ঐ রূপের

উদয়ও নাই, অস্তও নাই — শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে উহার নাম নিত্যোদিত রূপ।

রাত্রে, দিনে, নিদ্রায়, জাগরণে, শয়নে, ভোজনে, সর্বকালে, আসনে বসিয়া, এমন কি পথে চলিতে চলিতে, সাধক সর্বদা তাহার নিত্য সঙ্গী ইষ্টের দর্শন লাভ করিয়া থাকে। তখন সাধ্যের সঙ্গে সাধকের বিচ্ছেদ চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়। সংসারের সুখ-দুঃখ ও জ্বালা-যন্ত্রণা সাধককে আর কখনও স্পর্শ করে না — আঘাত করা ত দূরের কথা। কারণ, সাধকের মন তখন সর্বদা সাধ্য বস্তুতে লগ্ন থাকে, পূর্বের ন্যায় বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় না। জগতের কোন ঐশ্বর্য-সুখ অথবা মান-সম্মান সাধককে আকর্ষণ করিতে পারে না। ঐ অবস্থায় একটি অপূর্ব আনন্দের আস্বাদন সর্বদার জন্য সাধককে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঐ আনন্দের আর তুলনা নাই। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সাধককে আর অভিভূত করিতে পারে না। তখন ক্ষোভ বা ভয় অথবা সকল প্রকার বিকার সাধকের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া যায় — বস্তুতঃ সব বৃত্তিই তাহার থাকে, কিন্তু তাহার অধীনভাবে — দাসরূপে। সাধকের উপর উহাদের কোন প্রভুত্ব থাকে না, সাধক ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে জাগাইয়া উহাদের সহিত খেলা করিতে পারে।

এই সময় ভক্ত ইচ্ছাময় এবং স্বতন্ত্র, অথচ নিত্য ভগবৎ-সঙ্গের সঙ্গী এবং তাঁহার ভাবে ভাবিত। তখন তাহার মধ্যে অতুলনীয় শক্তির বিকাশ হয়। যদিও ইহা প্রকাশের বিষয় নহে, তথাপি সাধক নিজেকে তখন ভগবানের ন্যায় সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তৃত্বসম্পন্ন বলিয়া অনুভব করে। নিয়তির পারতন্ত্র্য অথবা অন্য কোন খণ্ডশক্তির অধীনতা তাহার আর থাকে না। তখন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাত

কিন্তু যদিও ভক্ত ভগবানের সমতা লাভ করে তথাপি ভক্ত বিশুদ্ধ অভিমানের দ্বারা নিজেকে দাস বলিয়া অভিমান করে, প্রভু বলিয়া করে না। তখন ভক্তের আত্মা ও ভগবানের আত্মা একই অভিন্ন আত্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। তথাপি ভক্ত ব্যবহার-ভূমিতে আরোপিত ভেদ বা আহার্যভেদ অবলম্বন করিয়া দাস-প্রভু ভাব অক্ষুণ্ণ রাখে।

সাধক তখন এক অদ্বিতীয় নিত্যানন্দময় বস্তু, তাই নিজেকে সর্বরসের আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারে। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ অদ্বৈতভূমিতে স্থিতি হয় বলিয়া যোগী ভক্ত ইচ্ছা করিলে নিজের আস্বাদ নিজে গ্রহণ করিতে পারে। ইচ্ছা না করিলে যেমন আছে তেমনি থাকে। ইচ্ছার দিক্‌টা নিত্য এবং ইচ্ছা না করার দিক্‌টাও নিত্য, উভয়ই সমরূপে তখন স্থিত হয়।

যদি ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার হ্লাদিনী শক্তি প্রকট হন। ইনি আত্মার স্বরূপশক্তি, যাঁহার দ্বারা আত্মা নিজের আনন্দ নিজে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণভক্তগণের পরিভাষাতে ইঁহারই নাম রাধা, রাম উপাসকগণের দৃষ্টিতে ইঁহার নাম সীতা। হ্লাদিনী যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকট না হন ততক্ষণ ইচ্ছার উদয় হয় না। হ্লাদিনী প্রকট হইলে রমণের জন্য সাকার ও নিরাকার উভয় সত্তার যোগ হয়। সাকার ও নিরাকার যুক্ত না হইলে আত্মারাম অবস্থা লাভ হয় না। জ্যোতি অথবা পুরুষ নিরাকার, আধার অথবা প্রকৃতি সাকার। হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর মিলিত হইয়া আত্মারাম স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। হ্লাদিনীর স্বভাব অত্যন্ত শীতল। ইহার ক্রিয়া সর্বপ্রকার আনন্দের মূল প্রস্রবণ। এইবার হ্লাদিনীসহকারে পুরুষ-প্রকৃতির যোগের ফলে পূর্ণ আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাই যথার্থ অদ্বৈত অবস্থা, যাহার নামান্তর সচ্চিদানন্দ। পূর্বে প্রাথমিক আত্মদর্শন প্রসঙ্গে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃতিবিযুক্ত আত্মা বা রিক্ত আত্মা। এখন যে আত্ম-স্বরূপের কথা বলা হইল তাহা প্রকৃতি-যুক্ত আত্মা বা পূর্ণ আত্মা।

পূর্ণ আত্মা এক। যখন এই মূল এক স্বরূপে স্থিতি হয় তখন অভেদ অথবা অদ্বৈত স্থিতি বলা চলে — ইহা লীলাতীত স্বরূপ-স্থিতি। ইহা পূর্ণ — পূর্ণ বলিয়াই অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায় স্বভাবতঃ ইহা হইতে ভেদের আবির্ভাব হইতে থাকে। ইহাই তাঁহার নিজ শক্তির খেলা। এই ভেদাংশের আবির্ভাব অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এক হিসাবে ইহাকে ভেদাভেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাই নিত্য লীলার ধারা।

আর একটি ধারা আছে — এই ধারাতে নিজ স্বাতন্ত্র্যবলে অভেদ বা অদ্বৈত নিজেকে গোপন করিয়া দ্বিতীয় রূপে প্রকাশিত হন। এই

ধারাতে অভেদভাব গুপ্ত অথবা বিস্মৃত থাকে বলিয়া এইটি সংসারের ধারাতে পরিগণিত হয়। পূর্ণ হইতে কলার আবির্ভাব হইয়া অহং জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই দ্বৈত ধারার বা সংসার-ধারার মূল প্রসূতি। হ্লাদিনী শক্তি ষোড়শী-কলা-রূপা অমৃত-কলা, কিন্তু অহং-জ্ঞান ষোড়শী কলা হইতে হয় না — খণ্ডকলা হইতে হয়। কারণ কলা যেখানে পূর্ণ সেখানে প্রকাশও পূর্ণ। প্রকাশ পূর্ণ বলিয়া সেখানে অহং-জ্ঞানের উদয় হয় না, অর্থাৎ অহংকার জন্মে না। যাহা আছে তাহা পরিপূর্ণ অহংভাব, অহংকার নহে। অহংকার থাকিলে তাহার প্রতিযোগিরূপে ইদং ভাবের সত্তা থাকে। অহংকার হইতে অজ্ঞান অথবা মোহ আবির্ভূত হইয়া পুরুষকে মোহিত করে ও জ্যোতিকে ঢাকিয়া ফেলে। তখন ঐ মোহগ্রস্ত পুরুষ কর্মাধীন হইয়া নিরন্তর চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। তাহার পর সদ্‌গুরু-কৃপাতে তত্ত্বদর্শন হইলে সাধন-পথে চলিতে থাকে ও ক্রমশঃ সাধন সম্পন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়ের পরে সিদ্ধিলাভ করে ও অখণ্ড সুখের অধিকারী হয়।

আট

আনন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে সংক্ষিপ্ত-ভাবে আনন্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে — প্রথমটি ব্রহ্মানন্দ, দ্বিতীয়টি ভজনানন্দ ও তৃতীয়টি জীবানন্দ। ব্রহ্মানন্দ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ, কিন্তু তাহাতে কোন আস্বাদন নাই; কারণ নিজেকে নিজ হইতে কিঞ্চিৎ বিভক্ত না করিলে আস্বাদন করা যায় না। জীবানন্দে আস্বাদন আছে, কিন্তু উহা পরিমিত ও বিনশ্বর। এই আনন্দের ক্রমিক বৃদ্ধি আছে, কিন্তু পরাকাষ্ঠা নাই। বস্তুতঃ এই আনন্দ স্বরূপ-দৃষ্টিতে ভোগানন্দ বলিয়া দুঃখেরই অন্তর্গত। আরোপ সাধকগণ বলেন, জীবানন্দ সর্বদা হেয়, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মানন্দও উপাদেয় নহে। তাঁহারা ভজনানন্দকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করেন। ব্রহ্মে লীন জীবের আনন্দ — আমের আঁটির সঙ্গে তুলনীয়, জীবানন্দ আমের ত্বক্ বা ছালের সহিত তুলনীয়, প্রকৃত রসাস্বাদন যাহা তাহা আঁটিতে নাই, ছালেও নাই, তাহা আছে উভয়ের মধ্যে। উহাই রসবস্তু। বুদ্ধিমান্ সাধক দুই প্রান্তের দুটিকে ত্যাগ করিয়া মধ্যের রসবস্তুটি গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বীজেও রস নাই, ছালেও নাই। ভজনানন্দ প্রেম — তাহাই আস্বাদনের বস্তু।

সাধক পূর্বোক্ত প্রণালীতে পূর্ণ কলা সম্পন্ন হইয়া নিজেকে আস্বাদন করিবার জন্য নিজে অভিন্ন অখণ্ড স্বরূপে স্থিত থাকিয়াও নিজ হইতে নিজেকে ভিন্ন করিয়া লয়। তখন প্রভু চান দুইয়ে এক হইয়া এক-স্বরূপে স্থিত থাকিতে, কারণ বস্তুতঃ সত্তা ত একই ; কিন্তু দাস প্রভুর সঙ্গে এক হইতে চায় না, সে জানে যে যদিও উভয়ের সত্তা একই সত্তা তথাপি সে নিজে ভিন্ন থাকিয়া প্রতিক্ষণে উন্মেষ এবং নব নব সুখ যাঁহার দর্শন হইতে স্ফুরিত হয় তাঁহারই সাক্ষাৎকার চায়। সে স্বরূপতঃ সনাতন জানিয়াও প্রতিক্ষণে নব নব নিত্য নবীন-আকাঙ্খা করে। সে ব্রহ্মে লীন হইতে চায় না, প্রভুর সহিত সমান হইতেও চায় না। সে যাহা চায় তাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্যের ভাষায় ইহাই — 'সত্যপি ভেদাহপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।' তখন দাস-ভাব দাসী-ভাবে পরিণত হয়, সে দেখে এক অদ্বৈত পুরুষ — বাকী সব প্রকৃতি, দাসী। জীব ও অজীব সবই প্রকৃতি। সকল দেহে একই মাত্র পুরুষ বিরাজমান। দেহই প্রকৃতি। অথবা সে দেখে এক অখণ্ড অদ্বৈত মা বা মহাশক্তি, বাকী সবই তাঁহার সন্তান — শিবও তাঁহার সন্তান, জীবও তাঁহার সন্তান। আসল কথা, সে দেখে যে একই অদ্বৈত আত্মা স্বয়ং বিরাজমান। তিনি এক হইয়াও অনন্তরূপে ও অনন্তভাবে নিজের সহিত নিজে খেলা করিতেছেন। এই একের মধ্যে তাঁহার সর্বভেদের সমন্বয় হইয়া যায়। ইহাই আরোপ সাধনার চরম সিদ্ধি।

———

গীতায় জীবনের লক্ষ্য

গীতায় আছে—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ (৬।১)

জগতে দুই শ্রেণীর সাধক দেখা যায় — সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাসী কর্মত্যাগী ও ফলত্যাগী, যোগী কর্মী ও ফলাগ্রহী। অর্থাৎ কর্ম ও ফল কার্য-কারণভাবে বদ্ধ। যে ফল চায় তাকে করিতে হইবেই। এই ফলই সিদ্ধি-ঐশ্বর্য-ইত্যাদি। যোগী এই সিদ্ধি চায় বলিয়া কর্ম করে, ফলও পায়।

যে ফল চায় না, সে কর্ম ত্যাগ করে। কারণ, সে ভাবে — ফল যখন চাই না, তখন পরিশ্রম করিয়া মরি কেন? সে নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করে। এ সন্ন্যাসী, কিন্তু যোগী কর্মমার্গী — সকাম, তাই ফল কামনা করিয়া কর্ম করে। ফলের আশায় কর্ম করে। ফলও পায়, তবে এ ফল অনিত্য। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য হইলেও তাহা অনিত্য।

তাই এতটা জ্ঞান যার আছে বা যে জ্ঞানমার্গী, সে নিষ্কাম হয় — ফল চায় না। সে জানে — ফলমাত্রই অনিত্য। তাহা চাহিলেই খালি ভোগের জন্য ঘোরাফেরা করিতে হয়। অশান্তি। ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিলে কর্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না। শুধু প্রয়োজন থাকে না, তাহা নহে — কর্ম করিলেই ফল নিতে বাধ্য হইতে হয়।

ভগবান্ বলেন — এই দুই আদর্শই ক্ষুদ্র, বস্তুত পূর্বোক্ত যোগী অপূর্ণ যোগী — পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী অপূর্ণ সন্ন্যাসী। পূর্ণ যোগী ও পূর্ণ সন্ন্যাসী অভিন্ন। তাহাতে কর্ম ও অকর্ম একাকার; অর্থাৎ যে ফল চায় না অথচ কর্ম করে, অথবা যে কর্ম ত্যাগ করে না অথচ ফল ত্যাগ করে, ইহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

পায়—

ঐশ্বর্য (১) যে কর্ম করে ও ফল চায়—ক্ষর পুরুষ (সর্বভূত)
[অপরা প্রকৃতি]

কৈবল্য (২) যে কর্ম করে না, ফলও চায় না — অক্ষর পুরুষ [পরা প্রকৃতি]

পরম (৩) যে কর্ম করে, ফল চায় না — পুরুষোত্তম

(৪) যে কর্ম করে না, ফল চায় — সে কোন পুরুষকেই পায় না। ক্ষর পুরুষ পায় না, কারণ কর্ম করে না, অক্ষর পুরুষ পায় না, কারণ সে সকাম। পুরুষোত্তমকেও পায় না — ঐ দুইটি কারণে অর্থাৎ কর্ম করে না বলিয়া ও সকাম বলিয়া। এই প্রকার লোক failure হইয়া সংসারে দুঃখ পায়। সিদ্ধি পায় না কিছুতে, স্থিতিও পায় না — পূর্ণতা ত দূরের কথা। আশা কেবল নিষ্ফল হয়।

গীতার আদর্শ—পূর্ণ যোগ বা পূর্ণ সংন্যাস, যাহাতে মর ও অমর উভয়ই লাভ হয়, অথচ উভয়েরই সঙ্গে নির্লেপ থাকে। পুরুষোত্তম লাভ হয়। ইহাতে নিজেরও লাভ, অন্যেরও লাভ।

নিজের লাভ ··· সে নিষ্কাম;

অন্যের লাভ ··· সে কর্মী।

তাহার কর্মের ফল জগতের আপন হইয়া যায়। কারণ, সে উহার দাবী করে না। সকাম কর্ম দ্বারা জগতের উপকার হয় না, নিজেরও হয় না।

গীতার আদর্শমতে আপন ও পর এক হওয়া চাই। ইহাতে জ্ঞান ও কর্মে সমন্বয় আছে। জ্ঞানের নিষ্কাম দিক্‌টা লইয়া কর্মের মলিনতা নষ্ট করিয়া দিলে বা কর্মের বেগে জ্ঞানের শুদ্ধস্থিতিকে dynamise করিলে উভয়ই পূর্ণ হয়, পুরুষোত্তম idealটিও তাই। ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয়।

কর্ম তো করবে, — কোন্ কর্ম করবে? যে সকাম বা ফলার্থী, তাহার কর্ম নিজের ইচ্ছার দ্বারা নিয়মিত হয়। অর্থাৎ ইষ্টফল ভবিষ্যৎ — তাহাকে বর্তমান করিবার জন্য যে কর্ম, অর্থাৎ যে কর্মের relation-এ ঐ ফল effect, সেই কর্ম করিবে।

আদর্শ যোগী ও সন্ন্যাসী কার্যকর্ম করিবে। তার ত' ফলস্পৃহা নাই — তাই তার কর্মে উহার নিয়ন্ত্রণ নাই। কার্য কর্ম কি? স্বভাবজ কর্ম = স্বকর্ম = প্রকৃতি = হৃদয়স্থ ঈশ্বর-প্রেরণা।

উহা করা মানে "ঈশ্বরাদেশ পালন করা" বা "স্বপ্রকৃতির নিয়োগে চলা," ইহাই স্বধর্ম পালন, উহাই গুরুবাক্য পালন। উহাই Voice of God মানা। উহাই স্বকর্ম সম্পাদন, উহাই শাস্ত্র মানা। কারণ, "শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ"। কার্যকর্ম কি? শাস্ত্র যা বলে। শাস্ত্র = শাস্তা বা গুরুর বা ঈশ্বরের নির্দেশ।

ইহাতেই নিজের কল্যাণ ও জগতেরও।

———

স্বসংবেদন

ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে আত্মজ্ঞান হয়না, আবার আত্মজ্ঞান না হইলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, জীবাত্মা ব্রহ্মের আশ্রিত ব্রহ্মেরই অংশ — আশ্রিতকে জানিতে হইলেই আশ্রয়কে জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে, যদিও সে জানা পূর্ণজ্ঞান না হউক।

ব্রহ্মজ্ঞান = ইচ্ছার বিকাশ বা যোগ (ঐশ্বর্য) — ইচ্ছার সমর্পণ বা ভক্তি (পরা) (মাধুর্য) — পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান — ব্রাহ্মীস্থিতি।

মূলে সব জীবই ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মানু। প্রথমে তা পাওয়া যায় না। ধর — কোন জীব দেবীলোকে আছে। সে দেবীর অংশরূপেই বর্তমান — এবং সেইভাবেই প্রতীয়মান হয়। দেবীর জ্ঞান হইলে তখন সে জীব নিজেকে দেবীর অংশরূপে দেখিতে পাইবে। ইহা সালোক্য। কারণ, দেবীর লোকের বা কিরণের প্রতিটি কণাই দেবীর অংশভূত জীব। ক্রমশঃ এই জীব দেবীর রূপ, শক্তি প্রাপ্ত হয়। — এইভাবে প্রাথমিক দেবীজ্ঞান বাড়িতে থাকে। অন্তে ঐ জীব নিজেকে দেবীর সহিত অবিভক্ত — অভিন্ন — দেখিতে পায়। তখন সে নিজেকে দেবী বলিয়া বুঝে। পূর্বে দেবীর আশ্রিত বা দাস বলিয়া বুঝিত। যখন দেবী বলিয়া বুঝে, সেটা ঐশ্বর্যাবস্থা।

মূলে সেখানেও দাস্য আছে।

দর্শনের মাহাত্ম্য আছে।

নিত্যকর্ম না করিয়া অন্যকর্ম করিতে নাই। হৃদয়কে পরিষ্কার করিবার জন্যই, নিত্যকর্মের অধিকারের জন্যই উপনয়ন বা দীক্ষা। দীক্ষা না লইয়া ঠিক ঠিক নিত্যকর্ম চলে না। এই কর্মফলে একটা আলো তৈয়ার হয় ও হৃদয়কে আলোকিত করে। দীক্ষা না হইলে সহজে সে আলো কর্ম দ্বারা তৈয়ার হয় না। তবে তীব্র কর্ম হইলে যে না হইতে পারে, তাহা নহে। প্রত্যহ কিছু কিছু আলো জন্মাতে

হয়, — ফলে, প্রত্যহ একটু একটু করিয়া হৃদয় শুদ্ধ হয়, ধীরে ধীরে হয়। মনে কর — হৃদয় শুদ্ধ হইয়া দশ আনা শুদ্ধিতে স্থিত আছে, কিন্তু প্রতিদিন যে নানাপ্রকার পাপ চিন্তা ও আচরণ হয়, তাহাতে আবার আবরণ আসে। নিত্যকর্ম দ্বারা ঐ আবরণ সরিয়া যায়। দৈনিক পাপক্ষয় হইয়া চিত্তের standard — শুদ্ধি বজায় থাকে।

ঐ কর্ম তীব্রতর ভাবে হইলে আগন্তুক মল সরাইয়া চিত্তকে আরও higher standard-এর শুদ্ধি প্রাপ্ত করাইবে। যেমন এগার আনা।

এই ভাবে ষোল আনার কাছাকাছি শুদ্ধি হইলেই জ্ঞানের উদয় হইবে। তখন পূর্ণশুদ্ধি। পূর্ণশুদ্ধি জ্ঞান ভিন্ন হয় না।

কর্ম দ্বারা ষোলআনা পবিত্রতা পাইলে জ্ঞান আসিবেই, বিলম্বের কারণ নাই। তবে পূর্বেও আসিতে পারে — কৃপার বশে। তখন জ্ঞানই শোধন করে। যাহা কর্ম করিত, তাহা জ্ঞানই করে — পরে শেষ মুহূর্তে জ্ঞান নিজমূর্তি ধারণ করে।

প্রকৃতির আবরণটা সরে গেলেই কর্ম আরম্ভ হয়। তাহাই স্বাভাবিক কর্ম — স্বভাবজ কর্ম। আপনা আপনি হয়, শেখাতে হয় না।

আত্মার আবরণ সরিলে জ্ঞান জাগে। তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

ভগবানের আবরণ সরিলে ভক্তি জাগে। তাহাই প্রকৃত ভক্তি, পরাভক্তি।

স্বাভাবিক কর্ম হইতে হইতে আত্মার আবরণ কাটিয়া যায়। জ্ঞানের উদয় হইলে তার সাধনা দ্বারা ভগবানের আবরণ সরিয়া যায়। কিন্তু ভক্তির উদয় হইলে তাহার সাধনা দ্বারা পূর্ণব্রহ্মের আবরণ কাটিয়া যায় না।

প্রথম আবরণ কাটান নিজের হাতে নাই — শেষ আবরণ (পরব্রহ্মের) কাটাও তাই।

প্রথম আবরণ কাটিলেই মুক্তি হয়। ইহা অপরামুক্তি। ইহার তিন স্তর ঃ—(ক) সিদ্ধ স্তর, (খ) জ্ঞানী স্তর, (গ) ভক্ত স্তর।

এই তিন অবস্থাতেই জীব অপূর্ণ থাকে। শেষ আবরণ কাটিলে পরামুক্তি। ইহা পূর্ণব্রহ্ম ভাবাপন্নতা। এখানে জীবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়।

অপূর্ণ জীব মুক্ত হইয়াও তিন স্তরে যুগপৎ থাকে না। সিদ্ধিতে জ্ঞান ও ভক্তি নাই, জ্ঞানে সিদ্ধি ও ভক্তি নাই, ভক্তিতে সিদ্ধি ও জ্ঞান নাই।

পূর্ণজীব পরামুক্তিতে যুগপৎ সিদ্ধ, জ্ঞানী ও ভক্ত।

সাকার হতে নিরাকার, নিরাকার হতে সাকার — অনেকে বলে। বোধ হয় ঠিক নয়। সাকার ও নিরাকারে মিশে আছে। সমভাব থাকলে পূর্ণভাব — যাহা উভয়ের অতীত। সাকার না হয়ে সাকারকে চালান যায় না। আবার সাকারের অতীত না হলেও হয় না। কাজেই সাকারের অতীত যে সাকার, তাহা নিরাকার — সঙ্গে একাকার। তেমনি নির্‌াকার না হয়ে নিরাকার ধরা যায় না, জানা যায় না। কাজেই এমন সাকার আছে, যাহা — নিরাকার, সেখান হতে নিরাকারের জ্ঞান হয়। উহা সমভাবে চলে। ওখান হতে সাকার ও নিরাকার উভয়ই জানা যায়।

নিরাকারেও যখন সাকার আছে — তখন যিনি যত বেশী উঠেন, তিনি তত দূরে গিয়াও সাকার পেতে পারেন। সাকার ধরিতে না পারিলে সেখানে তাহার নিরাকার। আর একজন ঐ নিরাকারে আকার দেখিতে পাবে — কিন্তু তাকেও কত করে গিয়ে নিরাকার বল্‌তে হবে। বাস্তবিক নিরাকার একেলা নাই। যে যতই উঠুক — সাকার আছেই। আবার সাকার মাত্রেই নিরাকার আছে।

সুতরাং নিরাকারের জন্য সাকার ত্যাগ করিয়া যেতে হয় না। সাকারের জন্যও নিরাকার হ'তে চ্যুত হতে হয় না। সাকার ও নিরাকার উভয়ই নিত্য। তবে সমসূত্র হলে কেহই লক্ষ্য হয় না। যে কোন আকারে নিরাকার পাওয়া যায়। কাজেই যে কোন আকারে অন্য আকারও পাওয়া যায়।

তিনটি রাস্তা, প্রতি রাস্তায় — ক্রিয়া-জ্ঞান-ভাব।

১। ক মার্গ (কর্ম মার্গ)

(a) ক্রিয়া i.e. অশুদ্ধিত্যাগ

(b) প্রাপ্তি = ঐশ্বর্য

(c) ঐশ্বর্যে মজে যাওয়া

২। খ মার্গ

(a) ত্যাগ, ঐশ্বর্যত্যাগ

(b) অভেদ প্রকাশ
(c) প্রকাশে তন্ময়তা

৩। গ মার্গ
(a) অদ্বৈতত্যাগ
(b) ভেদাভেদ প্রকাশ, ভাবদেহের আবির্ভাব
(c) তাতে তন্ময়তা।

শুধু চাহিলেই পাওয়া যায় না। আমি যদি ইচ্ছা করি মধু খাব, তা' হলেই মধু পাওয়া যাবে না। কর্ম দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে উপাদান তৈয়ার করতে হবে। মধুর উপাদান নাই, শুধু চাহিলেই কি মধু পাওয়া যায়? ভাণ্ডারে অর্থ থাকিলে, চাইবামাত্রই পেতে পারি, না থাকিলে শুধু চাহিলেই পাওয়া যায় না। চাওয়া মানে = অভাব-বোধ, যদি আমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে, তবে চাওয়ামাত্রই পাব। স্বভাবই অক্ষয় ভাণ্ডার, স্বভাবের সঙ্গে যোগ হলে ইচ্ছামাত্রই প্রাপ্তি হয় বা সৃষ্টি হয়। ইচ্ছা, পূর্ণের সঙ্গে যোগে, পূর্ণতা লাভ করে।

স্বভাবচ্যুত হইয়া ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। বিকার না কাটিলে, প্রকৃতিকে না পাইলে, ইচ্ছা পূর্ণ হবে না, অভাব কাটিবে না।

তবে কি আমাদের সব চাওয়া নিষ্ফল? না, আমাদের চাওয়াতে ও পাওয়াতে দৈনিক ও কালিক ব্যবধান আছে। যদি যোগী হইতাম, স্বভাবের সহিত যোগ থাকিত, তা হলে এ ব্যবধান থাকিত না। চাওয়ামাত্রই পেতাম। যেখানে ও যখন চাওয়া, সেখানে ও তখনই পাওয়া দেশ কাল মায়াজন্য। মায়ার গাঢ়তাবশত উহাদের দৈর্ঘ্য। শুদ্ধ মায়াবশতঃ তাৎকালিক ও তদ্দেশগত প্রাপ্তি। ইচ্ছা না হলে মায়াও নাই, — সুতরাং প্রাপ্তিও নাই। অর্থাৎ অভাবেও নাই — তাই অভাবের নিবৃত্তিও নাই। ইহা শুধু চিদ্‌ভাব, আনন্দে নহে। কারণ, অভাব হইয়া তার নিবৃত্তি হওয়াই আনন্দ। অভাবের বোধ না থাকিলে আনন্দের স্বাদ থাকে না। সুতরাং শক্তি ভিন্ন যেমন অভাব হয় না, তেমনি আনন্দও হয় না। স্বভাবে থাকিয়াও অভাব হইলেই আনন্দ, কারণ, অভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের উদয় অবশ্যম্ভাবী। এই ভাব-মহাভাবই আনন্দ। স্বভাবে থাকিয়া অভাব না হলে আনন্দ নাই। পূর্ব অবস্থা = স্বভাবে স্থিতি, কিন্তু তাতে আনন্দ নাই। অবশ্য নিরানন্দও নাই, শুধু চিদ্‌ভাব মাত্র। দ্বিতীয় অবস্থাও স্বভাবস্থিতি — আনন্দময়।

নিম্ন জগতে এই আনন্দই ফলরূপে নামিয়া আসে। শুধু চাহিলে হয় না। একাগ্রভাবে চাওয়া আবশ্যক। তা'হলেই অল্প-বিস্তর যোগাভ্যাস হয়। তখন ফল পাওয়া যায় — সেই অনুপাতে। বিয়োগ যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে আনন্দ সুখ-দুঃখরূপে খণ্ডিত। যদি সম্পূর্ণই বিয়োগ হয়, তবে শুধুই সুখ আর দুঃখ — আনন্দ কিছুই নাই। সেটা দ্বৈত বা অজ্ঞান অবস্থা। তখন জীব ও ঈশ্বরে যোগ নাই। যদিও স্বভাব ও ঈশ্বরে যোগ আছে। তা ঈশ্বরে আনন্দ আসে। জীবে তা ভেঙ্গে সুখ-দুঃখ হয়ে যায়। এটাও চাওয়ারই ফলে কিন্তু জীব ঈশ্বরও জানে না, স্বভাবও না, তাই মনে করে — না চাওয়াতে এসেছে। তবে কি সে সুখ-দুঃখ চেয়েছিল ? না চেয়েছিল আনন্দ অথচ সাকার সীমাচ্ছন্ন। অথচ সে যোগী নয়। তাই তার চাওয়াতে বহু জাতীয় জিনিস মিশেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তার যোগ তো আছেই — সে জানুক বা না জানুক। তাই ঈশ্বরানন্দ (তমোজাতীয় সাকার) জীবের কাছে বিচিত্ররূপে এসে পড়ে। সুখ চেতে গিয়ে দুঃখও এসে পড়ে।

মন ইন্দ্রিয়পথে বাহিরে ছড়াইয়া যায়। কিন্তু মনকে সংযত করিয়া আনা যায়। তখন ইন্দ্রিয়ের কাজ হয় না — বিষয়-জ্ঞান থাকে না। সংকল্প থাকিলে শুধু সংকল্পিত বিষয়ই জাগিতে থাকে। এইভাবে ইষ্টবস্তু দর্শন করা একাগ্র মনের পক্ষে সম্ভবপর। একটা বিরাট চৈতন্যের মধ্যে জগৎ ভাসছে। সেই বোধে প্রয়োজনমত ইষ্টবস্তুও ভাসছে। তাহাই যেন ইষ্টাকার ধারণ করে। বস্তুতঃ ঠিক ঠিক বস্তুরই দর্শন হয়। মন স্থির হইলে প্রাণও স্থির হয় বটে কিন্তু সেটা যথাস্থানে হয় না। সেইজন্য ইষ্টবস্তু বা স্থান যথাযথ দর্শন হইলেও সেখানে যাওয়া বা সেখানে আবির্ভূত হওয়া যায় না। তন্ময়তা — ধ্যান-ভঙ্গ হইলেই যে সেই। খালি মন দেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সে দেখিতে পারে বটে — স্বস্থান হইতে সব। প্রাণ কর্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা ছড়াইয়া যাইতেছে। তাহারও সংযমের প্রণালী আছে। তাহাই প্রাণায়াম। তাতে সিদ্ধ হলে কুণ্ডলিনী জাগে — নাভিচক্র ফোটে — শক্তি উদ্দীপিত হয়। ক্রিয়াশক্তির, বিকাশ হয়। তখন প্রাণশক্তি যথাস্থানে যাইয়া স্থির হয়। তখন ইষ্টবস্তুর স্থানে মন যাইতে পারে। কারণ, এ মন শুধু মন নহে, প্রাণযুক্ত মন। ইহার পরেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়।

সকলেরই ক্ষুধা আছে — যেমন দেহের, তেমন ইন্দ্রিয়াদির, তাই সকলেরই আহার চাই, ক্ষুধাবোধ না হওয়া পর্যন্ত জড়ত্ব রোগবিশেষ। ক্ষুধাবোধ হইলে যা-তা খাওয়াতে রোগের বৃদ্ধি হয়।

আহার সকলেরই চাই। চক্ষুর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তার ভোগ্য রূপ দাও — তবে সে ক্ষুধা মিটিবে। রূপবিশেষে সে ক্ষুধা মিটে বটে, তবে আবার ক্ষুধা হয়। এইরূপ সর্বত্র জানিবে।

এই ক্ষুধা হওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ, ভিতরে ক্ষুধা, বাহিরে তার অন্ন। ক্ষুধা থাকিলেই তার যোগ্য অন্ন আছে, বুঝিতে হইবে। যে অন্ন আমরা খাই, তাহা শুদ্ধ নহে, — তাই ভিতরে তার শোধন হয়। সারসত্ত্ব — নেওয়া হয়, অসার বাহির করা হয়। রূপেও তাই, — যে রূপ দেখি তার যেটুকু আমার চক্ষের পোষক, সেটুকু প্রকৃতি নিয়ে নেয়, বাকিটুকু বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ নিরন্তর হচ্ছে — তাই চক্ষুর জীবন চলছে।

চক্ষুর ক্ষুধা অনন্ত নয় বলে, — তার আহারও অনন্ত নহে, যদি তাই হোত তাহলে জগতের শান্তরূপে সে আকৃষ্ট হত না, তৃপ্তও হত না। যখন ক্ষুধা বস্তুতঃই এমন প্রবল হয় যে, আর কোন রূপেই তাহার নিবৃত্তি হয় না, ক্ষণেকের জন্যও না, তখন সেই অমৃত রূপ নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবে। তাতেই তার তৃপ্তি হবে। সে রূপে অসার নাই — তাই তাহা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য।

এমন অমৃত আছে যা চক্ষুর কাছে নিত্য-রূপ, কর্ণে নিত্য-সঙ্গীত-ইত্যাদি। যার যার ক্ষুধা আছে, সকলকেই সে অর্পিত করে, সেই অমৃতই অভাবের ভাব।

মহা অভাবের — মহাভাব।
= কাম = আনন্দ
যে প্রকার কাম সে প্রকার আনন্দ।
চিকীর্ষুর নিকট সে অমৃত = ক্রিয়াশক্তি,
জিজ্ঞাসুর নিকট সে অমৃত = জ্ঞানশক্তি।
কারণ, কামীর নিকট সে অমৃত = ইচ্ছাশক্তি।
প্রথম ভূমিতে তাহা কর্ম — সিদ্ধি ঐশ্বর্যভোগ।
দ্বিতীয় ভূমিতে তাহা জ্ঞান — কৈবল্য, মোক্ষ।
তৃতীয় ভূমিতে তাহা ভক্তি — প্রেম।

ক্রম এইরূপ—

১। সাধারণ অবস্থা—অহঙ্কার আছে — আমি কর্তা ও ভোক্তা। ঈশ্বর অসিদ্ধ। বর্তমান কর্মই কর্ম। সেটা আমার ইচ্ছা মাত্র।

২। উন্নত—অহঙ্কারের তীব্রতা কমিলে মোহ কমিয়া আসে। তখন দেখা যায় আমিই কর্তা বটে, তবে সে আমিটা শুদ্ধ বর্তমানে সীমাবিশিষ্ট নহে।

আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা বাধিত হয় — অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিহত হয়। কে বাধা দেয়? দ্বিতীয় আর কে আছে? আমিই আমাকে বাধা দিই। আমার পূর্বকর্ম — সংস্কার — আমার বর্তমান কর্মে বাধা দেয়। ইহাই আমার প্রকৃতি। এই সময়ে পুরুষকার আছে, প্রকৃতিও আছে। প্রথম অবস্থায় মোহবশতঃ প্রকৃতির সত্তায় দৃষ্টি পড়ে না। যতই জ্ঞান বাড়ে, ততই অজ্ঞানের সন্ধান ভাল করিয়া পাওয়া যায়।

৩। ইহার পর কর্তৃত্ব কেটে যায়—তখন দেখি যে, আমি কর্তা নহি, কেবল দ্রষ্টা মাত্র, যা কিছু করে, প্রকৃতি। যদিও সে আমার প্রকৃতি, তথাপি অহংভাব না থাকাতে মমত্ব থাকে না। তাই আমার বলিয়া ঠিক বুঝা যায় না। বাহ্য প্রকৃতিই তখন বলা উচিত।

৪। ইহার পরে প্রকৃতির কর্তৃত্ব আর আছে বলিয়া বুঝা যায় না। ক্রিয়াই তখন আর ব্যক্ত নাই।

৫। ভগবানের কৃপা হলে — তখন দেখা যায় তিনি কারয়িতা, আমি কর্তা, তবে এ কর্তৃত্বে ভয় নাই — বন্ধন নাই। কারণ ইহা দাসত্ব; দাসের হুকুম তামিল করা মাত্র। এ অবস্থায় আমি দ্রষ্টা ত থাকিই, অথচ কর্তাও হই (অবশ্য ভগবানের প্রেরণায়)। তিনি প্রভু, নিয়ামক — আমি নিয়ম্য — এ বোধ থাকে। ইহা আশ্রিত ভাব, আমি কি দেখি — দেখি, তিনি সর্বাধারে সব করাচ্ছেন। আমি যা করি, বলি — মূল তিনি, অপরেরও বলা, করারও মূল তিনি। সমগ্র জগতের সমস্ত ক্রিয়াই তাঁহার ইচ্ছা ও প্রেরণামূলক, ইহা দেখা যায়। পাপ-পুণ্য এ অবস্থায় থাকে না।

৬। ক্রমে তিনিই যে একমাত্র কর্তা, তাহা দেখা যায়। আমি দেখছি, তিনি করছেন। ইহাই নাটক — অভিনয়, লীলার সূত্রপাত, আমি দ্রষ্টা, তিনি অভিনেতা, তিনিই সাক্ষাৎভাবে অনন্ত সাজে অভিনয় করছেন, কেন? আমাকে দেখাবার জন্য। আর কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্মা — তাহা দেখা যায়।

ইহাই ভক্তির স্তর। আমি দেখি বটে, কিন্তু দেখিয়া আনন্দ পাই, তাঁহার লীলাদর্শনজনিত আনন্দ। পূর্বে আশ্রিত হইয়া দর্শকভাবে না থাকিলে এ লীলানন্দ সম্ভোগ হয় না।

৭। পরে দেখি তিনি আর কর্তা নাই, তিনিও দ্রষ্টা হইয়াছেন। আমি তাঁকে দেখছি — তখন বাহ্যলীলা নাই। আর তিনি আমাকে দেখছেন। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আছি। ইহাই প্রেম। তাঁহা হতেও লহর উঠছে, আমা হতেও লহর উঠছে, — পরস্পর মিলছে।

৮। ইহার পর আলিঙ্গন — সম্ভোগ-শৃঙ্গার।

৯। ইহার পর রসস্থিতি।

———

জীবনের লক্ষ্য

মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি ? জীবাত্মা অনাদিকাল হইতে প্রকৃতির প্রবাহে শৈবালের ন্যায় অণুরূপে বিভিন্ন প্রকার দেহের মধ্য দিয়া কালের গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। জানে না কোন্ স্থানে উপনীত হইলে এই অবিশ্রান্ত প্রবাহ নিবৃত্ত হইবে এবং সাগর-সঙ্গমে নদী যেমন কৃতার্থ হয় তেমনি মানবের আত্মা নিজের পরম কাম্য বস্তু লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য শান্তিলাভ করিবে। নানা সম্প্রদায়ে নানা ভাবে এই লক্ষ্যের নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা হইয়াছে এবং এই চেষ্টার ফলে দার্শনিক সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে যে এই সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটিই ভ্রান্ত নহে, তবে ইহা সত্য যে চরম সিদ্ধান্ত কখনও এক ভিন্ন দুই হয় না।

জ্ঞান প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে ভ্রম নিরসনও হয় না। কিন্তু এই জ্ঞান প্রাপ্তি প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপগত ভেদটিও জানিয়া লওয়া আবশ্যক। যে জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম তাহার সহিত আমরা অল্প বিস্তর আংশিকরূপে পরিচিত আছি। সেই জ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধির ধর্ম অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও মূলে এমন একটি অজ্ঞান থাকিয়া যায়, যাহা নিবৃত্ত না হইলে জীবনের প্রকৃত কল্যাণ আবির্ভূত হইতে পারে না। আকাশে মেঘ থাকিলে মেঘের অন্তরালস্থিত সূর্যবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য উদিত হওয়ার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে মেঘের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দর্শন হয় এবং তাহার কিরণ ও তাপ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু গভীর রাত্রিতে যখন আকাশে সূর্যের প্রকাশ থাকে না, তখন আকাশে মেঘ থাকিলে এবং ঐ মেঘকে অপসারিত করিলে যে সূর্যবিম্ব দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা বলা চলে না। ঠিক সেই প্রকার বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটিয়া গেলেও হৃদয়ে অন্ধকার থাকেই, যদি তাহার পূর্বে হৃদয় হইতে মূল অজ্ঞানটি নিবৃত্ত না হইয়া থাকে। এই-জন্য আগমিক যোগিগণ বলেন যে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্তির মূল্য তত অধিক নহে যতটা পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তির মূল্য। অর্থাৎ পুরুষের

স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবিক পক্ষে বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তির প্রশ্নই ওঠে না। আত্মা প্রাক্তন কর্মবশতঃ দেহ পরিগ্রহ করিলে ঐ দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার একটি কৃত্রিম আমিত্ববোধ ফুটিয়া উঠে। এই আমিত্ব বোধের আধার বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতে যে অজ্ঞান ধর্মরূপে ভাসমান হয় তাহাই বৌদ্ধ অজ্ঞান এবং ইহাতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহাই বৌদ্ধ জ্ঞান। কিন্তু ইহার মূল্য কতটুকু? যে অজ্ঞানের প্রভাবে আত্মা মায়ার অধীন হইয়া দেহ গ্রহণে বাধ্য হয় সেই অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মার স্বভাবসিদ্ধ শিবত্বরূপ ধর্ম অভিব্যক্ত হইতে পারে না। সেই মূল অজ্ঞানটিকে পৌরুষ অজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য যাহা অত্যন্ত আবশ্যক তাহা কর্ম নহে, জ্ঞানও নহে, এবং এমন কি ভক্তিও নহে। কারণ, এই সকল উপায়রূপে পরিগণিত হইলেও বুদ্ধির ব্যাপার। বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে দূর করিবার সামর্থ্য ইহাদের মধ্যে কোনটিরই নাই। এইজন্য মানবের জীবনের পরম আদর্শ কখনও সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধ হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানবের আত্মা হইতে ঐ মূল অজ্ঞানটি তিরোহিত না হয়। ঐ মূল অজ্ঞানটি আর কিছুই নহে, উহা আত্মার স্বেচ্ছায় পরিগৃহীত সঙ্কোচ। বস্তুতঃ শিবরূপী আত্মা সর্বপ্রকারে সঙ্কোচরহিত — উহাতে কালগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা বিভু বা ব্যাপক, ক্রিয়াগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা সর্বকর্তা, জ্ঞানগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা সর্বজ্ঞ এবং আনন্দগত সঙ্কোচ নাই বলিয়া উহা নিত্যতৃপ্ত। ইহাই আত্মার শিবস্বভাব। কিন্তু যখন লীলাচ্ছলে স্বেচ্ছাক্রমে আত্মা নিজেকে সঙ্কুচিত করেন ও অভিনয়ের জন্য জীবভাব গ্রহণ করেন তখন তাঁহার স্বাভাবিক সকল ধর্মই সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়। তখন এই পরিচ্ছিন্ন শক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র আত্মা মায়ার অধীন হইয়া কর্তা সাজে, অর্থাৎ কর্মজগতে প্রবেশ লাভ করে এবং কর্ম করা ও কৃতকর্মের ফলভোগ করা, এই উভয় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তর বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করে ও ত্যাগ করে। তাহার সংসার-চক্রে পরিভ্রমণের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। দেহসম্পন্ন আত্মার অভিমানের সামগ্রীর মধ্যে বুদ্ধি একটি প্রধান অবয়ব। জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই ইহার ধর্ম। বৌদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটিয়া যায় ইহা সত্য, কিন্তু ইহা ত অনেক নীচের কথা, ইহা দ্বারা ত মূল অজ্ঞান কাটিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতএব সর্বপ্রথম যাহাতে মূল অজ্ঞান কাটিয়া যায় তাহাই বিবেচনার বিষয়। পূর্বেই বলিয়াছি এই অজ্ঞান কাটাইবার পথে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কিছুরই তেমন উপযোগিতা নাই, কারণ এ সব মূলকে স্পর্শ করে না। একমাত্র ভগবানের কৃপাশক্তি দ্বারাই এই মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। ভগবৎ-কৃপা স্বভাবসিদ্ধ এবং অহেতুক হইলেও আধারের যোগ্যতা অনুসারে উহা উহাতে কার্যক্ষম-রূপে প্রতিফলিত হয়। কৃপা নিত্য হইলেও জীবাত্মার মূল আবরণ-রূপ মল যতক্ষণ পরিপক্ব না হয় ততক্ষণ কৃপা তাহাতে সঞ্চারিত হইতে পারে না। কিন্তু মল পরিপক্ব হইলে উহা মলপাকের তারতম্য অনুসারে সঞ্চারিত না হইয়া পারে না। যাহাকে লৌকিক জগতে দীক্ষা বলে তাহা ইহারই ফল। এই দীক্ষা স্থূলও হইতে পারে, সূক্ষ্মও হইতে পারে কিন্তু ইহা একান্ত আবশ্যক। ইহা না হওয়া পর্যন্ত সাধনার মূল্য তত বেশী হয় না। কারণ, সাধনা বুদ্ধির ব্যাপার। সাধনা অথবা উপাসনাদির ফলে বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। তখন সেই মুক্ত হৃদয়ে গুরুকৃপার অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। বলা বাহুল্য, এই অনুভবের রূপ নিজেকে শিবরূপে বোধ করা। এই অনুভব অমূলক নহে, কারণ শিবত্বের আবরণরূপী মল নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বরূপটি প্রকাশিত হয় তাহা বৌদ্ধজ্ঞানজনিত বৌদ্ধ অজ্ঞান-নিবৃত্তির পরে হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। ইহাই জীবন্মুক্তির সূচনা ও মানব জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। দেহান্তে বুদ্ধিরূপী ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আত্মা শিবরূপে বিরাজমান হয়, বুদ্ধির প্রশ্ন তখন আর থাকে না। এই প্রাপ্তি কোন অভিনব বস্তুর প্রাপ্তি নহে। আত্মা যে স্বয়ং শিবরূপী তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিস্মৃতির অপগম হইলে স্মৃতির পুনরুদয় বশতঃ আত্মা শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই তাহার পরম লাভ। ইহা না পাইলে শুধু কৈবল্য অবস্থায় স্থিত হইয়া কর্মের অতীত হইলেও পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না বলিয়া পূর্ণত্ব লাভ বাকী থাকিয়া যায়। কালান্তরে ঐ মলটুকু দূর করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, তাহা না হওয়া পর্যন্ত আত্মার নিজ স্বরূপভূত শিবত্ব অপ্রাপ্ত থাকিয়া যায়।

যোগের স্বরূপ

যোগের নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার। যোগ বলিতে পাতঞ্জল যোগ দর্শনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া আমি বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া লইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে বহু প্রকার যোগ-দর্শন এবং সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে। পাতঞ্জল যোগের ন্যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি প্রবর্তিত যোগ, হীনযানী বৌদ্ধদের যোগ, মহাযানী সম্প্রদায়ের, বিজ্ঞানবাদীদের এবং শূন্যবাদীদের অনুমত যোগ, জৈন দর্শনিক সাহিত্যে গৃহীত এবং সমালোচিত যোগ, পাশুপত যোগ, শৈব যোগ, তান্ত্রিক যোগ প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার যোগ-সাধনার প্রণালী এবং তদনুরূপ যোগবিষয়ক দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে।

পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। সমাধি হইতে প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হয়। সমাধির তারতম্য বশতঃ প্রজ্ঞার বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি গ্রাহ্য, গ্রহণ অথবা গ্রহীতাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয়। এক হিসাবে এই আলম্বনকেই সমাধি-প্রজ্ঞার বিষয় বলা যাইতে পারে। তবে ইহা লৌকিক বৃত্তি-জ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় নহে। উভয়ে পার্থক্য আছে। এক হিসাবে প্রজ্ঞামাত্রই সাক্ষাৎকারাত্মক। তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই সাক্ষাৎকারেও উৎকর্ষের ন্যূনাধিক ভাব রহিয়াছে। স্থূল অথবা সূক্ষ্মবিষয় অবলম্বন করিয়া এবং তাহা হইতে যে প্রজ্ঞার বিকাশ হয় তাহাতে সবিকল্প ও নির্বিকল্প দুইটি ভেদ আছে। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাঙ্কর্য থাকিলে বিকল্পের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া ঐ জ্ঞানকে সবিকল্প জ্ঞান বলে। কিন্তু শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাঙ্কর্য না থাকিলে অর্থাৎ যোগিগণ যাহাকে স্মৃতিপরিশুদ্ধি বলেন তাহা সিদ্ধ হইলে ঐ জ্ঞান নির্বিকল্পরূপে পরিণত হয়।

অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ আছে এবং জ্ঞানেরও সম্বন্ধ আছে। একটি বাচ্যবাচক ভাব এবং অপরটি বিষয়বিষয়ী ভাব। এ সম্বন্ধসূত্রে শব্দ ও জ্ঞানের সঙ্গেও সাধারণতঃ একটি সম্বন্ধ থাকে। এইজন্যই

সাধারণ অবস্থায়, এমনকি সমাধির ও নিম্নাবস্থায় জ্ঞান সবিকল্পই থাকিয়া যায়, কারণ ঐ অবস্থায় জ্ঞানের শব্দানুবিদ্ধতা নিবৃত্ত হয় না। জ্ঞান যখন সম্যক প্রকারে শুদ্ধ হয়, তখন তাহাতে শব্দের অনুবেধ থাকে না বলিয়া তাহা বিকল্পহীনরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। এইজন্যই পাতঞ্জল দর্শনের নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাধিজনিত প্রজ্ঞা নির্বিকল্প। যদি ইহাই নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার হয়, তবে ইহা বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার নহে, কারণ ঐ জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম উৎকর্ষ সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ সাস্মিতা সমাধি আয়ত্ত হইলে প্রজ্ঞার চরম বিকাশ সিদ্ধ হয়। এই প্রজ্ঞা একপ্রকার আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান নহে, কারণ গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয়ের উপসংহার হইলেও গ্রহীতারূপ সাস্মিতাতে এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকে। অস্মিতা যে শুদ্ধ আত্মা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শুদ্ধ অস্মিতারূপে সম্প্রজ্ঞাত যোগের চরম উৎকর্ষজনিত জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহাকে শুদ্ধ আত্মজ্ঞান বলা যায় না। আত্মা বা পুরুষের সহিত গুণাত্মিকা প্রকৃতির অবিবেক অস্মিতা অবস্থাতেও থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ ইহাই চিৎ ও অচিতের গ্রন্থি। এক হিসাবে ইহাকে হৃদয়গ্রন্থিও বলা চলে। এই গ্রন্থি মোচন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ গুণের সহিত পুরুষের বিবেক সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। যখন গুরুকৃপাতে অস্মিতাগ্রন্থি ভিন্ন হইতে থাকে, তখন ইহার অন্তর্গত চিৎ ও অচিৎ উভয় অংশ অর্থাৎ পুরুষাংশ ও গুণাংশ পরস্পর বিবিক্ত হইতে থাকে। ইহাই বিবেকখ্যাতির প্রারম্ভ। দীর্ঘকাল যথাবিধি অভ্যাসের ফলে এই খ্যাতি নির্মল হইতে থাকে। এই খ্যাতিতে পুরুষের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। পুরুষ গুণ হইতে বিবিক্তরূপেই সাক্ষাৎকৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণকে বাদ দিয়া নহে। কারণ, গুণের ক্রিয়া ব্যতিরেকে পুরুষের সাক্ষাৎকার আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। এই পুরুষ-সাক্ষাৎকার গুণবিরহিত না হইলেও অস্মিতা প্রকাশরূপে আত্মজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কারণ অস্মিতাজ্ঞানের মূলে অবিবেক বিদ্যমান থাকে, যাহাকে যোগিগণ অবিদ্যানামে আদিক্লেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যারূপ এই খ্যাতিতে বিবেকজ্ঞান সূচিত হইয়াছে বলিয়াই গুণ হইতে বিবিক্তরূপেই পুরুষের দর্শন হয়। যদিও এই দর্শনে

গৌণভাবে গুণও বিদ্যমান থাকে। এই সাক্ষাৎকার পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হইতে হইতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয় এবং গুণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। চরম অবস্থায় গুণের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের ক্ষীণতম দশাতে যে সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই চরম সাক্ষাৎকার এবং তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকার। ইহার পরক্ষণেই বস্তুতঃ ইহার ফলে অন্তিম গুণকলা অপসৃত হয় এবং সাক্ষাৎকারও আর থাকে না। তাহাই পুরুষ বা আত্মার স্বরূপস্থিতি। তখন বুঝা যায় আত্মা স্বয়ং দ্রষ্টা বা সাক্ষী, বিষয়রূপে তাহার সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না। যদি এবং যখন তাহা হয়, তখন উহাকে গুণযুক্ত আত্মার সাক্ষাৎকারই বলিতে হইবে, গুণাতীত শুদ্ধ আত্মার নহে। এই চরম সাক্ষাৎকারের ফলেই শুদ্ধ আত্মার স্বরূপস্থিতি হয় বলিয়া উহাকেই কৈবল্যের হেতুভূত আত্ম-সাক্ষাৎকার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান যে ইহা হইতে বিলক্ষণ তাহা বলাই বাহুল্য। পাতঞ্জলের উপদিষ্ট কৈবল্য অবস্থাতেও পুরুষের বহুত্ব থাকিয়াই যায়, কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে এবং প্রারব্ধ কর্মের অবসানে যে স্থিতিলাভ হয় তাহাতে বহুত্ব থাকে না। বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মূলে মহা-বাক্যের বিচার, কিন্তু যোগের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সম্যক্‌প্রকারের চিত্তবৃত্তির নিরোধ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ের আবশ্যকতা হয় না। শাঙ্করদর্শন সম্মত উপনিষদ-প্রতিপাদিত অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ বিবরণ আবশ্যক হইলে পরে জানাইব। অপরোক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধেও সকল সম্প্রদায়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। বস্তুতঃ কোন মতই অমূলক বা অপ্রামাণিক নহে, বৈচিত্র্য শুধু সাধকের অধিকারমূলক। বেদান্তের অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা পঞ্চদশীতে পাওয়া যাইবে।

———

জগতের রূপান্তর

যে অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া জগতের রূপান্তর সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা এখনও সর্বসাধারণের অজ্ঞাত এবং গভীর রহস্যে আচ্ছন্ন। তুমি সেই সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ — সেইজন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

জগতে ও জীবে অপূর্ণতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ সৃষ্টিমাত্রেই অর্থাৎ যে সৃষ্টির সহিত আমরা পরিচিত তাহা অপূর্ণতার নিদর্শন। সেই অপূর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা ও প্রত্যেকটি জীবের পূর্ণত্বলাভের চেষ্টা অভিন্ন। অভাববোধ অপূর্ণতা হইতেই হইয়া থাকে। দুঃখ, শোক, তাপ, কলুষিত বৃত্তি, খণ্ডভাব এবং তাহার যাবতীয় পরিণাম — এসব অপূর্ণতারই ফল। সৃষ্টির পর হইতেই এই অপূর্ণতা যেমন অনুভবে আসিয়াছে, অপরপক্ষে তেমনি ইহা দূর করিবার চেষ্টাও আরব্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা নানাপ্রকার উপায়ের আবিষ্কার হইয়াছে — সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই অপূর্ণতা দূর করিয়া জীব ও জগৎকে শান্তি, সুখ এবং পরমা তৃপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক বিচার ও সাধনা, সর্ববিধ লৌকিক প্রয়াস ঐ এক মহান উদ্দেশ্য দ্বারাই অনুপ্রাণিত ;

ইহা হইতে বুঝা যাইবে পূর্ণত্বলাভই জীব ও জগতের সকল প্রকার ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য। অনাদিকাল হইতে এই সকল অনুসরণ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এখন পর্যন্ত লৌকিক দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হইতেছে ইহার প্রাপ্তি পূর্বেও যেমন সুদূর-পরাহত ছিল এখনও তেমনি সুদূরপরাহত রহিয়াছে, কারণ জগতে দুঃখ কষ্ট এবং অভাব বোধের উপশম পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে ইহা বলা যায় না। দুঃখনিবৃত্তি, পরমানন্দ প্রাপ্তি, ব্রহ্মত্বলাভ, মোক্ষ প্রভৃতি যে কোন নামেই সেই মহা উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা যাউক না কেন, তাহার পূর্ণ উপলব্ধি এখনও পর্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ আনন্দ, মুক্তি, দুঃখনিবৃত্তি অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রভৃতি অবস্থা

লাভ করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহাতে সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জগতের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ যতক্ষণ সকলের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ একেরও অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিরই দুঃখনিবৃত্তি সম্যক সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না — কারণ সমগ্র সৃষ্টির অতীত সত্তা অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বদ্ধ। সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে কেহ উপায়বিশেষের সহায়তায় অথবা নিরুপায়ভাবে কোন শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা পদ লাভ করিলে তাহার পক্ষে পূর্ণত্বে অবগাহন করিবার পূর্বে পথ-নির্দেশ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা দুঃখক্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির দুঃখ-মোচনের চেষ্টা স্বাভাবিক। এই চেষ্টা অবস্থাভেদে নানাপ্রকারে হইয়া থাকে কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক না কেন ইহার ফলে সংসার-তাপে তাপিত ব্যক্তিবিশেষ দুঃখনিবৃত্তির মার্গ লাভ করে এবং দীর্ঘকাল পরে তাহার মার্গ-উপদেষ্টার ন্যায় সেও উচ্চাবস্থা লাভ করে। তখন প্রথম ব্যক্তি জীবোদ্ধার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পূর্ণত্বে অবগাহন করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন ঐ স্থান গ্রহণ করে এবং তাঁহারই ন্যায় উচ্চকার্যে ব্যাপৃত হয়। এইভাবে ক্রমশঃ এক একটি করিয়া যোগ্যতা অনুসারে জীব এই দুঃখের ও অভাবের রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করে। সৃষ্টির পর হইতেই জীবের উদ্ধারকার্য এইপ্রকারে নিষ্পন্ন হইতেছে। পরমাবস্থায় জীবের স্বরূপ কি থাকে এবং জীব মোটেই থাকে কিনা অথবা শুধু ব্রহ্মভাবে স্থিতি হয় কিংবা অন্যপ্রকার সিদ্ধাবস্থার অভিব্যক্তি হয়, এই বিষয়ে এইস্থানে আলোচনার কোন আবশ্যকতা নাই। জন্মমৃত্যুর অতীতাবস্থা সামান্য দৃষ্টিতে এক হইলেও তাহার নানাপ্রকার ভেদ আছে। রুচিবৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৈবল্য, নির্বাণ, পরিনির্বাণ, মহাপরিনির্বাণ, শান্ত ব্রহ্মপদ, শিবত্ব, পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অথবা পরমেশ্বরত্ব, নির্বিকল্পস্থিতি, নিত্যলীলা ইত্যাদি অনন্তপ্রকারের অবস্থা আছে। মরজগতের শোকতাপ প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যাহার যে প্রকার অধিকার অথবা রুচি সে সেইপ্রকার নিত্যাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ নিত্যাবস্থাও ভেদ করিতে সমর্থ হয়।

যে সকল আত্মা জগতের হিত ও সুখের চেষ্টা করিয়া থাকেন, যাঁহারা স্বভাবতঃ করুণাবিশিষ্ট এবং পরোপকার কার্যে রুচিসম্পন্ন তাহারা শুধু নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের নিবৃত্তি অথবা সুখ-সমৃদ্ধিতে

সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহারা নিজে দুঃখ এবং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অন্যের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধ্যাত্ম-মার্গেও এইরূপই হইয়া থাকে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ে প্রাচীন সময়ে ব্যক্তিগত দুঃখনিবৃত্তি বিশেষরূপে প্রার্থনীয় ছিল। যে জ্ঞানে জগৎকে দুঃখময় বলিয়া চিনিতে পারা যায়, শুধু তাহাই নহে — দুঃখের কারণ বুঝিতে পারা যায়, দুঃখনিবৃত্তির স্বরূপ জানিতে পারা যায় এবং উহার প্রাপ্তির উপায় আয়ত্ত করা যায় তাহাই প্রকৃত সম্যগ্‌জ্ঞান। দুঃখ-নিবৃত্তি নির্বাণেরই নামান্তর। ইহা শুধু দুঃখনিবৃত্তি নহে, দুঃখের সঙ্গে সমগ্রসত্তারই নিবৃত্তি। এই অবস্থায় লৌকিকজ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আবশ্যকতাও আর থাকে না। কিন্তু এই পথ ব্যক্তিগত দুঃখ-নিরোধের উপায় নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা, অখিল জগতের দুঃখনিবৃত্তির মার্গে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ, যাহার দুঃখনিবৃত্তি হয় অর্থাৎ যে নির্বাণপ্রাপ্ত হয় তাহার পঞ্চ স্কন্ধই নিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া সে নিজেই থাকে না — অন্যের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবে কে ? তা'ছাড়া অন্যের দুঃখ দূর করিবার বাসনা চিত্তে প্ররূঢ় না হইলে সম্যক জ্ঞানের উদয়ে নির্বাণে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। অশুদ্ধ বাসনা নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্হৎ অবস্থা উপলব্ধ হয়। তাহার পর যথাসময়ে স্কন্ধনিবৃত্তি সিদ্ধ হয়, যাহার নামান্তর নির্বাণ। ইহা কতকটা জীবন্মুক্তি ও বিদেহকৈবল্যের মত। সুতরাং স্থায়ীভাবে পরদুঃখমোচনের চেষ্টা এইপথে চলে না। যে নিজে অর্হৎ-ভাব প্রাপ্ত হয় সে অন্যকে জ্ঞানদান করিয়া শুদ্ধ পথে আসিবার সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু তাহার স্কন্ধনিবৃত্তি হইয়া গেলে তাহার এই পরোপকার ব্রত মধ্যপথেই খণ্ডিত হইয়া যায়। কিন্তু বহুলোকের দুঃখ দূর করিতে হইলে নিজের দুঃখ লঘু মনে করিয়া ঐ দুঃখকে প্রধান স্থান দেওয়া আবশ্যক। তাদৃশ ক্ষেত্রে স্বদুঃখ-মোচনের বাসনা অপেক্ষা পরদুঃখ-মোচনের বাসনাই অধিকতর বলবতী হয়। এই ক্ষেত্রে যদিও অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তথাপি ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ক্লিষ্ট অজ্ঞান ও অক্লিষ্ট অজ্ঞান এই উভয় প্রকার অজ্ঞানের মধ্যে পরহিতাকাঙ্ক্ষী আত্মার ক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকে না কিন্তু অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকার দরুণই পরহিত কার্য সম্ভবপর হয়। পরদুঃখ মোচনের বাসনাই শুদ্ধ বাসনা। অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত এই শুদ্ধ বাসনা থাকে। এই বাসনা থাকার দরুণ চিত্ত নির্বাণ হইতে

অব্যাহতি লাভ করে। যতদিন অক্লিষ্ট অজ্ঞান বর্তমান থাকে ততদিন মহাজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা চলিতে থাকে। এ চিত্ত বোধিচিত্ত অথবা বোধসত্তা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘনীভূত এবং বিন্দুরূপে পরিণত চিত্ত। যে পরিমাণে এই চিত্ত উৎকর্ষ লাভ করে সেই পরিমাণে ইহা নিম্নবর্তী ভূমি ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্ববর্তী ভূমিতে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে একেক ভূমি পরিহার করিয়া ঊর্ধ্বতর ভূমি লাভ করিতে করিতে দশম ভূমি প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই বোধিসত্ত্ব জীবনের পূর্ণতম আদর্শ। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলে নির্বাণের ভয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়, কারণ নির্বাণ তখন স্বায়ত্ত হয়। দশমভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়া — বুদ্ধ সম্রাট বা চক্রবর্তী পদে আরূঢ় হন। বুদ্ধের জীবনে একমাত্র ব্রতই পরোপকার অর্থাৎ জাগতিক জীবের দুঃখভঞ্জন। সংখ্যাতীত বুদ্ধ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যু ও নির্বাণকে পরিহার করিয়া নিরন্তর এই মহাকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

ইহা অতি উচ্চাবস্থা। বুদ্ধ শাস্তা অথবা উপদেষ্টা বা গুরু। তাঁহার শাসনকালে তিনি সাক্ষাদভাবেই স্বকার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকাল অতীত হইয়া গেলেও স্বরূপগত স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সংখ্যাতীত বুদ্ধ জীবোদ্ধার কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এখনও জগতের অজ্ঞান ও দুঃখ রহিয়াছে — এইভাবে কখনও যে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে সে সম্ভাবনা নাই। জীবের উদ্ধারকার্য অবশ্যই সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু ক্রমিকভাবে; এবং যত জীব প্রপঞ্চে সমাগত হইতেছে তাহার অনেক কম প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেছে। যে সকল জীব আবির্ভূত হয়, নিরবশেষভাবে সকলের উদ্ধার হইলেও — সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হয় না; কারণ নিরন্তর নব নব জীবের আবির্ভাব হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং ঐ স্থানে অনুগ্রহ ব্যাপারও যেমন নিরন্তর, জীবের সংসার প্রাপ্তিরূপ নিগ্রহও তেমনি নিরন্তর, ইহাই বলিতে হইবে।

বেদান্তের নানা জীববাদের দিক্ হইতে জীবের দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি পৃথক পৃথক ভাবে অবশ্যই বলা চলে কিন্তু একজীববাদের দিক্ হইতে — এবং ইহাই বেদান্তের মুখ্যপক্ষ — মুক্তিলাভ এখনও হইয়াছে বলা চলে না, কারণ যে দৃষ্টিতে মূলে একটিমাত্র জীব তদনুসারে তাহার মুক্তিই একমাত্র মুক্তি। সর্বজীবের মুক্তি ঐ এক-মুক্তির অন্তর্গত। এইজন্য কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন যে প্রকৃত

মুক্তি বা মোক্ষ এখনও হয় নাই। তবে যে মুক্তিশব্দের প্রয়োগ করা হয় তাহা ঈশ্বর-সাযুজ্যকে লক্ষ্য করিয়া।

বৈষ্ণব মহাজনগণ শুধু দুঃখনিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন আপন আপন সাধনায় পরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই আনন্দের আস্বাদন রসাস্বাদনরূপে অনন্তপ্রকারে নিত্যধামে হইয়া থাকে। জীবের যোগ্যতা অনুসারে শুদ্ধাভক্তির মহিমায় জীব এই লীলারসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। ভক্ত-ভগবান, তাহাদের অনন্তপ্রকার সম্বন্ধ — আস্বাদনের বৈচিত্র্যসাধক, ভগবান ও ভক্তির ধামের অনন্ত বৈচিত্র্য, সকলই রসাস্বাদন অবস্থায় সম্ভবপর হয়। ইহাই নিত্যলীলা নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম-মৃত্যু স্রোতের ঊর্ধ্ব, এমন কি নির্বাণ ও মহানির্বাণের অতীত আনন্দময় ভগবৎ-সত্তাতে হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে অনন্তপ্রকার লীলার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা নিত্যলীলা বলিয়া ইহার কখনই অবসান নাই। ভক্ত-জীব ভক্তির প্রভাবে এই আনন্দের নিত্যবিলাস অনুভব করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদের কৃপাতে অধিকার ও বাসনা অনুরূপ ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলায় যোগ দিতে অধিকার লাভ করে। কিন্তু ইহারাও জগতের দুঃখ সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, সকলেই নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিবে এবং কালের কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে, কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা সম্ভবপর হয় না।

জীব ও জগতের দুঃখ মহাজনদের হৃদয়কে চিরদিনই ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে সম্যক প্রকারে এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন সম্ভবপর হয় না। মহাজনদের মধ্যে যাঁহাতে যে পরিমাণ শুদ্ধ বাসনার বিকাশ থাকে তিনি সেই পরিমাণে অন্যের দুঃখমোচনে তৎপর ও সমর্থ হইয়া থাকেন। তারপর ঐ বাসনা নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনি পরামুক্তি লাভ করেন। তখন আর জীবোদ্ধার ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না। তাঁহার সমধর্ম অন্য কেহ ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ মহাকার্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তাহার অধিকার নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনিও পর-বৈরাগ্য লাভ করিয়া জগদ্‌ব্যাপারের অন্তরাল হন। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন প্রকার সময়ের জন্য এই জীবোদ্ধার ব্যাপার নিয়মিতভাবে চলিতেছে। কে কোন্ মার্গে বা কোন্ পদ্ধতিতে ক্রম অবলম্বন করিয়া অথবা না করিয়া কত জীবকে এবং কতটা পরিমাণে

উদ্ধার করিলেন, এইখানে সে আলোচনার আবশ্যকতা নাই। কারণ, যিনিই উদ্ধার করুন এবং যে ভাবেই করুন বস্তুত ইহা গুরুর কার্য। তিনি নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং বুঝিতে হইবে গুরু স্বীয় কার্য অনলস ভাবে নিরন্তর সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে এই কার্য গুরুমণ্ডলের দ্বারা অবিশ্রান্ত-ভাবে সম্পাদিত হইলেও এখনও জীব দুঃখপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে বলা যায় না। এখনও দুঃখের মাত্রা এবং দুঃখী জীবের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কম নাই। কম তো হয়ই নাই বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ এই লোকক্ষয়কারী কালের প্রভাব পূর্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক হইয়াছে। সর্বজগতের এবং জীবের দুঃখ দূর করিতে হইলে শুধু শাখা সংস্কার করিলেই চলিবে না — মূল সংস্কার করা আবশ্যক। মূল সংস্কার মানে কালের নিবৃত্তি। অর্থাৎ যে কালের অধীন হইয়া জীব অভাব ও যন্ত্রণা বোধ করিতেছে সেই কালকে নিবৃত্ত বা আয়ত্ত করিতে না পারিলে শুধু ব্যষ্টিভাবে জীবকে রক্ষা করা সত্ত্বেও জীবমাত্রের সুরক্ষা সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব পূর্ণভাবে গুরু স্বকার্য তখনই করিতে সমর্থ হইবেন যখন কাল আবদ্ধ হইবে এবং তাঁহার কার্যপথে বাধা দিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই: যখনই হউক না কেন ইহা অবশ্যই সম্ভবপর, কারণ সেই দৃষ্টিতে কালের নিরোধ এবং তজ্জনিত সৃষ্টিরও নিরোধ অবশ্যই আছে। সকলই স্বীয় ভোগকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। তদ্রূপ কালেরও শাসনকাল বা অধিকারকাল সমাপ্তপ্রায় হইলে উহা স্বভাবতই নিবৃত্ত্যুন্মুখ হয়। উহার প্রবল তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় কালকে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করার সময় উপস্থিত হয়। অবশ্য ইহা গুরুর কার্য। কালের যেমন শাসনকাল আছে তেমনি গুরুরও শাসনকাল আছে। কালের শাসনকালে গুরুকে এক হিসাবে কালের অধীন হইয়াই অর্থাৎ তাহার নীতি অনুসরণ করিয়াই স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে হয়। কালের লঙ্ঘন করা, উপেক্ষা করা অথবা কালজনিত নিয়মকে অনাদর করা কালের রাজ্যে সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা করিতে গেলে গুরুর স্বকার্য ব্যাহত হইয়া যায়। সেই প্রকার গুরুর শাসনকালেও কালের প্রকোপ থাকিবে না বটে, কিন্তু তদায়ত্ত ভাবে অবশ্যই কার্য করিবে। অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া তখন কালকে চলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর? গুরুরাজ্য স্থাপনের পূর্বে অর্থাৎ অখণ্ডগুরু জগতে প্রকট হওয়ার পূর্বে ইহা সম্ভবপর নহে। তাহার পর ইহা শুধু সম্ভবপর নহে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জগতের যাবতীয় জীব গুরুরাজ্য স্থাপনের পর ক্রমশঃ তৃপ্তি, পূর্ণতা ও পরমানন্দ লাভ করিয়া তাদাত্ম্য লাভ করিবে। তখন এক অখণ্ডগুরু অনন্ত খণ্ডবৎ বিভক্ত সত্তা স্বকায়াতে ধারণ করিয়া সকলের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইবেন। তখন প্রত্যেকেই নিজে পূর্ণতা লাভ করিয়া পূর্ণতার উপলব্ধি করিবেন এবং অনন্ত বৈচিত্র্য এক ও অখণ্ড নিজ-সত্তারই আনন্দময় অনন্তবিলাসরূপে অনুভব করিবেন। তখন এবং একমাত্র তখনই গুরুর মহনীয় ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। জগতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গৃহের কোণদেশে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও যতক্ষণ ক্লেশ ও তাপের এবং অভাবের লেশমাত্র অনুভব করিবে ততদিন এই মহাবস্থার উদয় হইয়াছে বলা চলিতে পারে না।

———

পূর্ণের স্বরূপ

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"॥

এই শ্লোকটিতে পূর্ণবস্তুর স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ণের স্বরূপ জাগতিক জ্ঞানের পক্ষে ধারণার অগোচর। নানাপ্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিলেও মানবীয় বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

পূর্ণবস্তু চিরপূর্ণ, তাহাতে কখনই অপূর্ণতা আসে না। হ্রাসবৃদ্ধি, উপচয়-অপচয়, আগম-অপায় — কিছুই উহাকে স্পর্শ করে না। এই পূর্ণই নিত্য স্থিতিরূপে স্বয়ংপ্রকাশ সত্তারূপে সর্বদা ও সর্বত্র অখণ্ডরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় ইহাকে আশ্রয় করিয়া শক্তির খেলারূপে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ণবস্তু শক্তির ক্রীড়াতে শক্তিমানের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াও নিত্যই লীলাতীত স্বরূপে অবস্থিত থাকে। 'অদঃ ও ইদং' এই দুইটি পদের দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট উভয় প্রকার সত্তাই গ্রহণ করা হইতেছে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই ইদং পদার্থ এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় তাহাই অদঃ পদার্থ। সাধারণরূপে ইন্দ্রিয়ের শক্তির ক্রমবিকাশের প্রভাবে যাহা এক সময়ে অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে বর্তমান থাকে তাহাও ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। ইহা ক্রিয়ার ফল। তদ্রূপ বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা যাহা একসময়ে ইন্দ্রিয়গোচর ছিল তাহাও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ কোন্‌টি ইন্দ্রিয়গোচর এবং কোন্‌টি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহা নির্দেশ সম্ভবপর হয় না। শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে ইন্দ্রিয়গোচর সত্তার অতীন্দ্রিয়রূপে আত্মপ্রকাশ এবং অতীন্দ্রিয় সত্তার ইন্দ্রিয়গোচররূপে স্ফুরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণের অন্তরালে স্বরূপ একই থাকে। এই স্বরূপটি পূর্ণবস্তু। ইহা নির্বিকার।

যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাই লোক — কারণ তাহাই আলোকিত হয় এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহাই অলোক

কারণ তাহা আলোকিত হয় না। সমগ্র বিশ্ব এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে লোকালোক এই উভয় ভাগে বিভক্ত। যাহাকে প্রচলিত ভাষায় ইহলোক ও পরলোক বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে এই লোকালোকের অন্তর্গত লোকেরই দুইটি দিক্। যে দিক্টা যে সময় এবং যাহার নিকট ইন্দ্রিয়ের গোচরভাবে বর্তমানে থাকে সেই দিকটা তাহার নিকট সেই সময় "ইহলোক" বলিয়া প্রতীত হয় এবং বিপরীত দিকটাকে সে তখন "পরলোক" বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এক অখণ্ড পূর্ণ সত্যই দেশ কাল ও অনন্ত প্রকারের আধারের দ্বারা অপরিচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে — উহাই পূর্ণ-তত্ত্ব। উহা এক হইয়াও অনন্ত, কারণ যদিও কোন বিশিষ্ট দেশের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই তথাপি অনন্ত দেশের প্রতি দেশেই পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাসমান। অথচ পৃথক পৃথক প্রতিভাসমান হইয়া তাহা খণ্ডিত হয় না। তাহা যেমন তেমনই থাকে। পূর্ণের বিজ্ঞান এই-ভাবেই আয়ত্ত করিতে হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় সেই পূর্ণ সত্য সর্বত্রই সমরূপে বিরাজমান। ইহলোকেও যেমন পরলোকেও তাহা ঠিক তেমনি। ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহাকে উপলব্ধি করা যায় এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত ভূমিতেও তাহাকে উপলব্ধি করা যায়। তাহা এক এবং অবিভক্ত সত্তা। ইন্দ্রিয়ের গোচর অংশকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন সবই তাহাই, অর্থাৎ সবই পূর্ণ। অর্থাৎ চক্ষু যাহা গ্রহণ করে তাহা পূর্ণ, কর্ণ যাহা গ্রহণ করে তাহাও পূর্ণ; অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি যাহা গ্রহণ করে সবই পূর্ণ। একই পূর্ণ সত্তা প্রতি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রতিভাসমান হইতেছে। এই প্রকারে পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ের অগোচর অংশকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন পূর্ণ সত্তা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ যাহা চক্ষুর অবিষয়, কর্ণের অবিষয় এবং অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়েরই অবিষয় অর্থাৎ অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি। এইজন্য নেতি নেতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে উহার নির্দেশের চেষ্টা করা সম্ভবপর নহে।

'পূর্ণমিদং' বলিতে ইহাই বুঝায় যে পূর্ণই ইদংরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচররূপে বিদ্যমান। তদ্রূপ 'পূর্ণমদঃ' এই বাক্যাংশের তাৎপর্য, এই পূর্ণই ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ একই পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের গোচরও বটে আবার ইন্দ্রিয়ের অগোচরও বটে — উভয়ই যুগপৎ সত্য। উহা একই সময়ে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, নিকটে ও দূরে,

বিশ্বরূপে ও বিশ্বাতীতরূপে বিদ্যমান। পূর্ণ অদ্বয় অনন্ত অখণ্ড উহা একই, দুই নহে। এই পূর্ণ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহা পূর্ণই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ণ এক ভিন্ন দুই হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যাহা হইতে নিঃসরণ হয় এবং যাহার নিঃসরণ, একই সত্তা এবং সমরূপেই পূর্ণ। গণিত-শাস্ত্রে যেমন অনন্ত হইতে কোন পরিমিত বা অপরিমিত সংখ্যার বিয়োগ করিলে বিয়োগের পর অনন্তই অবশিষ্ট থাকে ইহাও ঠিক তেমনি। পূর্ণ হইতে ধারা নির্গত হয় এবং যাহা নির্গত হয় তাহা পূর্ণই, তথাপি পূর্ণের হ্রাস হয় না কারণ পূর্ণ নির্বিকার। প্রশ্ন হইতে পারে ইহা কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই — ইহাই একের অনন্ত হওয়ার লীলা। যেমন একই চন্দ্র সহস্র দর্পণে সহস্র চন্দ্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয় অথচ চন্দ্রের মৌলিক একত্ব অখণ্ডই থাকিয়া যায় — ইহাও সেইরূপ। চন্দ্র সহস্র হইয়াও একই থাকে। সহস্র হওয়া একটা খেলামাত্র। সহস্র চন্দ্রের প্রত্যেকটি চন্দ্রও সেই একই চন্দ্র। কারণ সহস্র এক ব্যতীত অপর কিছুই নয়। একই সহস্রগুণিত হইয়া সহস্ররূপে প্রকাশিত হয়। গুণের মধ্যে একের আবির্ভাব হইলে অনন্ত এক ফুটিয়া উঠে। ইহাই সৃষ্টিলীলা। মূল একও যেমন এক, গুণস্থ একও তেমনি এক — পার্থক্য কিছু নাই। তবে ইহা জ্ঞানীর নিকট, অজ্ঞানী ইহা বুঝিতে পারে না। তেমনি সেইপ্রকার পূর্ণমধ্যে, অপূর্ণতা দূরের কথা, পূর্ণ আসিয়া মিলিত হইলেও পূর্ণের স্বরূপগত বৃদ্ধি হয় না। অনন্তের সঙ্গে কোন পরিমিত সংখ্যা যোগ করিলে এমন কি অনন্ত যোগ করিলেও যোগফল অনন্তই হয়, ইহাও তদ্রূপ। বাহিরেও পূর্ণ, ভিতরেও পূর্ণ। বাহির হইতে পূর্ণকে ভিতরে লইয়া গেলে ভিতরের পূর্ণের বৃদ্ধি হয় না অথচ বাহিরের পূর্ণেরও হ্রাস হয় না। তদ্রূপ ভিতরের পূর্ণকে বাহিরে লইয়া আসিলে ভিতরের পূর্ণের হ্রাস হয় না এবং বাহিরের পূর্ণের বৃদ্ধি হয় না। অন্তর পূর্ণ যেমন ছিল তেমনি থাকে, বহিঃপূর্ণও যেমন ছিল তেমনি থাকে। ইহার রহস্য এই ঃ পূর্ণ দুইটি নহে, একই পূর্ণ উভয়ত্র বিরাজমান রহিয়াছে।

এইভাবে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে, পূর্ণ বস্তু সর্বদেশের অতীত হইলেও প্রতিদেশেই নির্লিপ্তভাবে বিদ্যমান। তদ্রূপ উহা অতীত, অনাগত ও বর্তমান ত্রিবিধ কালের অতীত হইলেও প্রতিকালেই সমরূপে বর্তমান। কালে পূর্ণের বিকাশ নাই। যাহা অনাগত

অবস্থায় অপূর্ণ থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমান ভেদপূর্বক অতীতের দিকে ধারারূপে প্রবাহিত হয় — তাহা পূর্ণ নহে। বস্তুতঃ পূর্ণের ক্রমবিকাশ নাই — It is beyond evolution, এইপ্রকার যাবতীয় আধার বা উপাধি — কোনটিই পূর্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ প্রতি আধারের সহিত অভিন্নভাবে ওতপ্রোত হইয়া পূর্ণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। এই পূর্ণই আত্মা বা ব্রহ্ম।

———

মাতৃতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব

তুমি "মা" সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছিলে। আজ যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তুমি মনোযোগ সহকারে শুনিবে এবং শুনিয়া যাহাতে ঠিক ঠিক মনন করিতে পার তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

"মা" বলিতে পরাশক্তিকে বুঝায় যিনি সমগ্র সৃষ্টি প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন, ব্যাষ্টিভাবেও আছেন, সমষ্টি ভাবেও আছেন এবং তদতীত ভাবেও আছেন। এই পরাশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি ও বিশুদ্ধ চিন্ময়ী। শ্রীভগবান যেমন সচ্চিদানন্দময়, তেমনি তাঁহার শক্তিও সচ্চিদানন্দময়ী।

স্বরূপতঃ ইনি এক ও অভিন্ন। ভগবান যেমন এক, তাঁহার শক্তিও তেমনি এক। এই মূলীভূত শক্তি অব্যক্ত ও নিরাকার। ইনি ব্যক্তিভাবাপন্ন নহেন (impersonal)। এই মূল শক্তিকে বিশ্বাতীত চিৎশক্তি বলিয়া মানিবে। ইহার সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ অদ্ভুত। শক্তি হইতেই সৃষ্টি হয় — তাই অনন্ত সৃষ্টির উর্দ্ধে, অতীত প্রদেশে ইনি অবস্থিত। সৃষ্টি ইঁহারই অভিব্যক্তি। সেইজন্য ইনি অব্যক্ত হইলেও অংশতঃ ব্যক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান নিত্য অব্যক্ত, পরম রহস্যময় (ever unmanifest mystery of the Supreme)। শ্রীভগবানের সহিত সৃষ্ট জগতের সম্বন্ধের দ্বার এই পরাশক্তি। চিৎশক্তি মধ্যস্থ না থাকিলে শ্রীভগবানের সহিত জগতের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। অর্থাৎ ইঁহার নিত্যচৈতন্যের (eternal consciousness) মধ্যেই ভগবান বিধৃত আছেন (the Supreme Divine)। সুতরাং এই পরাশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে ভগবানের স্বরূপজ্ঞান উদ্ভূত হইতে পারে না। পরাশক্তিরূপিণী মা পরমেশ্বরেরই স্বীয় জ্ঞান ও শক্তিভূত।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পূর্ণের মধ্যে একটি দিক্ আছে তাহা স্বপ্রকাশময়, আর একটি দিক আছে যাহা পরমাব্যক্ত রহস্যময়। পূর্ণ অখণ্ড, তাই এই দুইটি দিক্‌ও আমাদের বুঝিবার জন্য বলা হইল। বস্তুতঃ সেখানে ভেদকল্পনা চলে না। যেটি

রহস্যময় ও অপ্রকাশ — তাহাই অব্যক্ত ভগবান, যেটি সপ্রকাশময় তাহাই ভগবৎশক্তি। এই অপ্রকাশ দিকটাও শক্তি, তবে চিরাব্যক্ত ও পরিপূর্ণ (Absolute power); এই দিকটা সত্তাও বটে, তবে চিরাব্যক্ত সত্তা (ineffable presence)। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে "মা" শক্তি, পরাশক্তি — ভগবান শক্তি নহেন। তিনি শক্তিমান্। বস্তুতঃ ভগবানও শক্তি — তবে পরিপূর্ণ ও নিত্য অব্যক্ত শক্তি। তাই সাধারণতঃ তাহাকে শক্তি বলা হয় না। শক্তি কার্যানুমেয়। তাঁহার সাক্ষাৎ কোন কার্য নাই। মনে হইতে পারে "মা" ই সত্তা, কারণ "মা"তেই নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রকাশমানতা রহিয়াছে। ভগবান সত্তাতীত। অতএব "অসৎ"। বস্তুতঃ তাহা নহে। ভগবানও সত্তাস্বরূপ। শূন্য নহেন, অসৎ নহেন — ineffable presence, তিনি নিত্য অব্যক্ত। পরাশক্তিরূপিণী সত্তা প্রকাশময়ী, তিনি চির অপ্রকাশাত্মক। এই চির অব্যক্ত শক্তিসত্তার সন্ধান একমাত্র "মা"ই জানেন — মহারহস্য শুধু "মা"-ই জ্ঞাত আছেন। গুপ্তভাবে নিহিত সৃষ্টি (hidden) ব্যাপারটি কি জান তো? রহস্যময় মহাসত্তা হইতে অনন্ত খণ্ডসত্তার আবির্ভাব। এই অখণ্ড খণ্ড সত্তা "মা"তেই আছে, বা ভগবানেই আছে — উভয়ই বলা চলে (containing বা calling) বাস্তবিকপক্ষে দুই-ই এক। কিন্তু আবির্ভাবের কারণ "মা"। কারণ গুপ্ত অবস্থা হইতে বাহির করা "মা"-র কার্য। বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ খণ্ডসত্তাগুলি পরাশক্তির অনন্ত আলোকে, চৈতন্যের শুদ্ধ প্রকাশে, সুষ্ঠুরূপে ভাসিয়া উঠে — চেতনভাবে ব্যক্তভাবে ফুটিয়া উঠে। এই সময়ে ঐ সত্তাগুলি শক্তির আকার ধারণা করে। পরাশক্তির প্রভাবে এরূপ হয়। অনন্ত চৈতন্য পাইয়া এরা চেতন হয়। এই পর্যন্ত পাওয়া গেল সত্তাগুলি শক্তি ও চৈতন্যময়। তারপর হয় সাকার — দেহবিশিষ্ট। এটা বিশ্বের অগ্রবর্তী দশা।

খণ্ড সত্তাগুলির তিনটি অবস্থা পাওয়া গেল —

(১) গুপ্ত, অব্যক্ত। এই অবস্থায় খণ্ডসত্তা মহাসত্তায় প্রচ্ছন্ন থাকে।

এই মহাসত্তা = ভগবান বা ভগবতী।

(২) প্রকট, চিদালোকে আলোকিত। এই অবস্থায় খণ্ড সত্তাগুলি চৈতন্যময় ও শক্তিময়রূপে বর্তমান। এইগুলি অনন্ত চিন্ময় রশ্মি,

যাহাকে তান্ত্রিকগণ বলেন "চিন্মরীচি"। ইহা পরাশক্তির ভূমিতে। বস্তুতঃ এই সকল শক্তিপুঞ্জ স্বাংশভূত, নিরাকার।

(৩) সাকার। ইহা বিশ্ব বা সৃষ্টি মধ্যে প্রকটিত রূপ। পরাশক্তির হৃদয়ে পরভগবান নিত্যই অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশমান। এই প্রকাশমানতা স্বভাবসিদ্ধ। পরাশক্তির অতীত স্বরূপ যেটি, তাহা রহস্যময় চির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, পরমাব্যক্ত।

পরাশক্তি ভগবানকে লইয়া খেলা করেন। তিনি তাহাকে ব্যক্ত করেন ও আকার দান করেন। সৃষ্টিতে ব্যক্ত করেন —

(ক) ঈশ্বর ও শক্তিরূপে। এটা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। এক হইয়াও যুগলরূপে প্রকাশিত।

(খ) পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে। ইহা ভিন্ন স্বরূপ। দ্বৈতভাবে স্থিত। উভয়ই নিরাকার।

আবার আকার দান করেন — অনন্তরূপে, কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে, তদন্তঃপাতী লোক-লোকান্তররূপে, তদন্তঃস্থ দেবতা ও তৎশক্তিরূপে।

এইভাবে পরাশক্তিরই প্রভাবে জ্ঞাতাজ্ঞাত অনন্ত জগতে যাহা কিছু আছে "সবই যে ভগবান" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহা পরাশক্তিরই মহিমা। যেখানে যা কিছু আছে সবই শক্তি কর্তৃক অনন্তের রহস্য উদ্‌ঘাটন মাত্র।

বস্তুতঃ সমস্ত বিশ্বই চিৎশক্তির অংশ বলিয়া অভিন্ন। যাহা কিছু যেখানেই থাকুক সবই তাঁহাদের উপর নির্ভর করে — কারণ, শক্তি যাহা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করেন, শিব তাহাই অনুমোদন করেন। তাহাই জগতে সত্তা লাভ করে।

বস্তুমাত্রেরই আবির্ভাবগত মূল রহস্য এই ঃ

(ক) ভগবানের ক্ষোভপ্রেরণা পরাশক্তির উপর।

(খ) ভগবৎ প্রেরিত পরাশক্তির ঈক্ষণ, দর্শন।

(গ) শক্তিদৃষ্ট তদ্‌ভিন্ন দৃশ্যের শক্তি দ্বারাই সৃষ্টিকারী আনন্দে প্রক্ষেপ।

(ঘ) ঐ প্রক্ষিপ্ত দৃশ্যের বীজভাব প্রাপ্তি।

(ঙ) ঐ বীজের আকার লাভ।

(চ) আকারের স্থূলত্বাপত্তি, মূর্ততা।

অতএব সৃষ্টিতে সর্বত্র শক্তিরই নানা প্রকট অবস্থা রহিয়াছে। চিৎশক্তিই জীব ও জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইহার তিনটি দিক্ আছে —

(১) বিশ্বাতীত পরাশক্তি।

(২) বিশ্বাত্মিকা-মহাশক্তি। বিশ্বমাতা। ইনি বিশ্বের আত্মা। পরাশক্তির personality।

(৩) ব্যষ্টিরূপা — খণ্ডশক্তি (জীবহৃদয়বাসিনী)।

(১) ইনি সৃষ্টির অতীত, — সৃষ্টির সঙ্গে অব্যক্ত ভগবানের যোজিকা।

(২) ইনি জীব সকলের সৃষ্টি করেন ; আর অনন্ত প্রক্রিয়া ও শক্তির ধারণ, অনুপ্রবেশ, বলাধান ও চালনা করেন।

(৩) ইনি উপর্যুক্ত দুটি প্রকারের শক্তিকে রূপদান করেন, উভয়কে আমাদের নিকট জীবন্ত ও সন্নিহিত করেন এবং মনুষ্য (human personality) ও ভগবৎশক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করেন।

এবার মহাশক্তির তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। মহাশক্তির কার্য ততক্ষণ আরব্ধই হয় না, যতক্ষণ পরাশক্তি কার্য না করেন। পরাশক্তি মহাশক্তির "অব্যক্ত চৈতন্য" মাত্র। পরাশক্তি ভগবৎ সত্তা হইতে সত্তা আকর্ষণ করিয়া সঞ্চার করিলে মহাশক্তি তাহা ধারণ করেন ও তাহাকে কার্যে পরিণত করেন, গঠন করেন। এই যে কার্যরূপে পরিণাম, ইহাই কোটি কোটি অণ্ডের রচনা। ইহার পর ঐ সকল অণ্ডে তিনি অনুপ্রবেশ করেন। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। এই অনুপ্রবেশের ফলে সকল অণ্ডেই ভাগবতী সত্তা (Divine spirit), সর্বধারিণী ভাগবতী শক্তি ও ভাগবত আনন্দ পরিব্যাপ্ত হয়। সৃষ্টিতে এই আনন্দ-প্রাচুর্য না থাকিলে কোন পদার্থ বাঁচিতে পারিত না, কিছুতেই তাহা থাকিত না। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। মহাশক্তির দুইটি রূপ —

(১) আন্তর। চৈতন্যাত্মক রূপা। ইহা "শক্তি"।

(২) বাহ্য। ক্রিয়াত্মক রূপা। ইহারই নাম "প্রকৃতি"। মহাশক্তিই প্রকৃতিকে চালনা করেন এবং প্রকৃতির প্রতি প্রক্রিয়াতে প্রকট বা গুপ্তরূপে খেলা করেন। সকল শক্তি ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য মহাশক্তিই করেন।

প্রতি ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বব্যাপী মহাশক্তির এক একটি খেলা। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু কি ?—

(১) মহাশক্তি যাহা দর্শনে সাক্ষাৎকার করেন (পরাশক্তি সঞ্চারিত মহা অব্যক্ত সত্তা হইতে)

(২) দর্শন করিয়া যাহা স্বীয় সৌন্দর্য ও শক্তিময় হৃদয়ে সঞ্চয় করেন, ও

(৩) স্বীয় আনন্দে যাহা সৃজন করেন।

মহাশক্তির সৃষ্টির স্তর বিন্যাস —

(১) সর্বোপরি শিখরদেশে — আমরা যে বিশ্বের অংশরূপে আছি তাহার ঊর্ধ্বে অসংখ্য জগৎ আছে। সর্বত্র অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ।

এই সকল জগতের ঊর্ধ্বে "মা" স্বপ্রকাশ নিত্য ও অনন্তশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই সকল জগতে বহু সত্ত্ব আছেন। সকলেই সেখানে বাস করিতেছেন এবং সঞ্চার করিতেছেন — যেন অচিন্ত্য অনন্তরূপে (ineffable completeness) ও অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত-রূপে (unalterable oneness) কারণ সকলেই চিরদিন মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে আছেন (she carries them safe in her arms for ever)।

(২) তার নীচে, আমাদের কাছাকাছি — অসংখ্য লোক আছে। সবগুলি পূর্ণ ও অতিমানস সৃষ্টি। এই সকল জগতে "মা-ই" অতি-মানস মহাশক্তি। ইনি ভাগবত ইচ্ছা (যাতে সর্বজ্ঞত্ব আছে) ও জ্ঞান (যাতে সর্বশক্তি আছে) রূপা শক্তি। তাঁহার সকল কাজই অব্যর্থ — সর্বত্র তাঁর সত্তা পরিপূর্ণ। প্রতি প্রক্রিয়াতেই মহাশক্তি স্বভাবলিঙ্গ। এই জগতে সকল ক্রিয়াই সত্যের স্ফুরণরূপা। সকল সত্তাই ভাগবত জ্যোতির আত্মা (soul), শক্তি (power), ও দেহ (body) ; সেখানে অনুভবই পূর্ণ আনন্দের বন্যা ও লহরী।

(৩) আমাদের জগৎ। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। সবাই অজ্ঞাতে আছেন। এই সকল অণ্ডে মন, প্রাণ ও দেহ মূল হতে পৃথকরূপে প্রতীত হয় (separated in consciousness)। আমাদের এই পৃথিবী এই অজ্ঞান জগতের একটি কেন্দ্র। এই জগতে সংঘর্ষ, আবরণ ও অপূর্ণতা আছে। কিন্তু ইহাও বিশ্বমাতা ধারণ করিয়া আছেন। মহাশক্তির প্রেরণায় ইহা পরম লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়।

পরাশক্তি চিন্ময়ী। তাই তিনি চিৎশক্তি।

মহাশক্তি জ্ঞানক্রিয়াময়ী। সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বের মিলিত অবস্থাই মহাশক্তি। ইনিই স্তর রচনা করেন। এক একটি লোক-সমষ্টি (system of words), এক একটি জগৎ (universe) উহা ঐ জগতের মহাশক্তির খেলা। ঐ জগতের আত্মারূপে তিনি খেলিতেছেন। ইনিই cosmic soul। ইনিই বিশ্বাত্মা ও বিশ্বাতীতের, অরূপের personality।

এই সব লোক-লোকান্তর পরাশক্তি সৃষ্টি করেন না। কিন্তু পরাশক্তিই ভাবরূপে প্রথমে প্রদর্শন করেন। মহাশক্তি তাহা দেখিয়া আনন্দে সৃজন করেন।

ইহার মধ্যে গভীর রহস্য আছে। সৃষ্টির ধারাটা এই প্রকার — জ্ঞান, তারপর ভাব, তারপর শক্তি, তারপর কর্ম। মস্তিষ্ক, হৃদয়, নাভি ও করণ (আনন্দেন্দ্রিয়)। প্রথমে মস্তিষ্কে জ্ঞানরূপে সঞ্চার হয় (vision), তারপর হৃদয়ে ভাবরূপে অবতরণ হয় (gathering in heart of hearts), তারপর নাভিতে আসিয়া শক্তিরূপ ধারণ করে (power), তারপর আনন্দে সৃজন হয়। ইহাই জাগতিক ব্যাপার। মহাসৃষ্টিতে এই ব্যাপারই বুঝিতে হইবে।

প্রত্যেকটি রচনা স্তরের ঊর্ধ্বেই মহাশক্তি আছেন মনে হয়।
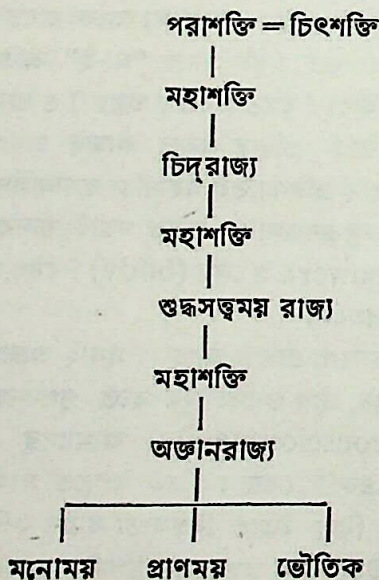
অজ্ঞানরাজ্যটি সোপানময়। চৈতন্যের স্তর ক্রমশঃ অবরোহণ করিয়াছে — চরমে জড়ের অচৈতন্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছে; পক্ষান্তরে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে — চরমে অনন্ত চৈতন্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে (infinity of spirit)। আরোহণ পথে প্রাণ (life), আত্মা (soul) ও মনের (mind) ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়।

এই অজ্ঞানজগতের উর্ধ্বে আছেন মহাশক্তি — ইনি সর্বদেবগণের অতীত। এই অজ্ঞান জগতের ঘটনাপুঞ্জ ও অভিব্যক্তি বা বিকাশের নিয়ামিকা ঐ মহাশক্তি — তাঁহার দর্শন, অনুভব ও দান (pours from her) — ইহা নিয়ত আছে।

(১) এই মহাকার্যের সাধন জন্য তিনি নিজের যাবতীয় শক্তি ও রূপ (powers and personalities) প্রকট করেন। ইঁহারা অজ্ঞান জগতের উর্ধ্বেই থাকেন — মহাশক্তির সম্মুখে তাহার আবরণ রূপে। এই সকল শক্তি ও রূপের বা মূর্তির অংশ (emanations) তিনি জগতে প্রেরণ করেন। ইহাদের উদ্দেশ্য হস্তক্ষেপ করা (intervene), পালন করা (govern), সংগ্রাম করা (battle) ও জয় করা, যুগের পরিবর্তন করা, শক্তিপুঞ্জের ব্যষ্টি ও সমষ্টি দ্বারা সকলকে সঞ্চালন করা। নানা যুগে নানা দেশে মনুষ্য এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপেই উপাসনা করিয়া আসিয়াছে।

(২) মহাশক্তির আরও কাজ আছে। ঈশ্বরের বিভূতিসকলের মন ও দেহ রচনা মহাশক্তির কার্য। তদ্রূপ মহাশক্তির নিজের বিভূতিসকলের মন ও দেহ রচনা তাঁহারই কার্য। এই কার্য তিনি পূর্ববর্ণিত শক্তিবর্গ ও তাদের অবতরণ দ্বারা সিদ্ধ করেন। ইহার উদ্দেশ্য যে তিনি ভৌতিক জগতে ও মানবিক চেতনার আবরণের মধ্যেও তাঁহার স্বীয় শক্তি, গুণ ও সত্তার কিঞ্চিৎ অংশ প্রকাশিত করিতে চান।

(৩) জাগতিক ঘটনা — সবই নাটকের খেলা। এই নাটকের ব্যবস্থা সবই মহাশক্তি করেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন মাত্র। তিনিই প্রকৃত অভিনেত্রী।

মহাশক্তির শাসন প্রণালী —

(ক) তিনি সৃষ্ট জগৎকে উপর হইতে শাসন করেন। এইটি তাঁহার impersonal দিক্। জাগতিক সকল পদার্থ অজ্ঞানের কার্যও তিনিই স্বয়ং। তবে তাঁহার শক্তি আবৃত। এ সব তাঁরই

সৃষ্টি — তবে সত্তা ন্যন। এ সব তাঁরই প্রকৃত দেহ ও শক্তি। এই সকলের আবির্ভাবের রহস্য এই যে, পূর্ণ ষোলো আনা সত্তার সম্ভাব্যতার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা কার্যে পরিণত করা বা গঠন করার ভার ভগবানের অচিন্ত্য অজ্ঞান বশে তাহারই উপর ন্যস্ত হয়। তিনি তখন মহান আত্মবলিতে সম্মত হন। ফলতঃ তিনি অজ্ঞানের আত্মা ও আকার মুখোসের ন্যায় ধারণ করেন।

(খ) আবার তিনি ত্রিবিধ লোকে অবতীর্ণ হইয়াও শাসন করেন। এটা তাঁর personal দিক্। তিনি দয়া করিয়া এই অন্ধকারে নামিয়া আসিয়াছেন, মিথ্যা ও ভ্রমে নামিয়া আসিয়াছেন, মৃত্যুতে নামিয়া আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য এগুলিকে আলোক, সত্য ও অমরত্বে পরিণত করিবেন। জগতের অনন্ত দুঃখে নামিয়া আসিয়াছেন — যেন ইহাকে পরমানন্দে পরিণত করিতে পারেন। সন্তানের প্রতি তাঁহার প্রেমে তিনি এইভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন।

———

রস ও সৌন্দর্য

সৌন্দর্যের কথা বলিতে গেলেই পূর্বে রসের কথা বলা আবশ্যক। জগৎটা রসের জন্য পাগল। কিসে রস পাইবে, কোথায় রস আছে, তাহার সন্ধান কেহ জানে না, তবু সকলেই রস চায়। মধুকর গুঞ্জন করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, সেও রসেরই আকাঙ্ক্ষায়, যোগী যোগমগ্ন, ভোগী ভোগবিলাসে বিভোর, স্ত্রীকে ভালবাসি, পুত্রকে ভালবাসি, যেখানে সৌন্দর্য দেখি, সেখানে ছুটিয়া যাই — সবই রসের পিপাসায়, — রসের লোভে সকলেই চঞ্চল। রস ভিন্ন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"। রসই সার — রসই সত্ত্ব।

যাহার আস্বাদন হয় নাই, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। রসের জন্য জগৎ পাগল, সুতরাং তাহার অনুভূতি একদিন কোথাও অবশ্যই হইয়াছে। নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত জগৎ সেই রসপানে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল, পরে নিয়তির প্রেরণায় সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জগৎ আজ তাহারই পুনঃপ্রাপ্তির আশায় মণিহারা ফণীর ন্যায় অশান্তভাবে ছুটিতেছে। যতদিন পুনরায় সেই যোগস্থাপনা না হইবে ততদিন এ অশান্তি ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই।

যে বস্তুর স্বাদ যে পায় নাই, তাহার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু রসের স্বাদ আমরা কবে পাইলাম, কোথায় ও কিভাবে পাইলাম? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ প্রশ্নের বিশেষ কোনই সার্থকতা নাই। কারণ, জীবনের অতীত অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, রসানুভূতি সকলেরই কখনও না কখনও অল্পবিস্তর অবশ্যই হইয়াছে। ভাল লাগা, সুন্দর বোধ হওয়া, আনন্দ অনুভব করা — ইহা কাহারও কখন ঘটে নাই, এমন বলা যায় না। সুতরাং রসের জন্য আকাঙ্ক্ষা হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু এ উত্তর সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহা চাই আর যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা সজাতীয় নহে। আস্বাদন করিয়াছি বেদানা, অথচ চাহিতেছি আঙ্গুর

— এমনটা হইতে পারে না। যে রস অনুভব করিয়াছি, তাহা পরিচ্ছিন্ন, ঐকদেশিক, ক্ষণিক, মলিন — কিন্তু যাহা চাই তাহা ইহার বিপরীত। যদি পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রেম কখনও আস্বাদন না করিয়া থাকি, তবে উহার জন্য তৃষ্ণা জাগে কেন? যে পরম সৌন্দর্য পশ্চাতে থাকিয়া এই তৃষ্ণার উদ্দীপন করিয়াছে, তাহাকেই আবার সম্মুখে উপলব্ধি না করিলে ইহার নিবৃত্তি হইবে না। সংসারে আনন্দ যতই পাই, সৌন্দর্য যতই দেখি, ততই প্রাণে অভাববোধ আরও বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে। দেখিয়াও দেখিবার সাধ কিছুতেই মিটে না, মনে হয় ইহা অপূর্ণ। যখনই অপূর্ণ বলিয়া বুঝি, তখনই সীমা চোখে পড়ে, তখনই অজ্ঞাতসারে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মনে হয় আরও — আরও এগিয়ে যাই, হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন তাহাকে ধরিতে পারিব। কিন্তু হায় মোহ! বুঝিতে পারি না যে কালপ্রবাহে এ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতে পারে না। আনন্দ যতই বাড়ুক, সৌন্দর্য যতই উজ্জ্বল হউক, তৃপ্তি তবুও সুদূরপরাহত, কারণ আরও বিকাশ সম্ভবপর এবং কখনই এই ক্রমবিকাশের সম্ভাবনীয়তা দূর হইবে না। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, হৃদয় যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা সসীম সৌন্দর্য কিংবা পরিমিত আনন্দ নহে। যদি হইত, তাহা হইলে একদিন না একদিন ক্রমবিকাশের ফলে তাহার তৃপ্তি হইত। বস্তুতঃ ইহা অসীম সৌন্দর্য, অনন্ত প্রেম, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। পূর্ণ সৌন্দর্যের সম্ভোগ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ণ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা হয়, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যে তৃষ্ণা মিটে না। যাহা হইতে বিরহ, তাহাকে না পাইলে ব্যাকুলতার অবসান সম্ভবপর নহে।

সুতরাং প্রশ্ন রহিয়া গেল — এ পূর্ণ সৌন্দর্য কবে আমি পাইয়াছিলাম এবং কোথায় পাইয়াছিলাম? আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, কালক্রমে এই পূর্ণ সৌন্দর্য আমি পাইতে পারি না; কোটীকল্পেও আমি এমন সৌন্দর্য পাইব না যাহার পরে আর সৌন্দর্য হইতে পারে না, অর্থাৎ কালের মধ্যে পূর্ণ সৌন্দর্যের বিকাশ হয় না — কালে যে বিকাশ হয়, তাহা ক্রমবিকাশ। এই ক্রমের অবসান নাই। আরও বেশী, আরও বেশী হইতে থাকে — কিন্তু কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, কালে কখনই ইহার অনুভূতিও হয় নাই। অর্থাৎ আমি যে পূর্ণ সৌন্দর্যের অনুভূতি করিয়াছি, তাহা

কোন সুদূর অতীতে নহে, কোন দিগন্তস্থিত নক্ষত্রমধ্যে নহে, কোন বিশিষ্ট কাল বা দেশে নহে।

অতএব এক হিসাবে এই প্রশ্নই অনুপপন্ন। কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রশ্ন তবুও থাকে। পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ইহা সত্য যে, এই সৌন্দর্যের আস্বাদন যখন আমি করিয়াছিলাম, তখন কাল ছিল না — যেখানে করিয়াছিলাম সেখানে দেশ ছিল না। সেটা আমার 'যোগ' অবস্থা বা মিলন। তারপর বর্তমানাবস্থা 'যোগভ্রংশ' বা বিরহ। আবার সেই যোগে ফিরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, পুনর্মিলন চাই। অর্থাৎ দেশকালে নির্বাসিত হইয়াছি, পুনরায় দেশকাল ভাঙ্গিয়া — বিলীন করিয়া, তদ্রূপ যোগযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু এই বিয়োগ কি নিতান্তই বিয়োগ? পূর্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদ কি সত্যই এত বাস্তব? তাহা নহে। বিয়োগ সত্য, বিচ্ছেদ স্বীকার্য — কিন্তু সে বিয়োগের মূলেও নিত্য যোগটি হারায় নাই, তাহা কখনও হারায় না। যদি হারাইত, তাহা হইলে এ বিয়োগ চিরবিয়োগ হইত, আর ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

ঐ যে আকাঙ্ক্ষা, ঐ যে সসীম অতৃপ্তি, উহা বলিয়া দিতেছে, অসীমের সঙ্গে যোগ একেবারে হারায় নাই। স্মৃতি আছে — তাই যোগ আছে। এই যোগ, এই অনুভূতি — অস্পষ্ট, স্বীকার করি, কিন্তু ইহা আছে।

যদি এ অনুভূতি, — যদি পূর্ণের এই আস্বাদন না থাকিত, তাহা হইলে সৌন্দর্যের কোন মানদণ্ড থাকিত না। মান ব্যতিরেকে তুলনা সম্ভবপর হইত না। যখন দুইটি বিকশিত পুষ্প দেখিয়া কোন সময়ে একটিকে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা সুন্দর মনে করি, তখন অজ্ঞাতসারে সৌন্দর্যের মানদণ্ডের প্রয়োগ করিয়া থাকি। যেখানে তারতম্যবোধ — সেখানে নিশ্চয়ই মানের ন্যূনাধিক্যনির্ণায়ক উপাধি আছে। প্রকৃতস্থলে চিত্তস্থ পূর্ণ সৌন্দর্যের অস্পষ্টানুভূতি বা অনুভবাভাসই বাহ্যসৌন্দর্যের তারতম্যবোধের নিমিত্ত। অর্থাৎ বাহিরের বস্তু দেখিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা পূর্ণ সৌন্দর্যের যত অধিক সন্নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা তত সুন্দর মনে হয়। সৌন্দর্যের বিকাশ যেমন ক্রমিক, এই সন্নিকর্ষও তেমনই ক্রমিক। বাহিরে যেমন পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য কখনই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ এই সন্নিকর্ষের চরমাবস্থা অর্থাৎ একীভাবও সম্ভবপর নহে।

দেশ ও কালে যখন পূর্ণ সৌন্দর্য পাওয়া যায় না এবং বৃত্তিজ্ঞান যখন দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ, তখন পূর্ণ সৌন্দর্য যে বৃত্তির কাছে প্রকাশ পায় না, ইহা সত্য কথা। বরং বৃত্তি পূর্ণসৌন্দর্যের প্রতিবন্ধক। সৌন্দর্যের যাহা পূর্ণাস্বাদ — বৃত্তিরূপে তাহাই বিভক্ত হইয়া যায়। বৃত্তিতে যে সৌন্দর্য বোধ হয়, তাহা খণ্ড সৌন্দর্য, পরিচ্ছিন্ন আনন্দ। পূর্ণ সৌন্দর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। বৃত্তিদ্বারা যে সৌন্দর্যের আভাস ফোটে — তাহা সাপেক্ষ, পরতন্ত্র, ক্রমবৃদ্ধিশীল, কালান্তর্গত। পূর্ণ সৌন্দর্য ইহার বিপরীত। এই পূর্ণ সৌন্দর্যের ছায়া ধরিয়াই খণ্ড সৌন্দর্যের আত্মপ্রকাশ।

তবে কি পূর্ণ সৌন্দর্য ও খণ্ড সৌন্দর্য দুইটি পৃথক বস্তু? তাহা নহে। উভয়ই বস্তুতঃ এক। তবে এই বিয়োগাবস্থায় দুইটিকে ঠিক এক বলা সম্ভবপর নহে। মনে হয় দুইটি পৃথক্। এই যে দুইএর অনুভব, ইহারই মধ্যে বিয়োগের ব্যথা লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহাকে জোর করিয়া এক করা যায় না।

কিন্তু তবু সত্য কথা এই যে উভয়ই এক। যে সৌন্দর্য বাহিরে তাহাই অন্তরে, যাহা খণ্ড সৌন্দর্য হইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বৃত্তিরূপে বিরাজমান, তাহাই পূর্ণ সৌন্দর্যরূপে অতীন্দ্রিয়ভাবে নিত্য প্রকাশমান। গোলাপের যে সৌন্দর্য তাহাও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য, শিশুর ফুল্ল মুখকমলে যে শোভা তাহাও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য — যে যখন এবং যেখানে যেভাবে যে কোন প্রকার সৌন্দর্য বোধ করিয়াছে, তাহাও সেই পূর্ণ সৌন্দর্যই।

প্রশ্ন হইতে পারে, সবই যদি পূর্ণ সৌন্দর্য এবং পূর্ণ সৌন্দর্য যদি সকলেরই আস্বাদিত ও আস্বাদ্যমান, তাহা হইলে আবার সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় কেন? কথা এই, পূর্ণ সৌন্দর্যবোধ অস্পষ্টরূপে সকলেরই আছে। কিন্তু অস্পষ্টতাই অতৃপ্তির হেতু। এই অস্পষ্টকে স্পষ্ট করিতেই ত সকলে চায়। যাহা ছায়া তাহাকে কায়া দিতে ইচ্ছা হয়। বৃত্তিদ্বারা এই অস্পষ্টের স্পষ্টীকরণ হয়, যাহা আবছায়ার মতন ছিল, তাহা যেন স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে। ভাসিয়া উঠে, কিন্তু খণ্ডভাবে। তাই বৃত্তিসাহায্যে স্পষ্ট সৌন্দর্যের সাক্ষাৎকার হইলেও খণ্ড বলিয়া, সসীম বলিয়া তৃপ্তি পরিপূর্ণ হয় না। বৃত্তি ত অখণ্ড সৌন্দর্যকে ধরিতে পারে না। অখণ্ড সৌন্দর্যের প্রকাশে বৃত্তি স্তম্ভিত হয়।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে করুন, একটি ফুটন্ত গোলাপ আমার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছে। ইহার সৌন্দর্য আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে — ইহাকে সুন্দর বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি। এই অনুভবকে বিশ্লেষণ করিলে আমি কি পাই? এ সৌন্দর্য কোথায়? ইহা কি গোলাপে, অথবা আমাতে, অথবা উভয়ে? এ অনুভবের স্বরূপ কি?

আপাততঃ ইহাই মনে হয় যে, ইহা শুদ্ধ গোলাপে নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সকলেই গোলাপটিকে সুন্দর দেখিত। কিন্তু তাহা দেখে না। আবার ইহা শুদ্ধ আমাতে অর্থাৎ দ্রষ্টাতেই আছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। তাহা হইলে আমি সব জিনিষই সুন্দর দেখিতাম, কিন্তু তাহা দেখি না। সুতরাং বুঝা যাইবে যে, এই অনুভবের বিশ্লেষণ হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যখন বৃত্তি দ্বারা বোধ হইতেছে, তখন সৌন্দর্য খণ্ডিতবৎ হইয়াছে, এক-দিকে অস্পষ্ট অথচ পূর্ণ সৌন্দর্য যাহা আমাতে আছে, অপরদিকে স্পষ্ট অথচ খণ্ড সৌন্দর্য যাহা গোলাপে দেখিতেছি। কিন্তু যথার্থ রসস্ফূর্তি কালে এরূপ থাকে না। তখন সৌন্দর্য আমাতে নাই, গোলাপেও নাই। আমি ও গোলাপ তখন একরস, সাম্যাবস্থাপন্ন — শুধু সৌন্দর্যই, স্বপ্রকাশমান সৌন্দর্যই তখন আছে। ইহাই পূর্ণ-সৌন্দর্য, যাহাতে ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়েই নিত্যসম্ভোগরূপে বিরাজমান আছে।

বৃত্তি দ্বারা সৌন্দর্যোপলব্ধি কাহাকে বলে? যখন কোন বিশিষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন অল্পবিস্তর ঐ বস্তু আমার চিত্তস্থ আবরণকে আঘাত দিয়া দূরীকৃত করে। চিত্ত পূর্ণ সৌন্দর্যাবভাসময়, কিন্তু এ অবভাস আবরণে ঢাকা বলিয়া অস্পষ্ট। কিন্তু একেবারে ঢাকা নহে, হইতে পারে না। মেঘ সূর্যকে ঢাকে, কিন্তু একেবারে ঢাকিতে পারে না। যদি ঢাকিত, তাহা হইলে মেঘ স্বয়ংও প্রকাশিত হইত না। মেঘ যে মেঘ তাহাও সে প্রকাশমান বলিয়া, সূর্যালোকসাপেক্ষ। সেই-প্রকার আবরণ চিত্তকে একেবারে ঢাকিতে পারে না। চিত্তকে ঢাকে, কিন্তু আবরণ ভেদ করিয়াও জ্যোতিস্ফুরণ হয়। তাই পূর্ণ সৌন্দর্য আবরণের প্রভাবে অস্পষ্ট হইলেও একেবারে অপ্রকাশমান নহে। যেখানে চিত্ত আছে, সেইখানেই একথা প্রযোজ্য। তবে অস্পষ্টতার তারতম্য আছে মাত্র। এই যে আবরণের জন্য অস্পষ্টতা, আবরণের

বিনাশে তাহাও স্পষ্টতায় পরিণত হয়। কিঞ্চিদাবরণ অপসারিত হইলে যে স্পষ্টতা জাগে তাহাও কিঞ্চিন্মাত্র। গৃহচ্ছিদ্র হইতে অনন্ত আকাশের যেমন একদেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, আংশিক ভাবে আবরণ-ভঙ্গবশতঃ সেইপ্রকার পূর্ণ সৌন্দর্যের একদেশমাত্রই প্রকাশ পায়। এই প্রকাশমান একদেশই খণ্ড সৌন্দর্য বলিয়া পরিচিত। এই আংশিক আবরণভঙ্গই বৃত্তিজ্ঞান। সুতরাং যাহা গোলাপের সৌন্দর্য তাহাও পূর্ণ সৌন্দর্যই, তবে একদেশমাত্র। এইরূপ জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যই সেই পূর্ণ সৌন্দর্যের একদেশ। আবরণভঙ্গের তারতম্যবশতঃ উদ্ঘাটিত সৌন্দর্যের তারতম্য অথবা বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়।

কিন্তু আবরণভঙ্গের বৈশিষ্ট্যনিয়ামক কে? আপাততঃ ইহা বাহ্য-পদার্থের স্বরূপনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলিয়াই ধরিতে হইবে। কিন্তু আমরা পরে দেখিব যে, ইহাই চরম কথা নহে। সুতরাং আবরণভঙ্গের ভেদ যে স্বাভাবিক, তাহা এই অবস্থায় বলা চলে না। আপাততঃ বলিতেই হইবে যে আগন্তুক কারণের বৈচিত্র্যবশতঃ আবরণাপগমেরও বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। স্ফটিকসন্নিধানে নীলবর্ণের স্থিতিতে স্ফটিক নীলাভাস হয়, পীতবর্ণে পীতাভাস হয় — ইহা আগন্তুক কারণজন্য ভেদের দৃষ্টান্ত ; চক্ষুসন্নিকৃষ্ট ঘট হইতে ঘটাকার বৃত্তি এবং পট হইতে পটাকার বৃত্তি চিত্ত ধারণ করে, ইহাও আগন্তুক ভেদ। ঠিক সেই-প্রকার ফুলের সৌন্দর্য ও লতার সৌন্দর্য উভয়ের অনুভবগত ভেদ বুঝিতে হইবে। ফুলের সৌন্দর্য্যস্বাদ যে বৃত্তি, লতার সৌন্দর্যাস্বাদ তাহা হইতে বিলক্ষণ বৃত্তি, ইহার কারণ আগন্তুক। ফুল ও লতার বৈশিষ্ট্য যেমন সত্তাগত, সেইরূপ জ্ঞানগতও বটে, আবার আস্বাদন-গতও বটে। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, ফুল এবং লতাতে এমন বিশিষ্ট কিছু আছে, যাহাতে একটি একপ্রকার সৌন্দর্যানুভূতির উদ্দীপক, অপরটি অপরপ্রকার।

কিন্তু ইহা আপেক্ষিক সত্য। বাহ্য পদার্থ যদি পরমার্থতঃ না থাকে, অথবা সে অবস্থায় না থাকে, তখন অথবা সেখানে বাহ্য পদার্থের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রসানুভূতির বৈচিত্র্য উপপাদন করা যায় না। সত্তা যেমন এক ও অখণ্ড হইলেও ফুল ও লতা খণ্ড-সত্তা, জ্ঞান যেমন এক ও অখণ্ড হইলেও ফুলের জ্ঞান ও লতার জ্ঞান অর্থাৎ ফুলরূপ জ্ঞান ও লতারূপ জ্ঞান পরস্পর বিলক্ষণ, সেইপ্রকার সৌন্দর্য এক ও অখণ্ড হইলেও ফুলের সৌন্দর্য ও লতার সৌন্দর্য অর্থাৎ

ফুলরূপ সৌন্দর্য ও লতারূপ সৌন্দর্য পরস্পর ভিন্ন। এ জগতে দুইটি বস্তু ঠিক এক নাই, প্রত্যেক বস্তুরই একটি স্ব-ভাব আছে, একটি ব্যক্তিত্ব আছে, একটি বিশিষ্টতা আছে, যাহা দ্বিতীয় বস্তুতে নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে খণ্ড সত্তা যেমন অনন্ত, সংখ্যায় এবং প্রকারে, খণ্ডজ্ঞানও সেইরূপ, খণ্ড সৌন্দর্যও সেইরূপ। কিন্তু যাহা সত্তা তাহাই ত জ্ঞান, কারণ প্রকাশমান সত্তাই জ্ঞান ও অপ্রকাশমান সত্তা অলীক। আর যাহা জ্ঞান তাহাই ত আনন্দ, কারণ অনুকূল জ্ঞানই বা ভাল লাগাই আনন্দ বা সৌন্দর্যবোধ, আর প্রতিকূল জ্ঞানই দুঃখ বা কদর্যতা। সত্তা যখন জ্ঞান তখন তাহা নিত্যজ্ঞান, আর জ্ঞান যখন আনন্দ, তখন নিত্যসংবেদ্যমান আনন্দ। এই নিত্যসংবেদ্যমান আনন্দই রস। সুতরাং রসের সদাকালীন অভিন্নভাবে আস্বাদনই অখণ্ড বা পূর্ণানুভূতির স্বরূপ; ইহা বৃত্তি নহে, রসস্ফূর্তি।

সুতরাং রসপদার্থে সত্তা ও জ্ঞানের অন্তর্নিবেশ আছে। রস হইতে সত্তা ও জ্ঞানের বস্তুতঃ পার্থক্য নাই। অতএব রস এক হইয়াও অনন্ত, সামান্য হইয়াও বিশেষ। একটি বিশিষ্ট রসস্ফূর্তি ফুল, আর একটি বিশিষ্ট রসস্ফূর্তি লতা — উভয়ের আস্বাদনগত ভেদ আছে। তাই জগৎ কাহারও অভাব সহ্য করিতে পারে না, একের অভাব অন্যে পূর্ণ করিতে পারে না। প্রতি বস্তুর মর্যাদা আছে, যাহা অলঙ্ঘনীয়।

বুঝা গেল, পূর্ণ সৌন্দর্যই খণ্ড সৌন্দর্য। কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্য যখন বৃত্তিতে প্রকাশমান, তখন উহা রসবিশেষ নহে, রসাভাস মাত্র। এই রসাভাস বিক্ষিপ্ত বৃত্তির নিরোধবশতঃ যথার্থ রসে পরিণত হয়, যাহাকে ecstatic অথবা æsthetic intuition বলা যাইতে পারে।

এই যে রসবিশেষ — ইহা অনন্ত, কারণ প্রতি ব্যক্তিতে স্ফূরণের ও আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য আছে। তবে যে আলঙ্কারিকগণ ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, সে কেবল জাতিগত ভেদ লক্ষ্য করিয়া, শাস্ত্রীয় ব্যবহারের সৌন্দর্যনিমিত্ত। মধুর স্বাদ ও গুড়ের স্বাদ একপ্রকার নহে, আবার মধুর স্বাদ ও লবণের স্বাদও একপ্রকার নহে। তথাপি যে কারণে মধু ও গুড়কে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, মধু ও লবণকে করা হয় না; সেই কারণেই আলঙ্কারিকগণ রসকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, মধু ও গুড় প্রয়োজনবশতঃ এক জাতির অন্তর্গত হইলেও, বস্তুতঃ উভয়ের যেমন আস্বাদগত বৈচিত্র্য

আছে, সেইরূপ একটি রস অপর একটি রসের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইলেও (যথা শৃঙ্গার) ঠিক এক নহে। সত্তা ও জ্ঞানের বৈচিত্র্যে যদি কোন সার্থকতা থাকে, রসেতেও তাহা আছে।

সুতরাং, এক হিসাবে রস অনন্ত, অপর হিসাবে নির্দিষ্টসংখ্যক। অথচ মূলে রস একই।

এই নির্দিষ্ট সংখ্যা কত সে বিচার এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু গোড়াকার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। এই যে অনন্ত রস বলিলাম, ইহার প্রত্যেকটির অবস্থাগত ভেদ সম্ভবপর। এই ভেদ স্থূলতঃ শুদ্ধ ও মলিন বলিয়া দ্বিবিধ। ইহা বাহ্যদৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রত্যেকটি রস যখন শুদ্ধভাবে স্বপ্রকাশ, তখনই যথার্থতঃ তাহা রসপদবাচ্য; আর মলিন হইলেই তাহা মিশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া প্রকৃত রস নহে, রসাভাস। এই যে এক একটি শুদ্ধ স্বপ্রকাশ রসাস্বাদ তাহারও আবার দুইটি অবস্থা আছে। এক অবস্থা চিরস্থির, তাহাতে প্রবেশ করিলে আর নামিতে হয় না; দ্বিতীয় অবস্থা স্থির হইলেও কালাবচ্ছিন্ন, সেখান হইতে ব্যুত্থানসংস্কারের প্রবলতায় নামিয়া পড়িতে হয়। উভয়ই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, বস্তুতঃ উভয়ই এক। তবে একটি চাঞ্চল্য কিম্বা মালিন্যের সম্ভাবনাবিরহিত, আর একটিতে সে সম্ভাবনা আছে। একটিতে ব্যুত্থানসংস্কার এবং নিরোধসংস্কার নাই অথবা চির-নিদ্রিত, আর একটিতে উহা আছে। কিন্তু আস্বাদনের কোন তারতম্য নাই।

অতএব যখন একটি খণ্ড সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা সম্ভোগ করি, তখন প্রথমতঃ উহা বিক্ষিপ্তবৃত্তির আস্বাদন। উহা একটি বিশিষ্ট (unique) সৌন্দর্যেরই আস্বাদন বটে, কিন্তু সে আস্বাদন নির্মল নহে, সুতরাং গভীর নহে। সে আস্বাদনে আত্মহারা হই না। ক্রমে যখন বৃত্তি স্থির হইয়া আসিতে থাকে, অর্থাৎ যখন বৃত্তি আপন ক্ষেত্র হইতে বিষয়ান্তরকে ডুবাইয়া দেয় বা সরাইয়া দেয়, কেবল সেই একটি মাত্র খণ্ড সৌন্দর্যকেই প্রকাশ করে, অর্থাৎ বৃত্তি যখন যাবতীয় বিষয়কে সেই একটি সৌন্দর্যে আহুতি দিয়া, সেই একটিকে লইয়া মাখামাখি করিয়া প্রকাশ পায়, তখনকার আস্বাদন কিছু নূতন আস্বাদন নহে। উহা সেই বিক্ষিপ্ত অবস্থার আস্বাদনই বটে; উভয়ে qualitative কোন ভেদ নাই, তবে উহা এখন নির্মল এবং সেইজন্য অতি গভীর। ইহাই একাগ্রভূমির প্রজ্ঞা। এখানে রসস্ফুরণ হয় — রসসামান্যের কোলে

একটি বিশিষ্ট রসব্যক্তি প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় সেই খণ্ড সৌন্দর্যই আপন আলোকে আপনি প্রকাশ পায়। ভোক্তা ও ভোগ্য যেন স্বসংবেদ্যমান সম্ভোগমধ্যে একাকার হইয়া স্থিতিলাভ করে।

কিন্তু এ অবস্থায় চিরকাল স্থিতি হয় না। ভাবের ঘোর কাটিয়া গেলেই পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসে, —যোগের পর আবার বিয়োগ আসে, মিলনের অবসানে বিরহ জাগে। কিন্তু যে কারণে এই যোগ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা যোগাবস্থায়ও অব্যক্তভাবে বর্তমান থাকে। মিলনের কোলে বিরহ এইভাবেই লুকাইয়া থাকে। "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। ইহাকে সংস্কার বলি আর যাহাই বলি তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু যদি এ সংস্কার কাটিয়া যায়, তাহা হইলে সে যোগ আর ভাঙ্গে না।

সুতরাং বিশিষ্ট রসস্ফূর্তির শুদ্ধাবস্থাও কালাতীত ও কালাবচ্ছিন্ন ভেদে দ্বিবিধ। যে উপায়ে কালকে অতিক্রম করা যায়, সদাকালীন স্থিতিলাভ করা যায়, সে উপায় ফলবান্ হইলেই ঐ বিশিষ্ট নির্মল রসাস্বাদও অবাধিত থাকিবে। কিন্তু সে আলোচনার ইহা স্থান নহে। তবে রসসামান্য রসবিশেষের বাধক নহে, ইহা আমরা পরে বলিব। কারণ, সামান্য বিশেষের বিরুদ্ধ নহে, — বিশেষেও সামান্য অনুস্যূত আছে।

এইখানে একটি কথার মীমাংসা করা আবশ্যক মনে করি। কেহ কেহ বলিতে পারেন, রসে বিশিষ্টতা আরোপিত ভেদ, স্বগত নহে। রস একই, কেবল উপাধিভেদে তাহাতে আগন্তুক ভেদের অবভাস হয়। আমরা মনে করি, ইহা যথার্থ সিদ্ধান্ত নহে। রস যে এক তাহা সত্য কথা, তাহাতে সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় ভেদ ত দূরের কথা, স্বগত ভেদ পর্যন্তও নাই। কিন্তু রস যে বহু তাহাও মিথ্যা নহে। বিভাবানুভাবাদির বৈচিত্র্যবশতঃ রস বিচিত্র। বলা বাহুল্য, ইহা লৌকিক দৃষ্টির অনুযায়ী। কিন্তু এখানেও বিভাবাদি ত মূলে রসের অঙ্গভূত। ঘটাকারবিরহিত ঘটজ্ঞান যেমন কল্পনীয় নহে, অথচ অখণ্ডজ্ঞান নির্বিষয়ক, সেইরূপ বিভাবাদিবিরহিত খণ্ডরস কল্পনীয় নহে, অথচ রসসামান্যে বিভাবাদির অবভাস নাই। বিক্ষিপ্ত বৃত্তিতে ভেদবোধ পরিস্ফুট, সেখানে বিভাবাদি যে পৃথক্ ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু যেখানে রসস্ফূর্তি সেখানেও বিভাবাদি আছে,

ভবে উহা অভিন্নভাবে রসাঙ্গরূপে ভাসমান। ইহা বিশিষ্ট রস। রসসামান্যে অবশ্য বিভাবাদির অবভাস থাকে না। কিন্তু বিশিষ্ট রসের মধ্য হইয়া না গেলে রসসামান্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। যখন বিশিষ্ট রসের স্ফূরণ হয় তখন রসসামান্যেরও স্ফূরণ হয় — অর্থাৎ রসস্ফূর্তিতে সামান্যাংশ ও বিশেষাংশ আছে, উভয়েই মিলিত। তন্মধ্যে বিশেষাংশের নিরোধ হইলে সামান্যাংশ থাকিয়া যায়। যেমন সুবর্ণ ও কুণ্ডল, — একটি বিশিষ্ট আকারে আকারিত সুবর্ণই কুণ্ডল। উভয়ে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, যখন কুণ্ডল দেখি তখন যেমন সুবর্ণকেও দেখি, সেইরূপ যখন বিশিষ্টরসের আস্বাদন হয়, তখন সামান্যরসেরও আস্বাদন হয়। সামান্যরসকেই বিশেষবশতঃ বিশেষ রস বলা যায়। সেই বিশেষাংশ না থাকিলে — অর্থাৎ বিলীন থাকিলে, রস সামান্যই। উহা নির্বিশেষ, নিরাকার। যে বিশিষ্ট আকারনিমিত্ত সুবর্ণকে কুণ্ডলাদি বলি, সে আকার না থাকিলে সুবর্ণ যেমন সুবর্ণ মাত্র, নিরাকার সুবর্ণ, কুণ্ডলাদি নহে। এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। সামান্যকে আশ্রয় করিয়াই বিশেষের স্ফূরণ হয়, আধারকে আশ্রয় করিয়াই আধেয়ের স্ফূরণ হয়, উপাদানকে আশ্রয় করিয়াই কার্যের স্ফূরণ হয়। কিন্তু বিপরীত মত সত্য নহে। কারণ বিশেষরহিত সামান্য, আধেয়হীন আধার, কার্যশূন্য উপাদান প্রতিভাত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, সেস্থলে অপেক্ষা-বুদ্ধি না থাকার দরুণ সামান্য, আধার বা উপাদান ইত্যাকার ভাবে জ্ঞান হয় না। কিন্তু বস্তুজ্ঞান অবশ্যই হয়। এখন বুঝিতে হইবে, যে-বিশেষের দরুণ এক রস নানা রস, সে-বিশেষের স্বরূপ কি ?

মনে করুন, এই বিশেষই উপাধি। ইহারই ভেদে রসের ভেদ হয়। বর্তমান অবস্থায় অর্থাৎ যখন আমরা বিক্ষিপ্ত বৃত্তির অধীন আছি তখন এ উপাধি যে বাহ্য ও অনিত্য তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। বস্তুতঃ এ উপাধি বাহ্যও নহে, অনিত্যও নহে। কাজেই রসে নিত্যই অন্তরঙ্গভাবে এ বিশেষ লাগিয়া আছে, সুতরাং রস যে নিত্যই নানা, নিত্যই স্বভাবতঃই পরস্পর বিলক্ষণ, বিশিষ্ট, তাহা মানিতে হইবে। অতএব রস এক, সর্বত্রানুস্যূত সামান্যভূত, ইহা যেমন সত্য, তেমনই রস অনন্ত, প্রতি রসই বিলক্ষণ ও বিশিষ্ট এবং এ বিশেষ স্বাভাবিক — কোন বাহ্য বস্তু কারণসম্বন্ধবশতঃ নহে, ইহাও তেমনই সত্য। যেখানে রসাস্বাদ সেখানে বাহ্যত্ব, আগন্তুকত্ব সম্ভবপর নহে। বাহ্য

ততক্ষণ যতক্ষণ ভেদ আছে, যতক্ষণ রসের উদয় হয় নাই। কিন্তু রসের অভিব্যক্তি হইলে বাহ্যত্ব থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে — এ উপাধি অনিত্য নহে কেন? উত্তরে বক্তব্য — জগতের যাবতীয় বস্তুই উপাধিস্বরূপ। যে দৃষ্টিতে কোন বস্তুই অনিত্য বা অসৎ নহে সে দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যায়। আপাততঃ যুক্তির দ্বারা ইহার সমাধান করিতেছি। অসৎ বলিলে কি বুঝায়? ইহাই বুঝায় যে, যে রূপটি একবার দৃষ্টি-গোচর হয়, অভিব্যক্ত হয়, ঠিক সে রূপটি আর দেখা যায় না। প্রতি নিমেষেই এইরূপ পরিবর্তন হইতেছে; কিন্তু ইহার তাৎপর্য কি? একের পর আর — এইভাবে অনন্ত রূপপরম্পরা অভিব্যক্ত হইতেছে, অথবা যাহা দ্বারা দেখা হয়, সেই চিত্ত ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে। বৃত্তি ভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি যেমন কথার কথা, রূপ না হইলে শুদ্ধ বৃত্তিও তেমনই। আসল কথা, এই বিশিষ্ট বৃত্তি ও বিশিষ্ট রূপ মাখামাখি। ইহারই স্রোত চলিয়াছে, — ইহাকে কালস্রোত বলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছি বলিয়া এই স্রোত আটকাইতে পারি না। কিন্তু কোন উপায়ে এই প্রবহমান স্রোতকে প্রতিবদ্ধ করিতে পারিলে স্থৈর্য আসিবে। অর্থাৎ বৃত্তি স্থির হইলে রূপও স্থির হইবে, রূপ স্থির হইলে বৃত্তিও স্থির হইবে। সুতরাং একাগ্র অবস্থায় যে রূপের প্রতিভাস হয়, সে রূপ চঞ্চল বা পরিবর্তনশীল নহে। যতক্ষণ চিত্তের একাগ্র অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ সেই স্থির বৃত্তির সম্মুখে রূপও অচঞ্চলভাবে প্রকাশমান থাকিবে। যদি এই একাগ্র অবস্থা ইচ্ছানুরূপ স্থায়ী থাকে, — যাহা মলিন প্রকৃতির ঊর্ধ্বে হইতে পারে, তাহা হইলে রূপের প্রকাশকাল স্বায়ত্ত থাকে। এই মনে করুন, একটি গোলাপফুলকে অবলম্বন করিয়া যদি আমার প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং এই একাগ্র সমাধি যদি সহস্র বৎসর না ভাঙ্গে, তাহা হইলে ঠিক ঐ সহস্র বৎসরই ঐ গোলাপটির প্রকাশ থাকিবে। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে জগতের শত লক্ষ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকিলেও স্থিরচিত্তের নিকট ঐ একমাত্র রূপই প্রকাশমান। অবশ্য এ সমাধি ভাঙ্গিতে পারে। কিন্তু তাহার হেতু এই যে, ভাঙ্গিবার কারণ চিত্তে আছে। যখন সে কারণ থাকিবে না, অর্থাৎ যখন রজঃ ও তমঃ কাটিয়া যাইবে, যখন সত্ত্ব বিশুদ্ধ হইবে, তখন এ সমাধি সদাকালীন অথবা ইচ্ছানুরূপ স্থিতিশীল হইবে।

জগতের যাবতীয় রূপই এক একটি প্রকাশ — মহাপ্রকাশের বিশিষ্ট বিলাস। আজ যদি সমাধি ভাঙ্গিয়া গিয়া কিম্বা আপন ইচ্ছায় সে রূপের তিরোধান হয়, তাহা হইলে ঠিক আবার সেইটিকে উদ্ভাসিত করা যায়। কারণ তিরোহিত হইলেও উহা কখনই মহাপ্রকাশের নিকট তিরোহিত হয় না, হইতে পারে না ; অব্যক্ত হয় শুধু বৃত্তি-জ্ঞানের নিকট। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সকল রূপই নিত্য, বস্তুমাত্রই সর্বদা সত্য। আর যে অবস্থায় সে রূপ ইচ্ছানুসারে প্রকাশমান থাকে তখন উহা বাহ্য নহে, প্রকাশেরই অঙ্গরূপে অর্থাৎ অনন্যরূপে অবস্থিত।

অতএব উপাধি যখন নিত্যই অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশমান, তখন অনন্ত বিশিষ্ট রস যে পরমার্থতঃ নিত্যকালই আছে, — অভিব্যক্তভাবেই আছে, তাহা স্বীকার্য। রস মাত্রই নিত্যসিদ্ধ, কদাপি সাধ্য নহে। তবে বৃত্তির অধীন বলিয়া আমরা উহা অব্যক্ত বলিয়া মানি। অভি-ব্যঞ্জক সামগ্রী আবরণ অপসারণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ রসেরই উদ্বোধন করিয়া থাকে এবং উদ্বোধনকালে অভিব্যঞ্জকও রসান্তর্গত হইয়া-পড়ে।

অতএব মানিতে হইবে যে বিশিষ্টরস প্রকারে এবং সংখ্যায় সর্বদা অনন্ত। কিন্তু অনন্ত হইলেও ইহার স্থিতি দ্বিবিধ। কখনও রসসামান্যে বিশেষ অন্তর্লীনভাবে শক্তিরূপে একাকার থাকে, কখনও বা পরিস্ফুটভাবে থাকে।

প্রথম শঙ্কার সমাধান একপ্রকার করা হইল। যাঁহারা মনে করেন, রসমাত্রই বিশেষাত্মক, সামান্য রস হইতে পারে না, তাঁহাদের মত সমীচীন বোধ হয় না। সামান্য না থাকিলে, বিশেষ থাকিতেই পারে না, একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। বিশেষাবস্থায় যখন আস্বাদন আছে, তখন সামান্য অবস্থাকেও রস না বলিয়া পারা যায় না। তবে সে রস সাধারণতঃ আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন।

সুতরাং বুঝা গেল, রস এক হইলেও তাহাতে অনন্ত বৈচিত্র্যের শক্তি আছে এবং এই শক্তি কখনও কখনও প্রস্ফুট হয়। যাহার বলে রস আপন বৈচিত্র্যশক্তিকে প্রস্ফুটিত করে অথবা প্রস্ফুট বৈচিত্র্যকে অন্তর্লীন করে তাহাই তাহার স্বাতন্ত্র্য। এই শক্তি বা উপাধিই রসের দেহ। ইহা সূক্ষ্মরূপে রসে লীন থাকুক কিম্বা স্থূলভাবে বিকশিত হউক, সদাই আছে। এই দেহের সঙ্গে রসের অভেদ সম্বন্ধ। প্রাকৃত জগতে যেমন দেহ ও দেহী ভিন্ন, এখানে সেরূপ নহে।

এ ত হইল শুদ্ধাবস্থার কথা। আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর জগতেও ঠিক ইহারই অনুরূপ অবস্থা। এই যে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই, ইহার প্রত্যেকটির অর্থ আছে। এক একটি মুখের যে ভাব, শুধু মুখের ভাব কেন, এক একটি মনুষ্য — এক একটি পশুপক্ষী, এক একটি বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, এক একটি বিশেষ ভাবের বা রসের বিকাশ অর্থাৎ স্থূলভাবে প্রকাশ। তবে ইহা অমিশ্র নহে, এইমাত্র কথা। কোন মনুষ্যের চেহারা সেরকম না হইয়া অন্যরকম হইল না কেন, হইতে পারিত না, ইহাই তাহার উত্তর। প্রতি মনুষ্যই যখন ভাবের বিকাশ, তখন ভাবের বৈশিষ্ট্যানুসারে আকৃতির বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক। আকৃতি ত ভাবেরই দেহ, সুতরাং ভাবের সহিত অভিন্ন। চরম পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একদেহে একটি বিশিষ্ট ভাবেরই বিকাশ হয়, অন্য ভাবের হয় না। যত ভাব তত দেহ। একই দেহ অবলম্বন করিয়া বহু ভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। তবে এক দেহের বহু বিলাস হইতে পারে — এক হিসাবে তাহাতেও ভাববৈচিত্র্য সম্পন্ন হয়।

ইহার পরে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রতি জীবের একটি আপন রূপ আছে — সেটি যে বিনশ্বর পদার্থের মত কল্পিত রূপ, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। যাবতীয় কল্পনার উপশম হইলেও তাহা থাকে। এই রূপ শুধু তাহারই রূপ, অন্যের নহে। ইহা ব্যতীত তাহার আর একটি রূপ আছে — সেটি সমভাবে সকল জীবেরই আছে, ঈশ্বরেরও আছে; এই দিক্ হইতে সে সকল জীবও ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন। প্রথমটি তাহার বিশেষ (Individual) রূপ; দ্বিতীয়টি সামান্য (Universal) রূপ। অর্থাৎ নির্বিশেষভাবে দেখিতে গেলে, যেমন সকল জীব এক এবং জীব ও ভগবান অভিন্ন, সবিশেষভাবে তেমনি প্রতি জীবই ভিন্ন এবং জীব ও

ঈশ্বর পরস্পর বিভিন্ন। সুতরাং জীবে ও ঈশ্বরে এবং জীবে ও জীবান্তরে এই ভেদাভেদ নিত্যই আছে। ভেদ যখন অনন্ত এবং অভেদ যখন এক এবং উভয়ই যখন নিত্য, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভেদ হইতে অভেদের দিকে কিম্বা ভেদের দিকে, দৃষ্টি অথবা ভাবও অনন্ত প্রকার। অর্থাৎ একটি জীব ভগবান্ অথবা জগৎকে যে চোখে দেখে, যেভাবে সংবেদন করে, অপর জীব ঠিক সেইরূপ করিতে পারে না। প্রতি জীবের দৃষ্টিকেন্দ্র স্বাভাবিক-ভেদবিশিষ্ট। সুতরাং ভগবানের সহিত এবং তাঁহারই অংশ জীবের সহিত প্রতি জীবেরই নিজের একটা বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। ভগবানেরও তেমনি প্রতি জীবের সহিত একটি বিশিষ্ট ভাবময় সম্বন্ধ আছে।

এই পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কারই রস সাধনার প্রথম সোপান। সৌন্দর্যতত্ত্বের সাধনা তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিতে পারা যায়, যখন পূর্বোক্তপ্রকারে রসসাক্ষাৎকার হইয়াছে। জীব শুদ্ধ চিৎশক্তি, তটস্থ হইলেও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং দর্পণবৎ স্বচ্ছ ; তাহার উপরে অনন্তপ্রকার সৌন্দর্যের ছায়াপাত হয় বলিয়াই অনন্তপ্রকার বিশিষ্ট রসের আস্বাদন হয়। এই যে অনন্ত রস ইহা অনন্তপ্রকার, কারণ জীবসংখ্যা অনন্ত। প্রতি দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে সৌন্দর্যের আভাস অনন্ত, দৃষ্টিকেন্দ্র অনন্ত বলিয়া প্রত্যেকটি আভাসও অনন্ত।

এই যে জীবের সামান্য ও বিশেষ রূপের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। যেখানে বিশেষরূপ অভিব্যক্ত সেখানেও অব্যক্তভাবে সামান্যরূপ থাকে, আর সামান্যরূপের অভিব্যক্তিকালেও অপরিস্ফুটভাবে বিশেষরূপ থাকে। অতএব ভেদ যেমন অভেদজড়িত, অভেদও তেমনি ভেদজড়িত। উভয়ে নিত্য সম্বন্ধ। ভেদাবস্থাতেও অভেদ আছে, তবে অভিভূত থাকে বলিয়া উহার উপলব্ধি মাত্র হয় না। অভেদাবস্থায় ভেদের সত্তাও সেইপ্রকার অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহার একটিও সাম্যভাব নহে। সাম্যভাব জীবভাব নহে, ঈশ্বরভাবও নহে, ভেদ বা অনেক নহে, অভেদ বা একও নহে — উহা সমকালে ভেদ ও অভেদ সমরূপে দুই-ই অথচ দুইয়েরই অতীত। জালন্ধরনাথের একটি কথা মনে পড়ে—

“দ্বৈতং বাঽদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা।”

অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব দ্বৈতও বটে, অদ্বৈতও বটে — অথচ বস্তুতঃ উহা দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পের অতীত।

পূর্ণ রসস্ফূর্তির স্বরূপ আলোচনাপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। এই সাম্যভাবে না দাঁড়াইলে রসানুভূতি পূর্ণ হইতে পারে না। এইখানে দাঁড়াইলে সবই সুন্দর দেখায়, সবই ভাল লাগে, সকলের প্রতিই প্রেমের অভিব্যক্তি হয় — কেন না, সব যে আমারই রূপ। সে অবস্থায় সেটাকে 'আমি' বলি কিম্বা 'তুমি' বলি তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। 'আমি' এবং 'তুমি' উভয় শব্দই সে অবস্থায় একই বস্তুর বাচক। ঔপনিষদগণ তাহাকে আত্মারাম অবস্থা বলেন, ভক্তগণ তাহাকে পরাভক্তি বলেন — স্বরূপতঃ উভয়ে কোন ভেদ নাই। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন —

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।

প্রথমে 'তোমাকে' বলিয়া নমস্কার করিলেন, পরে প্রত্যগাত্মভাবের স্ফূরণের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'আমাকে নমস্কার' — পরে দেখিলেন, যেটা 'তুমি' সেটাই 'আমি', সুতরাং তুমি ও আমি একত্র জড়িত করিয়া বলা হইল। যেখানে 'তুমি' ও 'আমি'র সাম্যভাব উপলব্ধ হইয়াছে, সেখানে 'তুমি' বলিলে 'আমি'কে বুঝায়, 'আমি' বলিলেও 'তুমি'কে বুঝায় — একই পদার্থের দুইটি নাম 'তুমি' এবং 'আমি'।

সূফী সম্প্রদায়ের সিদ্ধ কবি হল্লাজ বলিয়াছেন —

I am He whom I love, He whom I love is I,
We are *two* spirits dwelling in *one* body.

ইহা সেই উপনিষদুক্ত এক বৃক্ষে সমাসীন দুইটি পক্ষীর কথা — "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"।

পক্ষান্তরে জিলি বলিয়াছেন —

We are the spirit of *one*, though we dwell by turns in *two* bodies.

জলালুদ্দীন রুমিও প্রকারান্তরে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন—

Happy the moment when we are seated, thou and I;
With two forms and with two figures, but with one soul, thou and I.

জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর নির্দেশ আর কি হইতে পারে ?

যে এই ভাবে আরোহণ করিয়াছে সে আপনরূপে আপনি বিভোর হয়। একজন ভক্ত পূর্ণ সৌন্দর্যের অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া, পরে সেই অবস্থার স্মৃতি অবলম্বনে গাহিয়াছিলেন —

অহো নিমগ্নস্তব রূপসিন্ধৌ
পশ্যামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্ ।
অবাক্ চ নিঃস্পন্দতমো বিমূঢ়ঃ
কুত্রাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি দেব ॥

এখানে তুমি-ভাব আশ্রয় করিয়া ভক্তের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও আবার আমি-ভাবই প্রধানত ফুটিয়া উঠে।

সাধারণ মনুষ্যের জীবনেও এমন শুভ মুহূর্ত কখন কখন আসে, যখন সে তাহার খণ্ড আমি বা পরিচ্ছিন্ন-অহংকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণাহন্তার আভাস যেন কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হয়। তখন জগতের সর্ববস্তুর দিকে, এমন কি তাহার আপন রূপের দিকেও সে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে দৃষ্টিপাত করে — তখন তাহার নয়নসমক্ষে সবই যেন এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত বোধ হয়। তখন 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' তখন সকলই — তুমি, আমি এবং জগৎ — সকল পদার্থই যে মধুময় তাহা বুঝা যায়। তখন মনে হয়, সুখ-দুঃখ আনন্দে ভরা, নিন্দা ও স্তুতি মাধুর্যপূর্ণ, ভাল-মন্দ একাকার। তখন অন্তরে ও বাহিরে একটা একতান মধুর স্রোত বহিতে থাকে। একটা অসীম অনন্ত মাধুর্যসাগর আপন উজ্জ্বল প্রকাশে আপনি আপনারই কাছে যেন প্রকাশমান হইয়া উঠে। কখনও তাহাতে তরঙ্গ থাকে, কখনও বা থাকে না, অথবা সমকালে তরঙ্গ ও স্থৈর্য উভয়ই থাকে — কিন্তু মাধুরীর হ্রাস হয় না। ইহাই পূর্ণ রসবোধের অবস্থা। এখানে মিলনে আনন্দ, বিরহেও আনন্দ — হাসিতে মধু, কান্নাতেও মধু।

যাহা আমি তাহাই তুমি, আবার যাহা তুমি তাহাই জগৎ — সুতরাং যাহাকে আত্মপ্রেম বলে তাহারই অপর পক্ষ ভগবৎ প্রেম, সেইরূপ ভগবৎ প্রেমের অপর দিক্ জীব ও জগতের প্রতি ভালবাসা। মূল বস্তু এক এবং অদ্বিতীয়।

একই পুরুষ উত্তম ও প্রথম ভেদে কল্পিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ণরসের উদ্বোধ হইলে, এই এক ও অখণ্ড প্রেমের বিকাশ হয়।

কিন্তু ভেদদৃষ্টিতে জীব, জগৎ ও ভগবানের স্বরূপগত পরস্পর বৈলক্ষণ্যও ত আছে। পূর্ণ রসাস্বাদনকালে তাহাও অবশ্যই প্রকটিত হয়। নতুবা আস্বাদনের পূর্ণতা অসিদ্ধ থাকিয়া যায়।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতি জীব রসানুভূতি-কালে এমন একটি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সে যে আনন্দের আস্বাদন করে, অপর জীবও রসানুভব সময়ে তাহাই করে — কারণ তখন সেও যেমন পূর্ণ-আমি, অপর জীবও তাহাই, সুতরাং আস্বাদন-কর্তা বস্তুতঃ একই। এই আনন্দই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই ত চলিবে না। প্রতি জীবের স্বভাব যখন বিলক্ষণ, তখন একটি জীব যে বিশিষ্ট আনন্দের আস্বাদন করে, অপর কোন জীব তাহা করিতে পারে না, ইহা মানিতেই হইবে। এই আস্বাদনের প্রকার অনন্ত, সম্ভাবনীয়তা অপরিমিত। কাজেই কালাতীত ঐক্য অথবা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াও প্রতি জীবের আনন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কদাচ ন্যূন হয় না। একটা স্থির আনন্দের বক্ষে নিত্য নূতন অপরূপ আনন্দ ফুটিয়া উঠে — ব্রহ্মানন্দের সমুদ্রবক্ষে এই ত নিত্যলীলার লহরমালা। এই বিশিষ্ট আনন্দের দিক দিয়াই ভগবানের সহিত জীবের গুপ্ত সম্বন্ধ।

এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া বিশিষ্ট রসের আস্বাদনেই রসসাধনার সার্থকতা। রসজ্ঞ সামাজিকগণ এইজন্যই নির্বিশেষ সামান্যাত্মক ব্রহ্মানন্দ লাভকে রসচর্চার চরমফল বলিয়া মনে করেন না। স্বায়ম্ভুব আগমে আছে —

ব্রহ্মানন্দরসাদনন্তগুণিতো রম্যো রসো বৈষ্ণবঃ।
তস্মাৎ কোটিগুণোজ্জ্বলশ্চ মধুরঃ শ্রীগোকুলেন্দো রসঃ ॥

ব্রহ্মানন্দে সে মাধুর্য নাই, এমন কি বৈষ্ণবরসে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধি-পতি পরমাত্মানন্দরূপ রসেও শান্ত ও দাস্যের ঊর্ধ্বে গতি নাই বলিয়া মাধুর্যের সম্ভাবনা নাই। মাধুর্য একমাত্র ভগবদানন্দরসেই আছে। সখ্য ও বাৎসল্য অতিক্রম করিয়া উজ্জ্বল রসের মধ্যেই মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। অতএব সবিশেষ ভগবদ্‌ভাবে আরূঢ় না হইলে পূর্ণভাবে রসের আস্বাদন হইতে পারে না।

প্রত্যেকটি ব্যক্তির সহিতই সামান্যের একটি নিগূঢ় ও আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। ব্যক্তি সামান্যকে সামান্যভাবে পাইয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাকে আপন বিশিষ্টভাবে অনন্তকাল সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। যখন পারে তখনই সে যথার্থ রসিক, তৎপূর্বে নহে। প্রতি ব্যক্তির সহিত সামান্যের এই মিলন অতি গুপ্ত স্থানে সংঘটিত হয় — সে বিজন কুঞ্জমধ্যে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, কারণ সেখানে সামান্য শুধু সেই ব্যক্তিরই, অন্য ব্যক্তির নহে।

প্রতি ব্যক্তিই সামান্যকে বলিতে পারে — 'তুমি আমারই — শুধু আমারই'। এ কথা সত্য। আবার এ কথাও সত্য যে, সামান্য সকল ব্যক্তিরই সমান ধন, কাহারও নিজস্ব নহে। শ্রীকৃষ্ণ রাধাবল্লভ ইহাও যেমন সত্য, আবার গোপীমাত্রেরই বল্লভ ইহাও তেমনি সত্য। তবে ইহার মধ্যে একটি রহস্য আছে, যে গুপ্ত স্ব-ধামে শ্রীকৃষ্ণ শুধু একজনের, যতক্ষণ ঠিক সে স্থানে না যাওয়া যায়, ততক্ষণ 'তুমি আমার' এ কথা বলা চলে, কিন্তু 'শুধু আমারই' এ কথা বলা চলে না। সেই স্ব-ভাবের নামই রাধাভাব। যে গোপী সেই মহাভাবময় স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত সে-ই রাধা।

আমরা পূর্ণ রসাস্বাদের একটু দিগ্‌দর্শন করিলাম। অভিনব-গুপ্তাচার্য রসের যে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে রসতত্ত্বের মূল সূত্রটি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রস নিত্য বস্তু — আস্বাদ্যমান না হইলে যখন রসপদের সার্থকতা নাই, তখন উহা নিত্যই অস্বাদ্যমান। কিন্তু আস্বাদন করে কে? যেখানে ভোগ্য নিত্য, ভোগও নিত্য, সেখানে ভোক্তাও যে অবশ্যই নিত্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং, এ ভোক্তা "খণ্ড আমি" নহে, যে-আমি দেশে ও কালে পরিচ্ছিন্ন, মলিন সত্ত্বে উপহিত সে-আমি নহে, যে-আমি দেহসম্বদ্ধ বলিয়া জন্মমৃত্যু ও সুখদুঃখের অধীন সে-আমি নহে, যে-আমি প্রাকৃতিক নিয়মের নিগড়ে শৃঙ্খলিত, অনাদি কর্ম-সংস্কারের বশবর্তী সে-আমি নহে — কিন্তু পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন, নির্মল ও নিত্য আমি। এই "পূর্ণ আমি" দেশ-কালের অতীত, প্রাকৃতিক দেহবিরহিত, জাগতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে স্বাধীনভাবে নিত্য বিরাজমান — ইহার জন্ম-মরণ নাই, সুখ-দুঃখ নাই, বাসনা-কামনা নাই। এই পূর্ণ আমিই রসের আস্বাদয়িতা, ভোক্তা। কিন্তু ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ বস্তুতঃ একই পদার্থ — রসস্ফূর্তিকালে উহাদের পৃথগবভাস থাকে না, থাকিলে

রসস্ফুরণ হইতে পারে না। "ভোক্তৈব ভোগ্যরূপেণ সদা সর্বত্র সংস্থিতঃ"। তবে যে ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি পদপ্রয়োগ করা হয়, সে কেবল অলৌকিক ত্রিপুটীর অনুরোধে। পানকরসের ন্যায় ভোক্ত্রাদি পদার্থত্রয় অনেক হইয়াও একাত্মক। সুতরাং অভিনবগুপ্তাচার্যের সার সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ণ আমিই নিত্য আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেছেন। এই আস্বাদন বা চর্বণ শুধু শুষ্ক জ্ঞানমাত্র (cognition) নহে — সাংখ্যের পুরুষ যেমন প্রকৃতিকে নির্লিপ্ত ও উদাসীন দৃষ্টিতে পৃথগ্‌ভাবে সাক্ষিরূপে দূর হইতে অবলোকন মাত্র করেন* তাহা নহে — ইহা ভাবময় অনুভূতি (feeling)। সুতরাং রস যখন ভাবের গাঢ় ও অভিব্যক্ত অবস্থা মাত্র, তখন উহা যে শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহে, তাহা সুখবোধ্য। অর্থাৎ রসতত্ত্ব আনন্দাত্মক, শুধু চিদাত্মক নহে†। এইজন্যই আচার্য রসানুভূতিকে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক এই উভয় বিরুদ্ধ কোটি হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ সবিকল্পাদি ভেদ জ্ঞানগত, ভাবগত নহে।

রসই আনন্দ — রসই প্রেম। ইহা ভগবানের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ। এইজন্যই বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রেমকে 'আনন্দচিন্ময় রস' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রেমের যাহা আলম্বন, তাহা এই প্রেমে নিত্যই সংলগ্ন আছে। রসস্ফূর্তিকালে অলৌকিক ত্রিপুটীর সত্তা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। আলম্বন আশ্রয় ও বিষয়ভেদে দ্বিবিধ। এখানে আশ্রয়ালম্বন কিম্বা ভোক্তা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু প্রেমের বিষয়ালম্বন সৌন্দর্য। অর্থাৎ যাহা ভাল লাগে অথবা যাহা ভালবাসি, তাহাই সৌন্দর্য এবং ভাল লাগাই প্রেম। অতএব মূলতঃ প্রেম ও সৌন্দর্য অভিন্ন হইলেও রসস্ফুরণের দিক্ হইতে উভয় নিত্য সম্বদ্ধ।

---

* প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ স্বস্থঃ প্রেক্ষকবদুদাসীনঃ।

† 'শুধু চিদাত্মক নহে', বলিবার তাৎপর্য এই যে সাংখ্যোক্ত কৈবল্য রসপদবাচ্য নহে। পুরুষ চিৎস্বরূপ — এই স্বরূপাবস্থিতিই কৈবল্য। ইহা আনন্দাত্মক অবস্থা নহে। এইজন্য বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবাচার্যগণ এ অবস্থাকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন না। এখানেও বস্তুতঃ আবরণের সত্তা আছে। যখন এই আবরণ অপগত হইবে, যখন চিৎতত্ত্ব অবাধিত হইবে, তখনই আনন্দের প্রকাশ হইবে। কারণ, অবাধিত আত্মবিশ্রান্ত চৈতন্যই আনন্দের স্বরূপ।

আমরা সাধারণ অবস্থাতেও এই তত্ত্বের একটা পরিচয় পাই। কবি বলিয়াছেন — "ভাবের অঞ্জন মাখি যে দিকে প্যালটি আঁখি, নেহারি জগৎ এই অসীম সুন্দর।" অর্থাৎ হৃদয়ে ভালবাসা থাকিলে, চক্ষু সেই রাগে রঞ্জিত হইলে সর্বত্রই সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না। ভালবাসাই সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। যাহাকে যে ভালবাসে, তাহাকে এইজন্যই সে সুন্দর না দেখিয়া পারে না। তাই স্নেহময়ী জননীর চোখে কানা ছেলেও পদ্মপলাশলোচন বলিয়া প্রতিভাত হয়। আবার, যেখানে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে ভালবাসা আপনিই জাগিয়া উঠে। উভয় পক্ষই বীজাঙ্কুরবৎ পরস্পর জড়িত। রসানুভূতি যখন ভোক্তার দিক্ হইতে ফোটে তখন প্রথম পক্ষ যখন ভোগ্যের দিক্ হইতে জাগে, তখন দ্বিতীয় পক্ষ সার্থক বলিয়া বুঝা যায়। ঐ অনুভূতি কাহার কোন্ দিক্ হইতে কখন জাগে, তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ দুই পক্ষই সমান সত্য। অর্থাৎ প্রেম ও সৌন্দর্য উভয়ে পরস্পর ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক সম্বন্ধ। কোন্‌টি পূর্বে, কোন্‌টি পরে, সে প্রশ্নের উত্তর নাই।

আমরা এই দুই দিক্ হইতে কথাটার একটু আলোচনা করিব। সর্বদেশে ও সর্বকালেই প্রাজ্ঞগণ এই তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছেন। শকুন্তলার সেই—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

এই শ্লোকে কালিদাস এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির রমণীয়তা বলিলে সৌন্দর্যই বুঝায়। কালিদাস বলেন, এই সৌন্দর্যদর্শনে চিত্তে ভালবাসার বা "সৌহৃদের" স্মৃতি জাগিয়া উঠে — যদিও সে স্মৃতি অস্পষ্ট হউক, যদিও উহা অবুদ্ধিপূর্বক হউক এবং যদিও সে ভালবাসা "ভাবস্থির" হউক, তথাপি উহা ভালবাসারই স্মৃতি বটে। কিন্তু যাহার অনুভব হয় নাই, তাহার ত স্মরণ হয় না, সুতরাং মানিতে হইবে আমরা সৌন্দর্যকেই ভালবাসিয়াছিলাম। নতুবা সৌন্দর্যদৃষ্টে ভালবাসার স্মৃতি জাগিত না।

সৌন্দর্য ও সুন্দর, প্রেম ও প্রেমিক, একই। ধর্ম ও ধর্মীতে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই। যে জ্ঞাতা সে-ই জ্ঞান, যে আনন্দময় সে-ই আনন্দ, যে চেতন সে-ই চৈতন্য — আবার বিষয়ও সে-ই।

কিন্তু তবু জ্ঞানাংশে বহুত্বের আরোপ হয়, জ্ঞাতা একই থাকে। উপাধিভেদে সৌন্দর্য অনন্ত হইলেও সুন্দর একই বটে, তেমনই উপাধি-ভেদে প্রেম অনন্ত হইলেও প্রেমিক একই, তাহা সত্য।

প্রেমিক যেন "আমি", আর সুন্দর যেন "তুমি"। জগতের যত সৌন্দর্য সবই যখন এক সৌন্দর্য, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় সুন্দর তুমি। সব প্রেমই যখন মূলে এক প্রেম, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় প্রেমিক আমি। তোমার অনন্ত সৌন্দর্য, আমার অনন্ত প্রেম — প্রকারে অনন্ত, কালে অনন্ত, দেশে অনন্ত, বৈচিত্র্যে অনন্ত — ইহাতেই তোমাতে আমাতে নিত্যলীলা। অবশ্য এ লীলার স্ফূর্তি তখন সম্ভবপর যখন তুমি ও আমি স্বরূপে সজাগ থাকি।*

সুতরাং লীলা অনন্ত, ধাম অনন্ত, আস্বাদন অনন্ত। এইজন্যই পূর্ণ সৌন্দর্য চিরপুরাতন হইয়াও প্রতিক্ষণে রসিকের নিকট 'নিত্য নূতন' রূপে প্রতিভাত হয়। 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল' — দেখিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কখনই নিবৃত্ত হয় না।

ভালবাসা ও সৌন্দর্য জলপিপাসা ও জলের সহিত উপমেয়। সৌন্দর্য ভিন্ন ভালবাসার দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নাই। শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার একমাত্র বিষয় যেমন সত্য, জ্ঞানের একমাত্র বিষয় যেমন মঙ্গল বা নিঃশ্রেয়স, প্রেমের একমাত্র বিষয় তেমনই সৌন্দর্য বা প্রেয়ঃ। যদি জগতে জল বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে পিপাসাও থাকিত না, কারণ জল ও পিপাসা পরস্পর সাপেক্ষ। সেইজন্যই পিপাসার সত্তাই জলের সত্তা প্রমাণিত করে।

বস্তুতঃ পিপাসা জলের অভাব সূচনা করে অথবা সত্তা সূচনা করে, তাহা আলোচনার বিষয়। পিপাসা বিরহ, — উহা একদিকে যেমন মিলনের অস্পষ্ট স্মৃতির উদ্দীপক, অপর দিকে তেমনি মিলনের

* নানা ভক্তে রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়। চৈ, চরিতামৃত, মধ্য লীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ। শ্রীভগবান্‌ই সকল রসের বিষয় ও আশ্রয়। সুতরাং বস্তুতঃ ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন। লীলারস আস্বাদনের জন্য এই অভেদের মধ্যে রূপভেদ জাগিয়া উঠে।

সংঘটক। পিপাসা শব্দের অর্থ কি ? (ক) 'আমি জল চাই' এই যে বোধ ইহাতে জল কি তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। তেমন ভাবে স্মরণ করিতে পারিলে এই বোধ হইতেই জলের আবির্ভাব হইতে পারে, — এটি সৃষ্টিরহস্য।* এক হিসাবে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা ব্যতিরেকে অনুভব ও স্মৃতিতে মূলে কোন ভেদ নাই, — স্মৃতি বস্তুতঃ অস্পষ্ট অনুভব আর অনুভব স্পষ্টীকৃত স্মৃতি। উভয়ে কালগত ভেদ ভিন্ন আর বিশেষ কোন ভেদ থাকিতে পারে না। অতীতের আবরণ সরাইলে তাহাই বর্তমান। বর্তমানে আরোপ পরাইলে তাহাই অতীত — কালিক ভেদ কল্পনাপ্রসূত। যে কোন বস্তু সম্বন্ধে তীব্র ইচ্ছা, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিলেই সে বস্তু সৃষ্ট হয় অথবা অভিব্যক্ত হয়। স্মৃতি অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছার উদয় হওয়া সম্ভব নহে। ইচ্ছার উদয় হইলে প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্র কি বিলম্বে, এখানে কি দেশান্তরে প্রাপ্তি ঘটিবে তাহা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। উৎকট ইচ্ছা হইলে দেশকালের কোন নিয়ম থাকে না। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়।

যেখানে পিপাসা একপ্রকার তীব্র, সেখানে জল ত পিপাসা হইতে আপনি ফুটিয়া বাহির হইবে। সুতরাং সে স্থলে পিপাসা জলের সত্তা-সূচক ও সত্তার আবিষ্কারক। (খ) পক্ষান্তরে পিপাসা শব্দে কণ্ঠ-শুষ্কতা প্রভৃতি বোধের অবসানকামনা বুঝায়। এই স্থলে জললাভের আশা নাই, কারণ জল ত ইচ্ছার বিষয় নহে। যাহা চাওয়া হইতেছে তাহা কণ্ঠশুষ্কতার নিবৃত্তি, সে বোধ অস্পষ্ট হইলেও পিপাসুর অবশ্যই আছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহারই নাম দুঃখনিবৃত্তি অথবা শান্তি, এই ইচ্ছার ফলে জল ব্যতিরেকেই পিপাসার নিবৃত্তি হয়। এ স্থলে পিপাসা জলের ভাব কিম্বা অভাব কিছুই সূচনা করে না।

আমরা যাহাকে অভাব বলি তাহা বস্তুতঃ আংশিক আবরণ মাত্র। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যেটি অভাবের প্রতিযোগী, অভাবজ্ঞান তাহারই স্মৃতিঘটিত। এই স্মৃতিতে ভাবই আলম্বনস্বরূপ, সেইজন্য স্মৃতির গাঢ়তায় অর্থাৎ অভাববোধের তীব্রতায় ভাবের উদয় হয়। ইহা যোগবিজ্ঞানের একটি গূঢ় তত্ত্ব। আমের

* এইজন্যই আগমিকগণ স্মৃতিকে সর্বসিদ্ধিপ্রদানসমর্থ চিন্তামণির সহিত তুলনা করেন এবং মন্ত্রাদির প্রাণস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। "ধ্যানাদিভাবং স্মৃতিরেব লব্ধা চিন্তামণিস্তদ্বিভবং ব্যনক্তি"।

অভাববোধ আমের স্মৃতি ভিন্ন যখন হয় না এবং আমের স্মৃতিতে যখন সূক্ষ্মভাবে আমই আলম্বন রহিয়াছে, তখন বলিতেই হইবে, আমের অভাববোধের মূলেও আম আছে। সুতরাং, তীব্রভাবে সে বোধ জন্মিলে ঐ সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত আম স্থূলরূপে, ব্যবহারিকভাবে অভিব্যক্ত হইবে ; অতএব আমের প্রভাব মানে আমের সূক্ষ্ম সত্তা, ঐকান্তিক অভাব নহে। ঐকান্তিক অভাব প্রতিযোগি-নিরপেক্ষ, ভাষায় তাহার ব্যপদেশ সম্ভবে না, চিন্তারাজ্যেও তাহার স্থান নাই। আমরা যে অভাব শব্দের প্রয়োগ করি, তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভাবরূপেই পরিগণিত হয়, কিন্তু উহা ব্যবহারযোগ্য ভাব নহে। আমরা অভাবকে যে আংশিক আবরণ বলিয়াছি, এবার তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পিপাসা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ভালবাসা সম্বন্ধেও ঠিক সেই সব কথা প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা খণ্ড আমি অথবা পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কারের দিক হইতেই করা হইতেছে। যে যেপ্রকার ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করে, যে বিশিষ্ট সৌন্দর্যকে বিষয়রূপে প্রাপ্ত হইতে কামনা করে, তাহা অবশ্যই আছে। ভালবাসা তীব্র হইলেই সে সৌন্দর্য প্রকাশিত হইবে। অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার অনন্ত। চাহিতে জানিলেই ভাণ্ডার খুলিতে পারা যায়। এইজন্য নরোত্তম দাস বলিয়াছেন যে, রাগমার্গের সাধনার প্রধান বিশেষত্ব শুধু আকাঙ্ক্ষা করা — "ভাবনা করিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা", ইহা অতি সত্য কথা।

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি. তাহা হইতেই কাম ও সৌন্দর্যের সম্বন্ধও বুঝিতে পারা যাইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন কামদেব ও রতিতে প্রাকৃত সৌন্দর্য কল্পনার চরম উৎকর্ষ হইয়াছে, গ্রীক সাহিত্যেও সেইরূপ। কাদম্বরীতে কুসুমায়ুধকে "ত্রিভুবনাদ্ভুতরূপসম্ভার" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। কামকে "রূপৈক-পক্ষপাতী" এবং "নবযৌবনসুলভ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। Venus, Aphrodite, Adonis, Eros প্রভৃতির রূপ-বর্ণনা আলোচনা করিলে প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যেও যে কামদেবেই সৌন্দর্য কল্পনার উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস হয়। যে কোন কারণেই হউক সৌন্দর্য কামের উদ্দীপক এবং কাম সৌন্দর্যের প্রকাশক — এ কথা অস্বীকার করা চলে না। পণ্ডিত Remy de Gourmont তাঁহার 'Culture des Ideas' (১৯০০, পৃঃ ১০৩) গ্রন্থে

বলিয়াছেন — "That which inclines to love seems beautiful ; that which seems beautiful inclines to love. This intimate union of art and love is indeed the only explanation of art. Art is the accomplice of love." অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও এ বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। পণ্ডিত শান্তায়ন (G. Santayana) তাঁহার "The Sense of Beauty" নামক গ্রন্থে, গ্রোস (Gross) "Der æsthetische Genuss" নামক গ্রন্থে, কলিন স্কট "Sex and Art" নামক প্রবন্ধে (American Journal of Psychology, সপ্তম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০৬ পৃষ্ঠা), স্ট্রাজ (Stratz) তাঁহার "Die Schonheit des Weiblichen Korpos" নামক পুস্তকে এই বিষয়ের সবিশেষ চর্চা করিয়াছেন। শান্তায়ন স্পষ্টাক্ষরে যৌন আকর্ষণকে (sexual attraction) সৌন্দর্যবোধের (æsthetic contemplation) অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে বিশিষ্ট (specific) যৌন ভাবও (sexual emotion) সৌন্দর্যবোধের অন্তর্গত। গ্রোস দেখাইয়াছেন যে, যৌন ভাব ও সৌন্দর্যবোধ পরস্পর সম্বদ্ধ। কামশাস্ত্রেও এই বিষয়ের আলোচনা আছে। কামতত্ত্বের স্ফুরণ না হইলে চেহারায় লাবণ্য খেলে না, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।

বস্তুতঃ প্রেম ও কামে স্বরূপগত কোন প্রভেদ নাই। একই রস উভয়থা অভিহিত হয়। প্রাচীনকালে উভয় নাম এক বস্তুরই বাচক বলিয়া পরিচিত ছিল। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র কামবীজ, গায়ত্রী কামগায়ত্রী। "কামাদ্ গোপ্যঃ", এ কথা চিরপ্রসিদ্ধ। জগতের আদিদম্পতি কামেশ্বর-কামেশ্বরী, ইহা আগম শাস্ত্রে পরিচিত। আদিরস শৃঙ্গার কামাত্মক। এই সব স্থলে কামশব্দে প্রেমই বুঝিতে হইবে।

সাধারণতঃ ব্যবহারে কাম ও প্রেমের যে ভেদ লক্ষিত হয়, যাহা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে কামকে লৌহ ও প্রেমকে

সুবর্ণ বলা হইয়াছে, সেই ভেদের কারণ রসের শুদ্ধতা কিম্বা মলিনতা। বাহ্য বিষয়ের উপরাগবশতঃ রসের মলিনতা হইয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম। বলা বাহুল্য, ইহাতেও সেই তত্ত্বই প্রকটিত হইয়াছে।

মোট কথা, এ ভেদ প্রাচীন আচার্যগণও জানিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন — শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত মদন, কামদেব প্রাকৃত মদন। মদন কিন্তু একই — প্রকৃতির উর্ধ্বে অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ সম্পর্কশূন্য হইলে, মদন শ্রীকৃষ্ণ। ইনি 'কোটীকন্দর্পলাবণ্য,' 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ' — ইনিই আগমের ললিতা বা সুন্দরী। মহাযোগী কিম্বা মহাজ্ঞানীও এ বিশ্ববিমোহিনী মহাশক্তির কটাক্ষপাতে বিচলিত হইয়া উঠেন।* কামদেব ইঁহারই কণামাত্র সৌন্দর্য পাইয়া ত্রিভুবনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সৌন্দর্যলহরীকার বলিয়াছেন—

হরিস্ত্বামারাধ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ।
স্মরোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা
মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাম্‌ ।।

সৌন্দর্য একই — অপ্রাকৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণে, প্রাকৃতভাবে কামদেবে। অপ্রাকৃত সৌন্দর্য ও অপ্রাকৃত কামের সমরসাবস্থা শুদ্ধ শৃঙ্গার, প্রাকৃত সৌন্দর্য ও প্রাকৃত কামের সাম্যাবস্থা মলিন শৃঙ্গার। অতএব কাম ও সৌন্দর্য রসস্ফূর্তিকালে নিত্যমিলিত ভাবেই প্রকাশমান হয়।

এক মহাসৌন্দর্যেরই অনন্ত কলা অনন্ত খণ্ডসৌন্দর্যরূপে নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছে। এই সকল শুদ্ধ, কালাতীত কলা কালশক্তির আশ্রয়ে মলিন এবং বিনশ্বর ভাবে প্রকাশ পায়।

---

* শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্তি ধর। অতএব আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তহর। চৈ, চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ। শ্রীভগবান্‌ আপন সৌন্দর্যে আপনি পর্যন্ত মোহিত হইয়া পড়েন। ললিতমাধবে আছে — "অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।" পূর্ণ সৌন্দর্যের এমনি আকর্ষণ !!

অব্যাহতাঃ কলাস্তস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ ।
জন্মাদিষড়্‌বিকারাত্মভাবভেদস্য যোনয়ঃ ॥

জগতের সৌন্দর্য দেখিয়া পূর্ণসৌন্দর্যের স্মৃতি হৃদয়ে জাগে বলিয়াই প্রাণ কাঁদে। একজন ভাবুক কবি* এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন — "The youth sees the girl; it may be a chance face, a chance outline amidst the most banal surroundings. But it gives the cue. There is a memory, a confused reminiscence. The mortal figure without penetrates to the immortal figure within and there rises into consciousness a shining form, glorious, not belonging to this world, but vibrating with the agelong life of humanity, and the memory of a thousand love-dreams. The waking of this vision intoxicates the man; it glows and burns within him; a goddess (it may be Venus herself) stands in the sacred place of his temple; a sense of awe-struck splendour fills him and the world is changed." দেশকালের বাহিরে এই পূর্ণ সৌন্দর্য, সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ, আমরা আস্বাদন করিয়াছি। তাহারই পুনঃ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ঐন্দ্রিয়ক জগতে বিচরণ করিতেছি — কিন্তু এখানে উহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, মনে হয় সবই যেন পরিচিত, অতি পরিচিত, অথচ এই পরিচয়ের উপরে একটা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয় শুধু আংশিকভাবে ও ক্ষণিকভাবে সে আড়াল সরাইয়া দেয় — তখনই চির-পরিচিতকে "এই যে" বলিয়া চিনিয়া ফেলি।

যে সংসারসুখে সুখী, সেও সৌন্দর্যের মোহন করস্পর্শে ব্যাকুল হইয়া উঠে, যেন কিসের বিরহে কাতর ও চঞ্চল হয়। বস্তুতঃ সে তখন অজ্ঞাতসারে জন্মান্তরের সৌহৃদ স্মরণ করে। অনন্ত প্রকারের অনন্ত বিশিষ্ট ভাব হৃদয়ে স্থির হইয়া আছে — বিভাবাদির প্রভাবে তাহারই কোনটি না কোনটি অকস্মাৎ রসরূপে জাগিয়া উঠে।

* Edward Carpenter : "The Art of Creation." p. 137.

এক সৌন্দর্যই যখন নানা সৌন্দর্য এবং সেই মৌলিক নানা সৌন্দর্যই যখন জগতের ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্যরূপে প্রকাশমান, তখন জগৎ যে সৌন্দর্যসার তাহা বুঝা যায়। সকল বস্তুই সুন্দর, সবই রসময়, কিন্তু চিত্তে মল ও চাঞ্চল্য আছে বলিয়া দেখিবার সময় তাহা অনুভূত হয় না। রস তখন সুখ-দুঃখরূপে এবং সৌন্দর্য সুন্দর-কুৎসিতরূপে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কালের স্রোত সবেগে বহিতে থাকে এবং আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ে বিভাগ হয়, নীতির জগতে নামিয়া পড়ি, পাপপুণ্যের আবির্ভাব হয় ও রাগদ্বেষ সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠে।

যে দিকে তাকাই সে দিকেই যদি সৌন্দর্য না দেখিতে পাই, যাহাকে দেখি তাহাকেই যদি ভালবাসিতে না পারি, তবে রসসাধনার সিদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। সৌন্দর্য অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না, ভালবাসার কোন হেতু নাই। পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রেমের সহিত স্বাভাবিক মিলনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিতই স্বাভাবিক মিলন ফুটিয়া উঠে, যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কেহই পর থাকে না, কিছুই কুৎসিত থাকে না। মানুষের জীবনে সৌন্দর্যসাধনার ইহাই যথার্থ পরিণাম।